রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
আধুনিক সংস্করণ

শচীন্দ্রনাথ বসু

প্রাগিতিহাসের মানুষ



প্রাগিতিহাসের মানুষ

* রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত *

প্রাগিতিহাসের মানুষ

মানুষ সৃষ্টি থেকে পুরাপ্রস্তর যুগের কাহিনী

শচীন্দ্রনাথ বসু

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৪

প্রকাশক

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক

শক্তি রঞ্জন মিশ্র

ইউনাইটেড প্রিন্টার্স

৩০২/২/এইচ/৫, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

চিত্রশিল্পী

শচীন্দ্রনাথ বসু

প্রচ্ছদ

দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য

শচীন্দ্রনাথ বসু

দাম

সুলভ ৪০·০০

লাইব্রেরী ৪৫·০০

লেখকের ভূমিকা

বিশ্ব ও প্রাণ সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে মানব সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' ২০ বছর আগে প্রকাশিত হয়। বইখানি সমাদর পেয়েছিল, তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কলা কৌশল গড়ে ওঠার ফলে পুরাতত্ত্বে দ্রুত আবিষ্কার ঘটেছে এবং তার সঙ্গে দেশে দেশে এ সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল বাড়ছে, তাই সে বইয়ের তিনটি অংশ এখন পৃথক, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত গ্রন্থ রূপে দেখা দিয়েছে। এগুলিতে বর্তমানে অচল বা স্বল্পমূল্য বস্তু বর্জন করে অন্তর্বর্তী দুই দশকে উদঘাটিত নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে, তা ছাড়া আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আরও বিস্তারিত আলোচনা।

প্রথম সংস্করণের প্রথম অংশ 'মানুষের আগে' এবং তৃতীয় অংশ 'সভ্যতার আগে' নামে পুনঃপ্রকাশিত, বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয় ও বৃহত্তম ভাগের পরিবর্ধিত রূপান্তর। 'মানুষের আগে' প্রধানত সৌর জগতের ও জীব কুলের ক্রমবিকাশের কাহিনী। তার পর মানুষ গড়া থেকে শুরু করে দীর্ঘ পুরাপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন আদি মানবের অভ্যুদয় ও সর্বাঙ্গীণ পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের বিষয়। নবপ্রস্তর যুগ অর্থাৎ প্রাগিতিহাসের অন্তিম অধ্যায়টি 'সভ্যতার আগে' বইখানির আলোচ্য। উল্লেখ করা দরকার যে তিনটি বই মিলে এক ধারাবাহিক কাহিনী

হলেও প্রত্যেকটি স্বসম্পূর্ণ রূপে রচিত, সুতরাং শুধু পৃথক একটি পড়লেও উপভোগের ব্যাঘাত হবে না।

বহু লক্ষ বছর আগে মানুষের আবির্ভাব থেকে হাজার দশেক বছর আগে কৃষির আবিষ্কার পর্যন্ত পুরাপ্রস্তর যুগ প্রলম্বিত। এর মধ্যে আজকের খাঁটি মানুষ দেখা দিয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে, তার আগে একে একে এসেছে গিয়েছে আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পূর্বপুরুষরা। সাধারণের ধারণায় পুরামানবরা বর্বর ও পাশবিক, কিন্তু ফসিল ও ভূগর্ভ থেকে উদঘাটিত অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে ক্রমশ তাদের মধ্যে সভ্য মানসের কিছু কিছু অংকুর প্রকাশ পাচ্ছে। একেবারে আদি কালে বনমানুষের বংশজাত যে প্রাক্‌মানবরা দেখা দিয়েছিল তাদের কাহিনীতে এখনও কিছু কিছু ফাঁক এবং বেশ কিছু সংশয়। যারা নিঃসন্দেহে মানুষ তাদের ইতিহাস (আমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে) আরও সম্পূর্ণ এবং আগ্রহজনক, এই বইয়ের পাঠ সেখান থেকেও আরম্ভ করা যায়।

ভাষা সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার। বাংলা বানান বহুরূপী, সরল বানান গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেছি। বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নাম ও অন্যান্য শব্দের তদ্দেশীয় উচ্চারণের দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা ও সাধারণত যুক্তাক্ষর বর্জন করা হয়েছে; পরিবর্তে প্রথম উল্লেখে হসন্ত ব্যবহার করেছি, ভুল উচ্চারণের আশংকা না থাকলে (যেমন স্বল্পপরিচিত শব্দে) পরে হসন্ত বর্জিত হয়েছে। জ়-র উচ্চারণ ইংরেজি z-র মত বুঝতে হবে। পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ বইয়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হল।

পরিশেষে ঋণস্বীকৃতি। ফরাসী ছাড়া অনেকগুলি বিদেশী নামের উচ্চারণ জানিয়ে আমার পরম উপকার করেছেন বম্‌বে থেকে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ভাষাবিৎ শ্রী সুমিত গুহঠাকুরতা। কিন্তু উচ্চারণে ভুল ভ্রান্তি থাকলে সম্ভবত আমিই দায়ী, কারণ কিছু কিছু অন্যত্র থেকে সংগৃহীত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অশোক ঘোষ ভারত বিষয়ক ১২শ অধ্যায়টির পাণ্ডুলিপি পড়ে সমালোচনা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুদ্রিত অধ্যায়টি সর্বাংশে তাঁর অনুমোদিত নাও হতে পারে।

জুলাই, ১৯৮৪

"Once, Man entirely free, alone and wild,
Was blest as free—for he was Nature's child."

Wordsworth

লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান

বিশ্ব বিচিত্র

মানুষের আগে

সভ্যতার আগে

ভ্রমণ

সব হারানোর দেশে

দেশান্তরী

রম্য রচনা

মিহি ও মোটা

গল্প ও উপন্যাস

নতুন ঠিকানা

সাত সমুদ্র

সীতার স্বয়ংবর

মায়াপুরী

শনিবারের সন্ধ্যায়

কয়েকটি ঋতু

জীবনী

Jagadis Chandra Bose

১। আগের কথা

একদা এক বিশাল বিস্ফোরণে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনা, প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে—আজ অধিকাংশ সৃষ্টিবিজ্ঞানীর তাই ধারণা। তখন বিশ্বের তেজ (energy) ও বস্তুর আবির্ভাব, মহাকাল মহাকাশের শুরু। বিক্ষিপ্ত বস্তু ক্রমশ দানা বেঁধে গড়ে উঠল নীহারিকা, তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ—আজও এই সৃষ্টির কাজ চলছে প্রসারণরত বিশ্বে। এমনি করে ছায়াপথ নীহারিকার এক পাশে জন্ম নিল অতি সাধারণ তারা সূর্য এবং তার গ্রহ পরিবার, মূর্তি পেল আমাদের এই পৃথিবী। সে আজ ৪৬০ কোটি বছর আগের কথা।

বন্ধ্যা বসুন্ধরার কোলে উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থা সংযোগে তৈরি হল প্রাণের উপাদান প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিড। অবশ্য এমন বৈজ্ঞানিক জল্পনাও চলছে যে এই উপাদান বা প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম জীবের সৃষ্টি ঘটেছিল মহাকাশে, সেখান থেকে তা পৃথিবীতে পেঁছেছে। আদিতম জীবদের দেহ একটি মাত্র কোষ নিয়ে, প্রাচীন পাথরের গায়ে তার ছাপ থেকে মনে হয় ৩৫০ কোটি বছর আগেই তারা দেখা দিয়েছে। তখন থেকে প্রাণ বিকশিত হয়েছে বৃহত্তর, জটিলতর, বিচিত্রতর জীবে। প্রথম দিকে এই ক্রমবিকাশ ছিল অতি ধীর, সাগর জলে ক্ষুদ্র বায়ুজীবী প্রাণী দেখা দিল ১০০ কোটি বছর আগে। আরও ৪০ কোটি বছর পর্যন্ত অজীবীয় ও আদিজীবীয় অধিকল্প, তার শেষে পুরাজীবীয় অধিকল্পে (৬০-২২½ কোটি বছর আগে) প্রথমে খোলকাবৃত জলজ প্রাণী, পরে মেরুদণ্ডী প্রাণী আদিম মাছ দেখা দিল। স্থলে প্রথম প্রাণের সাড়া জাগাল উদ্ভিদ, তার পর মাকড়সা জাতীয় জীব এবং উভচর, ক্রমে অপুষ্পক বৃক্ষের বিস্তীর্ণ বন (যার থেকে পরে কয়লার সৃষ্টি হয়েছে), কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ।

মধ্যজীবীয় অধিকল্পে (২২½-৭ কোটি বছর আগে) সরীসৃপরা বিশাল আকার ধারণ করেছে ডাইনোসর গোষ্ঠীতে। তাদেরই পাশাপাশি বাস করেছে প্রথম ক্ষুদ্রাকার স্তন্যপায়ীরা। উড়ন্ত সরীসৃপ থেকে মূর্তি নিল পাখি। এত কাল উদ্ভিদ জগতে ফুল ছিল না, মধ্যজীবীয়ের অন্তিমে তরু লতা বর্ণোজ্জ্বল হল ফুল ও ফলে এবং বিদায় নিল ডাইনোসররা।

তার পর সাত কোটি বছর আগে আরম্ভ হয়ে নবজীবীয় অধিকল্প আজও চলছে। তাতে স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য, তার মধ্যে আবার প্রাইমেটদের, কারণ তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে বেশী। বৃহৎ প্রাণীদের মধ্যে নগণ্য প্রাইমেটরা নিজেদের স্থান করে নিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহত্তর প্রাইমেট বানর ও বনমানুষে বাড়ল মগজ ও হস্তকুশলতা, মানুষের মত তারা পাঁচ আঙুলে ধরতে পারে, মাঝে মাঝে দু পায়ে হাঁটে, চোখ দুটি মাথার সামনে সরে এসেছে। গরিলা ও শিম্‌পানজিতে মানুষেরই পূর্বাভাস দেখা যায়।

কল্প	অধিযুগ	বছর আগে	বৈশিষ্ট্য
কোআটার্নারি	হলোসিন		কৃষি, পশুপালন
		১০,০০০	
	প্লাইস্টোসিন		মানুষ*
		২০ লক্ষ	
টার্শারি	প্লায়োসিন		নররূপী বনমানুষ
		১ কোটি	
	মায়োসিন		
		২½	
	অলিগোসিন		বানর, বনমানুষ
		৪	
	ইয়োসিন		
		৬	
	পেলিয়োসিন		প্রথম প্রাইমেট
		৭	

চিত্র ১। নবজীবীয় অধিকল্পের বিভিন্ন ভাগ।

(* পরে দেখা যাবে কারও কারও মতে মানুষ আরও প্রাচীন।)

ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন অনুসারে অধিকল্পগুলিকে অনেকগুলি কল্পে ভাগ করেছেন, নবজীবীয়ের সাত কোটি বছর নিয়ে টার্শারি ও কোআটার্নারি কল্প। তাদের মধ্যে সাতটি অধিযুগ, প্রাচীনতম পেলিয়োসিনে প্রথম প্রাইমেট দেখা দেয়, অলিগোসিনে বানর ও বনমানুষ, এক কোটি বছর আগে প্লায়োসিনে নররূপী বনমানুষ। তার পর মানুষ গড়া শুরু হল,

সে সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী প্লাইস্টোসিন অধিযুগ যার সূচনা ২০ লক্ষ বছর আগে। বর্তমান হলসিন অধিযুগ মাত্র ১০,০০০ বছর হল আরম্ভ হয়েছে। মোটামুটি এ দুটির সঙ্গে মেলে নৃবিজ্ঞানীদের দুই যুগ পেলিয়োলিথিক (palaeolithic) ও নিয়োলিথিক (neolithic), অর্থাৎ পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগ (lith=পাথর)।

পৃথিবীর জন্ম যদি হয়ে থাকে বছরের পয়লা তারিখে তো মানুষের আবির্ভাব বড়জোর বৎসরান্তের ছ ঘন্টা আগে। কালের পটে এই সময়টুকু সামান্য হলেও আমাদের চোখে তা একান্ত আগ্রহজনক, কারণ এর মধ্যে বনমানুষোপম মূর্তি ও প্রবৃত্তি থেকে এই শ্রেষ্ঠ প্রাণীটির রূপান্তর হয়েছে আধুনিক মানুষে। কোন পথে কেমন করে তা সম্ভব হল তাই আমাদের কাহিনী।

২। বনমানুষ থেকে প্রাক্‌মানব

বনমানুষ থেকে যে মানুষের সৃষ্টি তা ডারুইনের শতাধিক বছর পরে আজ সুবিদিত, যদিও কোথাও কোথাও সুসভ্য নরের পক্ষে এই ধারণাটা পরম বিতৃষ্ণাজনক। উপরোক্ত পূর্বপুরুষ থেকে মানুষের দিকে অগ্রগতি হয়েছে ধীরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, ক্রমবিকাশের যেমন রীতি, এবং মানুষের মত বনমানুষ আর বনমানুষের মত মানুষ এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি আজও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। তা হলেও এই সূত্রের অনেকটা অনুধাবন সম্ভব, রহস্যময় কয়েকটি প্রাণীর ফসিল যা পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্যে। সাধারণত এদের নামকরণ হয় গ্রীসীয় বা ল্যাটিন শব্দের থেকে; গ্রীসীয় ভাষায় পিথেকস শব্দের অর্থ বনমানুষ, আন্‌থ্রোপস হল মানুষ—দ্বিতীয়টি নামের শেষে থাকলে সাধারণত মানুষ বোঝায়, পিথেকাস নামধারীরা বনমানুষ বা অন্য প্রাইমেট। অবশ্য নতুন আবিষ্কার বা পুনর্বিচারের সঙ্গে কখনও কখনও প্রাণীর বংশ পরিচয় বদলাতে হয়। প্রাণী কুলের বংশাবলী তৈরি হয় বৃহৎ থেকে সংকীর্ণতর ভাগে, যেমন মানুষের শ্রেণী স্তন্যপায়ী, বর্গ প্রাইমেট, গোত্র হোমিনিডি, গণ হোমো; বর্তমানে সব মানুষ সেপিয়েন্‌স প্রজাতিভুক্ত, সুতরাং তার বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েনস (ল্যাটিন শব্দ হোমো=মানুষ, সেপিয়েনস=যে ভাবতে জানে: এক কথায় বুদ্ধিমান মানুষ)।

আমাদের কাহিনীর শুরুতে বনমানুষ ও মানুষের মধ্যবর্তী একটি দলের সঙ্গে পরিচয় করা দরকার, নৃবিজ্ঞানীরা তাকে বলেন হমিনিড। অভিব্যক্তির বংশতরুতে যখন বনমানুষ ও বনমানুষরূপী প্রাইমেটদের প্রধান শাখার (পন্‌জিডি গোত্র) থেকে মানব-অভিমুখী প্রশাখাটি দেখা দিল তখন থেকে এই দ্বিতীয় ভাগের প্রাণীরা বনমানুষ আখ্যা ছেড়ে নাম নিয়েছে হমিনিড (হোমিনিডি গোত্র)। তারা সবাই আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ নয়, কারণ গাছ যেমন শাখা প্রশাখায় বাড়ে তেমনি এই ডাল থেকে আবার ডাল বেরিয়েছে, কোনও কোনওটা কিছু এগিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় থেমে গিয়েছে—এই মরা

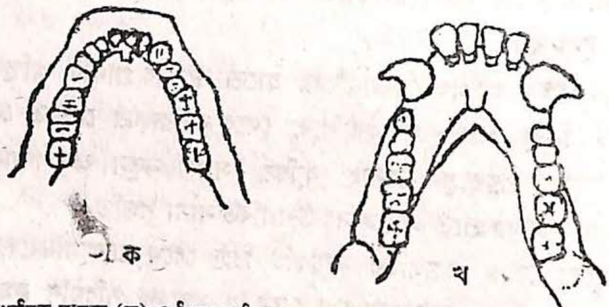
ডালগুলি পরীক্ষায় ফেল। যে হমিনিড শাখাটি মানুষে এসে সার্থক হয়েছে নানা পিথেকাসের জঙ্গলে সেটি খুঁজে অনুসরণ করাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। মানুষও অবশ্য হোমিনিডি গোত্রভুক্ত, কিন্তু স্পষ্টতার খাতিরে আমরা হোমো গণ-অন্তর্গত আদি মানব বোঝাতে বলব পুরামানব ও পূর্বতন ভিন্নগণীয়দের বলব প্রাক্‌মানব।

কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীদের হাতে এই সব প্রাণীর অস্থি সম্বল ছিল সামান্য। কিন্তু ১৯৬০ দশকের শুরু থেকে আবিষ্কার দেখতে দেখতে জমে উঠল, কারণ প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন অনুসন্ধানীর সংখ্যা বেড়েছে এবং তাঁদের হাতে এসেছে নব-উদ্ভাবিত নানা পদ্ধতি।

মানুষের দিকে অগ্রগতির কয়েকটি চিহ্ন দেখে প্রাক্‌মানবদের বনমানুষ থেকে আলাদা করে চেনা যায়, যেমন তাদের মগজের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে, সামনে প্রসারিত ভ্রূ-অস্থি কপালের দিকে নেমে গিয়েছে, মুখাগ্র চ্যাপটা এবং চোয়ালের হাড় হালকা ও পাতলা হয়ে এসেছে, বনমানুষের তুলনায় হাত অপেক্ষাকৃত ছোট ও পা লম্বা হয়েছে। কিন্তু অন্য সব হাড়ের চেয়ে দাঁত সহজলভ্য এবং প্রায়ই তার থেকে প্রাচীন প্রাইমেটদের খবর বেশী মেলে, দাঁতের বৈশিষ্ট্যগুলি মাপাও অনেক সহজ। আমাদেরই মত প্রাক্‌মানবদের এবং প্রাচীন ও আধুনিক বনমানুষের ৩২ পাটি দাঁত (এমন কি এশিয়া, আফ্রিকা ও য়োরোপের প্রায় সব রকম বানরেরও, যদিও প্রাচীনতর প্রাইমেটদের ৩৪ কিংবা তার বেশী), কিন্তু পার্থক্য দেখা যায় দাঁতের আয়তন, গড়ন ও সজ্জায়।

প্রথমত, বনমানুষদের সামনের দাঁত কৃন্তক (incisor) ও ছেদক (canine) অন্য দাঁতের চেয়ে লম্বা, মানুষের সব দাঁত সমান। বনমানুষের তালু সমতল, মানুষের তা খিলানের মত গোল করা। প্রাণীদের পেষক দাঁতের (molar) মাথাগুলি চর্বণের সুবিধার জন্য উঁচু নিচু থাকে, বানরদের দাঁতের মাথায় চারটি ঢিবি বা কাস্‌প (cusp) উঁচু হয়ে আছে, যেখানে বনমানুষ ও মানুষের পাঁচটি; কিন্তু বনমানুষদের মাড়িতে পুরঃপেষক (pre-molar) ও পেষকের সারি মুখের দুই পাশে সমান্তরাল, মানুষের তা ভিতর দিকে ক্রমশ চওড়া—অর্থাৎ একের দন্তপাটি ইংরেজি U অক্ষরের মত, অন্যের অনেকটা V-র মত, যদিও

সামনেটা গোল, অর্থাৎ অধিবৃত্তিক (parabolic)। মানুষের পুরঃপেষক দাঁতও সমতাপূর্ণ। আয়নার সামনে মুখ খুলে দাঁড়ালে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই চোখে পড়বে।



চিত্র ২। আধুনিক মানুষ (ক) ও শিমপানজির (খ) দন্তসজ্জা, দ্বিতীয়টিতে পেষক ও পুরঃপেষক দুই পাশে সমান্তরাল, মানুষের মাড়িতে দু পাশ ভিতরের দিকে ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

কি করে প্রাণীর দেহাংশ হাজার, লক্ষ এমন কি কোটি বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে ফসিল বা জীবাশ্ম সৃষ্টি হয় ইতিপূর্বে সাধারণ ভাবে তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে ('মানুষের আগে', পৃ ২২-২৭), প্রাক্‌মানব ও মানুষের আলোচনায় সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। ফসিল সৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়, তবে জানা আছে মাটির অজৈব আকরিক বস্তু ধীরে ধীরে হাড়ে অনুপ্রবেশ করে, তাদের আকার আকৃতি অক্ষুণ্ন রেখে। মাংস অবশ্য জীবাণুর ক্রিয়ায় অবিলম্বে পচে ক্ষয়ে ধ্বংস হয়। অস্থি সংরক্ষণের সম্ভাবনা বাড়ে যদি মৃত্যুর পর অবিলম্বে প্রাণী কাদা কিংবা আগ্নেয়গিরির ভস্ম অথবা শিলাজতুতে (bitumen) ঢাকা পড়ে; বনে জঙ্গলে —বিশেষত তা বৃষ্টিবহুল হলে—কঠিন দেহাংশও ক্ষয়িত হয়ে রাসায়নিক উপাদানে পরিণত হবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তৈরী ফসিলও প্রায়ই ক্ষয় হয়, বিশেষত উন্মুক্ত হয়ে পড়লে—যেমন বাতাস, জল বা খাদ্যান্বেষী পশুর তাড়নায়। সাধারণ লোকের চোখে পড়েও অনেক ফসিল অবজ্ঞাত থেকে যায়, দরকার প্রত্নজীববিজ্ঞানীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এবং যাকে বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। নর থেকে বানর পর্যন্ত প্রাণীর দেহাবশেষ অপেক্ষাকৃত বিরল, ইতরতর প্রাণীদের মত যৌথ কবর খুবই দুর্লভ, কারণ বুদ্ধির জোরে তারা সহজে ফসিল সৃষ্টির

উপযুক্ত অবস্থায় ধরা দেয় না, যেমন কাদায় ডুবে মরে না।

অস্থি আবিষ্কারের পরেও বাকি থাকে অনেক কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ। খণ্ডগুলি অতীব ভঙ্গুর হতে পারে বলে অতি সাবধানে তাদের শিলা, ভস্ম ও মাটির কবর থেকে উদ্ধার করতে হয়। আরও কঠিন হল বিক্ষিপ্ত টুকরো সব যথাযথ জোড়া দেওয়া, এই ধাঁধা মেলানো দক্ষ বিশেষজ্ঞের কাজ। তার পর সম্পূর্ণ রক্ত মাংসের মূর্তিটি গোড়ে তোলা ; প্রাচীনতর প্রাণী ডাইনোসর এবং অন্যান্য যাদের প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কালটি পাওয়া গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেটা অনেক সহজ—বনমানুষ, প্রাক্‌মানব ও পুরামানবের মাত্র কয়েক টুকরো হাড় থেকে প্রায় সবটাই অনুমান করে নিতে হয়, কারণ ফসিল যা মেলে তার অধিকাংশই দাঁত বা চোয়াল, খুলি আরও বিরল এবং নিম্ন দেহের হাড় স্বল্পতম। তবে এই অনুমানের কতগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে। যথা শ্রোণীচক্রের (pelvis) আকৃতি থেকে জানা যায় চতুষ্পদ না দ্বিপদ ; অন্য হাড় থেকে দেহের আয়তন ও ওজন নির্ধারণ করা যায়। যেমন আধুনিক মানুষের ঊরুর দৈর্ঘ্য থেকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিটির দৈর্ঘ্য নিখুঁত বলা চলে। ফসিলের মধ্যে দাঁত যে সবচেয়ে সুলভ তার কারণ উপরে কঠিন এনামেলের প্রলেপ আছে। ক্ষুদ্র হলেও এই অস্থিটুকু থেকে অনেক কথা জানা যায় ; দাঁতের গঠন ও আকৃতি যেমন বলে দেয় প্রাণী কোন গোত্রীয় বা গণীয়, তেমনি জানা যায় তা সাধারণত কোন কাজে লাগত—যেমন কাটবার বা চিরবার দাঁত দরকার মাংসভুকের, চওড়া পেষক দাঁত আঁশালো খাদ্য চর্বণের উপযুক্ত, সুতরাং তা নিরামিষাশীদের বৈশিষ্ট্য।

প্রাণীটি কত কাল আগের তা জানা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় মেপে প্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ধারণের উপায়গুলি আবিষ্কারের পর। এই সব পদার্থের পরমাণুগুলি নিজ নিজ হারে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে সীসায় পরিণতি অতি ধীর, সুতরাং আদি বস্তুর কতটা বাকি আছে তা মেপে পৃথিবীর জন্ম কাল থেকে পর্যন্ত বয়স মাপা যায়। শিলা, ভস্ম ও আগ্নেয়গিরিজাত অজৈব বস্তুতে তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম ক্ষয়ে আর্গন গ্যাস হচ্ছে, অর্ধেক ক্ষয় হতে লাগে ১৩০ কোটি বছর (অর্ধায়ু), বাকি অংশের অর্ধেক ক্ষয় হয় একই সময়ে, এমনি করে চলতে থাকে ঘড়ি ; সুতরাং অবশিষ্ট তেজী পটাসিয়াম মেপে জানা যায় কোনও বস্তু

এবং তার সংশ্লিষ্ট ফসিল কত প্রাচীন। আরও সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে, যেমন নতুনতর মানুষের ফসিলের প্রাচীনতা নিরূপণে প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে থেকে তেজস্ক্রিয় কারবন পদ্ধতি যোগ্যতর। জীব মাত্রেরই দেহে সাধারণ কারবন ছাড়াও তার প্রায় লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ আর একটু ভারী এক তেজস্ক্রিয় সংস্করণ বা আইসোটোপ আছে, আর অর্ধায়ু প্রায় ৫৭৩০ বছর, মৃত্যুর পর সেই হিসাবে ভারী কারবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয় সাধারণ কারবন, সুতরাং তার অবশিষ্টাংশ মেপে পরীক্ষাধীন বস্তুর তারিখ নির্ণয় সম্ভব। শুধু সাধারণ ফসিল নয়, অন্যান্য জৈব বস্তু, যেমন মানুষের ব্যবহৃত কাঠকয়লা, এ ভাবে পরীক্ষা করা চলে, তাতে হাড়ের চেয়ে বরং অনেক কম মাল দরকার হয়। পুরামানব ও তার পুরোগামীদের বয়স এবং মানুষের সৃষ্ট বস্তুর প্রাচীনতা নির্ধারণে আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য তেজস্ক্রিয়ার মাপ ছাড়া আরও কিছু কিছু পদ্ধতি উদভাবন করেছে।

শুধু দাঁত থেকে কি করে প্রাণীর বংশ পরিচয় জানা যায় তার এক উদাহরণ প্রায় তিন কোটি বছর প্রাচীন অলিগোসিন অধিযুগের প্রাইমেট অলিগোপিথেকাস, যদিও অন্য হাড়ের অভাবে তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা যায় না। তার দাঁত মিলেছে মিশরের ফায়ুম মরুভূমিতে কায়রো শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন তৃষিত মরু হলেও স্থানটি সে কালে উর্বর ভূমি ছিল, প্রাইমেট বর্গীয় বহু প্রাণীর মেলা ছিল সেখানে, সুতরাং এখন তা ফসিল শিকারীদের উর্বর ক্ষেত্র। অলিগোপিথেকাসের বত্রিশটি দাঁত এবং পেষকে চারটি কাস্প, সুতরাং সে প্রাক্‌বানর নয়, সম্ভবত বানর।

অভিব্যক্তির পথে মানুষের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক সন্দেহ করা হয়েছে এমন কয়েকটি প্রাইমেটের সঙ্গে এ বার আমরা পরিচয় করব। প্রোপ্লায়োপিথেকাসও প্রায় তিন কোটি বছর আগে ফায়ুম অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এবং তার সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য মিলেছে ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযান থেকে, যদিও অস্থি সম্বল মাত্র দুটি চোয়াল এবং কিছু খসা দাঁত; পেষকে পাঁচটি কাস্প, ছেদক ছোট। এর বৈশিষ্ট্যগুলি বানরের তুলনায় বনমানুষের, সুতরাং মানুষের বেশী কাছাকাছি, কারণ বানর ও বনমানুষের সম্পর্কের

তুলনায় বনমানুষ ও মানুষের আত্মীয়তা নিকটতর। ফিনল্যানডের জনৈক বিজ্ঞানী এক অভিনব প্রকল্পে একে আমাদের সাক্ষাৎ নিকট প্রপিতামহের সম্মান দিয়েছেন, তাঁর যুক্তি হল মানুষেরই মত এর ছেদক দাঁত ছোট এবং চোয়াল হালকা, কিন্তু বনমানুষে ছেদক অপেক্ষাকৃত লম্বা ও চোয়াল মোটা, সুতরাং অভিব্যক্তির পথে বনমানুষকে বাদ দিয়ে আমরা প্রোপ্লায়োপিথেকাস জাতীয় প্রাইমেট থেকে সোজা প্রাক্‌মানবে চলে আসতে পারি। কিন্তু বিরুদ্ধ সাক্ষ্য এত বেশী যে এই তত্ত্ব আমল পায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এক ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী এই প্রস্তাব করেছেন যে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বৃক্ষচর নয়, জলচর বনমানুষের থেকে।

প্লায়োপিথেকাস। এর হাড় প্রথমে পাওয়া যায় য়োরোপে শতাধিক বছরের আগে, আরও সাম্প্রতিক কালে আফ্রিকা ও য়োরোপে। দাঁত এবং খুলি ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে প্রাণীটিকে আরও ভাল করে জানা গিয়েছে। অন্তত দু কোটি বছর আগে মায়োসিন অধিযুগের বাসিন্দা সে। বনমানুষের মত চ্যাপটা মুখ এবং পেষক দাঁতে পাঁচটি কাস্‌প; তাদেরই মত আধা-সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, অনায়াসে হাত দিয়ে ঝুলত বর্তমান বনমানুষ গিবন যেমন ডালে ঝুলে ঝুলে চলে, সাধারণ সম্মতি অনুসারে গিবনেরই পূর্বপুরুষ সে।

বর্তমান বনমানুষদের মধ্যে গিবন আকারে ছোট এবং সম্পর্কে আমাদের অনেকটা দূরে, বাকি তিনটি বৃহৎ বনমানুষ গরিলা, শিমপানজি ও ওরাং ওটাঙের মধ্যে প্রথম দুটি মানুষের নিকটতম। অধিকাংশের মতানুসারে শিমপানজি ও গরিলা, তা ছাড়া মানুষেরও জন্ম দানের গৌরবটা ড্রায়োপিথেকাস নামক লুপ্ত বনমানুষের প্রাপ্য, আজ থেকে এক কোটি ৪০ লক্ষ বছর আগেই তার শাখা (বা প্রজাতি) ভাগ হয়ে গিয়েছে মানুষের দিকে, পরে অন্যান্য প্রজাতি থেকে ঐ দুটি বর্তমান বৃহদাকার বনমানুষের সৃষ্টি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান বনমানুষরা আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ নয়, তাদের বিবর্তন মানব শাখার পাশাপাশি। আমরা এই হমিনিড সূত্রের অনুসরণ করব একটু পরে, আপাতত আরও কিছু পিছিয়ে গিয়ে প্রাচীনতর পনজিডরা (অর্থাৎ প্রাচীন বনমানুষরূপী প্রাইমেট গোত্র) পর্যন্ত মানব বংশ সূত্রের অন্বেষণ করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণায় বেশ কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, বিশেষত আমাদের কাহিনীর আদিতম নায়ক ঈজিপ্টোপিথেকাস সম্বন্ধে।

ঈজিপটোপিথেকাস। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলুইন সাইমনস্ ১৯৬৩ সালে ফায়ুম মরুতেই তাঁর আবিষ্কৃত হাড় থেকে এই নামটি (মিশরী বনমানুষ) সৃষ্টি করলেন। তিন বছর পরে তাঁর অধীনস্থ একটি দল পেলেন এর প্রায় সম্পূর্ণ এক খুলি। ১৯৭৭ সালে সেখানে ফিরে গিয়ে কায়রোর প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে সাইমনস বেশ কিছু বিরল হাড় আবিষ্কার করলেন, যেমন বাহুর উপরাংশের চারটি খণ্ড। তাদের পরীক্ষা থেকে প্রাণীটির চেহারা এমন কি সামাজিক আচরণও অনুমান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র মাথা, সরু হাত পা ও লম্বা লেজ নিয়ে দেখতে অনেকটা ছোট খাটো বানরের মত। ওজনে পুরুষরা সাড়ে পাঁচ কিলোগ্র্যামের বেশী নয়, স্ত্রীরা তার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু মর্দারা লম্বা ছেঁদক দাঁত বার করে মুখ বিকৃত করলে মূর্তিটি ভয়ংকর। বনমানুষ, বেবুন-বানর ও অন্যান্য প্রাইমেট পুরুষদের ছেদক বড়, বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে তা মস্ত অস্ত্র, দলের মধ্যে সঙ্গিনীর অধিকার নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করে এই বিকশিত দাঁত, এমন কি সমাজে কর্তৃত্বের স্তর প্রতিষ্ঠিত করতে তা সহায়ক। ঈজিপটোপিথেকাসের কঙ্কালের ও বাহুর হাড় থেকে বোঝা যায় বানরের মত তার লেজ ছিল (বর্তমান বনমানুষদের তা নেই), সে চার পায়ে ভর করে ডাল থেকে ডালে চরে বেড়াত ফায়ুমের ঘন বনে. তা আজ প্রায় তিন কোটি বছর আগের কথা। প্রাণীটির সবচেয়ে বড় সম্পদ তার প্রায় ৩০ ঘন সেন্টিমিটার (সিসি) মগজ, দেহের আকৃতির অনুপাতে তা আর কোনও স্তন্যপায়ীর চেয়ে বেশী।

ঈজিপটোপিথেকাসের চক্ষু-বিবর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনেক দূর পর্যন্ত অনুমান করেছেন। সমসাময়িক অনেক নিশাচর প্রাণীর মধ্যে এরা সক্রিয় হত প্রধানত দিনের আলোয়। তার থেকে মনে হয় এরা দল বেঁধে বাস করেছে—রাতের প্রাণীরা অনেকে স্বভাবে নিঃসঙ্গ। একই নজির চোখ ও কন্ঠস্বরের সাহায্যে দলের মধ্যে সহজ পারস্পরিক বার্তা বিনিময় নির্দেশ করে। এই সামাজিক সংহতির ফলে এদের মধ্যে একাচরদের তুলনায় দৃঢ়তা, সাহস ও প্রতিদ্বন্দিতা বেড়েছে, তার ফলে আবার মেধার বৃদ্ধি ঘটে এদেরকে বুদ্ধির সেরা

বানিয়ে থাকতে পারে। সাইমনস, প্রসিদ্ধ ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী লুই লীকি ও আরও অনেকের মতে ঈজিপটোপিথেকাস মানুষ ও বনমানুষের (হমিনিড ও পনজিড গোত্রের) আদিতম যৌথ পূর্বপুরুষ, "মানব বংশতরুর আদিতম সদস্য" ইত্যাদি বর্ণনায় তাকে অভিনন্দিত করা হয়েছে। তা ছাড়া দাঁতের সাদৃশ্য থেকে সাইমনস ও অনেকের বিশ্বাস তার সাক্ষাৎ বংশধর হল ড্রায়োপিথেকাস, মানুষের দিকে অগ্রগতির পথে এই প্রাইমেটটির গুরুত্ব আমরা এখনই লক্ষ্য করব, সুতরাং পূর্বগামী ঈজিপটোপিথেকাসের স্থানও নিঃসন্দেহে প্রধান (চিত্র ৯)।

ড্রায়োপিথেকাস। নামের অর্থ গেছো বনমানুষ, চেহারাটা সম্ভবত ছোট খাটো শিমপানজিরই মত। প্রথম আবিষ্কার ফ্রান্সে ১৮৫৬ সালে, প্রাচীন বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে আগে এরই খোঁজ পাওয়া যায়, লুপ্ত বনমানুষের মধ্যে একমাত্র এটিই ডারুইনের জানা ছিল। ক্রমে য়োরোপের অন্যান্য এলাকায় এবং আফ্রিকা ও এশিয়ায় দূর দূরান্তে এর নানা প্রজাতির চিহ্ন মেলে এবং ড্রায়োপিথেকাস যোগ্য কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কয়েক বছর আগে লুই লীকি কিনিয়ার ফোর্ট টের্নান অঞ্চলে ড্রায়োপিথেকাস প্রাপ্তির সংবাদ দেন। পূবে এশিয়ার সীমায় চিন দেশে তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। মাঝখানে উত্তর ভারতের শিবালিক পর্বতে এই জাতীয় নানা লুপ্ত বনমানুষের—তা ছাড়া প্রাক্‌মানবের—নজির আছে, বোঝা যায় সেখানেও বহু কাল ধরে বিবিধ ও বিচিত্র প্রাইমেট গোষ্ঠীর বিবর্তন ঘটেছিল। সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে শিবালিকের পশ্চিমাঞ্চলে (এখন পাকিস্থান) এক তীর্থযাত্রী নাকি এক চোয়াল কুড়িয়ে পান, তার আয়তন থেকে প্রাণীটিয় নাম হয় ড্রায়োপিথেকাস জাইগ্যান্‌শিয়াস। ১৯৬৮ সালের খবরে প্রকাশ পানজাব ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিলাসপুর জেলায় (হিমাচল প্রদেশ) আবার একটি বড় মাপের পেষক দাঁত সম্বলিত চোয়াল পাওয়া যায় তিন খন্ডে, পানজাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষজ্ঞ বলেন শিবালিকে ইতিপূর্বে এত বড় চোয়ালযুক্ত বনমানুষের ফসিল আর পাওয়া যায় নি।

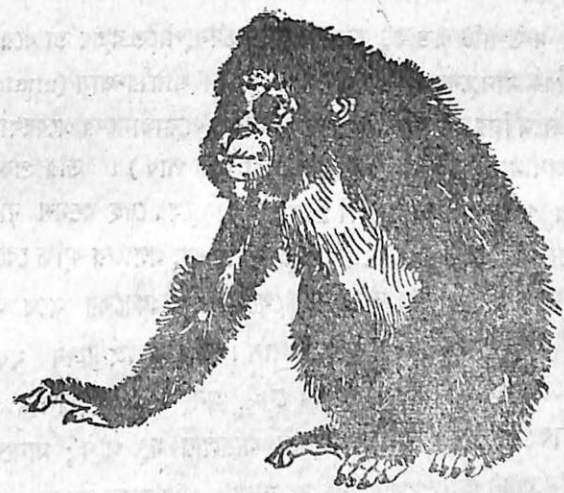
বিভিন্ন দেশে ড্রায়োপিথেকাসের অন্যূন ছ'টি প্রজাতি নির্দিষ্ট হয়েছে—তার মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে ভারতেই তিনটি—এরা দু কোটি বছর কি তারও

কিছু বেশী প্রাচীন। এদের মধ্যে এ কালের নরাকার বনমানবদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়—শিমপানজি ও গরিলা বিভিন্ন প্রজাতির উত্তরপুরুষ। দুইই আফ্রিকার প্রাণী, কিন্তু কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে অন্তিম পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা ওরাং ওটাংও এক তৃতীয় প্রজাতি-জাত হতে পারে, যদিও শিমপানজি ও গরিলার তুলনায় ওরাং অনেকটা অন্য ধরনের বনমানুষ। প্রশ্ন উঠতে পারে কি করে ড্রায়োপিথেকাস এত দূর দূরান্তে ছড়াল, এত অসদৃশ জাতের জন্মদাতা হল। বস্তুত, সে কালে দক্ষিণ য়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা, ভারত ও পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল এবং পাহাড় ও সমুদ্রের বাধা ছিল কম, সুতরাং যদি আফ্রিকায় ড্রায়োপিথেকাসের জন্ম হয়ে থাকে, যেমন অনেকের বিশ্বাস, তবে মহাদেশ অতিক্রমের পথে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিমন্ডল তার সহায় ছিল। মনে রাখতে হবে যে প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে হয়তো সহস্র সহস্র বছর কেটেছে, তার মধ্যে অভিব্যক্তি ঘটেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন বংশধর প্রজাতি দেখা দিয়েছে।

লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন নেপিয়ার মানুষ সৃষ্টির অনুসরণে ড্রয়োপিথেকাস গণটিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ছকে ঈজিপটোপিথেকাস থেকে প্রাক্‌মানবের পথে মানুষের অভিব্যক্তি। অপর পক্ষে বর্তমান বনমানুষদের তুলনায় নাকি মানুষের সঙ্গে ড্রায়োপিথেকাসের দাঁত ও চোয়ালের সাদৃশ্য বেশী; অনেকের মতে এই বনমানুষটিই প্রাক্‌মানবের স্রষ্টা।

প্রোকন্‌সাল। নানা পিথেকাসের মধ্যে এই নামটি যেন ছন্দপতন, তার একটা মজার ইতিহাস আছে। ১৯৩০ দশকে লুই লীকি কিনিয়ায় কিছু ফসিল আবিষ্কার করে লনডনে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠালেন, পরীক্ষায় সিমপানজির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁরা ঐ আখ্যাটি দিয়েছিলেন—প্রো মানে প্রাক্‌, আর কনসাল নামে তখন লনডনের চিড়িয়াখানায় এক বিখ্যাত শিমপানজি ছিল, সুতরাং অর্থ দাঁড়াল শিমপানজির পিতৃপুরুষ। অনেকের ধারণা গরিলার সঙ্গেও হয়তো তার একই সম্পর্ক। প্রোকনসাল আফ্রিকানাসের খুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ফসিল খন্ড আগে কচ্ছপ খোলের অংশ বলে ভুল করা হয়েছিল, পরে পুনর্গঠিত খুলিটি পরীক্ষা করে লুইর পুত্র পুরাবিজ্ঞানী রিচাড লীকি বলেন বনমানুষটি

ভূমিচর ছিল না, ছিল বানরের মত গেছো, সুতরাং পরবর্তী সব বনমানুষের জন্মদাতা হতে পারে সে। আবার কারও কারও মতে মানুষও তার সাক্ষাৎ বংশধর হতে পারে। ড্রায়োপিথেকাসের সঙ্গে প্রোকনসালের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ এবং ডেভিড পিলবিম ও সাইমনস মনে করেন দুটি প্রায় একই প্রাণী, পার্থক্য গণের নয়, বড়জোর উপগণের। প্রোকনসালের আবির্ভাব প্রায় দু কোটি বছর আগে, অস্থি যা পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কালটি গড়ে তোলা যায়, পা ও গোড়ালির গঠন থেকে মনে হয় অল্প সময়ের জন্য প্রাণীটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। ফসিল প্রায়ই প্লায়োপিথেকাসের কাছাকাছি অবস্থিত, সম্ভবত তারা সমকালীন। প্রোকনসালের আকৃতিতে বেশ পার্থক্যও



চিত্র ৩। প্রোকনসাল, মানুষের সম্ভব পূর্বপুরুষ।

দেখা যায়—বামন জাতের শিমপানজি থেকে গরিলার সমান পর্যন্ত, কিন্তু বৈশিষ্ট্য সব এক ও অভিন্ন গণের।

জাইগ্যান্‌টোপিথেকাস। এর পরে এশিয়াবাসী দুটি দানবের পালা। বিখ্যাত বিশেষজ্ঞরাও যে চমকদার ভুল তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারেন এখানে আছে তার এক দৃষ্টান্ত। চীন দেশে আবহমান কাল থেকে 'ড্র্যাগনের অস্থি' ব্যবহার হয় ওষুধ বানাতে, এতে সারে না এমন রোগ নেই, সুতরাং এর সংগ্রহ ও বিক্রি

মস্ত বড় ব্যাবসা সেখানে। এই ড্র্যাগনাস্থি আর কিছুই নয়, নানা রকমের মিশ্র ফসিল। আশ্চর্য নয় যে বিদেশী প্রত্নবিজ্ঞানীরা সে দেশের দাওয়াইখানায় ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন হাড়ের খোঁজে। হং কং শহরের এমনি এক দোকানে ওলন্দাজ ভূতত্ত্ববিৎ ফন কোএনিগস্‌ভাল্‌ড এক নরোপম প্রাইমেটের তিনটি প্রকাণ্ড দাঁত আবিষ্কার করেন; একটি মাড়ির দাঁত গোড়ার কাছে মানুষের দাঁতের তুলনায় প্রায় ছ' গুণ বড়, গরিলার তুলনার দু গুণ। তিনি এর নাম দিলেন জাইগ্যানটোপিথেকাস, অর্থাৎ দানব বনমানব। এই অনুসন্ধানী ব্যক্তিটিই আবার ১৯৪১ সালে যবদ্বীপের মধ্যাঞ্চলে সংগিরন জেলায় নিচের পাটির দুটি প্রকাণ্ড চোয়াল পান। প্রাণীটির আখ্যা দেওয়া হল মেগানথ্রপাস, অর্থাৎ বিরাট মানুষ।

যাদের দন্তপাটি এত বড় তাদের দেহও তদনুপাতে বৃহৎ তা ধরে নিয়ে প্রাচীন কালে দানবিক মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করলেন শারীরস্থান (anatomy) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জার্মেনির ফ্রান্‌ৎজ্‌ হ্বাইডেনরাইশ্‌ (পুরামানবের গবেষণায় এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির অসামান্য দানের পরিচয় আমরা পরে পাব)। তাঁর প্রকল্প অনুসারে অভিব্যক্তির পথে বনমানুষরূপী প্রাথমিক মানুষের দেহ ক্রমশ দানবিক আকার নিয়েছে, তার পর আবার দেহ ছোট হয়েছে, কিন্তু মগজের বৃদ্ধি বেড়েই চলেছিল; এই ভাবে চীন ও যবদ্বীপের দানবদের থেকে ক্রমবিকাশের পথে উদ্ভূত হয়েছে যবদ্বীপীয় আদি মানব পিথেকান্‌থ্রপাস। তিনি লিখলেন যবদ্বীপের দানব গরিলার চেয়ে বড়, আর চীনের দানব সেই অনুপাতে যবদ্বীপীয় দানবের চেয়ে বড়—অর্থাৎ প্রায় দেড় গুণ এবং পুরুষ গরিলার দু গুণ; মানবের বংশাবলী অতীতে অনুধাবন করতে গেলে এই সব দানবে পেঁছাতে হয়।

দানব মানবের এই চিত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু নৃতত্ত্ব ও অস্থিশাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে প্রকাণ্ড দাঁত বা ভারী চোয়ালের মালিককেও যে তদনুপাতে অতিকায় হতে হবে এমন কোনও কথা নেই, সুতরাং দানবিকতার যুক্তি খাটে না। ইতিমধ্যে এও প্রতিষ্ঠিত হল যে চীন দানব মানুষ নয়, এক বৃহদাকার বনমানুষ—ঠিক তার নাম থেকে যা বোঝায়। প্রচণ্ড শক্তিধারী এই মাংসাশী দানব জন্তু জানোয়ার শিকার করে গুহায় নিয়ে আসত। ১৯৫৬ সালে চৈনিক প্রত্নবিৎ ওএন-চুং দক্ষিণ চীনে কোআংসি প্রদেশে চুনাপাথরের গুহায় এর

দুটি নিম্ন পাটির চোয়াল ও পঞ্চাশেরও বেশী দাঁত পেয়েছেন এবং ১৯৫৭ সালে ঐখানেই আর একটি নিম্ন চোয়াল পেয়েছেন প্রায় সব দাঁত সমেত, তাতে সন্দেহ থাকে না যে প্রাণীটি বনমানুষ, যদিও উন্নত ধরনের, এবং মানুষের সম্পর্কহীন। তখন আবার নতুন বিতর্ক শুরু হল প্রাণীটির কুল পরিচয় নিয়ে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন সে প্রাক্‌মানব গোত্রের অতি বিকৃত এক প্রশাখা। লীকি এবং তাঁর এক চৈনিক সহকর্মী বললেন জাইগ্যানটোপিথেকাসের গোত্র প্রাক্‌মানব বা বনমানুষের নয়, ওরিয়োপিথেকাস নামক এক উচ্চ প্রাইমেট গোত্র লোপ পাওয়ার আগে তার এক বিকার। এখন অনেকের বিশ্বাস ড্রায়োপিথেকাস থেকে যেমন প্রাক্‌মানব ও বর্তমান বৃহৎ বনমানুষদের পূর্বপুরুষরা দেখা দিয়েছে, তেমনি জাইগ্যানটোপিথেকাস তারই এক তৃতীয় শাখা যা প্রায় ৯০ লাখ বছর আগে দেখা দিয়ে প্রায় ১০ লাখ বছর আগে মরে গিয়েছে। বছর কয়েক আগে ইয়েলের সাইমনস ও ভারতের ডঃ গুপ্ত এ দেশের প্লায়োসিন স্তরে আদি জাইগ্যানটোপিথেকাসের এক নিম্ন চোয়াল আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন।

মেগানথ্রপাস সমস্যার এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি, তবে নিঃসন্দেহে সে অভিব্যক্তির পথে অনেক বেশী অগ্রসর—হয় প্রাক্‌মানব নয়তো পুরামানব। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা হবে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি পিথেকাসনামা প্রাণী পুঁথি পত্রে ছড়িয়ে আছে, যথা লিম্‌নোপিথেকাস, প্যারাপিথেকাস, সিবাপিথেকাস (প্রাপ্তি স্থান শিবালিক পর্বত বা শিব থেকে) ইত্যাদি। কিন্তু ফসিল বিরল বলে এরা অনেকটা অজ্ঞাতকুলশীল, সবাই হয়তো বনমানুষ নয়। ১৯৬০ দশকে পূর্ব আফ্রিকায়ও সিবাপিথেকাসের অস্থি পাওয়া গিয়েছে, এবং সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্থানে বেশ সম্পূর্ণ এক ফসিল পেয়েছেন, তদনুসারে প্রাণীটি প্রায় নিঃসন্দেহে এশীয় বনমানুষ ওরাঙের সাক্ষাৎ বা নিকট পূর্বপুরুষ। যাই হক, মনে হয় মায়োসিন অধিযুগের প্রায় এক কোটি বছর ধরে প্রাইমেট অভিব্যক্তির বংশবৃক্ষ বিচিত্র শাখা প্রশাখায় ঘন হয়ে উঠেছিল, কোনওটা অন্ধ পথের বিকার, কোনও স্বল্পায়ু ব্যর্থ পরীক্ষা যা স্পষ্ট নজির বিশেষ কিছু রেখে যায় নি, অনেকে সম্ভবত এখনও সম্পূর্ণ অজানা।

এবার আমরা লম্বা পা ফেলে এক প্রাক্‌মানবের সঙ্গে পরিচয় করব, যার আবির্ভাব আমাদের ভাগ্যবিধায়ক বলা চলে, সম্ভবত কোনও ড্রায়োপিথেকাস থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু বহু বছর সে ছিল অবহেলিত, যাদুঘরে ধুলো সংগ্রহ করছিল তার অস্থি, প্রাণীটির পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী 'রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের' অনুরূপ। এই অনুসন্ধানে প্রধান গোয়েন্দা আমাদের পরিচিত এলুইন সাইমনস এবং ডেভিড পিলবিম, ইনি জাতে ইংরেজ, কাজ শিখেছেন সাইমনসেরই কাছে এবং পরে তাঁর সহযোগে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন।

১৯১৫ সালে শিবালিকে একটি উপর পাটির চোয়াল পাওয়া যায়, তার থেকে প্রাণীটির নাম দেওয়া হল ড্রায়োপিথেকাস পানজাবিকাস। বহু বছর বাদে পরবর্তী দৃশ্য ১৯৩০ দশকের প্রথম দিকে, তখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জি. ই. লিউইস ভারতে এসে শিবালিকে খুঁড়ে পেলেন উপর ও নিচের পাটির দুটি চোয়াল খণ্ড, প্রথমটিতে তখনও যুক্ত রয়েছে তালুর অংশ এবং দুটি পেষক ও দুটি পুরঃপেষক দাঁত, বাকি জায়গায় দেখা যায় একটি ছেদকের গর্ত, একটি কৃন্তকের গোড়া এবং আর একটির গহ্বরের অংশ। এই সম্বল নিয়ে লিউইস এক নতুন গণ সৃষ্টি করলেন রামাপিথেকাস—রামের দেশবাসী বলে। দ্বিতীয় চোয়ালের যে মালিক ব্রহ্মা থেকে তার নাম দিলেন ব্রামাপিথেকাস (সুতরাং পিথেকাসের মধ্যে আমরা তিনটি ভারতীয় দেবতার দেখা পাই—যদিও সবাই এখন আর টিকে নেই)।

লিউইস দাবি করলেন যে রামাপিথেকাস বনমানুষ নয়, হমিনিড বা প্রাক্‌-মানব, অন্তিম মায়োসিন অধিযুগের প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ বছর প্রাচীন জীব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য লিখিত নিবন্ধে এই দাবির সমর্থনে যুক্তি দাখিল করে তিনি বললেন রামাপিথেকাস হোমো ও অস্‌ট্রালোপিথেকাসের জন্মদাতা; প্রথমটি মানুষের গণ আর অসট্রালোপিথেকাস আর একটি প্রাক্‌মানব যার সঙ্গে আমরা এর পরেই পরিচয় করব। তাঁর মতে যত প্রাচীন বনমানুষ পাওয়া গিয়েছে তাদের তুলনায় রামাপিথেকাস সর্বাপেক্ষা মনুষ্যতুল্য, যেহেতু তার তালু খিলানের মত গোল করা, চোয়ালের দু পাশ সমান্তরাল নয় এবং সব দাঁত মাপে সমান। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সন্দিহান হয়ে রইলেন, কারণ ফসিল সামান্য এবং তাতে অতি প্রয়োজনীয় ছেদক দাঁতটি নেই। এই

বনমানুষ-না-প্রাক্‌মানুষ বিতর্কের তলায় ক্রমে বেচারা রামাপিথেকাস চাপা পড়ে গেল—সেটা হয়তো স্বাভাবিক, কারণ লিউইস তরুণ শিক্ষার্থী মাত্র, বিজ্ঞানী মহলে অজ্ঞাত, তা ছাড়া তাঁর নিবন্ধটি কখনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায় নি।

এর পর আবার দীর্ঘ বিস্মৃতি—প্রায় ৩০ বছরের। ১৯৬১ সালে সাইমনস ড্রায়োপিথেকাস পানজাবিকাস ও লিউইস-বর্ণিত রামাপিথেকাসের চোয়াল পরীক্ষা করে সাদৃশ্য দেখালেন যে যদিও দুটিতেই ছেদক দাঁত নেই, তাদের গহ্বর থেকে বোঝা যায় দুটিই আকারে ছোট ছিল, অর্থাৎ তারা বনমানুষের মত নয়। দু বছর পরে আফ্রিকায় প্রাপ্ত একটি ছেদক পরীক্ষা করতে করতে তিনি দেখলেন লিউইস-প্রাপ্ত ঊর্ধ্ব পাটির চোয়ালের গর্তে তা বেশ খাপ খাচ্ছে। এ দিকে লীকি ১৯৬১ সালে কিনিয়ার ফোর্ট টের্নান অঞ্চলে কিছু ফসিল আবিষ্কার করে উপরোক্ত তৃতীয় প্রাণীটির নাম দিয়েছেন কিনিয়া-পিথেকাস উইকেরি, এই ফসিল ছিল আগ্নেয়গিরিজাত ছাইয়ের নিচে, পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বয়স সূক্ষ্ম ভাবে জানা গেল এক কোটি ৪০ লক্ষ বছর। তা মিলে গেল ৪০০০ কিলোমিটার দূরস্থ রামাপিথেকাসের সঙ্গে, যদিও এই ফসিলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্তরের অভাবে উপরোক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয় নি (সাবেক উপায় অনুসারে অনুমান ছিল ৮০ লাখ থেকে দেড় কোটি বছর পর্যন্ত)। এখন দুইয়ের নানা সাদৃশ্য থেকে সাইমনস, পিলবিম এবং অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর ধারণা কি. উইকেরিও আসলে রামাপিথেকাস, বড়জোর প্রজাতিগত পার্থক্য তাদের মধ্যে। এই দুইয়ের উপর পাটির চোয়াল দুটির বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের পর স্পষ্ট দেখা গেল যে ভিতর দিকে তারা মানুষের চোয়ালের মত চওড়া এবং সব দাঁত সমান, সাইমনস বললেন প্রাণী দুটি হয়তো একই প্রজাতি, ১৯৭২ সালে মৃত্যুর আগে লীকি নিজেও দুইয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। সাইমনসের মনে হল রামাপিথেকাস ফসিলের সম্পূর্ণ পুনর্বিচার দরকার এবং এই সিদ্ধান্তের থেকে নতুন বৈপ্লবিক আবিষ্কারের সূচনা।

ইয়েলে রক্ষিত অস্থি সম্পদ আবার বার করে পরীক্ষা করতে করতে তিনি ভাবলেন লিউইস পেয়েছেন রামাপিথেকাসের শুধু ঊর্ধ্ব চোয়াল ও রামা-

পিথেকাসের শুধু নিম্ন চোয়াল—তা কেন, তা হলে কি তারা একই প্রজাতি হতে পারে? মুখোমুখি লাগিয়ে দেখলেন চোয়াল দুটি বেশ খাপ খেয়ে গেল। এর পর অবিলম্বে স্বলপায়ু ব্রামাপিথেকাস মারা পড়ল, নবজীবন পেল রামাপিথেকাস। শুধু তাই নয়, ১৯৬৫ সালে তিনি ও পিলবিম দাবি জানালেন যে ড্রায়োপিথেকাস পানজাবিকাস ও ব্রামাপিথেকাস অভিন্ন। এই সব সমীকরণ থেকে তিনটির মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইল শুধু রামাপিথেকাস এবং তার পুরো নামটি দাঁড়াল রামাপিথেকাস পানজাবিকাস (প্রথমোক্ত প্রাণীটির গণ বর্জিত হল তা ভুল বলে, কিন্তু প্রজাতির নামটি রইল প্রাণীটি আগে আবিষ্কৃত বলে)। মাত্র দুটি অসম্পূর্ণ চোয়াল ও গোটা কয়েক দাঁতের সাক্ষ্য নিয়ে সে আমাদের সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষ স্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, এই হল বিস্মৃতির সমাধি থেকে রামাপিথেকাসের পুনরুদ্ধারের কাহিনী। (কিন্তু কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি নয়, উত্থানের পর পতনের আশঙ্কা, রামাপিথেকাস-রামায়ণের পরবর্তী পর্বে নতুন গবেষণা আবার তার ভাগ্য নিয়ে খেলছে, তা আমরা দেখব চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে।)

সাইমনস ও পিলবিমের অধ্যবসায় ও একাগ্র গবেষণার ফলে ঐ সামান্য সম্বল থেকে প্রাণীটির সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব জানতে পেরেছি। ধৈর্য-শীল সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও মাপজোকে দেখা গিয়েছে যে লুপ্ত ছেদকের গহবরের সাক্ষ্য অনুসারে এই দাঁত ছিল ছোট, চোয়ালের দু পাশ যে বনমানুষের মত সমান্তরাল নয়, মানুষের মত অধিবৃত্তিক তার ইঙ্গিত এই যে রামাপিথেকাসের মুখাগ্র ছুঁচালো ছিল না। মুখ বন্ধ করলে বনমানুষদের উপর নিচের লম্বা ছেদক দাঁত একটি আর একটির উপর চড়ে, পাশাপাশি চোয়াল চালনে (খাদ্য পিষতে যেমন দরকার) তারা বাধা দেয়, তাই খাওয়ার সময়ে তাদের মুখ নড়ে উপরে নিচে; ছোট ছেদকে সেই বাধা নেই, সুতরাং রামাপিথেকাস আমাদেরই মত চোয়াল ঘুরিয়ে খাবার পিষে খেতে পারত। এর থেকে অনুমান যে তার জীবন রীতিতেও বনমানুষের তুলনায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল, সে ফল মূল পাতা ছাড়াও শক্ত খাবার খেত এবং তা খুঁজতে বন ছেড়ে খোলা জমিতে বেরিয়ে আসত, অর্থাৎ তার ভক্ষ্য পুরো-গামীদের মত সীমিত রইল না। খাদ্য অন্বেষণে জঙ্গলের বাইরে পা দেওয়ার

কারণ ছিল, পূর্ববর্তী ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ঐ সময়ে পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চল নাতিউষ্ণ হয়ে পড়েছিল, জঙ্গল হালকা হয়ে ফল ও বাদাম বিশেষ ঋতুতে ছাড়া আর সারা বছর মিলত না, তাই খাদ্যের খোঁজে কোনও কোনও বনমানুষ বন ছেড়ে তৃণপ্রান্তরে বার হতে লাগল, সেখানে পেল শিকড়, বীজ এবং অবশেষে ছোট জন্তুর মাংসও। নৃবিজ্ঞানীরা বলেন এই সব পরিবর্তনের থেকেই রামাপিথেকাসের উদ্ভব। রামাপিথেকাস ও কিনিয়াপিথেকাসের দাঁতের ক্ষয় লক্ষ্য করে সাইমনস বলেছেন আমিষ নিরামিষ দুইই চলত। তা ছাড়া মাড়ির দাঁতও মানুষের সঙ্গে মেলে বেশী এবং তাদের উদ্গম একের পর এক, বনমানুষের মত যুগপৎ নয়। তা হলে তার শৈশব কালও বনমানুষের চেয়ে দীর্ঘতর ছিল, এবং আমরা জানি মানব শিশু এই অতিরিক্ত কালে নানা দক্ষতা অর্জন করে।

শুধু দাঁত থেকে মানুষের দিকে অগ্রগতির এতখানি ইঙ্গিত, অন্যান্য অস্থি পেলে অনেক বেশী জানা যেত। খুলি বা হাত পায়ের হাড় এ যাবৎ মেলে নি বলে কতগুলি গুরুতর প্রশ্নের জবাব নেই, যথা রামাপিথেকাসের দেহ কত বড় ছিল, মগজের পরিমাণ কতটা, হস্তকুশলতা কত দূর এগিয়েছিল এবং সে সোজা হয়ে চলত কিনা, যদিও প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ ক্লার্ক হাওএল লিখেছেন যে বর্তমান নজির থেকেই জোর করে বলা যায় সে চতুষ্পদ ছিল না। দাঁত ও চোয়ালের আকার আকৃতি থেকে মনে হয় চেহারাটা ছিল খর্বকায় শিমপানজির মত, তবে মুখ সামনে অতটা এগিয়ে ছিল না।

হস্তকুশলতা প্রসঙ্গে এখানে লীকির একটি দাবি উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট টের্নান অঞ্চলের যে জায়গায় তিনি প্রথম কিনিয়াপিথেকাসের ফসিল আবিষ্কার করেন, শেষ জীবনে সেখানেই তিনি নাকি আবার পেয়েছিলেন কৃষ্ণসার হরিণের পায়ের হাড় এবং এক খন্ড লাভা জাতীয় পাথর ; হাড়গুলি কাটা, তিনি বললেন তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় ঘা মেরে ফাটানো হয়েছে, কিনিয়াপিথেকাস মজ্জা এবং একই উপায়ে মাথার ঘিলুও বার করে খেয়েছে এবং হাতুড়ির কাজ করেছে ঐ পাথরটি। শুধু তাই নয়, পাথরের উপর আঘাতের চিহ্ন দেখে লীকির মনে হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহারকারী তা ভেঙে নিয়েছে— অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শুধু উপকরণ ব্যবহার নয়, উপকরণ তৈরির প্রথম নিদর্শন।

এ সম্বন্ধে পিলবিমের মন্তব্য হল যে কোনওটির নজির যথেষ্ট নয়, হাড় ও পাথর দুইই অন্য কারণে ভাঙতে পারে, সুতরাং এই মানবিক কীর্তির দাবি এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। তবে তাঁর মতে রামাপিথেকাসের সময়ে হাতিয়ার ব্যবহারের সূচনা হওয়া অসম্ভব নয়, যদি ছোট ছেদক দাঁতের সঙ্গে এই কৌশলের সম্পর্ক থাকে ; যুক্তিটা এই যে বড় ছেদক যে সব কাটা ছেঁড়ার কাজ সহজেই পারে, ছোটর বেলায় তাতে যান্ত্রিক সাহায্য দরকার। এখানে মনে রাখতে হবে যে সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী কিনিয়াপিথেকাস ও রামাপিথেকাস একই প্রাণী, সুতরাং এ কথা তার বেলায়ও খাটে।

ভারত ও পূর্ব আফ্রিকা ছাড়া আরও কয়েকটি দেশ থেকে পরে রামাপিথেকাস ফসিল আবিষ্কারের খবর এসেছে। ইয়েল থেকে পিলবিমের দল, ইংল্যানডের কুইন মেরি কলেজ দল ও পাকিস্থান ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দপ্তরের উদ্যমে পশ্চিম শিবালিকে দাঁত ও নিম্ন চোয়াল পাওয়া গিয়েছে (১৯৭৬), এগুলির আনুমানিক বয়স ৯০ লাখ বা এক কোটি বছর। লনডন যাদুঘরের পিটার অ্যানড্রুজ তুরস্কে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ বছর প্রাচীন নিম্ন চোয়াল উদ্ধার করেছেন, এ যাবৎ তা সবচেয়ে সম্পূর্ণ। য়োরোপে হাংগেরি থেকেও রামাপিথেকাস অস্থি প্রাপ্তির দাবি শোনা গিয়েছে (১৯৭৫)।

এই সব ফসিলে নতুন কোনও দেহাংশ না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি রামাপিথেকাস বেশ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা অবশ্য আশ্চর্য নয়, কারণ বর্তমান সাক্ষ্য অনুসারে অন্তত ৬০-৭০ লাখ বছর সে পৃথিবীতে ছিল। আমরা দেখেছি ড্রায়োপিথেকাস পরিবারের চিহ্ন আরও দূর দূরান্তরে পাওয়া গিয়েছে। স্থান, কাল, জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি অনুসারে রামাপিথেকাসের নিশ্চয় কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বস্তুত, পুঁথি পত্রে তার একাধিক প্রজাতির উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতে এই "প্রাচীনতম প্রাক্‌মানব পূর্বপুরুষের" প্রথম আবিষ্কারের পর জল্পনা শুরু হল যে তা হলে সেখানেই অথবা এশিয়ায় মানুষের উৎপত্তি, আমরা পরে দেখব এর অনেক আগেই এই মহাদেশের পূর্ব প্রান্তে পুরামানবের ফসিল পাওয়া গিয়েছে। রামাপিথেকাসের চিহ্ন অন্যত্র পাওয়া যাওয়ার পর এই সম্ভাবনা দুর্বল হয়েছে, কিনিয়াপিথেকাস সম্ভবত তার এক আদি সংস্করণ,

তার দেশ পূর্ব আফ্রিকা, সুতরাং সেখান থেকে পূব দিকে পরিযাণ (migration) আরম্ভ হয়ে থাকতে পারে। আফ্রিকা যে নানা লুপ্ত ও আধুনিক বানর ও বনমানুষে সমৃদ্ধ তা আমরা জানি। তা ছাড়া অবিলম্বে দেখা যাবে আফ্রিকা আরও এক প্রসিদ্ধ প্রাক্‌মানব অসট্রালোপিথেকাসের ধাত্রী, উপরন্তু সেখানে আবির্ভাব আর একটি প্রাণীর যাকে আদিতম মানব বলে দাবি করা হয়েছে।

এশিয়া আফ্রিকার এই প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে পরিশেষে দুটি নতুন খবর উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালে জানা যায় যে আমাদের ঘরের কাছে বর্মা দেশে প্রায় চার কোটি বছর প্রাচীন কিছু প্রাইমেট অস্থি আবিষ্কার হয়েছে যার সঙ্গে বনমানুষ অভিব্যক্তির যোগ থাকতে পারে। মান্দালয়ের পশ্চিমে পন্‌ডং পর্বত একদা সমুদ্রের নিচে ছিল, সেখানে বর্মী ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন চারটি নিম্ন পাটির চোয়াল খন্ড ও দাঁত। ইতিপূর্বে ১৯২০ দশকেও সেখানে অনুরূপ ফসিল উদ্ধার হয়েছিল, তাদের থেকে দুটি অল্প-বিভিন্ন প্রাইমেটের নাম দেওয়া হয় পনডিন্‌জিয়া ও অ্যাস্‌ফিপিথেকাস। নতুন আবিষ্কারের পর অনুমান করা হয়েছে আকার আকৃতিতে তারা ছিল আমাদের সুপরিচিত রিসাস বানরের মত, ওজন ১৪ কিলোগ্র্যামের কাছাকাছি। "অনেকটা বানর, কিন্তু বনমানুষের মত দাঁত, গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত তারা", এই রকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, খাদ্য সম্ভবত ফল ও অন্যান্য উদ্ভিদ। ফসিলের সঙ্গে প্রাপ্ত চার কোটি বছর আগের কুমির, কচ্ছপ, অন্যান্য সরীসৃপ ও হীনতর প্রাণীদের দেহাবশিষ্ট থেকে এই প্রাইমেটদের বয়স জানা গিয়েছে, এদের গুরুত্ব এই যে ক্ষুদ্র প্রাইমেটদের থেকে বানর ও বনমানুষ অভিব্যক্তির পথে এরা হয়তো তাদের যৌথ পূর্বপুরুষ, ইজিপটোপিথেকাসেরও আদিতর। এর থেকে মার্কিন আবিষ্কর্তারা সন্দেহ করেছেন মানব-তরুর মূল এশিয়ায়, জল্পনা করেছেন সেখান থেকে আফ্রিকায় গিয়ে এরা বনমানুষের পথে আমাদের পরবর্তী পিতৃপুরুষে অভিব্যক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে সমসাময়িক আর এক গবেষণার থেকে এক তরুণী নৃবিজ্ঞানী দাবি করেছেন এই মূল নিহিত মধ্য আফ্রিকার বৃষ্টিধৌত বনে। সেখানে জাইরা (প্রাক্তন কংগো) দেশের এক সংকীর্ণ অঞ্চলে বাস করে কিছু বামন

শিমপানজি, আমাদের পরিচিত চিড়িয়াখানার জন্তুটির চেয়ে সামান্য ছোট। সংখ্যায় অল্প এবং মানুষকে এড়িয়ে চলে তারা, তাই বেশী ধরা পড়ে নি, কঙ্কালও বিরল। ১৯৩৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে তাদের পূর্বপুরুষ থেকেই আফ্রিকার বনমানুষ ও মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে, ১৯৭৮ সালের খবরে জানা যায় যে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী এড্রিয়েন জিলম্যান যতগুলি সম্ভব জীবন্ত বামন শিমপানজি ও তাদের কঙ্কাল পরীক্ষা করে এই অভিমতের সমর্থনে নজির সংগ্রহ করেছেন। যেমন, আফ্রিকার অন্য বনমানুষদের মত তারাও মাটিতে ও গাছে চলতে ফিরতে সমান পটু, কিন্তু বন্দী অবস্থায় তারা যে সাধারণ শিমপানজির চেয়ে বেশী ঘন ঘন দু পায়ে হাঁটে তা মানুষের আত্মীয়তার নির্দেশক। তা ছাড়া অভিব্যক্তির পথে বনমানুষদের যে সব সাধারণ বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে তাও তাদের মধ্যে প্রকট নয়, যথা ডাল থেকে ঝুলে ঝুলে চলবার মত দীর্ঘ বাহু তাদের নেই; গরিলা ও সাধারণ শিমপানজি পুরুষদের ছেদক দাঁত স্ত্রীদের চেয়ে বড়, মানুষের তা নয়, খর্ব শিমপানজিরা এ বিষয়েও তার কাছাকাছি। দেহের ও মগজের আয়তনে তাদের স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ অন্য বনমানুষের চেয়ে কম। সাধারণ থেকেই বিশেষের উৎপত্তি এই নিয়ম অনুসারে উপরোক্ত নজির থেকে সন্দেহ করা যায় যে প্রাক্‌মানবের শাখা বিভক্ত হওয়ার আগে বনমানুষ ও মানুষের যৌথ পূর্বপুরুষ চেহারায় এবং সম্ভবত স্বভাবেও প্রায় বামন শিমপানজির মতই ছিল।

রামাপিথেকাস ও অসট্রালোপিথেকাসের মধ্যে অনেক কালের অন্ধকার। রামাপিথেকাসের অধিকাংশ ফসিলের বয়স এক কোটি ৪০ লক্ষ বছরের কাছাকাছি, বোধহয় সেই সময় তার চরম বিকাশ ঘটেছিল, ৯০ লাখ বছরের কম কোনও অস্থি পাওয়া যায় নি; তা হলে বর্তমান সাক্ষ্য অনুসারে অন্তিম রামাপিথেকাসের সঙ্গে প্রাথমিক অসট্রালোপিথেকাসের দূরত্ব প্রায় ৫০-৬০ লাখ বছরের। এবং সাম্প্রতিক অনুসন্ধানীদের দাবি অনুসারে প্রথম মানুষের আবির্ভাবও সেই অতীতে পিছিয়ে গিয়েছে। প্লায়োসিন অধিযুগের এই বিশাল ফাঁক পেরিয়ে সেতু গড়বার মত বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি, সমগ্র প্লায়োসিনের এক কোটি বছর জুড়ে নব নব প্রাইমেট এবং তাদের মধ্যে ক্রমশ

খোলা জমিতে বাস ও দু পায়ে চলার চেষ্টা দেখা দিয়েছে, কিন্তু টুকরো টাকরা ফসিল যা মিলেছে তা কেবল কৌতূহল বাড়িয়েছে, নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র গাঁথা সম্ভব হয় নি। নতুন আবিষ্কারের বিরাট এক ক্ষেত্র পড়ে আছে এখানে। অবশ্য অসট্রালোপিথেকাসের পূর্ববর্তী ফাঁক ভরবার প্রশ্ন মিলিয়ে যায় যদি রামাপিথেকাস পদচ্যুত হয়—সেই সম্ভাবনার আলোচনা হবে পরে।

এ দিকে এই সমস্যার সমাধানে সম্প্রতি এক অভিনব ধারণার সুপারিশ করেছেন এলেইন মর্গ্যান তাঁর 'জলচর বনমানুষ' গ্রন্থে। মানব অভিব্যক্তির পথে বনমানুষরা একদা জলে বাস করেছে এই পুরাতন প্রস্তাবের সূত্র ধরে লেখিকা বলেছেন যে ৯০ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়ে বহু লক্ষ বছর ধরে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অংশ সমুদ্রমগ্ন হয়েছিল, তখন দ্বীপে দ্বীপে আশ্রিত বনমানুষ দলের দিকে জল সরে আসে, এই নতুন পরিবেশে বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটে মানুষের দিকে। এই কালের কোনও ফসিল সাক্ষী যে নেই তার কারণ হয়তো শক্তিশালী সামুদ্রিক প্রাণীরা বনমানুষদের দেহাবশেষ চিবিয়ে খেয়ে হাড়গোড় গুঁড়ো করে ফেলেছে।

যাই হক, নিঃসন্দেহে প্রাক্‌মানব অসট্রালোপিথেকাস কিন্তু রামাপিসেকাসের অনেক আগেই আবিষ্কৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিখ্যাত, অনেক রকমারি ফসিল পাওয়ার ফলে শুধু বংশ পরিচয় ছাড়াও তার সম্বন্ধে অনেক বেশী জানা গিয়েছে। আমাদের কাহিনীতে এ বার তার পালা।

৩। মানুষের পূর্বপুরুষ ?

দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের জোহানেসবার্গ শহরে অধ্যাপক রেমন্ড ডার্ট তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন শারীরস্থান বিষয়ক যাদুঘরের জন্য ফসিল সংগ্রহ করতে। ১৯২৪ সালে এক দিন এঁদের এক জন ৩০০ কিলোমিটার দূরে টাউং (দেশী ভাষায় 'সিংহ ভূমি') নামক জায়গার এক চুনাপাথরের খনি থেকে নিয়ে এলেন বিলুপ্ত জাতির বেবুনের একটি খুলি, ডার্টের অনুরোধে খনির মালিক তাঁকে দুটি বড় বাক্স ভরে ভাঙা পাথর পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম বাক্সে কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অবিলম্বে চোখে পড়ল অদ্ভুত এক খন্ড পাথর, যেন কোনও খুলির গহবরে বস্তু জমে তৈরি হয়েছে, এবং সেই ছাঁচের আকার আকৃতি মোটেই বেবুনের খুলির মত নয়। খুঁজতে খুঁজতে নিচে আর একটি পাথর পাওয়া গেল যার খোবলে ওটি চমৎকার খাপ খায়, তাতে অস্পষ্ট দেখা গেল এক খন্ড খুলি ও নিম্ন চোয়ালের রেখা। কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে জমাট পাথর কুচি সরিয়ে হাড়গুলি মুক্ত করতে করতে ক্রমে দেখা দিল পাঁচ ছ বছর বয়স্ক এক শিশুর মুখ ও খুলির অধিকাংশ। মুখ ও দাঁতে যেন মানুষের আভাস মেলে, যদিও মগজের মাপ মাত্র ৫০০ সিসির মত, অর্থাৎ তা বয়স্ক আধুনিক মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু বনমানুষের তুলনায় বড়। বেবুনের মত লম্বা চোয়াল ও মস্ত ছেদক দাঁতও অনুপস্থিত। ডার্ট বললেন বনমানুষ ও মানুষের মধ্য পথে এর স্থান, নাম দিলেন অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণী বনমানুষ)।

কিন্তু খ্যাতি ও মর্যাদার পরিবর্তে পেলেন অবিশ্বাস ও উপহাস। তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা অধিকাংশই য়োরোপীয়, তাঁরা বললেন ঐ ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক প্রাণীটি শিম্পানজি বা গরিলার মত কোনও নরোপম বনমানুষ, তার বেশী কিছু নয়। ইতিপূর্বে এ রকম অনেক দাবি ধোপে টেকে নি, তা ছাড়া অবিশ্বাসের গোড়ায় ছিল প্রধানত এক গোঁড়া বিশ্বাস যে মনুষ্যত্বে পৌঁছাতে বনমানুষের আগে মগজ বেড়েছে, পরে চোয়াল ও দাঁত বদলেছে, যেমন দেখা

গিয়েছে কুখ্যাত পিল্‌টডাউন মানবে। এই ব্যক্তি তখন সগৌরবে পন্ডিতদের বিচার বিবেচনা জুড়ে ছিল—কে জানত যে অদৃষ্ট এক দিন তাঁদেরই পরিহাস করবে, পিলটডাউন মানব মিথ্যা প্রমাণিত হবে। (বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি ও গোয়েন্দাগিরির এই সরস কাহিনীর বিশদ বর্ণনা পরে।) ডার্ট মানলেন না যে তিনি সাধারণ কোনও বনমানুষের অস্থি উদ্ধার করেছেন মাত্র। তাঁর বিশ্বাস প্রাণীটি খাঁটি দ্বিপদ, কারণ যে ছিদ্র দিয়ে সুষুম্নাকান্ড (spinal cord) খুলিতে ঢোকে এই মুণ্ডতে তার স্থান বনমানুষের মত পিছন দিকে নয়, আরও সামনে, তার থেকে বোঝা যায় টাউং শিশুর মাথা মেরুদন্ডের উপর সোজা বসানো ছিল। কিন্তু ডার্ট তখনও অখ্যাত, বিজ্ঞান জগতে পাত্তা পেলেন না; একমাত্র তাঁর দেশবাসী প্রত্নজীববিৎ রবার্ট ব্রুম এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সমর্থনে এবং পরে অন্যত্র নিজের আবিষ্কার থেকে আরও প্রমাণ দাখিল করেছিলেন।

টাউং শিশুর মুন্ড থেকে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে চার বছর লাগল, ডার্ট স্পষ্ট দেখলেন চোয়াল দুটি ও দাঁত বনমানুষের তুলনায় বরং মানুষের অনুরূপ। সামনে কৃন্তক ও ছেদক অনেকটা ছোট, যেখানে বনমানুষের সেগুলি লম্বা (বেশী উদ্ভিদজাত খাদ্য কাটতে ছিঁড়তে এবং লড়াই করতে সুবিধা হয় বলে)। তা ছাড়া বড় ছেদককে জায়গা দিতে বিপরীত দন্তপাটির মধ্যে ফাঁক না থাকলে মুখ বন্ধ হবে না, এই ফাঁক আছে বনমানুষের (অথবা কুকুরের, যার থেকে ঐ দাঁতটির ইংরেজি নাম এসেছে); বনমানুষের চোয়ালও মানুষের তুলনায় লম্বা ও ভারী, সুতরাং তাদের চালাতে দরকার হয় বড় মাংসপেশী এবং সেগুলির খুঁটির কাজ করে খুলির উপরে উঁচু করে তোলা হাড় বা অস্থিচূড়া—এই সব কিছুর উদ্দেশ্য হল উদ্ভিদ আহার্যের চর্বণ ও পেষণ। দেখা গেল টাউং চোয়াল বনমানুষ শিশুর তুলনায় ছোট ও হালকা, ছেদক লম্বায় ছোট বলে দন্তপাটিতে ফাঁক নেই এবং খুলির মাঝামাঝি অস্থিচূড়াও অনুপস্থিত। প্রাক্‌মানবের এই সব বৈশিষ্ট্য যে খাদ্য রুচি পরিবর্তনের নির্দেশক তা আমরা রামাপিথেকাসের আলোচনায় দেখেছি।

ব্রুম বুঝলেন বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ ভাঙতে মাত্র একটি শিশুর খুলির উপর নির্ভর করলে চলবে না। চাই বয়স্ক খুলি এবং বিশেষত দ্বিপদত্ব প্রমাণ করতে পা

ও শ্রোণীর হাড়, সুতরাং নতুন অনুসন্ধান দরকার। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, জোহানেসবার্গের প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কয়েকটি গুহা থেকে পাথর কেটে চালান হচ্ছে, এক দিন সেখানে গিয়ে কর্তাদের থেকে উপহার পেলেন এক খুলির ঊর্ধ্বাংশ ; খুঁজতে খুঁজতে অবিলম্বে তার আরও কয়েকটি খণ্ড পাওয়া গেল। জায়গাটির নাম স্টার্কফনটাইন, পরে সেখানে আরও ফসিল পাওয়া গিয়েছে। পরোক্ষ উপায়ে এগুলির আদিতম বয়স অনুমান করা হল ২৫ লক্ষ কিংবা তদূর্ধ্ব বছর, চারটি খুলি থেকে মগজের মাপ দাঁড়াল গড়ে ৪৮৫ সিসি। টাউং খুলির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেও ব্রুম তাঁর আবিষ্কারের প্রজাতীয় নাম বদলে দিলেন, পরে প্রাণীটিকে নতুন গণের সম্মান দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন সর্বসম্মতিক্রমে সেও অ. আফ্রিকানাস।



চিত্র ৪। অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাসের অনুমিত মূর্তি।

দু বছর পরে সেখানেই ব্রুম আবার এক খুলির খণ্ড উপহার পেলেন, খোঁজ করে জানলেন অদূরে ক্রমড্রাইতে এক স্কুলের ছেলে পথে যেতে যেতে দেখতে পায় মাটির তলা থেকে তা উঁকি দিচ্ছে। ব্রুম ছুটলেন খুঁজতে, বালক তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিল, উপরন্তু দিল সেই খুলিরই আরও কয়েকটি অংশ এবং কিছু দাঁত। সব জোড়াতাড়া দিয়ে তিনি দেখলেন অ. আফ্রিকানাসের সঙ্গে মুণ্ডটির বেশ কিছু পার্থক্য আছে, এটির চোয়াল ও দাঁত বৃহত্তর, প্রাণীটিও যেন বড়সড় গাঁট্টাগোট্টা। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি আবার নতুন

গণ ও প্রজাতি সৃষ্টি করলেন—প্যারান্‌থ্রপাস রোবাস্‌টাস (গ্রীসীয় শব্দ থেকে প্যারানথ্রপাস বোঝায় মানুষ-সন্নিকট, মনে হয়েছিল তার প্রাচীনতা অসট্রালোপিথেকাসের চেয়ে কম)। প্রায় প্রতি আবিষ্কারের নতুন নামকরণের জন্য ব্রুম নিন্দিত হয়েছিলেন ; কেউ বলেন প্যারানথ্রপাস অ. আফ্রিকানাসেরই এক প্রকার ভেদ মাত্র, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের রীতি অনুসারে আমরাও তাকে অসট্রালোপিথেকাস রোবাসটাস বলব।

১৯৪৯ সালে প্রথম খনিটির নিকটতর সোআর্টক্রান্‌স নামক জায়গায় আরও ফসিল উদ্ধার হল, উপরন্তু স্টার্কফনটাইনের প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উত্তর-পূবে মাকাপান গুহায় ডার্ট আবার অনেক অস্থি আবিষ্কার করলেন। সব মিলিয়ে ডার্ট, ব্রুম ও অন্যান্য সন্ধানীরা দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের প্রধান পাঁচটি ঘাঁটিতে অসট্রালোপিথেকাসের কয়েক শো ফসিল উদ্ধার করেছেন, তার মধ্যে ব্রুম পেয়েছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি শ্রোণীচক্র যার থেকে নিঃসন্দেহে এই প্রাক্‌মানবের দ্বিপদ গতি প্রমাণিত হয়েছে।

স্থূল পরোক্ষ পদ্ধতির সঙ্গে অনেকখানি যুক্তিসংগত অনুমান মিশিয়ে তিনি যখন অসট্রালোপিথেকাসের বয়স আন্দাজ করলেন মোটামুটি ২০ লক্ষ বছর তখন তাও বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানীরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—যার মগজ বড়জোর শিমপানজির চেয়ে সামান্য বড় আমাদের এমন দ্বিপদ পূর্বপুরুষ কিনা ২০ লাখ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল! যদিও এখন জানা গিয়েছে যে ব্রুমের অনুমান ভুল নয়, ঐ ধরনের পাণ্ডিতী অভিমানের ফলে অসট্রালোপিথেকাস অনেকের চোখে বনমানুষ হয়েই রইল, বহু দিন প্রাক্‌মানবের স্বীকৃতি পেল না। কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধান ও গবেষণা, প্রথমত লীকি দম্পতির, তাকে যোগ্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ট্যান্‌জানিয়ায় তাদের কর্ম ক্ষেত্র থেকে মধ্য পথে রামাপিথেকাসের বিচরণ ভূমি ভারতকে ফেলে প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের যবদ্বীপ, সেখানে এক ওলন্দাজ চিকিৎসক ১৮৯১ সালে উদঘাটন করেন জাভা মানব ; সে এখন হোমো ইরেক্‌টাস গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সর্বসম্মতিক্রমে মানুষ, অনেকের মতে প্রথম মানুষ—নিঃসন্দেহে তার পরে অসট্রোলোপিথেকাস এক দিকনির্দেশক আবিষ্কার। লীকিদের অনুসরণ করে কাছাকাছি ইথিওপিয়া, কিনিয়া ও অন্যত্র বিগত কয়েক বছরে উদ্ধার হয়েছে

আরও বেশ কিছু প্রাক্‌মানবের অস্থি, যদিও কেউ কেউ বলেন তারা অনেকে হোমো গণের আদি মানব। সেই বিতর্কে পেঁছাবার আগে অসট্রালোপিথেকাস-গণীয়দের সঙ্গে ভাল পরিচয় করা দরকার। প্রথমে দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে কোথায় কোন ধরনের অসট্রালোপিথেকাস দেখা দিয়েছিল।

পূর্ব আফ্রিকার ট্যানজানিয়ার এক রুক্ষ মরুভূমিতে সেরেংগেটি প্রান্তরের ওলডুভাই নামক জায়গাটি মেরি ও লুই লীকির প্রধান কর্মক্ষেত্র বলে আজ বিশ্ববিখ্যাত। লাখ বিশেক বছর আগে এই উষর ভূমির সম্পূর্ণ অন্য চেহারা ছিল, দুটি আগ্নেয়গিরির পাদ দেশে ছোট ছোট হ্রদ ও জলা, তাদের ঘিরে উর্বর প্রশস্ত প্রান্তরে বিচিত্র তরু লতা ও প্রাণীর সমাবেশ—এক জাতের অতিকায় বেবুন বানর ছাড়াও বরাহ, নানা হরিণ, খড়্গদন্ত বাঘ, হস্তীকায় ডাইনোথেরিয়াম, গণ্ডার, শকুনি ইত্যাদি। হ্রদের পলিতে ও আগ্নেয়গিরিনিসৃত ভস্মে বহু লক্ষ বছর ধরে নানা জন্তু, প্রাক্‌মানব, এমন কি পুরামানবের দেহ ধরা পড়ে সংরক্ষিত হয়ে আছে। পরে গিরি গর্ভের আগুন নিভল, প্রবহমান এক নদের প্রবল বার্ষিক বন্যাস্রোত ক্রমে সেখানে কাটল প্রায় ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৯০ মিটার গভীর এক খাত। কালে কালে নদী হারাল তার ধারা, দেখা দিল তৃষিত মরু।

এখন উপলাকীর্ণ দগ্ধ ভূমি খাঁ খাঁ করছে, কিন্তু ফসিল-শিকারীদের কাছে তা সব-পেয়েছির দেশ। কারণ তার বন্ধ্যা মাটি অতীব অস্থি-উর্বর এবং কেক কাটলে যেমন পর পর স্তর দেখা যায়, নদীর ছুরিও তেমনি খাতের গায়ে পলি ও ভস্মের বেশ কয়েকটি স্পষ্ট স্তর উন্মুক্ত করেছে। সবচেয়ে সুবিধা হল বয়স জানতে এই বস্তুর উপর তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতির প্রয়োগ চলে, জানা গেল নিম্নতম স্তরের মেঝে ১৯ লক্ষ বছর (অর্থাৎ প্রায় প্লাইসটোসিন অধিযুগের সূচনা কাল) এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতর স্তরের ছাত ১০ লক্ষ বছর প্রাচীন ; এই দুটিই সবচেয়ে গুরুতর, তাদের উপরে অবশ্য আছে আরও সাম্প্রতিক বিভাগ। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘাঁটিগুলিতে সূক্ষ্ম তারিখ নির্ণয় সম্ভব হয় নি এই ধরনের স্তরের অভাবে, ফসিলবাহী পাথরও ব্যাবসার খাতিরে উধাও হয়েছে ; এই কারণে টাউং খুলির বয়স এক দিকে ২০ লাখ বছরের বেশী অন্য দিকে ১০ লাখ বছরের কম হতে পারে। এই রকম জায়গায় আবিষ্কৃত জন্তুর হাড়

অন্য তারিখ-নির্ণীত ঘাঁটিতে প্রাপ্ত অনুরূপ হাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরোক্ষে বয়স অনুমান করা চলে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে জন্তুগুলি লুপ্ত বলে তা সম্ভব হয় নি।

ওলডুভাইর নীরস ক্ষেত্রে ১৯৩১ সালে প্রথম পা দিয়ে লীকি অবিলম্বে বুঝলেন তিনি এক পুরাতাত্ত্বিক সোনার খনি পেয়েছেন, খাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথুরে হাতিয়ারের মধ্যে এক আদিম হাত-কুড়াল (hand-axe) উদ্ধার হল কয়েক মিনিটের মধ্যে। দেখা গেল নিম্নতম স্তরের হাতিয়ার প্রায় স্বাভাবিক পাথরের মত, কিন্তু এক মাথা ভাঙা, যেন ছিলকা খসিয়ে ধার আনবার চেষ্টা হয়েছে। লীকি বললেন এগুলি প্রাকৃতিক কারণে খন্ডিত হয় নি, কিন্তু বছরের পর বছর যায়, সে কাজটা করে থাকতে পারে এমন কোনও যন্ত্রশিল্পীর হদিস পাওয়া গেল না। লুই কাজ করতেন উত্তরে কিনিয়ার রাজধানী নাইরোবি শহরের যাদুঘরে, সময় পেলেই কয়েক শো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে চলে আসতেন ওলডুভাইতে; অবশ্য পথ বলতে তখন কিছু ছিল না, আরও ছিল না সময়ের ও অর্থের সাকুল্য। ২৮ বছর ধরে এ ভাবে প্রচন্ড গরমে বুনো মোষ তাড়িয়ে পতি পত্নী অবশ্য নানা স্তরের হাতিয়ার ছাড়াও সংগ্রহ করলেন বহু প্রাণীর অস্থি, সেগুলির কিছু কিছু ভুক্তাবশিষ্ট। চারটি প্রধান স্তর থেকে দেড় শো'র বেশী প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেল, এ সব জন্তুর অনেকগুলি আজ লুপ্ত, কিছু তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত। কিন্তু তবু সেই রহস্যময় শিলাশিল্পীরা এত অধ্যবসায় ব্যর্থ করে লুকিয়ে রইল, কতিপয় ক্ষুদ্র খুলি-খন্ড ও দাঁত ছাড়া প্রাক্‌মানবের অস্থি কিছু জুটল না।

অবশ্য লীকি দম্পতি নিয়মিত খনন আরম্ভ করতে পেরেছিলেন মাত্র ১৯৫০ দশকে। অবশেষে ১৯ জুলাই ১৯৫৯, অপরাহ্ণ। লুই জ্বর নিয়ে তাঁবুতে শুয়ে পড়েছেন, তাঁকে রেখে স্ত্রী কুকুরদের হাঁটাতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ দেখেন নিম্নতম স্তর থেকে উঁকি দিচ্ছে এক খুলি। কিছুটা মাটি সরিয়ে প্রকাশ পেল বড় বড় দাঁত, তৎসত্ত্বেও তারা নিশ্চয় প্রাক্‌মানবের। "পেয়েছি পেয়েছি" বলে চিৎকার করতে করতে তিনি ছুটে গেলেন তাঁবুতে। জ্বর ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন লুই, স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটলেন, পেঁছে দেখেন সত্যিই যেন কোনও প্রাক্‌মানব মুন্ড প্রকাশমান। সন্ধানে পাওয়া গেল

ইতস্তত ছড়ানো আদিম পাথুরে হাতিয়ার ও পশুর হাড় (সম্ভবত মাংস ভক্ষণের পর বর্জিত); নিম্ন বা আদি প্লাইসটোসিন কালের তৈরি অস্ত্র ও প্রাক্‌মানবের একত্র সমাবেশ দেখা গেল।

খুলিটি অক্ষত নয়, নিম্ন চোয়াল নেই, কিন্তু তার ভাঙা হাড়গুলি জোড়া দিয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ এক করোটি। মেধার মাপ ৫৭০ সিসি, আধুনিক মানুষের সঙ্গে পেষক দাঁতের ক্ষয় তুলনা করে বোঝা গেল তা ১৭-১৮ বছর বয়স্ক যুবকের (বয়সের সঙ্গে দাঁতের ক্ষয় বাড়ে)। স্তরের ভস্মে তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম মেপে জানা গেল ১৭½ লাখ বছর আগে সে ওলডুভাইতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার মাড়ির দাঁতগুলি আশ্চর্য রকম মোটা, তার থেকে ডাক নাম তৈরি হল 'বাদামভাঙা মানুষ', আর লীকি বৈজ্ঞানিক আখ্যা দিলেন জিন্‌জান্‌থ্রপাস বোআজাই (পূর্ব আফ্রিকার সাবেক নাম জিন্‌জ্‌, তার থেকে গণ আর গবেষণার সহায়ক ব্যক্তির নামে বোআজ (Boise) তহবিল থেকে প্রজাতি)। স্বভাবতই লীকিরা ভাবলেন জিনজানথ্রপাস ঐ সব হাতিয়ারের স্রষ্টা এবং তা হলে হয়তো তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায়। কিন্তু আমরা পরে দেখব অবিলম্বে আর এক জন সেই সম্মান দাবি করল।

এখন জিনজানথ্রপাসও অসট্রালোপিথেকাসের এক জোয়ান সংস্করণ বলে বলে স্বীকৃত, ওরফে অ. বোআজাই। অনেকে রোবাসটাসের সঙ্গে তার পার্থক্য মানেন না—আমরা পরে অসট্রালোপিথেকাস প্রজাতিদের ভেদাভেদ আলোচনা করব। ওলডুভাইর পরে পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্রও তাদের সদৃশ প্রাক্‌মানবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ইথিওপিয়ায় ওমো নদীর উপত্যকার ফসিল-সমৃদ্ধি আজ বিখ্যাত। ওলডুভাই ও ওমো দুইই আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণে এক বিশাল ফাটলের অংশ এবং এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। এখন ওমো ওলডুভাইর চেয়েও বেশী উত্তপ্ত স্থান, কিন্তু সে কালে দু জায়গা দিয়েই বয়ে গিয়েছিল নদী, জলের ধারে উদ্ভিদ-সমৃদ্ধ জমি, সুতরাং বহু জন্তু জানোয়ারের বাস, বনের পরে প্রান্তর—সবই প্রাক্‌মানবের বিকাশ ও বৃদ্ধির অনুকূল। ওমোতেও স্তরে স্তরে জমেছে আগ্নেয়গিরি-নিসৃত ভস্ম, যার তারিখ নির্ণয় সহজ, উপরন্তু স্তরের সংখ্যা বেশী এবং নিম্নতমটি ৪০ লাখ বছরেরও বেশী প্রাচীন ; তা ছাড়া এক মস্ত সুবিধা যে

খননের কাজ কম, কারণ ভূগর্ভের ঠেলায় নিচের স্তরগুলি উঠে উপরের সঙ্গে কোণাকুণি হয়ে থেমেছে, সুতরাং ফসিল-শিকারী সেই ঢালু জমির উপর দিয়ে হেঁটে নেমে এলেই উন্মুক্ত ও ক্রমশ-প্রাচীনতর স্তরগুলিতে অনুসন্ধান চালাতে পারে।

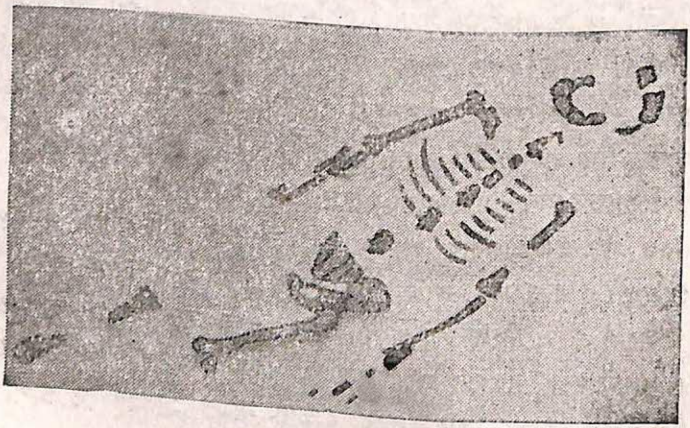
ফ্রানস থেকে কামিল আরামবুর্গ ও ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লার্ক হাওএল তাঁদের দল নিয়ে এখানে এসে পেয়েছিলেন নানা বিলুপ্ত জন্তু (শুয়োরেরই ছয় গণ ও আট প্রজাতি) এবং প্রাক্‌মানবের খুলির ও চোয়ালের খন্ড, তা ছাড়া দাঁত। চারটি দাঁত বোআজাইর অনুরূপ, কিন্তু তাদের বয়স ৩৭ লাখ বছর, অর্থাৎ আদি জিনজানথ্রপাসের দ্বিগুণ। উপরন্তু হাওএল উদ্ধার করলেন ৩০ লক্ষ বছর প্রাচীন দাঁত ও উরু-অস্থির অংশ, সেগুলি দেখতে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের অ. আফ্রিকানাসের হাড়েরই মত।

লীকিদের যোগ্য সন্তান রিচার্ড, অল্প বয়সেই বাপ মা'র সঙ্গে প্রাক্‌-মানবের পুরামানবের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে তাঁর শিক্ষানবিসি হয়েছে। বেশ কিছু দিন ওমো উপত্যকা পরীক্ষা করে নতুনের খোঁজে তিনি হেলিকপটারে চড়ে বসলেন। ওমো নদী ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির থেকে নেমে এসে দেশের সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কিনিয়ায় তুর্কানা হ্রদে পড়েছে, নাইরোবি থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে এই জলাশয়টি সংকুচিত হতে হতে এখনও ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আকাশ থেকে কতগুলি চিহ্ন দেখে হ্রদের ধারে তিনি এমন একটি স্থলে নামলেন যার ঠিক নিচেই লুকিয়ে ছিল সমৃদ্ধতম এক ফসিল খনি। মাটি খুঁড়ে প্রথম বছরেই উদ্ধার হল তিনটি উৎকৃষ্ট খুলি, চব্বিশের বেশী সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ চোয়াল, বাহুর ও পায়ের হাড় এবং দাঁত। তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বোআজাই ধরনের। অসট্রালোপিথেকাস ছাড়া তুর্কানায় রিচার্ডের অন্য আবিষ্কারও আছে, তা পরে আলোচ্য।

আরও পরে ইথিওপিয়ার আফার মরু উপরোক্ত ঘাঁটিগুলির মত প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। রাজধানী আডিস আবাবার প্রায় ২৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূবে এখানে একদা ছিল এক প্রকান্ড হ্রদ, এখন তার বিশুষ্ক তলে প্রাচীন কালের সাক্ষী স্তর পর পর জমে উঠেছে। ছোট এক নদী আওআশ ঘোলা জল বয়ে নিয়ে চলেছে, তার ধারে হাডার নামক জায়গাটিতে চাপা ছিল

সমৃদ্ধ ফসিল খনি। সেখানে প্রধান আবিষ্কর্তা যুক্তরাষ্ট্রের ডনাল্ড জোহানসন, সঙ্গে আছেন ফ্রানসের তরুণ ভূবিজ্ঞানী মরিস তায়েব এবং ইথিওপিয়ার পুরাতত্ত্ব দপ্তর থেকে আলেমেহু অ্যাসফ। তারিখ ৩০ নভেমবর ১৯৭৪, সে দিন দুপুরের আগে মরা হ্রদের প্রান্তে ১০০ মিটার পলির নিচে তাঁরা পেয়ে গেলেন এক দেহাবশেষ—শুধু দাঁত ও ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ড নয় (সাধারণত যেমন পাওয়া যায়), ক্রমে সংগ্রহ হল কঙ্কালের ৪০ শতাংশ; সব যে একটি প্রাণীর থেকেই এসেছে তা বোঝা গেল কারণ কোনও হাড়ই দুটো নেই। প্রথম দাবি অনুসারে তার প্রাচীনতা প্রায় ৩৭½ লক্ষ বছর হলেও ক্রমশ কমে সর্বশেষ নির্ধারণ অনুযায়ী তা ২৯—৩৬½ লক্ষ বছরে দাঁড়িয়েছে, মধ্যাঙ্ক ৩২ লক্ষ ৮০,০০০ বছর গ্রহণ করা যেতে পারে। অসট্রালোপিথেকাসের এতটা অক্ষয় ফসিল এর আগে আর মেলে নি, যদিও ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি এক গণনায় তার অস্থি খণ্ডের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪২৭, তার অধিকাংশই দাঁত ও চোয়াল। শ্রোণীচক্রের প্রসার দেখে বোঝা গেল প্রাণীটি স্ত্রী জাত য়।

সেই প্রথম রাত্রে উত্তেজনায় তাঁবুতে কারও ঘুম হল না, বিয়ার পানের সঙ্গে সঙ্গে চলল উল্লসিত আলোচনা, নির্জন নিঃশব্দ প্রকৃতি বিদীর্ণ করে টেপরেকর্ডারে চড়া গলায় বেজে চলেছে বীট্‌ল্‌স নামক পপ-গায়ক দলের গান, তা রচিত কোন এক লুসির নামে—তাই হয়ে গেল এই আদিম কন্যাটির আদুরে নাম।



চিত্র ৫। লুসির অস্থি সংগ্রহ।

১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে আরও দুটি অভিযানে জোহানসনের আন্তর্জাতিক দল হাডারের এক পর্বত গাত্র থেকে লুসির অনুরূপ আরও প্রায় ২০০ দাঁত ও অস্থি খণ্ড উদ্ধার করেছেন, সেগুলি যাদের দেহাবশিষ্ট তাদের সংখ্যা তেরোর কম নয়, হয়ত তিরিশের বেশী, তাদের মধ্যে ছিল স্ত্রী, পুরুষ ও অন্তত চারটি শিশু। স্থানীয় পরীক্ষার থেকে জোহানসন জল্পনা করেছেন এরা মারা পড়েছিল আকস্মিক বন্যা বা সংক্রামক রোগের মত কোনও দুর্ঘটনায়। স্বদেশে পরীক্ষা শেষ করে ১৯৮০ সালের প্রথমে মরিস তায়েবের সঙ্গে তিনি ইথিওপিয়ায় ফিরে যান এবং হাডারের সম্পূর্ণ সম্পদ (৩৫০-র বেশী) সে দেশের জাতীয় রক্ষণশালাকে হস্তান্তর করেন। আধুনিক সংশোধন অনুসারে এগুলি লুসির সমপ্রাচীন।

১৯৮১ সালের শেষার্ধে আফার মরুতে আরও ফসিল উদ্ধার করেন জোহানসনের সহকর্মী টিমথি হোআইট ও ডেজ্মন্ড ক্লার্ক লুসির প্রাপ্তি স্থানের ৭২ কিলোমিটার দক্ষিণে। আওআশ নদীর উপত্যকা খুঁড়ে ১০ দিনে দুই বিভিন্ন প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেল, নিকটবর্তী তেজস্ক্রিয় ছাই থেকে তাদের বয়স দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ বছর। একটি উরু-অস্থির উপরাংশ প্রায় ১১ সেন্টিমিটার লম্বা, তার থেকে অনুমান তা ছিল ১৬-১৭ বছর বয়স্ক এক পুরুষের। পেশীগুলি কোথায় হাড়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা বোঝা গেল দাগ থেকে এবং হোআইট বলেন তা দ্বিপদ গতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয় প্রাণীটির খুলির সাত টুকরো ছিল প্রায় ৮০০ মিটার দূরে, পরস্পরের ৪৬ সেন্টিমিটারের মধ্যে, তিনটি খণ্ড সহজেই খাপে খাপে মিলে গেল, তার থেকে খুলির আকৃতি অনুমান করা হয়েছে। আবিষ্কর্তাদের ধারণা মগজের পরিমাণ ৪০০ সিসি, দেহের উচ্চতা এক মিটার ২৪ সেন্টিমিটার এবং চলন সম্ভবত আধুনিক মানুষের মত। লুসি-সদৃশ হলেও তাঁরা এই প্রাক্মানবের কোনও নাম দেন নি, শুধু বলেছেন সে মানুষের এ যাবৎ প্রাচীনতম সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ হতে পারে।

সেই আদি কালে হ্রদের চার পাশ গাছপালায় ঢাকা ছিল এক নানা রকম জন্তু জানোয়ারের বাস ছিল সেখানে। লুসি ও অন্যান্যরা খেয়েছে কাঁকড়ার দাড়া, কচ্ছপের ও কুমিরের ডিম। পণ্ডিত মহলে লুসি এখন আরও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, কারণ যদিও অনেকের মতে সে অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস ছাড়া কিছু নয়, জোহানসন তার নাম বদলে অ. আফারেন্সিস প্রজাতি সৃষ্টি

করেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁর দাবি নিয়ে তীব্র কখনও বা তিক্ত বিতর্ক চলেছে, বিরোধ কি নিয়ে আমরা তার আলোচনা করব পরে।

এই সব আবিষ্কার থেকে অসট্রালোপিথেকাসগণীয়দের নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত, শুধু কিছু অসংলগ্ন অস্থির তুলনা এবং বিচারে তা অস্বাভাবিক নয়। বর্ণনার সুবিধার জন্য আপাতত উপরোক্ত প্রজাতীয় নামগুলি ব্যবহার করে প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার, তাতে এই প্রাক্‌মানবদের মূর্তিটি আরও স্পষ্ট হবে।

প্রজাতি		উচ্চতা (মিটার)	ওজন (কেজি)
অ. আফ্রিকানাস	পুং	১·৩৭-১·৫২	৩৬-৪৫
	স্ত্রী	কিছুটা ছোট	কিছুটা লঘু
অ. রোবাসটাস	পুং	১·৫২	৬৮ পর্যন্ত
	স্ত্রী	১·৩৭	প্রায় ৩৬
অ. বোআজ়াই	পুং	১·৬৮	৯১ পর্যন্ত
	স্ত্রী	১৫-২০%কম	প্রায় ৪৫

টাউং আফ্রিকানাসের আনুমানিক ওজন ২৭-৩২ কিলোগ্র্যাম, অবশ্য সে শিশু; ক্রমড্রাইতে প্রাপ্ত ঐ প্রজাতির আর একটি হালকা কৃশকায় গড়নের প্রাণীর একই ওজন, সে স্ত্রী হতে পারে। আফারবাসিনী লুসির উচ্চতা যে এক মিটারের সামান্য মাত্র ঊর্ধ্বে তা বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেছে, মাপটির সাক্ষী কঙ্কালের অনেকগুলি হাড়, সুতরাং তা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। উপরের তালিকা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকানাস আমাদের চেয়ে অনেকটা ছোট খাটো ছিল—এমন কি শিমপানজির থেকেও, যার ওজন প্রায় ৭০ কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত হয় (গরিলার উচ্চতম ভার ২৩০ কিলোগ্র্যাম)। কিন্তু বোআজ়াইর দৈর্ঘ্য ও ভার বর্তমান মানুষের পরিধির মধ্যে পড়ে। রোবাসটাস ও বোআজ়াই স্ত্রীর ওজন যে পুরুষের প্রায় অর্ধেক তাও লক্ষণীয়।

মগজের মাপে তিন দলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। সর্বাধিক নমুনা আছে আফ্রিকানাসের, তার থেকে আয়তন দাঁড়ায় ৪৫০-৫৫০ সিসি (শিমপানজির গড় মাপ ৪০০ সিসি), রোবাসটাস-বোআজ়াইর সর্বোচ্চ মাপ ৬০০ সিসি উল্লিখিত হয়েছে। শুধু খিলুর পরিমাণ থেকে জোর করে বলা যায়

না তাদের বুদ্ধি বেশী ছিল। কিন্তু খুলির অন্যান্য পার্থক্য স্পষ্ট ; আফ্রিকানাসের মাথার আকৃতি মানুষের অনুরূপ এবং খুলি দু ভাগ করে উপরে যে অস্থি-চূড়া নেই তাও মানুষের মত ; পক্ষান্তরে অন্য দুই দলের অস্থি-চূড়া বর্তমান, তা বনমানুষের সঙ্গে মেলে। কারও কারও মতে রোবাসটাসের তুলনায় জোয়ান বোআজ্নাইর চূড়া বেশী উচ্চারিত, খুলির হাড়ও বেশী মোটা।

দৈহিক আয়তনের অনুপাতে আফ্রিকানাসের দাঁত, বিশেষত পেষক, মানুষের দাঁতের চেয়ে কিছুটা বড়, তাই চোয়ালও অপেক্ষাকৃত মোটা, কিন্তু কৃন্তক, ছেদক ও পেষক পরস্পরের সমান লম্বা, তাদের গড়নও মানুষের দাঁতের মত ; এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন আয়তনের চেয়ে আকৃতিগত সাদৃশ্যের তাৎপর্য বেশী। তা ছাড়া দন্তপাটি যে অধিবৃত্তিক এবং তাতে যে কোথাও ফাঁক নেই (যেমন গরিলার আছে) তাও মানবোপম। রোবাসটাস ও বোআজ্নাইর দন্তসজ্জা অনুরূপ, কিন্তু মাড়ির দাঁত আফ্রিকানাসের পেষক ও পুরঃপেষকের তুলনায় বেশ মোটা এবং নিজেদের সম্মুখ-দন্তের চেয়ে অনেক বড়। যাঁরা তিন প্রজাতির পক্ষপাতী তাঁরা বলেন বোআজ্নাইর পেষক রোবাসটাসের চেয়ে অত্যধিক বড়, চোয়ালও বেশী ভারী ; এক পরীক্ষা অনুসারে প্রথমটির মাড়ির দাঁত দ্বিতীয়টির চেয়ে গড়ে ৪০ শতাংশ বড়, তবে পরীক্ষক নিজেই বলেছেন তা ব্যক্তিগত পার্থক্যও হতে পারে।

এই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বৈসাদৃশ্য প্রাণী কুলের শ্রেণী বিভাগে মস্ত বড় সমস্যা। নরবিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতিক্রমে মানেন যে জগৎ জুড়ে বর্তমান মানুষ একই প্রজাতি যার বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েনস, তবু দেশে দেশে তাদের রূপে বর্ণে চুলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কত জাতিগত পার্থক্য। আবার একই গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ বেশী লম্বা, কারও রং কালো, কারও হাড় মোটা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্য। পুরা কালের আলোচনায় যেখানে প্রাণীটিকে চোখে দেখা যাচ্ছে না, শুধু কয়েকটি অসংলগ্ন এবং হয়তো অসম্পূর্ণ অস্থির উপর নির্ভর সেখানে সমস্যাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের সামনে প্রশ্নটা এই যে হাড়ের আকৃতিতে যে প্রভেদ দেখা যাচ্ছে তা প্রজাতি ভেদ এমন কি গণ ভেদের পক্ষে যথেষ্ট কিনা, নাকি শুধু স্থান কাল জলবায়ু ইত্যাদি জনিত প্রকার ভেদ মাত্র। এই প্রশ্নের জবাব নিয়ে যে মত ভেদ দেখা দেবে তা আশ্চর্য নয়।

অসট্রালোপিথেকাসের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিন দলেরই বেশ কিছু জমেছে, তবু শ্রেণী বিভাগে দুটি চরম মত এবং মাঝামাঝি বিশ্বাসও দেখা যায়। চরম ভাগ-দাররা বলেন তিনটি প্রজাতিই মান্য, চরম যোগদারের ধারণা তারা সব এক প্রজাতি। এমন প্রস্তাবও শোনা গিয়েছে যে তথাকথিত আফ্রিকানাস ও রোবাসটাস ফসিল একই প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষের অস্থি, তাই লঘু গুরু ভেদ (এই বিচারে অবশ্য বোআজাই রোবাসটাস-দলীয়); কিন্তু এই মতবাদ প্রায় অচল, কারণ তা হলে ফসিলের প্রাপ্তি স্থান থেকে মানতে হয় যে কোথাও শুধু স্ত্রীরা কোথাও শুধু পুরুষরা মরেছে, যদিও অন্য নজির থেকে মনে হয় স্ত্রী পুরুষ দল বেঁধে বাস করত। ডেভিড পিলবিম ও অন্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এখন এক গণ দুই প্রজাতির পক্ষপাতী, এই মধ্যপন্থীদের দৃষ্টিতে বোআজাই রোবাসটাসেরই চরম মোটাসোটা প্রকারান্তর। দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের অধ্যাপক ফিলিপ টোবায়াসও প্যারানথ্রপাস ও জিনজানথ্রপাস আখ্যা বর্জন করে এক গণের সমর্থক। লুই লীকি শেষ পর্যন্ত ওলডুভাই-দলীয়দের শুধু জিনজানথ্রপাস নামে অভিহিত করে গিয়েছেন, প্রজাতির নাম বাদ দিয়ে। ক্লার্ক হাওএল এবং আরও কয়েক জন মনে করেন রোবাসটাস ও বোআজাই অভিন্ন, কিন্তু অসট্রালো-পিথেকাসের বদলে প্যারানথ্রপাস গণ পছন্দ করেন। সুতরাং সব নিয়ে এখনও তিন গণীয় তিন প্রজাতীয় নাম ব্যবহার হচ্ছে, যদিও সমার্থক নামগুলি বাদ দিলে দাঁড়ায় এক গণ অসট্রালোপিথেকাস এবং অধিকাংশ মতানুসারে দুই প্রজাতি আফ্রিকানাস ও রোবাসটাস (বোআজাই, ওরফে জিন্‌জ, শুধু এক প্রকার ষণ্ডা রোবাসটাস)।

সে যাই হক, এই প্রাক্‌মানবদের সম্বন্ধে যা বেশী জানতে ইচ্ছা করে তা হল এদের চেহারা, এদের জীবনযাত্রা, এরা কি খেত, কেমন করে তা সংগ্রহ করত, শেষ পর্যন্ত এদের কি হল ইত্যাদি। ফসিলের মাপ ও পরীক্ষা থেকে যা প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান (দেহের দৈর্ঘ্য, ওজন বা মেধার পরিমাণ), তার তুলনায় এই সব বিষয়ে নিশ্চয়তা আরও কম, জল্পনা কল্পনার স্থান বেশী। কিন্তু পরোক্ষ হলেও যুক্তিসংগত অনুমান থেকে যা জানা গিয়েছে তাতে এই মানবোপম প্রাণীদের আমরা প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাই।

আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে পিগ্‌মি জাতির বেঁটে খাটো মানুষ এবং শিমপানজি, দুইয়েরই সঙ্গে অসট্রালোপিথেকাসের মিল ছিল, বিশেষ করে আফ্রিকানাসের—তেমনি হালকা পাতলা প্রাণী সে। তার রোমশ দেহ ও মুখশ্রী শিমপানজিদের চেনা চেনা মনে হতে পারে, যদিও সে যে মাটিতে হাত না ঠেকিয়ে সর্বদা সোজা হয়ে দু পায়ে চলে তা দেখে সন্দেহ জাগবে। মুখাবয়ব অনেকটা বনমানুষের ছাঁচে তৈরি ; চিবুক প্রায় নেই বললেই চলে, দন্তপাটি সমেত মুখাগ্র অগ্রসর, চ্যাপটা চওড়া নাক, চোখের উপরে ভ্রূ-অস্থি সামনে অনেকটা এগিয়ে এসে চক্ষু কোটরগত, তার পর মানুষের তুলনায় মাথা এতটা ঢালু হয়ে উঠেছে যে কপাল প্রায় অনুপস্থিত, মাথার তালু ও পশ্চাদংশ বেশ ছোট। খুলির পার্থক্য থেকে অনুমান করা হয় যে রোবাসটাসের মুখখানা ছিল আফ্রিকানাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত চওড়া ও চ্যাপটা, উপর নিচে বেশী বড় ও ভারী এবং কপাল ও মাথার তালু আরও নিচু।

বনমানুষরা চলতে ফিরতে হাত পা দুইই ব্যবহার করে, যদিও অল্প সময় শুধু দু পায়ে হাঁটতে পারে, কিন্তু হাঁটু পুরো সোজা হয় না এবং পায়ের পাতার ধারে ভর করে কুঁজো হয়ে চলে। অসট্রালোপিথেকাস সর্বদা দু পায়ে চলত বটে, কিন্তু তার চলন এখনকার মানুষের মত লম্বা পা ফেলে অনায়াস গমন ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জানা যায় পায়ের হাড় থেকে, তা অবশ্য বেশী পাওয়া যায় নি, কিন্তু শ্রোণীচক্র, খুলি ইত্যাদিও কিছু কিছু নির্দেশ দেয়, যথা খুলিতে দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মাংসপেশীর জন্য কতটা জায়গা আছে অথবা খুলির কোথায় সুষুম্নাকাণ্ডের যোগছিদ্রটি অবস্থিত। লুই লীকি লিখেছেন অসট্রালোপিথেকাসের হাড় আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েনসের তুল্য এবং শ্রোণী-অস্থির স্পষ্ট ইঙ্গিত সে আমাদেরই মতন হাঁটত। স্টার্কফনটাইন গুহার অন্যতম আবিষ্কার একটি আফ্রিকানাসের প্রায় সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড, শ্রোণীচক্রের অধিকাংশ এবং ঊরু-অস্থির উপর ভাগ ; শ্রোণীচক্র খাঁটি মানুষের মত দৈর্ঘ্যে ছোট ও প্রস্থে বড়, ঊরুর হাড়েও দেহভার বজায় রেখে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলার সংগতি দেখা যায়। কিন্তু অনেকের বিচারে তার গতি অত সহজ সাবলীল ছিল না, এক মত অনুসারে সে ছোট ছোট পদক্ষেপে পা টেনে টেনে হাঁটত, আর দৌড়াত দু পাশে দুলে দুলে। তার গতি

যদি হোমো সেপিয়েনসের তুলনায় কিছুটা আড়ষ্ট হয় তবে সেটা স্বাভাবিক, কারণ মানব শিশুর হাঁটি হাঁটি পা পা-র মত এও প্রাণীর ইতিহাসে প্রথম দু পায়ে চলার চেষ্টা। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলেন এ বিষয়ে রোবাসটাস আফ্রিকানাসের চেয়ে আরও অপটু ছিল এবং কতটা সোজা হয়ে দাঁড়াত তা বলা যায় না ; জন নেপিয়ারের মতে দুই প্রজাতির চলনে অনেকটা পার্থক্য ছিল, কিন্তু অনেকেই তা মানেন না।

বনমানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মত এদেরও বিচরণের যে প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ তা অনুমান করা যায়। কিন্তু যেমন রামাপিথেকাস সম্বন্ধে ধারণা তেমনি এরাও বনমানুষের ক্ষেত্র জঙ্গল ত্যাগ করেছে, সাধারণত চলা ফেরা করে বনের প্রান্তে তৃণপ্রান্তরে, তার মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা, নদী কিংবা হ্রদ অথবা অন্য কোনও জলাশয়ের খুব দূরে যায় না। বাসা বলে অবশ্য কিছু নেই, তবে সুবিধা মত গুহা গহবর পেলে তাতে আশ্রয় নেয়। ছোট ছোট দল চলেছে পেট ভরাবার তাগিতে—গাছ থেকে ফল বাদাম বীজ, মাটি খুঁড়ে রসালো শিকড়, ইঁদুর, কচ্ছপ বা অন্য কোনও ছোট সরীসৃপ, খরগোশ, পাখির ডিম ও বাচ্চা, কোনও কোনও জাতের পোকা ইত্যাদি, হয়তো জলের মাছও। পূর্ব আফ্রিকায় তখন নানা বড় জানোয়ারের বাস ছিল—লুপ্ত হাতি ডাইনোথেরিয়াম, গণ্ডার, বুনো মোষ, সিংহ, চিতা, হায়না, খড়্গদন্ত বাঘ—তাদের সম্ভবত অসট্রালোপিথেকাস দল এড়িয়ে চলত, তবে রুগ্ন পঙ্গু বৃদ্ধ বা সদ্যোজাতদের প্রতি নজর ছিল হয়তো। মাংস অবশ্য কাঁচা খাওয়া হয়েছে।

অ. আফ্রিকানাস যখন দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে তখন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গে সে যে মাংসও যোগ করেছে তার সমর্থনে হাওএল লিখেছেন গুহায় তার নিজের দেহাস্থির কাছাকাছি কৃষ্ণসার হরিণ, ঘোড়া, জলহস্তীর মত বড় জন্তুর অস্থিও পাওয়া গিয়েছে ; কোথাও বা সেগুলি ভাঙা বা ফাটানো, যেন হাড় ভেঙে মজ্জা, খুলি ফাটিয়ে ঘিলু খেয়েছে সে। অবশ্য সে সব কোনও মাংসাশী পশুর ভুক্তাবশেষ হতে পারে, কিন্তু বাঘ সিংহ জাতীয় জন্তু সাধারণত নিজেদের ডেরায় হাড় নিয়ে যায় না, নরম মাংস খেয়ে বাকিটা ফেলে রেখে যায়। ভুক্ত পশুর খুলি ও পায়ের লম্বা হাড়ই বেশী দেখা যায়, যেন তাদের মুন্ডু ও ঠ্যাং উদ্ধার করে শিকারীরা আপন আড্ডায়

নিয়ে গিয়েছে, হয়তো বা হায়না বা শেয়ালের মুখের গ্রাস কেড়ে। স্টার্কফনটাইন গুহায় অ. আফ্রিকানাসের ভুক্তাবশিষ্টের নজির লক্ষ্য করে পিলবিম বলেন বেবুনের মত বড় জাতের হিংস্র বানর খেয়েছে সে, সুতরাং সাহসী সংঘবদ্ধ শিকারী বলে অনুমান করা যায় তাকে।

খাদ্য নিয়েও দুই প্রজাতির মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়েছে। দাঁতের চেহারা ও আয়তন থেকে নিশ্চয় করে বলা না গেলেও কল্পনা করা যায় আহার্য কি ছিল। আফ্রিকানাসের দাঁত মানুষের অনুরূপ বলে মনে হয় তার আমিষ নিরামিষ দুইই চলত, কিন্তু রোবাসটাসের ভারী চোয়ালে প্রকাণ্ড পেষক দাঁত, সেই চোয়াল চালাবার মোটা মাংসপেশী এবং তার খুঁটি খুলির অস্থি-চূড়া দেখে অনেকের ধারণা সে সম্পূর্ণ উদ্ভিদভুক্ ছিল, ফল বাদাম ডাঁটা ইত্যাদি খেয়েই পেট ভরাত (বনমানুষদের এখনও তাই প্রধান খাদ্য), শিমপানজি ক্বচিৎ ছোট জন্তুও ধরে খায়, রোবাসটাসও বড়জোর তা করে থাকতে পারে। কিন্তু পিলবিম তাকে সাত্ত্বিক আহারী বানাতে রাজী নন, তাঁর মতে আফ্রিকানাসের তুলনায় তার পেষক সামান্য মাত্র বড় এবং সেটুকু হতে পারে দেহ বড় বলে। আবার রিচার্ড লীকি তুর্কানা হ্রদে অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন যে সব ফসিল পেয়েছেন তাতে চরম মোটা চোয়াল ও পেষক দেখা যায়, তার থেকে অনুমান করা হয়েছে যে জিন্‌জ বা বড় জাতের রোবাসটাস শেষের দিকে খুব রুক্ষ উদ্ভিদজাত খাদ্য চর্বণের দিকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তাঁর লিখিত এক বই অনুসারে আফ্রিকানাস ও জিন্‌জ দুইই নিরামিষাশী ছিল।

যারা খাদ্য সংগ্রহ করতে মাটি খুঁড়ে শিকড় বার করেছে, জন্তু শিকার করেছে, তারা কি সে সব কাজ শুধু হাতে করেছে? বরং মনে হয় গাছের ডাল, ভুক্ত পশুর হাড় ও শিং এবং পাথর দিয়ে তারা অনেক কাজ সাধন করেছে—সব রকম অস্ত্র যন্ত্রকে এক কথায় বলা চলে সাধনী। প্রকৃতির প্রভাবে কাঠ দ্রুত পচে ক্ষয়ে গিয়েছে, এক লক্ষ বছরে হাড়েরও ভেঙে চুরে পরিবর্তন হয়েছে, পাথর অবশ্য অনেক বেশী অক্ষয়। স্বাভাবিক অনুমান অনুসারে তিন বস্তুই প্রথমে কাজে লাগানো হয়েছে; শিমপানজিরা সরু ডাল সুবিধা মত বদলে নিয়ে উই পোকা ধরে, এবং আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি লুই লীকি ফোর্ট টের্নানে ফাটা হাড় ও পাথর থেকে দাবি করেন কিনিয়াপিথেকাস (ওরফে

রামাপিথেকাস) পাথর খন্ড করে তা দিয়ে হাড় ফাটিয়েছে, কিন্তু সেই দাবি বিশেষ আমল পায় নি। অসট্রালোপিথেকাসও কাজ সাধন করতে নিজের সুবিধা মত পাথর ভেঙে সাধনী বানিয়েছে কিনা তা এখনও বিতর্কের বিষয়। আমরা এও দেখেছি ওলডুভাইতে প্রচুর তৈরী হাতিয়ার উদ্ধারের বেশ পরে সেখানে জিন্‌জ আবিষ্কার হয়, তখন রটে গেল সে-ই যন্ত্রের স্রষ্টা (লুই পরে বলেছেন তিনি কখনও ঐ দাবি করেন নি)। কিন্তু অবিলম্বে লীকি পরিবারেরই আবিষ্কৃত আর এক ব্যক্তি তার গৌরবটা কেড়ে নিল।

লীকিরা তার নাম দিয়েছেন হোমো হাবিলিস, তাঁদের মতে সে আদিতম মানুষ। কিন্তু এখনও অনেকে বলেন সে হোমো নামের অযোগ্য, অ. আফ্রিকানাসের উন্নত সংস্করণ মাত্র, যেমন পিলবিম ও হাওএল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হাবিলিসের সঙ্গে বিশদ পরিচয় করব, তখন এই বিতর্ক ও মানুষের অভিব্যক্তিতে তার স্থান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আপাতত লক্ষণীয় যে হাবিলিস ও অ. আফ্রিকানাস যদি অভিন্ন হয় তবে আফ্রিকানাস নিঃসন্দেহে পাথরের যন্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করেছে। আর তারা ভিন্ন হলে অসট্রালোপিথেকাস পাথুরে হাতিয়ার বানাত কিনা সেই প্রশ্নের চরম নিষ্পত্তি এখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষ্য। পরোক্ষ সাক্ষ্য ও স্বাভাবিক অনুমান থেকে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা আফ্রিকানাস এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল, রোবাসটাস সম্ভবত করে নি ; রিচার্ড লীকি তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে বলছেন শুধু আফ্রিকানাস হাতিয়ারদক্ষ ছিল. কিন্তু পিলবিমের মতে এই পার্থক্য ভিত্তিহীন। আপাতত আমরা ধরে নিতে পারি অসট্রালোপিথেকাস ডাল, হাড় এবং সম্ভবত পাথর থেকে স্থূল সাধনী বানাতে জানত, তা দিয়ে সে ছোট জন্তু মেরেছে, হাড় ভেঙে মজ্জা বার করে খেয়েছে, আত্মরক্ষা ও অন্য কাজও করেছে।

প্রত্নবিজ্ঞানীদের এই সব বিবিধ আবিষ্কার থেকে অসট্রালোপিথেকাসের চিন্তা, রীতি নীতি, সমাজ ইত্যাদির যুক্তিসংগত অনুমান অনেকটা সম্ভব এবং তা মানুষের প্রাথমিক অভিব্যক্তির আভাস দেয়। বর্তমান বনমানুষ এবং পশু সমাজের সমীক্ষা থেকেও এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাদের স্বভাবেও 'মানবিক' গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বিকাশ দেখে অবাক হই আমরা। খাদ্য সংগ্রহে শিমপানজিদের ডাল বা কাঠি দিয়ে সাধনী তৈরি

ও তার ব্যবহার ছাড়াও আফ্রিকার বনে জেন গুডলের গবেষণা তাদের সমাজ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছে ('মানুষের আগে', পৃ ৭২-৭৯)। আগে ধারণা ছিল তারা শুধু ফল পাতা ইত্যাদি খায়, পোকার বেশী আমিষ খাদ্য তাদের রোচে না, তিনি দেখলেন ছোট জন্তু, ছোট বানর এবং বিশেষ করে বেবুন ছানার মাংসে তাদের তৃপ্তি কম না। শিমপান্‌জি যখন শিকার দেখতে পায় দলের অন্যরা তার হাবভাব দেখে তা বুঝতে পারে এবং কখনও কখনও শিকারের পথ আটকাবার ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষণ ধরে রসিয়ে মাংস চিবায় তারা, প্রায়ই তার সঙ্গে পাতা মিশিয়ে নেয়। অন্য কেউ হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইলে তাকেও নিজের গ্রাস থেকে দেয়, অনেক সময়ে শিকারী মরা জন্তুটির টুকরো ছিঁড়ে একে তাকে দান করে। সুতরাং মানুষ যে আমিষ নিরামিষ দুইই খায় এটা আকস্মিক বা আশ্চর্য বৈচিত্র্য নয়। রামাপিথেকাসের খাদ্য রুচিও যে অনুরূপ ছিল তার দাঁতের পরীক্ষার থেকে সাইমনসের এই অভিমত আমরা আগে লক্ষ্য করেছি।

মানব সমাজে খাদ্য যেই সংগ্রহ করুক, অন্যরা তার ভাগ পায়, দেখা গেল শিমপান্‌জিও মাংস নিয়ে তাই করে (যদিও ফল নিয়ে মাঝে মাঝে কাড়াকাড়ি হয়)। কিন্তু খাদ্য বন্টনের ঐতিহ্য পশু সমাজে আরও প্রাচীন। চিতাবাঘ ও চিতা ছাড়া আফ্রিকার বৃহত্তম মাংসাশী পশুরা দল বেঁধে শিকার করে এবং পরে ভাগ করে খায়। সিংহদের মধ্যে এ নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া লাগে, কিন্তু জংলী কুকুরদের ব্যবহার আদর্শ ; শিকারীরা কয়েক গ্রাস খেয়ে সরে দাঁড়ায় বাচ্চাদের জন্য, তাদের হয়ে গেলে নিজেরা পেট ভরে খায়, কিছু অবশিষ্ট না থাকলে খিদে মেটাতে আবার শিকারে যায়। শিকার যদি ছোট হয়, অনেক সময়ে তা টেনে নিয়ে আসে কোলের শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য। বড়দের সঙ্গে শিকারে যাওয়ার বয়স যাদের হয় নি, তারা যদি গৃহাগত শিকারীদের মুখে মুখ ঠেকিয়ে খোঁটে, তখন শিকারী উদগার করে খাদ্য বার করে দেয়। দেখা গিয়েছে এক বয়স্ক খোঁড়া কুকুর যখন ভিক্ষার এই কৌশলটি শিখে নিল তখন দলের যৌথ দাক্ষিণ্য তাকেও বাঁচিয়ে রাখল।

পক্ষান্তরে বেবুন সমাজে রুগ্ন ও আহত সঙ্গীরা অনাদৃত। এই বানররা খুঁজে খুঁজে প্রধানত বীজ, ঘাস ও ফল মূল খায়, অক্ষমরা দলের সঙ্গে

চলতে পারে না, তাদের জন্য কেউ খাবার এনে দেয় না। তার কারণ নিরামিষাশীদের এত বেশী খেতে হয় যে নিজেদের পেট ভরাতেই দিন চলে যায়। তা হলে এর মধ্যে কি এই ইঙ্গিত আছে যে মাংসাহার প্রাণীর ক্রমবিকাশের পথে সাহায্য করে, মানুষকেও করেছে?

ইতরতর প্রাণী কীট মাছ সরীসৃপ ইত্যাদির মধ্যে সন্তান প্রীতি দেখা যায় না, কিন্তু আমিষাশী বা নিরামিষাশী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই প্রত্যক্ষ সন্তান বাৎসল্যের আড়ালে প্রকৃতির এক বৃহত্তর পরোক্ষ অভিসন্ধি আছে—পাখি যখন বাচ্চাদের জন্য পোকা ধরে আনে, বুনো কুকুর খোঁড়া সঙ্গীকে খাবারের ভাগ দেয়, শিমপানজি যখন ভিক্ষাপ্রার্থীকে নিজের গ্রাসটা দিয়ে দেয় তখন তারা সেই উদ্দেশ্যের খোঁজ রাখে না। একমাত্র মানুষের আশ্চর্য মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক ধারণা খেলে ও তার অনুশীলন চলে, সুতরাং ধরা পড়ে যে প্রকৃতির এই গূঢ় উদ্দেশ্য প্রজাতির সংরক্ষণ অর্থাৎ বংশরক্ষা। এই নখদন্তবিক্ষত নির্দয় জগতে যারা সেটা ভাল পারে, অভিব্যক্তির পথে চলবার যোগ্যতা তাদের বেশী। ইতর প্রাণীরা এত বেশী সন্তান সৃষ্টি করে যে অধিকাংশ ধ্বংস হয়েও প্রজাতি টিকে থাকে। উন্নত পশুদের বংশধর কম, সংরক্ষণের প্রয়োজন তাদের বেশী। এদের মধ্যে যারা দল বেঁধে শিকার করে না, খাবার ভাগ করে খায় না (যেমন চিতাবাঘ) বলা যায় তাদের সামাজিক অভিব্যক্তি অসম্পূর্ণ, তারা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য। বুনো কুকুর বা শিমপানজি প্রদর্শিত সহযোগিতা ও মাংসাহারের রীতি অনুসরণ করে মানুষ উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়েছে।

দু পায়ে খাড়া প্রাক্‌মানব দেখা দিল পর মানুষ-অভিমুখী অভিব্যক্তি অবাধগতি হল, বস্তুত তা এত দ্রুত এগিয়েছে যে দেহ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারে নি, এবং তার কিছু কিছু কুফল আমরা এখনও ভোগ করছি। বেশী ক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যে কষ্টকর তা কে না টের পেয়েছে, সেই কষ্ট কাটাতে মাঝে মাঝে দেহের অধিকাংশ ভার এক পা থেকে আর এক পায়ে চালান করি (কথায় বলে "এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি"), নড়ে চড়ে দাঁড়াই। কোমর বা পিঠের ব্যথা এবং কটিবাত রোগে মানুষ প্রায়ই ভুগে থাকে, তার মূলে আছে মেরুদন্ডের চাকতিগুলির ও অন্তর্নিহিত

নার্ভের উপর চাপ। বহু কোটি বছরের নিয়ম ভেঙে খাড়া দেহে ভিতরের অঙ্গগুলির স্থান বদল হল, যেমন পাকস্থলী নিচে নামল, হৃদ্‌যন্ত্র উপরে উঠল। এই সব কারণে হজমের বিকার, হার্নিয়া ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তা ছাড়া বনমানুষের তুলনায় পা বেশী লম্বা হওয়াতে সেখানে রক্তের চাপ বেশী, তার থেকে স্ফীতশিরা রোগ; বৃহত্তর মগজকে জায়গা দিতে মাথা বড় হল, কিন্তু নারী দেহে জন্মনালি সংকীর্ণ থাকল বলে শিশুর প্রসব হল কঠিনতর, অতএব প্রয়োজন সভ্য মানুষের আবিষ্কার সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার।

দ্বিপদ প্রাক্‌মানবরাও সম্ভবত এই ধরনের নিগ্রহ ভোগ করেছে, অভিব্যক্তি আরও ধীরে অগ্রসর হলে হয়তো তাদের (এবং মানুষের) তা সইতে হত না, কিন্তু মানতেই হবে যে তার তুলনায় লাভ হয়েছে অনেক বেশী। দু পায়ে দাঁড়াতে এবং চলতে পারার নানা সুবিধা, যথা দূর পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে শিকার বা শত্রুর সন্ধান করা চলে, পিলবিম বলেছেন খাড়া মূর্তি শত্রুর চোখে বেশী ভয়ংকর। জোহানসনের জল্পনা স্ত্রীরা শিশুদের কোলে করে, পুরুষরা খাদ্য হাতে নিয়ে চলতে পেরেছে, ফলে পারিবারিক সংহতি বেড়েছে। মুক্ত হাত দুটি দিয়ে শিকার ধরা অথবা অস্ত্র তৈরি করা, তা বয়ে বেড়ানো এবং ব্যবহার করাও সহজ।

হাতিয়ার ব্যবহার ও সৃষ্টি থেকে মেধা বৃদ্ধি, মাংসাহার, গোষ্ঠী জীবন ও সামাজিক অগ্রগতি পরীক্ষা করবার আগে এখানে একটি আগ্রহজনক বিতর্কের উল্লেখ দরকার। আগে দ্বিপদত্ব পরে সাধনী সৃষ্টি ও ব্যবহার উপরোক্ত এই প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথা বলে বিশেষজ্ঞদের চমকে দিলেন ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরউড ওআশ্‌বার্ন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিণাম প্রথমটি, হাতিয়ার ব্যবহারের ফলেই দু পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে এই মতের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি। প্রধানত শ্রীমতী গুডলের কাজ থেকে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে দ্বিপদ না হয়েও শিমপানজি হাতিয়ার ব্যবহারে আনাড়ী নয়, তার চেয়েও উন্নত আমাদের কোনও চতুষ্পদ পূর্বপুরুষ বুঝল যে পাথর বা লাঠি অস্ত্র হিসাবে বেশ কাজের জিনিস, ছোট খাটো জন্তু মারা চলে তা দিয়ে। কালে কালে এ দিকে হাত পাকিয়ে গেছো জীবন

ত্যাগ করে দূরে দূরে চরে বেড়াতে সাহস পেল সে। মুক্ত হাতে হাতিয়ার নিয়ে তখন প্রাকৃতিক নির্বাচনে বাছাই হল অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হল তারা যারা অপেক্ষাকৃত ভাল ছুটতে পারে, সুতরাং এই পথে ক্রমে চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদের উদ্ভব। ওআশবার্নের মতবাদ যদি সত্য হয় তবে অসট্রালোপিথেকাস হাতিয়ার ব্যবহার—সম্ভবত তৈরিও—জানত, কারণ সে নিঃসন্দেহে দ্বিপদ। কিন্তু অন্যান্য নজির থেকে জন রবিনসন ও আরও অনেকে মনে করেন যে দ্বিপদ গতির পরিণাম হাতিয়ার।

তেমনি মস্তিষ্ক বৃদ্ধি দ্বিপদত্বের আগে না পরে তা নিয়েও দুই মত, তবে সাম্প্রতিক ফসিলের নজির থেকে মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষরা আগে সোজা হয়েছে, বুদ্ধি পরে বেড়েছে, তার সাক্ষ্য আমরা দেখব পরবর্তী অধ্যায়ে। যাই হক, এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই যে এক দিকে যেমন মেধা বাড়তে থাকল, অন্য দিকে নানা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হল। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে শিকার ও মাংসাহার আয়ত্ত না হলে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠত না। অস্ত্র দিয়ে শিকার করা এবং সেই মাংস কাটা সহজ, সুতরাং আদি শিকারী সমাজে খাদ্য বস্তুর বৈচিত্র্য বেড়েছে, যা নিশ্চয় প্রজাতি সংরক্ষণের সহায়ক। উদ্ভিজ্জ থেকে যথেষ্ট পুষ্টি সংগ্রহ করতে প্রায় সারা দিন ধরে খেতে হয়, মাংসে শক্তিমাত্রা (ক্যালরি বা এনার্জি) বেশী, সুতরাং আমিষাশীরা অন্য কাজের এবং বিশ্রামের অবসর পেয়েছে। দল বেঁধে শিকারে লাভ বেশী বিপদ কম, তাই গোষ্ঠী ও সহযোগিতা সংহত হয়েছে, ফলে ভাগাভাগি করে খাওয়ার রীতিও সহজ স্বাভাবিক হয়েছে। পুরামানবদের প্রধান আহার্য মাংস পুরুষ সংগ্রহ করে আনে বলে তাদের উপর স্ত্রীদের নির্ভরতা বেড়েছে, তার প্রভাব কাজ করল দৃঢ়তর যুগ্ম সম্পর্ক, সন্তানের যত্ন এবং সাংবৎসরিক যৌন মিলনের দিকে—এর সূচনা অসট্রালোপিথেকাসদের মধ্যেই হয়ে থাকতে পারে। হীনতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রতি বার বিভিন্ন সঙ্গী সঙ্গিনীর যৌন মিলন ও প্রজনন হয় এবং তা ঘটে বছরের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট সময়ে। বনমানুষ প্রমুখ অনেক প্রাইমেটের মাসিক ঋতুচক্র আছে, কিন্তু শুধু চক্রের চরমে তারা সংগমে প্রস্তুত হয়। মানুষের মত অসট্রালোপিথেকাস স্ত্রীও হয়তো সারা মাস সারা বছর গ্রাহিকা থাকত,

যদিও তারা জোড়ায় জোড়ায় স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক পাতাত কিনা তা বলা যায় না। যৌন আচরণের এই রকম দৈহিক অভিব্যক্তি থেকে ক্রমে অনুরাগ বন্ধনও ঘন হয়েছে, একগামিতার (monogamy) পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে। এই পথে অসট্রালোপিথেকাস যেটুকু এগিয়েছে তার থেকে গোষ্ঠী জীবন ও সামাজিক বন্ধনের প্রেরণাও বাড়ল। রিচার্ড লীকির বিশ্বাস তার দুই প্রজাতিই সমাজবদ্ধ জীব ছিল।

আমরা কল্পনা করতে পারি ছোট ছোট যাযাবর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে আফ্রিকার মাঠে ঘাটে, পুরুষদের হাতে পাথর, লাঠি বা লম্বা হাড়, শিশুরা মায়ের কোলে। বনমানুষ পূর্বপুরুষদের গভীর জঙ্গল ত্যাগ করে তার প্রান্তে খোলা তৃণপ্রান্তরে কিংবা ফাঁকা বনভূমিতে খাবার খুঁজছে তারা। হয়তো কোনও এক জায়গায় কাটাচ্ছে দিন কয়েক—গুহার মুখে বা ভিতরে, অথবা খোলা মাঠে—তার পর আবার চলা। পথে কোনও পাথরের আকার আকৃতি দেখে কারও পছন্দ হল, তুলে নিল হাতে। দূর দূরান্তে বিচরণ করলেও সর্বদা চেষ্টা জলের কাছাকাছি থাকার, বড় জোর এক দিনের পথের মধ্যে। পরে মানব সমাজে স্ত্রী পুরুষের যে কাজ ভাগাভাগি দেখি তার সূচনা হয়েছে—শিকার ও আত্মরক্ষা পুরুষের কাজ, ফল মূল সংগ্রহ ও শিশুর যত্ন স্ত্রীদের। অল্পবয়স্করা খাদ্যের খোঁজে সাহায্য করছে, কেউ খপ করে ধরে ফেলল এক গিরগিটি, অন্যরা দেখল কোথাও লম্বা ঘাসে লুকিয়ে আছে খরগোশ, গাছের নিচে ঘুমন্ত হরিণ শিশু, অথবা গর্ত থেকে উঁকি দিল এক ছুঁচো, দৌড়ে গিয়ে ইশারায় খবর দিল বড়দের, তাদের এক জন পা টিপে টিপে এগিয়ে হাতের লম্বা ডালটির চোখা মুখ বিঁধিয়ে মারল খরগোশ, পলাতক হরিণ পড়ে গেল পাথরের ঘা খেয়ে। যথেষ্ট খাবার জুটিয়ে গাছের নিচে বা গুহার মুখে বসে ভাগ করে ভোজন—ব্যাং, ইঁদুর গিরগিটি আস্ত ঢুকল মুখে, বড় জন্তুকে ভাঙা হাড় বা পাথর খণ্ড কিংবা দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে তার সঙ্গে উদ্ভিজ্জ ভক্ষ্য মিশিয়ে চর্বণ। মাঝে মাঝে মুখ আওয়াজ করছে নানা রকম, তা ঠিক ভাষা বা বাক্য নয়, মগজের ক্ষুদ্রতা ও গঠন থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান তা সম্ভব ছিল না। তবে ঐ ধ্বনিগুলির অর্থ তারা নিজেরা বুঝত, তা ছাড়া নিঃসন্দেহে অঙ্গ সঞ্চালন

ও মুখভঙ্গি দিয়েও মনের ভাব প্রকাশ করত (শিমপানজির মুখেও নানা ভাব ফুটে ওঠে)। শিকারে সহযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় মৌখিক ধ্বনি এবং অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, এবং সেই বিনিময়ে শিকারী যত দক্ষ হয়েছে তত তার শিকার ও সহযোগিতা মার্জিত হয়েছে।

খাওয়া সেরে কাছেই হ্রদের ধারে নিচু হয়ে জল খেয়ে এল কেউ কেউ, তার পর হয়তো দু দণ্ড বিশ্রাম; কেউ শুয়ে পড়ল, বাচ্চারা ঘুমাল, সদ্যভুক্ত হরিণের উরুর হাড় ঘষে মেজে নিল এক জন, যে পাথর কুড়িয়ে এনেছিল সে তা ঠুকে ঠুকে একটা দিক ভাঙতে চেষ্টা করল, যাতে একটু ধার আসে। পছন্দ মতো কাজটি সেরে সে তার পুরনো ভোঁতা হাতিয়ারটি ছুঁড়ে ফেলে দিল—১৫-২০ লাখ বছর পরে এই অক্ষয় উপল খণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে সভ্য মানুষ কল্পনা করবে এই দিনটি। জায়গাটা ভাল লাগল, হ্রদের ধারে ঘন গাছপালা, সেখানে ছোট খাটো জন্তু সহজেই মেলে, সুতরাং পরেও কয়েক বার তারা ঘুরে ঘুরে এসেছে। অদূরে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় মস্ত এক পাথর লম্বা হয়ে এগিয়ে আছে, তার নিচে অথবা গাছে চড়ে রাত কাটিয়েছে হিংস্র জন্তু এড়াতে।

যে সব অঞ্চলে আফ্রিকানাস ও রোবাসটাস দুইই বাস করত, সেখানে তাদের সম্পর্ক কি ছিল তা নিয়ে জল্পনা হয়েছে। যদি রোবাসটাস হাতিয়ার-অপটু নিরামিষাশী হয়ে থাকে তা হলে খাদ্যের খোঁজে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রও হয়তো ছিল কিছুটা পৃথক, তবে দুই প্রজাতির দুটি দলের হঠাৎ মুখোমুখি এসে পড়াও অসম্ভব নয়। তখন আফ্রিকানাসের হাতে প্রখর অস্ত্র দেখে অন্য দল হয়তো আস্ত পাথর তুলে নিয়েছে, দুই গোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে চলেছে প্রধানত বাক্‌যুদ্ধ, অর্থাৎ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হুমকি হুংকার অঙ্গভঙ্গি, স্ত্রীরা ও শিশুরা ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকে থেকেছে। সংঘর্ষ যদি এর বেশী গড়িয়ে থাকে তো বেঁটে খাটো আফ্রিকানাস অস্ত্রের জোরে বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছু হটিয়ে থাকতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে এই বর্ণনা অধিকাংশে আনুমানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাক্ষ্য থেকে দৈনন্দিন জীবন ও সমাজের ছবি আঁকবার চেষ্টা। তবে

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অসট্রালোপিথেকাসের ধরন ধারন বনমানুষের মত ছিল না, বরং ছিল মানুষেরই মত। অবশ্য আমাদের তুলনায় তারা বাঁচত অনেক কম, এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে অ্যালান মান্ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত অনেক দাঁত পরীক্ষা করেছেন, নাবালক ও সাবালকের দাঁত যথাক্রমে যে হারে বেড়েছে ও ক্ষয়েছে তার থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত যে আফ্রিকানাস গড়ে মাত্র ২০ বছর বাঁচত, সাতে এক জন ৩০ পর্যন্ত পেঁছাত, কিন্তু ৪০ পার হত না কেউ। এদের পরে মানুষও তার ইতিহাসের অধিকাংশ কাল খুব স্বল্পায়ু ছিল এবং বলতে গেলে তার আয়ু ভাল রকম বেড়েছে সাম্প্রতিক কালে সভ্য হয়ে।

কিন্তু ব্যক্তি স্বল্পজীবী হলেও প্রজাতি তা ছিল না। ওমো ও আফার অঞ্চলে আমরা ৩০ লক্ষ বছর প্রাচীন আফ্রিকানাসের সঙ্গে পরিচয় করেছি, কিন্তু আরও দূর অতীতে তাদের আভাস পাওয়া যায়। ওমো উপত্যকাতেই ক্লার্ক হাওএলের অধীনে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অভিযান আগ্নেয়গৈরিক ভস্ম-নিমগ্ন চল্লিশটি দাঁত ও দুটি চোয়ালের হাড় উদ্ধার করেছে, ভস্মের বয়স সম্ভবত ৪০ লক্ষ বছর, হাওএলের নিশ্চিত বিশ্বাস এগুলি এসেছে অসট্রালোপিথেকাস থেকে, যদিও এই অস্থিগুলির মালিকরা সম্ভবত মাংসাশী ছিল না। উত্তর-পশ্চিম কিনিয়ার কানাপোই এলাকায় বাহুর উর্ধ্বাংশের এক খণ্ড অস্থি উদ্ধার হয়েছে, যা হয়তো ৪০ লাখ বছর পুরনো ; পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় তার গঠন বনমানুষের নিকটতর, হার্ভার্ডের অধ্যাপক ব্রায়ান প্যাটারসন ও হাওএল প্রাণীটিকে রোবাসটাস না বলে আফ্রিকানাস দলীয় বলতে চান। কিনিয়ার লোথাগান নামক স্থানে প্যাটারসন নিম্ন চোয়ালের একটি পেষকযুক্ত খণ্ড পেয়েছেন, তাঁর হিসাবে তা ৫০ লক্ষ বছর প্রাচীন হতে পারে। সবচেয়ে রহস্যময় দক্ষিণ য়োরোপ ও চীনে আবিষ্কৃত ৬০-৮০ লাখ বছর পুরাতন কিছু চোয়াল ও দাঁত। এই সব ফসিল সত্যিই অসট্রালোপিথেকাসের হলে রামাপিথেকাস-পরবর্তী কয়েক বছরের ফাঁকটা ভরে যাচ্ছে, কিন্তু আবিষ্কর্তারা এখনও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তথ্যসম্বলিত নিবন্ধ প্রকাশ করে প্রাচীনত্বের আনুষ্ঠানিক দাবি জানান নি, বোধহয় উপরোক্ত তারিখগুলি মেনে নিলে ক্রমবিকাশের ছকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার হয় বলে।

আবার অপ্রত্যাশিত সাম্প্রতিক ফসিলেরও উল্লেখ আছে। ক্রমড্রাইতে প্রাপ্ত

হালকা আফ্রিকানাসটির বয়সের অনুমান মাত্র সাড়ে সাত লাখ বছর। ওলডুভাইর উত্তরে ও অদূরে নেট্রন হ্রদের পশ্চিম কূলে পেনিন্‌জ নামক স্থানে রিচার্ড লীকির দলের কে. কামোয়া রোবাসটাস-সদৃশ্য এক নিম্ন চোয়াল আবিষ্কার করেন, তার বয়সও সাত লাখের মত।

অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ফসিলগুলি বাদ দিয়ে উচ্চ নিম্ন সীমার কাছাকাছি বয়স ও প্রাপ্তি স্থান আপাতত এই রকম:

		বয়স (লক্ষ বছর)	
	প্রজাতি	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
অ.	আফ্রিকানাস	৩০ (ওমো, আফার)	১০ (ক্রমড্রাই)
অ.	রোবাসটাস (ছোট)	১৫ (সোআর্টক্রানস)	১০ (সোআর্টক্রানস)
অ.	রোবাসটাস (বড় অর্থাৎ বোআজ্রাই জাতীয়)	৩৭ (ওমো)	২০-র অধিক—১০ (তুর্কানা)

অধিকাংশ সাম্প্রতিক ধারণা অনুসারে এই দুই প্রজাতিই পৃথিবীর মঞ্চে দেখা দিয়েছিল আজ থেকে মোটামুটি ৩৫ লাখ বছর আগে এবং পালা শেষ করে বিদায় নিয়েছে ১০-১৫ লাখ বছর আগে, এই দুই সীমার বাইরে যা ফসিল আছে দৃঢ়তর সাক্ষ্যের অভাবে তা আপাতত মুলতুবি থাকছে। তেমনি অসট্রালোপিথেকাস যে য়োরোপ ও এশিয়াতেও ছড়িয়েছিল তারও এক দিন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে বড় জাতের রোবাসটাস ছোট জাতের চেয়ে অনেক প্রাচীন (যদিও ওমোতে প্রাপ্ত চারটি দাঁত বাদ দিলে বয়সের এই পার্থক্যও অনেক কমে যায়), টোবায়াস বলেন প্রথমটি দ্বিতীয়টির পূর্বপুরুষ। তিনি দুই অসট্রালোপিথেকাস প্রজাতির মধ্যে যৌন মিশ্রণ সম্বন্ধেও জল্পনা করেছেন, যথা বড় রোবাসটাস ও আফ্রিকানাসের মধ্যে সংকর সৃষ্টির ফলে ছোট দাঁত ও ছোট মুখের দিকে অভিব্যক্তি, যেমন ছোট জাতের রোবাসটাসে। মাকাপানে ডার্ট-আবিষ্কৃত প্রাক্‌মানবিক ফসিলগুলি রবিনসনের মতে আফ্রিকানাসের, কিন্তু টোবায়াসের বিচারে স্টার্কফনটাইন আফ্রিকানাস ও সোআর্টক্রানস রোবাসটাসের মধ্যবর্তী, অথবা মিশ্রণ বা সংকর।

বহু লক্ষ বছর ধরে রোবাসটাসের বিশেষ কিছু অভিব্যক্তি হয় নি। অনেকের মতে তার কারণ সে মাংস খেতে চেষ্টা করে নি, আর তাই মেধাও বাড়ে নি। রবিনসন বলেন সে সাধনীর সৃষ্টি ও ব্যবহার শিখল না, তাই মস্তিষ্ক প্রেরণা পেল না বিকাশের, ফলে সে অপরিবর্তিত থেকে গেল। এই স্থবিরতা ও ও তার পরিণাম সম্বন্ধে হাওএল বলেছেন আফ্রিকার কংগো দেশে গরিলা কয়েক নিযুত বছর ধরে প্রায় অপরিবর্তিত, কিন্তু একই বনের বাসিন্দা খর্বকায় পিগমি জাতের মানুষ অনেক কিছু গ্রহণ করেছে, শিখেছে। গরিলা পাতা বাকল ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ বস্তু খায়, পিগমিদের ফল মূল ইত্যাদির সঙ্গে সরীসৃপ, বাচ্চা হরিণ ও অন্য ছোট জন্তুতেও রুচি আছে। তারা যন্ত্রদক্ষ, শিকার ধরতে জাল ও অন্য উপকরণ ব্যবহার করে, তাদের আহার্য ও তার সংগ্রহ অনেকটা অ. আফ্রিকানাসের মত। হাওএল বলেন আফ্রিকানাস তাদের মত অভিব্যক্ত হয়েছে আর রোবাসটাস গরিলার মত ক্রমবিকাশের পথে থেমে গিয়েছে। হালকা চটপটে আফ্রিকানাস বন ছেড়ে ক্রমশ প্রান্তরের দিকে এগিয়েছে, যা পেয়েছে তাই চেখে দেখেছে, বর্ষা কালে ফল ফলারি যথেষ্ট পেলেও শুষ্ক ঋতুতে খাদ্যাভাবে পড়ে মাটি খুঁড়ে শিকড় উদ্ধার করতে, ছোট জন্তু ধরতে এবং খোলা জায়গায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাকে হাতিয়ার ব্যবহার ও উদভাবন শিখতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উদ্ভিদজীবী রোবাসটাস সম্ভবত বনের আশ্রয় ছাড়তে পারে নি, অথচ বন বনানী কমে আসছে বলে খাদ্যাভাবে জঠর জ্বালা বাড়ছে, কোথাও বা হয়তো অস্ত্রদক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংঘর্ষে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। জীবন সংগ্রামের এই সব অবিরাম চাপ তাকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ দিকে ক্ষুদ্রকায় আফ্রিকানাস ক্রমে গায়ে পায়ে বুদ্ধিতে মানব অভিমুখে বাড়ল এবং পাঁচ থেকে ১০ লাখ বছরে মানুষ হয়ে গেল—এই প্রথম মানুষের নাম হোমো ইরেকটাস। আফ্রিকানাস আমাদের সাক্ষাৎ ঠাকুরদা আর রোবাসটাস জ্যাঠতুতো বা খুড়তুতো দাদু।

হাওএল-অঙ্কিত এই চিত্রের অর্ধেকটা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের গ্রাহ্য হলেও, বাকিটা অর্থাৎ আফ্রিকানাসের পরিণাম নিয়ে ভিন্ন মতও দেখা দিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে সে আমাদের সাক্ষাৎ পিতামহ নাও হতে পারে। আপাতত হোমো হাবিলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা দরকার।

৪। হয়তো মানুষ

আমরা আগে দেখেছি ওলডুভাইর নানা হাতিয়ার যে জিনজানথ্রপাসের হাতের কাজ এই বিশ্বাস বেশী দিন টেকে নি। সেই যে বহু সন্ধানের পর মেরি লীকি প্রথম জিন্‌জ খুলিটির দেখা পেলেন তার পর ছ মাস যেতে না যেতেই তাঁদের আর এক পুত্র জনাথান এ বার প্রকৃত যন্ত্রশিল্পীকে আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে বাপ মা'র সঙ্গে কাজে গিয়ে ওলডুভাইর নিম্নতম স্তরে ঐ সব হাতিয়ারের কাছেই তিনি পেলেন প্রথমে খড়্গদন্ড বাঘের এক চোয়াল খণ্ড, তার পর ক্রমশ কিছু নররূপী দাঁত, একটি চোয়ালের কিছু অংশ, খুলির কয়েক খণ্ড ও অন্যান্য হাড়। সেগুলি জোড়া দিয়ে মগজের আয়তন বার হল প্রায় ৬৬০ সিসি, যে ক্ষেত্রে জিন্‌জের মাত্র ৫৭০ সিসি। প্রাচীনতা জিন্‌জেরই সমান, ১৭½ লক্ষ বছর। মগজ ছাড়া লীকিদের মনে হল দাঁতও অসট্রালোপিথেকাসের চেয়ে মানবোপম। কিন্তু ইংরেজ প্রত্নবিৎ সার উইলফ্রেড ল গ্রো ক্লার্ক ও প্রাণীবিজ্ঞানী জন রবিনসন ভাবলেন প্রাণীটি জিন্‌জেরই প্রকারভেদ মাত্র। ১৯৬২ সালে লীকিরা এক তরুণবয়স্ক ব্যক্তির খুলি এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালের অংশ পেলেন, সবই প্রথম ফসিলগুলির অনুরূপ। ক্রমে আরও সংগ্রহ হল নাবালক ও সাবালক খুলির খণ্ড, তার মধ্যে এক দ্বাদশী মেয়ের ভাঙা মুণ্ড দেখে লুই সন্দেহ করলেন পৃথিবীর প্রথম খুন। তা ছাড়া মাটির সমাধি থেকে উদ্ধার হল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ এক সাবালকের হাত ও আঙুলের কিছু হাড়। উপরন্তু বাম পদতলের অধিকাংশ (চিত্র ৬)। সব নিয়ে বছর তিনেকের মধ্যে নিম্নতম ও তদুচ্চ স্তরে এই জাতীয় সাত জনের দেহাংশ আবিষ্কৃত হল। আমরা দেখেছি নিম্নতম স্তর দুটি প্রায় ২০ লক্ষ বছর থেকে ১০ লক্ষ বছর প্রাচীন।

ওলডুভাইর চারটি এই দলীয় খুলির মস্তিষ্কের মাপ ৬০০ থেকে ৬৮৪ সিসির মধ্যে, গড়ে ৬৪২ সিসি, যেখানে অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাসের গড় মাপ প্রায় ১০০ সিসি কম। জিন্‌জের চেয়ে এদের দাঁত অনেক ছোট এবং আকৃতিতে প্রায় আধুনিক মানুষের অনুরূপ। স্ত্রী ও পুরুষের ছেদক



চিত্র ৬। ওলডুভাইতে প্রাপ্ত পদতলের অস্থি।

দাঁত সমান। কিন্তু হাত ও পায়ের অস্থির আয়তন থেকে বোঝা গেল এরা পরবর্তী মানুষের চেয়ে অনেক ছোট খাটো ছিল; দৈর্ঘ্যে ১·২২-১·৩৭ মিটার, ওজনে ২৭-৩২ কিলোগ্র্যাম; স্ত্রী পুরুষ প্রায় সমান। পদতলের অস্থি গঠন আরও নির্দেশ দেয় যে প্রাণীটি সোজা হয়ে দাঁড়াত এবং নিয়মিত দু পায়ে হাঁটত, যদিও ইঙ্গিত আছে যে আজকের মত লম্বা পা ফেলে সহজ অনায়াস চলার ক্ষমতায় সে কিছু খাটো ছিল। কিন্তু পিলবিমের মতে দু পায়ে হাঁটা ও ছোটার অভ্যাস এ কালের শিকারীর চেয়ে তার কম ছিল না।

হাতখানিও নরোপম, আঙুলের ডগা মোটা এবং চওড়া, কিছুটা চ্যাপটা নখ, কিন্তু আঙুলের হাড় থেকে বোঝা যায় এই ওলডুভাইয়ারা আমাদের মত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী একত্র করতে পারত না। তবে তখন কলম চালাবার চেয়ে বেশী দরকারী কাজ ছিল হাতিয়ার তৈরি, কাটবার চাঁছবার থেঁতলাবার যে

সব পাথুরে উপকরণ আশেপাশে পাওয়া গিয়েছে আঙুলের গঠন তা বানাবার পক্ষে যথেষ্ট, এ সব দিয়ে পশুর ছাল ছাড়ানো, মাংস বা উদ্ভিজ্জ বস্তু কাটা ইত্যাদি চলত। অসট্রালোপিথেকাস হাতিয়ার তৈরি করেছে কিনা এবং সে ও এই ওলডুভাইবাসীরা অভিন্ন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ঐ ঘাঁটির নানা সাধনী যে এদের কাজ তাতে সন্দেহ থাকল না। এই বিচিত্র সৃষ্টির সঙ্গে আমরা একটু পরেই পরিচয় করব।

আবিষ্কারের পরে নামকরণ। ১৯৬৪ সালে লুই লীকি, ফিলিপ টোবায়াস ও জন নেপিয়ার এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় সব তথ্য প্রকাশ করে তার নাম দিলেন হোমো হাবিলিস অর্থাৎ দক্ষ মানুষ, কারণ পাথর ভেঙে সাধনী সৃষ্টিতে হাতের কাজ তার এক প্রধান বিশেষত্ব। সে হোমো নামের যোগ্য এবং আদিতম মানুষ। এই দাবির সমর্থনে লীকি ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের নিবন্ধে বললেন পরবর্তীদের তুলনায় তার মগজ ছোট হলেও শুধু মগজ দিয়ে মানুষ চেনা যায় না। খুলির মধ্যে মেধার মাপ বাতিল করে তাঁরা জোর দিলেন খুলির পশ্চাৎ ও উপরিভাগের গঠন এবং দাঁতের আকার আকৃতির উপর, হাবিলিস ও বিভিন্ন ধরনের প্রাক্‌মানবের খুলি ও নিম্ন চোয়ালের ছবি পাশাপাশি রেখে স্পষ্ট পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু ডেভিড পিলবিম ও ক্যালিফর্নিয়ার বার্নার্ড কাম্‌পবেল প্রমুখ জন কয়েক বিশেষজ্ঞ হাবিলিসকে মানুষ বলে মানলেন না। তাঁদের মতে সে বড়জোর অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাসের উন্নততর উপপ্রজাতি, কারণ যদিও তার মগজ তুলনায় কিছুটা বড় এবং দাঁতে সামান্য পার্থক্য আছে, নতুন গণ এমন কি প্রজাতি সৃষ্টির পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে প্রাক্‌মানব ও মানবের প্রভেদ কোথায়। মনুষ্য-নির্ণায়ক বলে যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে তার কিছু কিছু প্রাক্‌মানবেও দেখা যায়, যেমন দ্বিপদ গতি, অধিবৃত্তিক দন্তসজ্জা এবং ছোট ছেদক দাঁত। তবে মানুষের দিকে এগিয়ে এগুলি আরও সম্পূর্ণ ও মার্জিত হয়েছে। তা ছাড়া বিশেষ গুণ হল বৃহৎ মস্তিষ্ক, কিন্তু তাও ক্রমশ বেড়েছে, হাবিলিসের পরেও তার দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়। বিলাতের দুই প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ সার আর্থার কীথ ও ল গ্রো ক্লার্ক বেশ কয়েক বছর আগে মানব মেধার নিম্নতম সীমা

স্থির করেন যথাক্রমে ৭৫০ ও ৭০০ সিসি, কিন্তু এর পিছনে বিশেষ কিছু যুক্তি নেই।

অবিসংবাদিত পুরামানব হোমো ইরেকটাসের ফসিলও ওলডুভাইতে পাওয়া গিয়েছে এবং তার সংগে নাকি অন্তিম হাবিলিসের নিকট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে ; এর থেকে মনে হয় কয়েক লক্ষ বছর অভিব্যক্তির ফলে হাবিলিস থেকে ইরেকটাসের উদ্ভব। মানুষের যে নিকটতম সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ তার মনুষ্যত্বের দাবিও জোরালো। ইরেকটাসে মস্তিষ্ক আরও বেড়েছে, কিন্তু মানুষ নির্ণয়ে অনেকে হাতিয়ার সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন—শিমপানজির মত সরু ডাল তৈরি করে নিয়ে পোকা ধরা নয়, কাঁচামাল ভেঙে বদলে সুনির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী উপকরণ গড়ে নেওয়া। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন অ. আফ্রিকানাসেরও সেই ক্ষমতা ছিল তাঁরা বলবেন তা হলে সেও হোমো নাম দাবি করতে পারে। অবশ্য হাবিলিসের কাজ অনেক নিঃসন্দেহ বিচিত্র এবং মার্জিত।

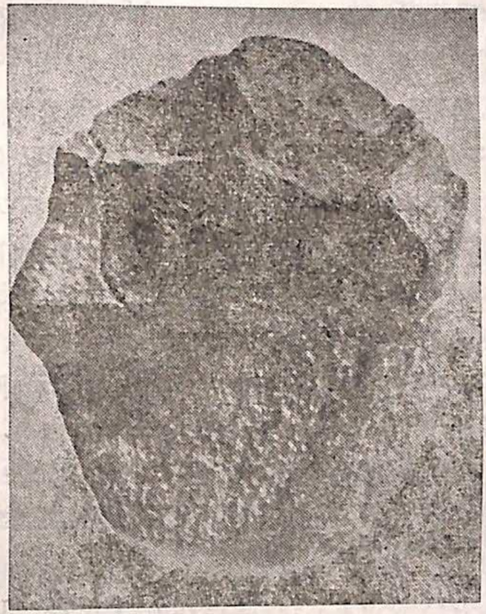
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাক্‌মানব ও মানবের মধ্যে গণ্ডি টেনে দেওয় সহজ নয়, এখানেও সমস্যা এই যে পার্থক্যগুলি আপেক্ষিক। কিন্তু এই ক্রমিক পরিবর্তন স্বাভাবিক, কারণ অভিব্যক্তি এক একটি আকস্মিক লাফ দিয়ে ঘটে নি, (যদিও অবশ্য সম্প্রতি এই ধরনের এক তত্ত্ব মাথা তুলছে)। আমরা একটু পরে দেখব অন্যত্র আবিষ্কৃত আরও কিছু কিছু ফসিল হোমোগণীয় বলে দাবি করা হয়েছে—আপাতত এরা এবং হাবিলিস মানুষ ও অমানুষের মধ্যে এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

মানব বা প্রাক্‌মানব যাই হক, হাবিলিস নিঃসন্দেহে হাতিয়ারস্রষ্টা। এই সৃষ্টি মানব ইতিহাসের এক গুরুতর পদক্ষেপ, প্রথম সুদূরপ্রসারী কীর্তি। মনে রাখতে হবে যে হাতিয়ারের ব্যবহার ও তার সৃজনের মধ্যে বহু কালের ফাঁক। গেছো পূর্বপুরুষদের হাত ডাল ধরতেই সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত ছিল, মাটিতে নেমে অভ্যাস বশে সম্ভবত ডালকেই তারা প্রথম অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছে, যেমন বানর বনমানুষ এখনও করে। ভুক্তাবশিষ্ট সুবিধাজনক এক খণ্ড হাড় বা তার চেয়েও কঠিন পাথরের যোগ্যতা তারা বুঝেছে। কিন্তু একদা কোনও পূর্বপুরুষের মনে হল এদের আকৃতি কিছুটা বদলে নিলে

কাজের অনেক সুবিধা হয়, তখন গোল পাথরকে ঘা মেরে ভেঙে সে তাতে আনল প্রখরতা। কোনও আকস্মিক ঘটনাও বুদ্ধি খুলে দিয়ে থাকতে পারে, হয়তো ভোঁতা পাথরে হরিণের ছাল ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে সে ছুঁড়ে ফেললে তা, টুকরো হয়ে ভেঙে পাথরের ধারালো মুখ প্রকাশিত হল। যে করেই ঘটে থাকুক এই আবিষ্কার, এই বিদ্যায় সে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে, অবশ্য প্রথম দিকে অতি ধীরে। হাবিলিসের কীর্তির মত সূচনারই পরিণতি আজ জটিল যন্ত্র যুগে। যান্ত্রিক উপকরণে বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে হার মানিয়ে মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে, আবার তা দিয়ে হানাহানিতে পরস্পরের ধ্বংসের ব্যবস্থাও করেছে।

ওলডুভাইর হাতিয়ার থেকে হাবিলিসের হস্তকুশলতা ও বুদ্ধি বিবেচনা ছাড়াও তার জীবন ধারার আভাস পাওয়া যায়। নিম্নতম দুই স্তর থেকে মেরি লীকি ৪০ বৎসরাধিক কাল ধরে কয়েক লক্ষ ছোট বড় পাথর ও অস্থি খন্ড সযত্নে সংগ্রহ করে শ্রেণী ভাগ করেছেন, প্রায় ২০ লাখ থেকে ১০ লাখ বছর প্রাচীন এই সাধনীগুলির নীরব বাণী একাগ্র সাধনায় উদ্ধার করে জানতে চেয়েছেন এদের নির্মাতারা কি করত, কি খেত, কোথায় বসে খেত, কোথায় বাস করত ইত্যাদি। দুটি প্রধান শিল্প কৌশল লক্ষ্য করেছেন তিনি। যেটি প্রাচীনতর তাকে বলা হয় ওলডুভীয়, এই রীতিতে তৈরি হয়েছিল প্রধানত কাটারি (chopper), অনেকগুলিই নিকটবর্তী আগ্নেয়গিরির শক্ত জমাট লাভার নুড়ি থেকে, আকৃতি চ্যাপটা, এক মাথা অল্প বিস্তর সরু, আয়তন ছোট যাতে সহজে হাতে ধরা চলে। একটি পাথরকে আর একটি দিয়ে আঘাত করে প্রথমে এক বড় ফালি খসে গেল, আবার কাছাকাছি আর এক ফলক খসিয়ে পাথরটির এক মাথায় সৃষ্টি হল আঁকাবাঁকা ফলা, কপাল ভাল হলে মিস্ত্রী পেল এক ছুরি বা কাটারি যার ধারে মাংস কাটা চলে, করাতের মত ঘষে ঘষে গিঁট এবং নরম হাড় বিচ্ছিন্ন করা যায়, মৃত পশুর চামড়া চাঁছা বা ডালের মাথা চোখা করার কাজও হয় (চিত্র ৭)। ছোট বড় কাটারির সঙ্গে খসা ফালিগুলিও পাওয়া গিয়েছে—তারাও ধারালো এবং কাটা ও চাঁছার কাজে লাগত।

এই ওলডুভীয় শিল্পে ক্রমশ উৎকর্ষ দেখা যায় নিম্নতম থেকে তদূর্ধ্ব স্তর পর্যন্ত, উপরন্তু এই দ্বিতীয় স্তরে উন্নততর দুমুখী কাটারি বা তথাকথিত



চিত্র ৭। ওলডুভাইর নুড়ি যন্ত্র।

হাত-কুড়াল পাওয়া গিয়েছে—এই শিল্পের নাম আশলীয় (ফ্রানসের St Acheul নামক জায়গার থেকে)। পাথরের দুই পাশ থেকে আরও যত্নে ফালি খসিয়ে সৃষ্টি হয়েছে দুটি ফলা এবং সেগুলি একমুখী কাটারির চেয়ে আরও সোজা এবং ধারালো। তা ছাড়া কাটারির এক দিকে পাথরটা অপরিবর্তিত থাকত। কিন্তু হাত-কুড়ালের সবটা থেকে পাত খসিয়ে সুবিধা মত পাথরের আয়তন ও আকৃতি বদলানো হত। সামনের দিকটা অপেক্ষাকৃত চোখা, পিছনটা গোল করা যাতে হাতে ধরতে সুবিধা হয়। ঘা মেরে কাটা, টুকরো করা, চাঁছা, মাটি খোঁড়া ইত্যাদি তার ব্যবহার—সম্ভবত ঠিক কুড়াল নয়, নানা কাজে বহু-ব্যবহৃত সাধারণ সাধনী তা। নিম্ন (আদি) পুরাপ্রস্তর যুগের প্রাথমিক উপকরণ এই কাটারি ও হাত-কুড়াল। আশ্চর্য এই যে সেই আদিম কারিগরদের সৃষ্টির মধ্যে মেরি পেয়েছেন .ব মিলিয়ে ১৮ শ্রেণীর সাধনী।

এগুলি দিয়ে নানা কাজ সম্পন্ন হত। কাটারি এবং হাত-কুড়ালের বহুল সাধারণ প্রয়োগ ছাড়া অন্যগুলির আকার আকৃতি থেকে বিবিধ বিশেষ ব্যবহার অনুমান করা হয়েছে, যেমন ছাল থেকে রক্ত মাংস চাঁছার জন্য চাঁছনি, হাতুড়ির কাজের জন্য প্রায় গোলাকার পাথর, হাতের চাপে বা ঘা মেরে খোদাই করবার বাটালি, গর্ত করতে মুচির সূঁচের মত ছিদ্রকর যন্ত্র, কামারের নেহাইর মত পাথর যার উপর রেখে অন্য পাথর ফাটানো হয়, যন্ত্র বানাবার যন্ত্র হাতুড়ি পাথর, পশুর ছাল ছাড়াতে ও পরিষ্কার করতে কাটতে কসাইর উপকরণের মত ছেদনাস্ত্র, খুঁড়তে এবং ফুটো করতে 'শাবল' বা 'খন্তা'। এদের আয়তন সধারণত পাঁচ থেকে ১৬-১৭ সেন্টিমিটার, হাতুড়ি পাথর হয়তো একটি মুরগির ডিমের সমান, শাবল ও হাত-কুড়াল তার তিন গুণ লম্বা। বলা বাহুল্য, কোনও যন্ত্রেরই তখন কাঠের হাতল ছিল না (হাত-কুড়াল নামে তারই ইঙ্গিত)। আশেপাশে পাওয়া গিয়েছে বহু অকেজো টুকরো টাকরা যা কারিগরের কাজের সময়ে খসে পড়েছিল, উপরন্তু অখণ্ড অপরিবর্তিত পাথর যা স্থানীয় শিলা নয়, অন্য জায়গা থেকে এনে কাজে লাগানো হয়েছে। কারিগরি না করে স্বাভাবিক শিলা খণ্ডও নিশ্চয় ব্যবহার হয়েছে।

যারা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে এত বিচিত্র সাধনী সৃষ্টি করে নিজেদের কাজ সহজ করেছে তারা নিশ্চয় মানুষ নামের যোগ্য, হোমো হাবিলিস আখ্যার পক্ষে এও ছিল লীকি দম্পতির এক প্রধান যুক্তি ; মগজের মাপ বড় কথা নয়, তা দিয়ে কি কাজ হয়েছে সেটাই আসল। মেরির অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ফলে এই ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও শ্রেণী বিভাগ করেই তিনি বিরত থাকেন নি, আনুষঙ্গিক অনেক আশ্চর্য সম্ভাবনার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন এই যন্ত্রশিল্পীরা কোথায় কোথায় কত দিন থেকেছে, কি খেয়েছে এবং তখনকার প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব, জলবায়ু, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি সম্বন্ধেও। খাতের প্রায় ২০ কিলোমিটার জুড়ে অনেকগুলি বসতির চিহ্ন পাওয়া যায় জন্তুর হাড় ও হাতিয়ারের সাক্ষ্য থেকে। খাদ্যের অবশিষ্ট দেখে বোঝা যায় উদ্ভিজ্জ বস্তু ছাড়াও মাছ সরীসৃপ পাখি ও স্তন্যপায়ী অর্থাৎ সব শ্রেণীর প্রাণী তাদের পেটে গিয়েছে (স্তরের নিম্নতম প্রাণীদের ৯৫

শতাংশ এখন বিলুপ্ত)। নানা বর্তমান আদিবাসী সমাজে এখনও প্রায় সব কিছুই আহার্য, যথা দক্ষিণ আমেরিকার অদূরে তিয়েরা দেল ফুএগো দ্বীপবাসীরা খাদ্য অনিশ্চয় বলে উকুন, নানা পোকা ও তাদের ডিম, শুঁয়োপোকা, কাঁকড়া বিছে, সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ খায়, তারা রান্না জানলেও কাঁচা মাংস পছন্দ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিগত মহাযুদ্ধের পর এক য়োরোপীয় দম্পতি সোভিয়েট গুপ্তচরের ভয়ে অসট্রেলিয়ায় সিডনি শহরের অদূরে গুহায় ও নির্জন প্রান্তরে ২৮ বছর কাটিয়েছিল ফল মূল ও ইঁদুর খেয়ে।

হাবিলিস বড় জন্তুও খেয়েছে, বসতির কোনও কোনও ভাঙা হাড়ের চেহারা দেখে মনে হয় বৃহৎ পশুদের অস্থি ফাটিয়ে সে মজ্জা বার করেছে। লীকি অনুমান করেন যে হাবিলিস তার পাথুরে অস্ত্র দিয়ে হয়তো নিরামিষাশী জিনজানথ্রপাসকেও হত্যা করত, কিন্তু এটা সম্ভবত আবিষ্কর্তার অতিকল্পনা। কোথাও কোথাও নদীর স্রোতে হাবিলিস গোষ্ঠীর উচ্ছিষ্ট ও হাতিয়ারাদি ক্রমশ সরে গিয়েছে, কিন্তু যে সব স্থলে ধুলো, জল কাদা, গাছ গাছড়ায় এ সব বস্তু ধীরে ধীরে চাপা পড়েছে সে সব আস্তানায় বাসিন্দারা যেখানে তাদের ফেলেছিল ঠিক সেখানেই তারা পড়ে আছে। এই ধরনের আশ্রয় স্থলে যে তারা বেশ কিছু কাল কাটিয়েছে তা বোঝা যায় ভিটের অল্প জায়গায় কয়েক সেনটিমিটার গভীর অংশের মধ্যে পশুর হাড়, পাথুরে হাতিয়ার এবং বর্জিত বস্তুর প্রাচুর্য দেখে। এই ওলডুভাইয়ারা যে মাটিতে বসেছে সেই 'মেঝে' উদ্ধার করা হয়েছে, দেখা যায় স্থানীয় তরু লতা ও প্রাণীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছে তারা, ভোজ্যের উচ্ছিষ্ট যেখানে ছুঁড়ে ফেলেছে সেখানেই পড়ে আছে এক জায়গায় আছে অপর্যাপ্ত মাছের মুড়ো ও কুমিরের হাড়, তা ছাড়া নলখাগড়ার অশ্মীভূত অংশ, বোঝা গেল তারা জলের কাছাকাছি বাস করত। আর এক আড্ডার উচ্ছিষ্টে আছে ফ্লামিংগো পাখির হাড়, এই পাখি এমন সব ছোট ছোট প্রাণী খায় যা ঈষৎ কষায় অগভীর জলে বাড়ে, সুতরাং অদূরে ছিল ঐ রকম কোনও হ্রদ। এটি বোধ হয় জল্পনার চরম দৃষ্টান্ত।

আর এক আশ্রয়ে হাতিয়ার তৈরির অবশিষ্ট ফালি এবং আহার-বর্জিত ভাঙা হাড় প্রায় সাড়ে চার মিটার চওড়া ও ন' মিটার লম্বা চতুষ্কোণ মেঝে জুড়ে ঘন হয়ে জমে আছে, কিন্তু এই পরিধির বাইরে মিটার খানেক জায়গা প্রায়

পরিষ্কার, আবার আরও দূরে আবর্জনা দেখা যায়। তা হলে হয়তো ঐ পরিষ্কার অংশে সে কালে কাঁটা গাছের বেড়া ছিল যাতে ভিতরের ভিটেতে নিরাপদে বাস করা যায়। বাসিন্দারা সেখানে সাধনী বানাত এবং খাওয়া দাওয়া করত, উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট সেখানেই ফেলত, নয়তো ছুঁড়ে দিত বেড়ার বাইরে।

অন্যত্র এক বসতিতে গোল করে ঘিরে উপর উপর চাপিয়ে পাথর সাজানো—শুধু তাই নয়, ৬০-৯০ সেন্টিমিটার পর পর স্তূপটি একটু বেশী উঁচু। পাথরের এই সাজ টিকে আছে প্রায় দু লাখ বছর, দেখে মনে হয় এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এক গোষ্ঠী যেমন বানায় এও হয়তো তেমনি এক আশ্রয়, তারাও গোল করে পাথর দিয়ে ঘিরে জায়গায় জায়গায় উঁচু করে দেয় যাতে সেখানে খুঁটি বা ডাল দাঁড় করিয়ে তার উপর চামড়া বা ঘাস বিছিয়ে বাতাস আটকানো যায়। অপর একটি সম্ভব উদ্দেশ্য হল শিকারীরা এই আড়ালের পিছনে আত্মগোপন করেছে। ভিতরে পাথরের ছিলকা ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আশ্রয়টি অপেক্ষাকৃত ছোট, অনুমান হয় বাসিন্দারা অনেক কাজ করত বাইরে, সেখানে বড় বড় পশুর ফসিল ইঙ্গিত করে এদের কেটে খেতে তারা খোলা জায়গাতেই বেশী সুবিধা পেয়েছে। উচ্ছিষ্টের মধ্যে ছিল জিরাফ, জলহস্তী ও কৃষ্ণসার মৃগের হাড় এবং লুপ্ত হাতি ডাইনোথেরিয়ামের একটি দাঁত।

প্রশ্ন ওঠে এ সব বৃহৎ জন্তু ওলডুভাইয়ারা নিজেরাই মেরে থাকতে পারে কিনা। হয়তো তাদের তারা তাড়া করে নিয়েছে জলা জায়গায়, সেখানে কাদায় আটকে পশুরা আর উদ্ধার পায় নি, তখন তাদের মারা অনেক সহজ, নয়তো খিদের জ্বালায় তিলে তিলে মৃত্যু ঘটেছে। অথবা এও হতে পারে যে শিকার করেছে আসলে কোনও মাংসাশী পশু, এরা লাশ কেড়ে নিয়েছে তাদের থেকে। সম্ভবত লাশ যখন বেশী ভারী তখন তা 'ঘরে' আনতে চেষ্টা করে নি, যেখানে পেয়েছে সেখানেই আড্ডা গেড়ে সবটা মাংস শেষ করেছে। দুটি জায়গায় এর নজির আছে প্রায় সম্পূর্ণ দুই বিশাল কঙ্কালে; একটি হাতির, অন্যটি ডাইনোথেরিয়ামের, প্রতি জন্তুর ওজন কয়েক টন। কঙ্কালের হাড়গুলি এলোমেলো, অসংলগ্ন—টানাটানি ও কুপিয়ে খসানোর নিদর্শন যেন। এই কাজে ব্যবহৃত কাটারি এবং অন্যান্য যন্ত্র বিবর্জিত ফাঁকে

ফাঁকে। মাংস কাঁচা খাওয়া হত, আগুন জ্বালার কৌশলটি যারা আবিষ্কার করেছে তাদের কথা আছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

খাদ্য রুচির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোনও কোনও ঘাঁটিতে কৃষ্ণসার মৃগ অস্থির প্রাধান্য, খুলির হাড় যেখানে সবচেয়ে পাতলা অনেক সময়ে ঠিক সেইখানে ঘা মেরে তা ফাটানো হয়েছে। অন্যান্য আস্তানায় কোথাও জমে আছে অপর্যাপ্ত বড় বড় কচ্ছপের খোলস, কোথাও বা শামুকের খোলস গিলগিশ করছে। এক জায়গায় এক জিরাফের শুধু মুণ্ডটি, স্পষ্ট বোঝা যায় সুস্বাদু ঘিলুর লোভে ওটি কেটে আনা হয়েছিল। উচ্চতর দ্বিতীয় স্তরে ক্রমশ ঘোড়া ও জেব্রা অস্থির বৃদ্ধি দেখে মনে হয় তখন জলবায়ু শুষ্কতর হয়ে বন জঙ্গলের স্থান দখল করছিল তৃণ প্রান্তর। এই স্তরে চাঁছনির প্রাচুর্য, অর্থাৎ পশুর চামড়া পরিষ্কার করে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা।

এই রকম আরও অনেক কৌতূহলজনক ইঙ্গিত মেলে। যেমন ইতস্তত হাড়ের খুব সরু কুচি কুচি টুকরোর স্তূপ। নিশ্চয় অধিবাসীরা ইঁদুর ছুঁচো গিরগিটি বা ছোট পাখির হাড় সংগ্রহ করে সযত্নে জমিয়ে রাখে নি। সুতরাং শ্রীমতী লীকির মতে ওগুলি তাদেরই বিষ্ঠার অবশিষ্ট, অর্থাৎ তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুদের সবটাই খেয়েছে—যেমন কুচো মাছ খাই আমরা—এবং হাড়গুলি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছে। যেমন হাড়ের পরীক্ষায় তেমনি হাতিয়ারের বিশ্লেষণ থেকেও তিনি আশ্চর্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছেন। যথা প্রথম স্তরে কাটারির প্রাধান্য, দ্বিতীয় স্তরে প্রায় গোলাকার শিলা খণ্ডের। কিন্তু এতগুলি পাথরের গুলি কি কাজে লেগেছে? এদের বানাতে যে সময় ও শ্রম খরচ হয়েছে তাতে এগুলি শুধু ছুঁড়ে মারতে ব্যবহার হয়েছে মনে হয় না, কারণ তা হলে সহজে হারিয়ে যাবে। মোঁর বলেন এগুলি বোলা হতে পারে; এই অস্ত্রটি দক্ষিণ আমেরিকার উন্মুক্ত তৃণ প্রান্তরে এখনও ব্যবহার হয়, এতে দুই বা ততোধিক পাথর চামড়ার ফালি বা রজ্জু দিয়ে জোড়া থাকে, শিকারী তা মাথার উপর ঘুরিয়ে ছুটন্ত পশু বা বড় পাখির দিকে ছুঁড়ে মারলে তা প্রাণীর পা জড়িয়ে ফেলে এবং পরে সহজে অস্ত্রটি উদ্ধার করা যায়। তাই যদি হয় তবে চামড়া বা রজ্জু এখন পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

লীকিদের অধ্যবসায়ের ফলে ওলডুভাইয়া হাতিয়ার সম্বন্ধে যা জানা গেল

তার কিছুটা আনুমানিক হলেও তাদের উৎকর্ষ থেকে মনে হয় যন্ত্র শিল্পের সূচনা ঐখানেই নয়। এই ধারনার স্বপক্ষে কিছু নজির যে পাওয়া গিয়েছে তা অবিলম্বে দেখা যাবে।

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে অনুমান হয় খর্বকায় হলেও শিকারে হাবিলিসের' বেশ দক্ষতা ছিল, বিচিত্র ছোট বড় জন্তু মারত তারা, অস্ত্র ছুঁড়তে বা লাঠি চালাতে আমাদেরই মত হাত ও বাহু ব্যবহার করত। এ কালের যে সব আদিবাসী সম্প্রদায় খাদ্য উৎপাদন জানে না, সংগ্রহ ও শিকারই অবলম্বন, তাদের বাসস্থানে বর্জিত বস্তুর সঙ্গে ওলডুভাইর যন্ত্রপাতি ও আবর্জনার তুলনা করে হাবিলিস গোষ্ঠীর জীবন ধারা সম্বন্ধে যে অনুমান হয় তা অসট্রালোপিথেকাস সমাজেরই অনুরূপ (আমরা একটু পরে দেখব ওলডুভাই ছাড়াও কোথাও কোথাও এরা একই কালে কাছাকাছি বাস করেছে)। সম্ভবত ১০-১২ জনের দল একই জায়গায় কিছু দিন করে থাকত, স্ত্রী পুরুষের কাজ ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল, পুরুষরা শিকারে যেত, বড় জন্তু মারতে একাধিক দল হাত মিলিয়ে থাকতে পারে। মেয়েরা ফল মূল শাক সবজি বা ছোট জন্তু খুঁজে বেড়াত বাচ্চাদের কোলে বা সঙ্গে নিয়ে। এই ধরনের দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক সহযোগিতা দরকার, কারণ নেতাস্থানীয় কোনও বিশেষ গোষ্ঠীপতির প্রাধান্য ছিল না—স্ত্রী পুরুষের সমায়তন ছেদক দাঁতের মত এই সমাজ ব্যবস্থাও বনমানুষের বিপরীত ও মানুষের অনুরূপ। তথাপি এই ক্ষুদ্রমেধার সব বিষয়ে নিশ্চয় পরবর্তী উন্নত মানুষের সমকক্ষ ছিল না, যেমন চাল চলন ও ভাষা (যদি কিছু থেকে থাকে) নিশ্চয় অনেক সরল ও স্থূল ছিল।

ওলডুভাইর পরে পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্র বিগত কয়েক বছরে আরও বেশ কয়েকটি হাবিলিস বা তদনুরূপ প্রাচীনতর ফসিল উদ্ধার হয়েছে। ট্যানজানিয়াতেই ঐ ঘাঁটির মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থানটি লিটোলি (স্থানীয় ফুলের নাম), কাল ১৯৭৫। এ বার স্বাধীন অনুসন্ধানী মেরি লীকি, বয়স ৬০ পেরিয়ে গিয়েছে। প্রায় ৪০ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে এখানে তিনি কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু বিশেষ কিছু না পেয়ে ওলডুভাইর খাতে তাঁদের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারগুলির সূত্রপাত করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মেরির মন বললে

লিটোলিতে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে, পুত্র ফিলিপকে (রিচার্ডের কনিষ্ঠ) নিয়ে তিনি সেখানে ফিরে গেলেন এবং অবিলম্বে তাঁর এই নারী-প্রবৃত্তি পুরস্কৃত হল।

পাওয়া গেল নরোপম দাঁত ও চোয়াল খণ্ড, তা ছাড়া আগ্নেয়গিরিজাত ছাইয়ের নিচে প্রচুর পায়ের ছাপ—অধিকাংশই জন্তুর, তবে কিছু দ্বিপদ প্রাণীরও। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় মেপে ভস্মের বয়স দাঁড়াল প্রায় ৩৭½ লক্ষ বছর। লিটোলির ছাপগুলি সংরক্ষিত হয়েছে এক বিরল দুর্ঘটনায়, মাটিতে সেগুলি পড়ার পরে এক ছোট আগ্নেয়গিরি উদ্গার করল এমন এক বিশেষ ছাই যা বৃষ্টির পরে শুকিয়ে সিমেনটের মত শক্ত হয়ে গেল, ফলে ছাপগুলি তার নিচে পাকা হয়ে গাঁথা রইল। ৩০ লক্ষাধিক বছরে ধরে ক্রমশ বৃষ্টি ও বাতাস এই ঢাকনা ক্ষয় করে আবার উন্মুক্ত করেছে চিহ্নগুলি, তাদের প্রথম আবিষ্কারের অংশীদার ফিলিপ ও নাইরোবিতে কর্মরত ব্রিটেনের অ্যান্ড্রিউ হিল, তার পর চলল এই চিহ্ন ও ফসিল নিয়ে মেরির সুনিয়ন্ত্রিত একাগ্র গবেষণা।

এক পেশাদার স্থানীয় কর্মী ছাপগুলি পরীক্ষা করে কুড়িটি প্রাণী সনাক্ত করেছেন, যথা গুবরেপোকা, শতাপদী বিছা, পাখি, খরগোশ, বেবুন, শুয়োর, জিরাফ, হাতি, গণ্ডার, মোষ ও নানা হরিণ (গণ্ডারের ছাপ তার পক্ষে অতিরিক্ত বড় মনে হয়েছিল, পরে জানা গিয়েছে তা এক অতিকায় বিলুপ্ত গণ্ডারের)। এই সব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ফসিলও সেখানে পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া ছিল বড় ছোট দু রকম দ্বিপদের পদচিহ্ন, মাপ যথাক্রমে ২১·৫ × ১০ সেনিটমিটার এবং ১৮·৫ × ৮·৮ সেনটিমিটার, পদক্ষেপের মধ্যে ফাঁক ৪৭·২ ও ৩৮·৭ সেনিটমিটার। দুই সারি ছাপের মধ্যে ফাঁক এত কম যে মনে হয় এ দুটি মানুষ বা প্রাক্মানব একত্র পাশাপাশি চলে নি, কিছুটা সময়ের ব্যবধান ছিল। বিভিন্ন আয়তনের পদচিহ্ন থেকে প্রশ্ন উঠেছে এরা কি দুই জাতের দ্বিপদ, নাকি স্ত্রী পুরুষ, নাকি বয়সের পার্থক্য হেতু দেহে ছোট বড়।

অস্থির মধ্যে দাঁত ও চোয়াল ছাড়াও পাওয়া গিয়েছে শিশুর কঙ্কালের অংশ, সব পরীক্ষা করে মেরির বিশ্বাস এগুলি একই জাতের প্রাণীর এবং সে মানুষ। কিন্তু অবিলম্বে দেখা যাবে এ নিয়েও বিতর্ক চলছে। যাই হক, খণ্ডিত বিবর্ণ হাড়গোড়ের তুলনায় পা বা হাতের ছাপ যেন রক্ত মাংসের প্রাণীগুলিকে

আমাদের সামনে এনে দাঁড় করায়, লিটোলির ঐ চিহ্নগুলি অস্থির উপর প্রাণ-স্পন্দিত মাংসের। তা ছাড়া ফসিল নানা কারণে স্থানান্তরে সরে যেতে পারে, পদচিহ্ন নিঃসংশয়ে বলে দেয় প্রাণীটি একদা সেইখানে উপস্থিত ছিল। দ্বিপদত্বের স্পষ্ট প্রমাণ বলে এ ক্ষেত্রে ছাপগুলি আরও মূল্যবান, পায়ের বা শ্রোণীর অস্থি এত প্রত্যক্ষ নজির হতে পারে না। মানুষের প্রাগিতিহাস অনুসরণ করে আমরা পরে আরও হাত পায়ের ছাপের সম্মুখীন হব, কিন্তু তা অনেক সাম্প্রতিক কালের কথা।

দ্বিপদ ও পশুর এই সব পদচিহ্ন থেকে কল্পনা করা হয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ বছর প্রাচীন তমসাবৃত দূর অতীতের এক ভয়ংকর দৃশ্য। জল খেতে জড়ো হয়েছিল বিশাল গণ্ডার, হাতি, খড়্গদণ্ড বাঘ ও সে কালের আরও নানা জন্তু, হঠাৎ গুম গুম আওয়াজ, তার সঙ্গে মাটি কেঁপে উঠল, দেখতে দেখতে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গার আকাশ অন্ধকার করে দিল; হুড়মুড় করে পালাচ্ছে ভয়ার্ত জন্তুর দল এবং তাদের সঙ্গে দুই পায়ে ছুটছে ক্ষুদ্র এক মানুষেরই মত প্রাণী। হয়তো পলাতকদের অনেকে চাপা পড়ল ভস্মে, কেউ বা বাঁচল, কারও সাক্ষ্য এই সমাধির নিচে এত যুগ অপেক্ষা করেছে ভাবী কালের উত্তরপুরুষের জন্য।

পদচিহ্ন থেকে মেরি আরও জল্পনা করেছেন। পায়ের মাপ এবং তা যে অপেক্ষাকৃত চওড়া তার থেকে তাঁর অনুমান দেহের উচ্চতা এক মিটার ২০ সেন্টিমিটার নাগাদ এবং এই দ্বিপদরা শিমপানজির মত হেলে দুলে ধীর কদমে চলত, সুতরাং শিকারে অক্ষম। অথচ দাঁতের চেহারা দেখে মনে হয় তারা মাংসাশী, তা হলে সে মাংস সম্ভবত মৃত জন্তুর; তা ছাড়া অবশ্য ফল মূল যা পেত তাই খেত। আর যদি এমন হয় যে তারা শিকার জানত, তা হলে হাতের অস্ত্র পাথর বা গাছের ডালের বেশী কিছু নয়।

যাই হক, এই লিটোলীয়দের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল তারা দ্বিপদ, সেটা জল্পনা নয়। এবং এই ক্ষমতা যে ওলডুভাইর হাবিলিস বা অসট্রালোপিথেকাস প্রজাতিদের চেয়ে বেশ কয়েক লাখ বছর আগে দেখা দিয়েছে পায়ের চিহ্নগুলি তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অথচ তাদের এবং পরবর্তী অসট্রালোপিথেকাসের মগজ ছোট, ঐটুকু খুলিতে পূর্ণগঠিত মস্তিষ্কের

স্থানই হতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানীরা বলছেন আগে দ্বিপদত্ব না আগে মেধা বৃদ্ধি অথবা দুইয়েরই একযোগে বিকাশ ঘটেছে কিনা এই সনাতন বিতর্কেরও নিষ্পত্তি করেছে লিটোলীয়দের পদচিহ্ন; লুসির হাঁটুর হাড় ও শ্রোণীচক্রেরও একই নির্দেশ। এই সব নজির থেকে এখন এই বিশ্বাস অতীব প্রবল যে মানব অভিব্যক্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ দ্বিপদ চলন, প্রায় ৪০ লক্ষ বছর প্রাচীন এই বৈশিষ্ট্য বনমানুষ থেকে মানুষের পথটি পৃথক করেছে মেধা বৃদ্ধি ও অস্ত্র সৃষ্টির অনেক আগে।

ট্যানজানিয়ার লিটোলি থেকে ইথিওপিয়ায় লুসির বিচরণ ক্ষেত্র আফার উপত্যকা দেড় সহস্রাধিক কিলোমিটার উত্তরে, সেখানেও বাসিন্দারা দ্বিপদত্বের প্রাচীনতা প্রমাণ করেছে, কিন্তু তাদের কুলশীল নিয়ে আবিষ্কর্তাদের মধ্যে তীব্র অনৈক্য। জোহানসন লিটোলীয়দের মনুষ্যপদচ্যুত করে একেবারে আদিম অসট্রালোপিথেকাসের দলভুক্ত করেছেন, তাঁর মতে লুসি এই আদিম জাতের। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা লুসি ও অন্যান্য আফারবাসীদের নিয়ে সৃষ্টি করলেন প্রাচীনতর এক প্রজাতি অসট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস, কারণ তাঁদের মতে দাঁত ও অন্যান্য হাড়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আফ্রিকানাস বা হাবিলিসের তুলনায় আরও আদিম ধরনের এবং পৃথক। তাঁরা বলেন আফার ও লিটোলির ফসিল অতি অনুরূপ এবং সমসাময়িক, প্রাণী দুটি এক ও অভিন্ন অ. আফারেনসিস, অনেক বিষয়ে বনমানুষের কাছাকাছি; বনমানুষের মত দুইয়েরই মগজ ছোট, ছেদক দাঁত বড়, অন্য দাঁত ও মাড়ির দন্তসজ্জাও আদিম ধরনের, মুখাগ্র ছুঁচালো; তা ছাড়া পুরুষরা স্ত্রীদের চেয়ে অনেকটা বড়, যেমন গরিলার সমাজে। কিন্তু তারা দ্বিপদ, কারও কারও মতে দেহ আমাদেরই মত খাড়া, চলনও আমাদের মত। আফারেনসিসের চেয়ে আফ্রিকানাস কম প্রাচীন এবং অতটা বনমানুষোপম নয়, সুতরাং সে আফারেনসিসের বংশধর, তার পরিণাম হয়েছে বিলোপে, আর একই আদিপুরুষের আর এক বংশধর মানুষ, অভিব্যক্তির ধাপে ধাপে সে ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠেছে।

জোহানসন ও তদ্দলীয়দের এই বিশ্বাস পণ্ডিত মহলে অবিশ্বাসের মুখে পড়েছে। যথা, সাইমনস বলেছেন তাঁরা যতটা দাবি করেছেন আফারেনসিস ততটা বনমানুষতুল্য নয়। জোহানসন ও সহকর্মীরা তার কোমর, হাঁটু

ইত্যাদির হাড় পরীক্ষা করে বলেছেন আফারেনসিস পুরোদস্তুর দ্বিপদ, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই, কিন্তু সম্প্রতি অন্য গবেষণাগারে জ্যাক স্টার্ন ও র‍্যান্‌ড্যাল সুস্‌ম্যান ফসিলের সূক্ষ্মতর পরীক্ষার পর অভিমত দিয়েছেন সেগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক নয়। শিমপানজির মত লুসিও কোমর ও হাঁটু ঈষৎ বেঁকিয়ে হাঁটত, উপরন্তু আফারেনসিসের আঙুল, কব্জি, কোমর ও উরুর হাড় বৃক্ষারোহণ নির্দেশ করে, বিশেষত ক্ষুদ্রদেহদের অস্থি, অর্থাৎ জোহানসন যাদের লুসির মত স্ত্রী জাতীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। বৃহত্তর পুরুষরা আরও সহজে হাঁটত। স্টার্ন ও সুসম্যান জল্পনা করেছেন স্ত্রীরা অধিক সময় গাছে থাকত খাদ্য সংগ্রহ করতে, শত্রু এড়াতে এবং ঘুমাতে (যেমন এখনও ওরাং ও গরিলা সমাজে দেখা যায়), পুরুষদের দেহ বড়, ভারী ও শক্তিশালী, তাই তারা মাটিতে বেশী সময় কাটাত। পরে বন কমে আসাতে স্ত্রীরাও ভূমিচর হতে শিখল। তাঁদের মতে আফারেনসিস একাধারে দেহের অস্থি, চলাফেরা ও বাস রীতিতে বনমানুষ ও মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণী।

কিন্তু ভিন্ন মতে ফসিলে আয়তনগত ও অন্যান্য বৈষম্য এত বেশী যে তা শুধু স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ বলা চলে না। রিচার্ড লীকির ধারণা ওর মধ্যে আছে ছোট বড় অন্তত দুটি প্রাণী প্রজাতি। যেমন হাবিলিসকে নিয়ে, তেমন লুসির ক্ষেত্রেও অনেকে বলছেন সে আফ্রিকানাস ছাড়া কিছু নয়। লিটোলীয়দের আফ্রিকানাসের দলভুক্ত করতে রিচার্ড লীকির ঘোর আপত্তি, তা হবে অধঃপতন ; দুই গোষ্ঠীর গঠন ও আকৃতিগত প্রভেদ বিবেচনা করে তাঁর অভিমত লিটোলীয়রা বনমানুষতুল্য নয়, তারা উন্নততর ও মানুষ নামের যোগ্য। দুই তরুণ ও কৃতী আবিষ্কর্তার মধ্যে এ নিয়ে তিক্ত বিরোধ। লীকিদের মত জোহানসনের আত্মগর্বও বিখ্যাত, "জোহানসন মনে করেন প্রকৃত সত্য একমাত্র তাঁর কাছেই ধরা দিয়েছে" বা "তিনি সর্বদা অন্যের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করছেন" এমন মন্তব্য শোনা গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, ১৯৮২ অকটোবরে লুসি সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে জোহানসনের উপর বিরক্ত হয়ে ইথিওপীয় সরকার সে দেশে বিদেশীদের অনুসন্ধান নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ হল জোহানসন ও তাঁর দল কেবল ফসিল

লুট করেছেন, স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করেন নি। উপরন্তু তাঁর 'লুসি' নামক বইতে জোহানসন ইথিওপীয় সংস্কৃতি নিয়ে অশোভন মন্তব্য করেছেন, কর্মচারীদের অজ্ঞতা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অপবাদ দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজের বইতে বর্ণনা করেছেন কেমন করে রাতের আঁধারে এক গোরস্থান থেকে তিনি এক হাঁটুর হাড় চুরি করেছিলেন আধুনিক মানুষ ও লুসির তুলনা করতে। মৃতের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক এই কাজের তিনি পরে ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন, যেমন বইতে উদ্ধৃত অপরের উক্তিও বদলেছেন। এ ছাড়া জোহানসনের মার্কিন গবেষক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ আগেই দেখা দিয়েছে, এক বিজ্ঞানী দল ছেড়ে যাওয়ার পর আর এক জন ইথিওপীয় সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁকে মার্কিন সরকারের গুপ্তচর বলে অভিহিত করেছেন। বিজ্ঞানীরা যে সর্বদা সাধারণের উচ্চ স্তরে বিচরণ করেন না এই সবই তার উদাহরণ।

যাই হক, লুসি গোষ্ঠীর দ্বিপদত্ব নিয়ে জোহানসন জল্পনায় অনেক দূর এগিয়েছেন। হাত দুটি মুক্ত হওয়ায় স্ত্রীরা বাচ্চা কোলে করে, পুরুষরা খাদ্য বহন করে চলত, এর থেকে বিশেষ দুটি দুটি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যৌথ সম্পর্ক গড়ে উঠল, পূর্বগামীদের মত শুধু ঋতু অনুসারে সঙ্গী সঙ্গিনী নির্বিচারে যৌন মিলনের স্থান নিল সাংবৎসরিক সংগম, ফলে বাড়ল ব্যক্তিগত সুখ ও সন্তানের সংখ্যা, সুতরাং প্রজাতির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। আবার পুরুষরা আকারে স্ত্রীদের দ্বিগুণ বড় বলে সেই জোরে তারা একাধিক স্ত্রীর হারেম নিয়ে বাস করে থাকতে পারে।

এখানে মানুষের জন্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জোহানসনের এক অভিনব প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। আফার অঞ্চলে প্রথম আবিষ্কারগুলির পর তিনি বলেন মানুষের জন্ম আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ বা পূর্ব এশিয়ায় (যেখানে প্রথম হোমো ইরেকটাসের দেখা মেলে) নয়, তা আরব দেশ অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া। এর নজির তিন দেশের তিন কালের পুরামানব বা প্রাক্‌মানব—জ্যেষ্ঠ লীকি আবিষ্কৃত ১৭½ লক্ষ বছর প্রাচীন হাবিলিস (ওলডুভাই, ট্যানজানিয়া), পুত্র রিচার্ডের উদ্ধৃত প্রায় ২৩ লক্ষ বছর বয়স্ক ১৪৭০ খুলি (তুর্কানা, কিনিয়া—এর আলোচনা ঠিক নিচেই) এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার লুসি যার বয়স

আরও অনেকটা বেশী (আফার, ইথিওপিয়া)। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখি প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পূর্বগামীর বাসভূমি ক্রমেই উত্তরে-পশ্চিম এশিয়ার দিকে সরছে এবং আফার লোহিত সাগরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উপরন্তু জানা আছে একদা ঐখানে এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে স্থলের যোগ ছিল।

এ বার আমরা যাই রিচার্ড লীকির নিজস্ব ফসিল-সমৃদ্ধ ক্ষেত্র কিনিয়ার তুর্কানা হ্রদে। তার রৌদ্রদগ্ধ বালুকাকীর্ণ কূলে বড় জাতের অসট্রালোপিথেকাস রোবাসটাসের খুলি, চোয়াল ইত্যাদি ছাড়া রিচার্ড লীকির অন্য আবিষ্কারও প্রসিদ্ধ। ১৯৭১ সালে তিনি পেলেন এক খণ্ড চোয়াল যার বয়স সম্ভবত ২৬ লাখ বছর এবং বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে মনে হয় তা ছিল হোমো গণভুক্ত প্রাণীর। পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর দল হ্রদের পূব তীরে বহু ফসিল উদ্ধার করেন, এর মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠল ১৯৭২ সালে তার প্রথম অস্থিগুলির দেখা পেলেন রিচার্ডের কিনিয়াদেশী সহকারী বার্নার্ড এন্‌জেনেও এক খাড়া খাতের স্তরে। (এই সব আবিষ্কারে স্থানীয় অধিবাসীদের দান কম নয়, যদিও তাঁদের নাম প্রায়ই শোনা যায় না ; ওলডুভাইর সম্পূর্ণতম হাবিলিস খুলিটির আবিষ্কর্তা লুই ও মেরি লীকির সহকারী পিটার এম্‌ভুবে।) পরে আরও বেশ কয়েকটি টুকরো পেলেন অন্যরা। বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে সেগুলি জোড়া লাগাতে কেটে গেল ছ সপ্তাহ, উদগ্রীব কর্মীদের চোখের সামনে যা মূর্তি নিল নিঃসন্দেহে তা অতি উন্নত শ্রেণীর নরোপম প্রাণীর খুলি। যাদুঘরের তালিকায় এই বস্তুটির সংখ্যা হল ১৪৭০ এবং এখনও ব্যক্তিটি '১৪৭০ মানব' নামে পরিচিত। রিচার্ড ছাড়াও সাইমনস, পিলবিম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ওলডুভাই হাবিলিসের সঙ্গে তার নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ; রিচার্ড, লুই এবং আরও অনেকের বিশ্বাস সে হাবিলিস, যদিও কেউ কেউ তার মধ্যে অসট্রালোপিথেকাস চরিত্র লক্ষ্য করেছেন এবং আমরা জানি অনেকের মতে অসট্রালোপিথেকাস ও হাবিলিস অভিন্ন। এই আবিষ্কারের মাত্র কয়েক মাস পরে লুই মারা যান।

খুলিটির বয়স অন্তত ২৩ লক্ষ বছর, তাতে মেধা ছিল ৮০০ সিসি, অর্থাৎ লুসির দেড় গুণের বেশী ; তার মালিক ওলডুভাইয়া হাবিলিসের থেকে প্রাচীন হলেও মগজ বেশ কিছু বড় (আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কেও গড় মাপের

উপরে নিচে অনেকটা তারতম্য দেখা যায়), মেধার মাপ এমনি বাড়তে বাড়তে মাত্র লাখ খানেক বছর আগে থেমেছে। এ ছাড়া স্পষ্ট দ্বিপদ গতির নির্দেশক পায়ের হাড়ও পাওয়া গেল। ১৪৭০ খুলি এবং ১৫৯০ সংখ্যা-চিহ্নিত অনুরূপ খুলির আবিষ্কারে এও প্রতীয়মান হল যে হাবিলিস একই সময়ে অসট্রালো-পিথেকাসের কাছাকাছি তুর্কানা হ্রদের আশেপাশে বাস করেছে, হয়তো বা তার মেধা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলেই পূর্ব আফ্রিকাবাসী জোয়ান অসট্রালো-পিথেকাসের বিলোপ ঘটেছে।

এই তুর্কানাবাসীরাও শিকারী ছিল, কাছাকাছি বিভিন্ন জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়েছে, তা ছাড়া নানা জাতের পাথর থেকে তৈরি সাধনী, তার মধ্যে কাটারি ও চাঁছনির সংখ্যাই প্রায় ৬০০। হ্রদের পূব ধারে কুবি ফোরা নামক জায়গা খুঁড়ে রিচার্ড যে মেঝেটি উদ্ধার করেছেন তাতে জন্তুর হাড়ের সঙ্গে আছে ওলডুভীয় কাটারি ও ফলক, কিন্তু সেগুলি সম্ভবত ওলডুভাইর সাধনীর চেয়ে সাড়ে সাত লাখ বছর বেশী প্রাচীন। রিচার্ড তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে বলেছেন যে পূর্ব তুর্কানায় চার রকম দ্বিপদ প্রাণী বাস করেছে এবং হোমো-গণীয়দের ছোট ছোট দল ফল, বীজ ও মাংস সংগ্রহ করে আস্তানায় নিয়ে গিয়ে ভাগ করে খেত।

১৯৭৭ সালে রিচার্ডের বয়স ছিল মাত্র ৩২, এরই মধ্যে শুধু তুর্কানা অঞ্চলে তিনি শতাধিক ফসিল হাড় আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রাক্‌মানবিক বা মানবিক বলে দাবি করা হয়। যৌবন কালেই তিনি কিনিয়ার যাদুঘরের অধ্যক্ষ হয়েছেন এবং বিশ্বে তাঁর মর্যাদা বেড়েছে। এ নিয়ে বেশী বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য জ্যেষ্ঠ লীকি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন, মেরি এই মনোমালিন্যের থেকে দূরে দূরে থাকতেন। শেষ কালে লুই সব তিক্ততা মুছে ফেলেন, ১৯৭২ সালে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে ছেলের তাঁবুতে বসে বলেন যে সে তুর্কানায় তিনটি নরোপম প্রজাতি আবিষ্কার করবে। রিচার্ডের সহধর্মিণীও শাশুড়ীর মত স্বামীর সহকর্মিণী।

তুর্কানায় আধুনিকতম আবিষ্কারে আমরা তিনটি নতুন নাম পাই—মার্কিন বিজ্ঞানী কে বেরেন্‌সমায়ার ও লিও লাপোর্ট, তাঁদের সঙ্গে রিচার্ডের পত্নী মীভ্‌। ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে হ্রদের পূব ধারে প্রথমে পাওয়া গেল

জলহস্তী ও জলচর পাখির কতগুলি পদচিহ্ন, তার পর জলহস্তীর একটি ছাপের থেকে মাটি সরিয়ে উদঘাটিত হল এক রহস্যময় দ্বিপদের পদচিহ্ন, এবং পরে পর পর আরও ছ'টি অনুরূপ ছাপ। এগুলির থেকে প্রাণীটির উচ্চতা ও ওজন অনুমান করা হয়েছে দেড় মিটার ও ৫৪ কিলোগ্রাম। পায়ের মাপ ২৬×১০ সেনটিমিটার, অল্প জলে পিছল ভূমিতে হাঁটছিল বলে অপেক্ষাকৃত ছোট পদক্ষেপে চলেছে সে, একটু আগে জলহস্তী হেঁটে গিয়ে গভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে, তাতে এক বার পিছলে পড়ল ব্যক্তিটির পা ; হয়তো জলের ধারে ছোট জন্তু বা পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে চলেছিল সে। কয়েক দিনের মধ্যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে বালি এসে ভরে দিল গর্তগুলি, শুরু হল সংরক্ষণ। ছাপগুলি পড়েছে লিটোলির প্রায় ২০ লক্ষ বছর পরে, তুলনায় স্পষ্ট দেখা যায় এতটা সময়ের ব্যবধানে পায়ের পাতা আরও বড় হয়েছে, ব্যক্তিটির উচ্চতাও বেড়েছে। ফসিল থেকে জানা যায় পূর্ব আফ্রিকায় অসট্রালোপিথেকাস রোবাসটাস ও অবিসংবাদিত মানুষ হোমো ইরেকটাস দুইয়েরই বাস ছিল, এগুলি তাদের কারও হতে পারে। অনেকে মনে করেন চিহ্নগুলি ইরেকটাসের হওয়াই স্বাভাবিক, আসট্রালোপিথেকাসের তুলনায় পা বড় ও পদক্ষেপের মধ্যে ফাঁক বেশী ; পিলবিম স্বচক্ষে দেখে এসে বলেছেন ছাপগুলি আমাদেরই পদচিহ্নের মত। তুর্কানা ও লিটোলির পদচিহ্নগুলি ঘিরে দর্শকদের জন্য 'খোলা যাদুঘর' সৃষ্টি করার পরিকল্পনা হয়েছে।

পরিশেষে আবার ইথিওপিয়ার ওমো নদীর উপত্যকা। সেখানে ফরাসী ও মার্কিন দলের আবিস্কৃত প্রাচীন অসট্রালোপিথেকাসের দাঁত ও চোয়াল উল্লিখিত হয়েছে, ১৯৬৭ সালে ফরাসী দলটি একটি ও মার্কিন দল তিনটি হাবিলিস দন্ত উদ্ধার করেন। তার আলোচনায় পিলবিম বলেন সেখানে ৪০ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে অন্তত দুটি প্রজাতির বাস ছিল, একটি দক্ষিণ আফ্রিকার অসট্রালোপিথেকাসের মত, অন্যটি পূর্ব আফ্রিকার হাবিলিস সদৃশ। ১৯৬৯ সালে হাতিয়ার আবিষ্কারেরও খবর আসে, আগ্নেয়গিরির ভস্ম থেকে তাদের বয়স জানা গিয়েছে ১৯ থেকে ২১ লক্ষ বছর।

আফ্রিকার নব উদঘাটিত ঘাঁটিগুলিতে নরোপম দ্বিপদ প্রাণীদের সঙ্গে

আমাদের পরিচয় হল। মানব অভিব্যক্তির পথে এদের কার কোথায় স্থান সে সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী বিশেষজ্ঞ অভিমতের কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা, এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্বাসের আরও দৃষ্টান্ত অবিলম্বে দেখা যাবে। যে ক্ষেত্রে মানুষ চেনা নিয়েই সমস্যা, সুতরাং প্রাক্‌মানব ও আদি মানবের প্রভেদটা অস্পষ্ট, সেখানে এই অনৈক্য আশ্চর্য নয়। তবু সাম্প্রতিক গবেষণা নানা দিকে নতুন আলোকপাত করে প্রাক্তন ধারণায় নাড়া দিয়েছে, যেমন অস্ট্রালোপিথেকাসের ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে।

নবাবিষ্কৃত যে সব ফসিল মানবিক বলে দাবি করা হয়েছে তারা যদি অস্ট্রালোপিথেকাসের না হয়ে তাই হয় তা হলে অস্ট্রালোপিথেকাসকে আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ বলে মানতে কঠিন বাধা দেখা দেয়। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি অনেক ঘাটিতে দুইই ছিল সমসাময়িক, যেমন ওলডুভাই, ওমো ও তুর্কানায়, তা ছাড়া গত অধ্যায়ে বিভিন্ন অস্ট্রালোপিথেকাস প্রজাতির যা প্রাচীনতা লক্ষিত হয়েছে নবাবিষ্কৃত হোমোদের বয়স তার চেয়ে কম নয়। অস্ট্রালোপিথেকাস যদি ক্রমশ বদলে মানুষ হয়ে থাকে তা হলে তা কি করে সম্ভব? উপরন্তু কতগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্যেও অ. আফ্রিকানাস বেশী রকম স্বকীয়তা অর্জন করেছে যার নির্দেশ সে মানব অভিমুখী ধারার বহির্ভূত, তা হলে সে পার্শ্ববর্তী এক প্রশাখা।

প্রাণীর অভিব্যক্তি তো সোজা সরল পথে চলে নি, তার আশেপাশে অনেক অলিগলি, কেউ তাদের মধ্যে পথ হারিয়ে মরেছে, কেউ এগিয়ে গিয়েছে। মানুষের বিবর্তনেও একের পর এক সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ এক প্রশাখাহীন সরল শাখা বেয়ে লক্ষ্যে পৌঁছায় নি, বস্তুত লক্ষ্য বা পরিকল্পনা কিছু ছিল না, বরং যেন প্রকৃতির খেয়ালে কেউ থেকেছে সফল শাখার কাছে কেউ সরেছে দূরে, নতুন নতুন পরিবেশের পরীক্ষায় কখনও কখনও কোনও শাখা আর বাড়তে পারে নি, কারও বা ভাগাভাগি হয়েছে, যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ক্রমে মানুষের রূপ নিয়েছে। এমতাবস্থায় আশ্চর্য নয় যে এই জটিল ধাঁধার মধ্যে মানুষের ধারাটি অনুসরণ করতে বিশেষজ্ঞরা এখানে ওখানে ভিন্ন পথ নিয়েছেন।

ফলে প্রাক্‌মানব থেকে মানুষের বিভিন্ন বংশতরুর এই শাখা প্রশাখার

জঙ্গল কিছুটা বিভ্রান্তিকর, আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি (চিত্র ৮)।

কিনিয়াপিথেকাস—হোমো হাবিলিস——————হোমো সেপিয়েন্স
(রামাপিথেকাস) |——জাভা মানব (হোমো ইরেক্টাস)—নেআন্ডার্টাল মানব
ক |——জিনজান থ্রপাস (অ. বোআজাই)

রামাপিথেকাস—হোমো হাবিলিস—হো. ইরেকটাস—হো. সেপিয়েনস
খ |——অসট্রালোপিথেকাস (আফ্রিকানাস)
|—— প্যারান্থ্রপাস (অ. রোবাস্টাস)

অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস—|—হোমো হাবিলিস
গ |—অ. রোবাসটাস

রামাপিথেকাস———লিটোলীয় হোমো বা অ. আফারেন্সিস
ঘ

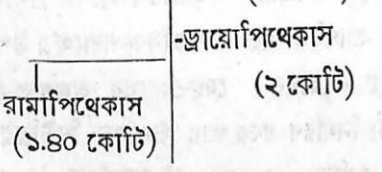
৪০ লক্ষ বছর ৩০ ২০ ১০ ০
অ. আফারেনসিস—|—হো. হাবিলিস হো. ইরেকটাস ? হো. সেপিয়েনস
ঙ —অ. আফ্রিকানাস—অ. রোবাসটাস

চিত্র ৮। ক—লুই লীকি, খ—জন নেপিয়ার, গ—ফিলিপ টোবায়াস, ঘ—ডেভিড পিলবিম, ঙ—ডনালড জোহানসন।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ফসিলশিকারীরা সাধারণত নিজ নিজ আবিষ্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন—বিজ্ঞানীরাও মানুষ, সর্বদা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও আবেগমুক্ত নন, বরং নিজেদের দাবি দাওয়া আপন সন্তানের মত আগলে রাখেন তাঁরা। লুই লীকির ছকে হোমো হাবিলিস থেকে সোজা এসেছে আজকের মানুষ হোমো সেপিয়েনস, এমন কি হোমো ইরেকটাসও ভিন্নমুখী প্রশাখা, যদিও হাবিলিস থেকে ইরেকটাসের উদ্ভবও সম্ভব (ক)। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মানব অভিব্যক্তির পথে সেপিয়েনসের আগেই ইরেকটাসের স্থান, যেমন

লনডনের জন নেপিয়ারের ছকে দেখা যায় (খ)। দক্ষিণ আফ্রিকাদেশীয় ফিলিপ টোবায়াস কিন্তু অ. আফ্রিকানাসকে লুপ্ত শাখা বলে মানেন না, তাঁর বিশ্বাস এই প্রাক্‌মানবটি থেকে নরনামযোগ্য হাবিলিসের উদ্ভব (গ); এই শাখায় মগজ বাড়ল, কিন্তু আফ্রিকানাসের দ্বিতীয় উত্তরপুরুষ রোবাসটাস সেই বরটি থেকে বঞ্চিত ও বিলুপ্ত। পিলবিম মনে করেন প্রথম প্রাক্‌মানবের এ যাবৎ প্রাচীনতম বংশধর লিটোলির হোমোগণীয়রা বা লুসির গোষ্ঠী অ. আফারেনসিস (ঘ)। জোহানসন ও টিম হোআইটের বংশাবলীতে এই আদিম অসট্রালোপিথেকাস থেকেই মনুষ্যপদবাচ্য হাবিলিসের উদ্ভব এবং অ. আফ্রিকানাস ও রোবাসটাস নিষ্ফল শাখা (ঙ), বিলুপ্ত শাখায় মগজ প্রায় বাড়েই নি, মানুষের দিকে দ্রুত বেড়েছে। জোহানসন হাবিলিসকে মানুষ বলে মানেন, তাঁর মতে প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত হোমোর সঙ্গে রোবাসটাসও বেঁচে ছিল, তখন অসট্রালোপিথেকাসের দিন ফুরিয়ে গেল। হাবিলিস থেকেই ইরেকটাসের উদ্ভব কিনা এবং তা হলে সেটা কখন সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত নন।

এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি অধিকাংশের মতে ড্রায়োপিথেকাস গণীয় বনমানুষ থেকে প্রাক্‌মানব ও তদ্‌জাত মানবের শাখাটি ভাগ হয়ে গিয়েছে (চিত্র ৯)। এবং বর্তমান নজির অনুসারে প্রাচীনতম প্রাক্‌মানব রামাপিথেকাস, জঙ্গলের বাইরে এসে নতুন পরিবেশে তার দ্রুত অভিব্যক্তি ঘটেছে—যাদের বংশকণিকা (gene) দু পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল অগ্রগতির পথে তারা হল প্রকৃতির বরপুত্র, কারণ খাড়া দেহের দূরদৃষ্টি শিকার সন্ধান করতে, শত্রুকে ফাঁকি দিতে সাহায্য করে, সুতরাং এই যোগ্যতমরা বেশী দিন বাঁচল, অনুরূপ সন্তান বেশী সৃষ্টি করল এবং বংশানুক্রমে প্রান্তরবাসী দ্বিপদ ও তাদের জংলী জাতিদের



চিত্র ৯। বনমানুষ থেকে প্রাক্‌মানবের বিভাগ (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নির্দেশ করে কত বছর আগে)।

মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হল। দীর্ঘ কাল ধরে রামাপিথেকাস ও তার অজ্ঞাত নিকট বংশধররা অভিব্যক্ত ও বিভক্ত হয়েছে, অবশেষে দেখা দিল প্রাক্‌মানব অসট্রালোপিথেকাস ও মানুষ।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আবিষ্কারের আগে বনমানুষ থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত যে বংশতরু নৃবিজ্ঞানীরা অনেকে গ্রহণ করেছিলেন তা হল (চিত্র ১০)

ড্রায়োপিথেকাস (২ কোটি)—
- —জাইগ্যান্‌টোপিথেকাস (৯০-১০ লক্ষ)
- —শিমপানজি, গরিলা
- —রামাপিথেকাস··· (১.৪০ কোটি)
  - —অ. আফ্রিকানাস (৩৫ লক্ষ)
  - —অ. রোবাসটাস (৩৫ লক্ষ)
  - —হাবিলিস—হো. ইরেকটাস—হো. সেপিয়েনস (২৩ লক্ষ)

চিত্র ১০। বনমানুষ থেকে মানুষের বংশতরু (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নির্দেশ করে কত বছর আগে)।

লিটোলীয়দের স্থান হবে হাবিলিসের আগে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন যে দুইয়েরই মানুষ নামের যোগ্যতা তর্কের বিষয়। মানব শাখার শেষের দিকে যারা আছে তাদের তারিখ, অভিব্যক্তির সূত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির বিশদ আলোচনা হবে ভবিষ্যৎ অধ্যায়গুলিতে।

এই বংশতরুগুলি সম্বন্ধে উল্লেখনীয় যে ক্যালিফর্নিয়ার এক তরুণ বিজ্ঞানী দলের উদভাবিত একটি অভিনব পদ্ধতির ফলে সম্প্রতি আর একটি বিতর্ক দেখা দিয়েছে প্রাক্‌মানব শাখার প্রাচীনতা নিয়ে। ভিন্‌সেন্‌ট সারিখ, জন ক্রনিন ও অ্যালান উইলসন প্রমুখ কর্মীরা অভিব্যক্তির শাখা প্রশাখা অনুসরণে ফসিল চর্চা না করে জীবন্ত প্রাণী দেহের রাসায়নিক পদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত এক 'বংশতরুর ঘড়ি' ব্যবহার করেছেন। দেহ-কোষের অন্তর্গত যে বংশকণিকা জীব কুলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তার উপাদান নিউক্লিইক অ্যাসিড অণুর পার্থক্য থেকেই এই বৈচিত্র্য, সুতরাং এই আণবিক বৈষম্য-গুলির সংখ্যা গুণে অভিব্যক্তির তরুতে শাখা প্রশাখার দূরত্ব আন্দাজ করা যায়। তেমনি প্রোটিনের আণবিক ভেদ আর একটি নির্দেশক ('মানুষের আগে', পৃ ৮১-৮২)। এক দিকে শিমপানজি ও গরিলা অন্য দিকে আধুনিক

মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রোটিনের যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে এই কর্মীদের হিসাবে তা ৫০ লক্ষ বছরের দূরত্ব নির্দেশ করে। তা ছাড়া, মানুষ, গরিলা ও শিমপানজির কোষস্থিত নিউক্লিইক অ্যাসিডের ৯৯ শতাংশ অভিন্ন এবং মাত্র এক শতাংশের পরিবর্তন নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি ঘটেছে, সারিখ ও তন্দল য় এই নিকটপন্থীদের হিসাবে তা ৫০-৬০ লক্ষ বছর আগে। সুতরাং তাঁদের 'ঘাড়ি' অনুসারে প্রথমে গিবন ও ওরাঙের শাখা ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ঐ সময়ে প্রাক্‌মানব ও মানুষের শাখাটি আফ্রিকার বনমানুষদের থেকে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সনাতন ধারণা অনুসারে এই বিভাগ ঘটেছে আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছরেরও আগে, কারণ প্রাক্‌মানব রামাপিথেকাসের বয়স ঐ রকম। এই ধারণার পোষকরা বলেন তা ছাড়া ঐ অল্প সময়ে মানুষের মত বিবিধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীর অভিব্যক্তি সম্ভব কিনা তা সন্দেহের বিষয়, সুতরাং আণবিক ঘাড়িও সংশয়জনক। প্রত্যুত্তরে নবীনপন্থীরা রামাপিথেকাসকে একেবারে পদচ্যুত করতে চেয়েছেন, তাঁদের বৈপ্লবিক বক্তব্য হল প্রধানত শুধু দাঁত থেকে রামাপিথেকাসকে প্রাক্‌মানব বলা হয়েছে, কিন্তু সে সেই মর্যাদার যোগ্য নাও হতে পারে, হয়তো বংশতরুতে বনমানুষ প্রাক্‌মানব বিভাগের আগে তার স্থান, শিমপানজি ও মানুষের যৌথ পূর্বপুরুষের কাছাকাছি। এই তত্ত্বের সমর্থনে জোহানসন তাঁর নিজের আবিষ্কারের নজির হাজির করেছেন, তিনি বলেন অ. আফারেনসিস আদিম ধরনের বনমানুষোপম প্রাক্‌-মানব, সুতরাং বনমানুষ প্রাক্‌মানবের বিভাগটি তার খুব আগে ঘটে নি, তাঁর অনুমান ৫০ লক্ষ থেকে এক কোটি বছরের মধ্যে তা ঘটেছে।

ফসিলের নতুন নজিরও পুনর্বিবেচনার কারণ হয়েছে। পিলবিম রামা-পিথেকাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, ১৯৮০ সালে প্রাপ্ত কিছু অস্থি খণ্ড জোড়া দিয়ে তিনি অনেকটা সুসম্পূর্ণ এক পুনর্গঠন করেন ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে। সেটির পরীক্ষায় মনে হয় সিবাপিথেকাসের মত এশীয় রামাপিথেকাসেরও মানুষ বা আফ্রিকী বনমানুষদের তুলনায় ওরাঙের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক ছিল, সুতরাং তাকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে ভাবা কঠিন, বরং সে ও সিবাপিথেকাস একই গণভুক্ত হতে পারে। এর পর রিচার্ড লীকি বললেন বিজ্ঞানীরা রামাপিথেকাসকে ভুল বুঝেছেন এবং প্রাণীটি আসলে স্ত্রী সিবা-

পিথেকাস। রামাপিথেকাসকে নিয়ে বিভ্রান্তির আর এক কারণ কিনিয়ার জাতীয় যাদুঘরে এবং লনডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত কিছু ফসিল ইতিপূর্বে পরীক্ষা হয় নি, নয়তো পরীক্ষায় ভুল ছিল। দাঁতের নজির থেকে রামাপিথেকাস প্রাক্‌মানবের আসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তারও ব্যাখ্যা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এবং প্রাক্‌মানবের আবির্ভাব যদি প্রায় দেড় কোটি বছর আগে না ঘটে থাকে তবে বনমানুষ থেকে এই শাখা উদ্‌গমের তারিখ নির্দেশ করতে আমাদের অত পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।

সুতরাং আপাতত অবস্থাটা অনিশ্চিত, তবে মনে হয় নিকটপন্থীরা ক্রমশ শক্তি সংগ্রহ করছে। রিচার্ড লীকির মতে তাদের আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন কথাও শোনা যায় যে সনাতনপন্থীরা সারিখ ও তদ্দলীয়দের তারিখ মেনে নিচ্ছে, তবে তা আণবিক ঘড়ির সাক্ষ্য থেকে নয়, ফসিলের নতুন নজির অনুসারে। তা হলে প্রায় ২০ বছর আগে পুনরুজ্জীবনের পর রামাপিথেকাস আবার অদূর ভবিষ্যতে অবজ্ঞার তিমিরে নিমজ্জিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, সে ক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে আগে যা বলা হল তার মূল্য হবে কেবল ঐতিহাসিক, মানব অভিব্যক্তির প্রচলিত ছকগুলি থেকে তার নাম কাটা যাবে, রামাপিথেকাস ও অসট্রালোপিথেকাসের মধ্যে বিস্ফারিত ফাঁক আর রহস্যজনক মনে হবে না এবং নতুন করে খোঁজ পড়বে প্রথম প্রাক্‌মানবের।

তারিখ নিয়ে প্রাচীন ও নিকটপন্থীদের এই বিতর্কের এক দিন নিষ্পত্তি হবে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে—অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বও নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে প্রশ্ন করে এগিয়ে চলেছে। তাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেবেই, যেমন বর্তমানে অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস মানুষের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ কিনা বা আদিতম মানুষ কে এই সব প্রশ্নেও আমরা দেখেছি—এই অস্পষ্টতার কারণেই মানব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টি গবেষণার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, বহু নৃবিজ্ঞানীকে আকর্ষণ করেছে তা। ফলে মাত্র কয়েক বছরে নানা দিকে ধারণা বদলেছে, যেমন দ্বিপদত্বের প্রাচীনতা এবং এই গুণ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির কালগত অনুক্রম সম্বন্ধে, এবং সাধারণ ভাবে এই সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে যে পূর্ব ধারণার তুলনায় মানুষ অনেক প্রাচীন—প্লাইসটোসিন অধিযুগের চৌকাঠ পেরিয়ে প্লায়োসিনেও তাকে চেনা যায়।

এই উর্বর ক্ষেত্রে এত দ্রুত আবিষ্কার ঘটছে যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দূর অতীতের তমসাবৃত স্থানগুলি আলোকিত হয়ে মানব বংশতরু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যার মানবত্ব নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা নেই এ বার সেই মানুষটির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। এই ব্যক্তি এবং তৎপরবর্তীদের সূত্রে উপরোক্ত আধুনিক আবিষ্কার থেকে আমাদের সরে যেতে হবে গবেষণার প্রথম যুগে যে সব অনুসন্ধানীরা মানব প্রাগিতিহাসের ভিৎ স্থাপন করেছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হবে। অজ্ঞানতার অন্ধকার জঙ্গলে পথ করতে স্বভাবতই কখনও তাঁরা দিক ভুল করেছেন, ব্যর্থতা তিক্ততার মুখে পড়েছেন, তবু তাঁদের এক-নিষ্ঠ সংকল্প ও উদ্দীপনার ফলেই আদিমানবরা একে একে মূর্তি পেয়েছে। নানা দিক থেকে তথ্য তত্ত্বের সংযোজনে কি করে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের ইতিহাস গড়ে উঠল সেই বাস্তব কাহিনী গল্পের মতই আকর্ষণীয়।

৫। নিশ্চয় মানুষ

মানুষের প্রাগিতিহাস যেন চলচ্চিত্রের ফিল্‌ম, তার পৃথক ছবিগুলি যেমন পর পর দু তিনটি দেখলে তাদের পার্থক্য ধরা যায় না, মনে হয় পাত্র পাত্রী একই অবস্থায় স্থির হয়ে আছে, তেমনি ফসিল যখন প্রায় সমকালীন তখন অভিব্যক্তির গতি অগোচর। আবার পুরনো চলচ্চিত্রের উপর প্রায়ই কাঁচি চালানো হয় সময় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে, ফলে চোখের সামনে হঠাৎ লাফ মেরে দৃশ্য বদল হয়, ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না; তেমনি ফসিলের ফাঁক যখন বেশী তখন ক্রমবিকাশের পরম্পরা সেই গহ্বরে তিমিরাবৃত, সুতরাং কাহিনীর অগ্রগতি অতিরিক্ত আকস্মিক ঠেকে। এই সব ফাঁক পরিপূরণের কাজে প্রত্নবিজ্ঞানীর কোদাল সর্বদা ব্যস্ত, কিন্তু যত দিন না নতুন নজির মাটির সমাধি থেকে আত্মপ্রকাশ করছে তত দিন ঘটনাসূত্রের কিছু আভাস দেখি, কিছু অনুমানে পাই, কিছু তার বুঝি না বা। তখন নানা তত্ত্ব খাড়া করে তাদের পরীক্ষা চলে।

হোমো ইরেকটাসের ইতিহাস এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বহু বছর ধরে জানা ছিল সে এশিয়াজাত প্রথম মানুষ, হঠাৎ আফ্রিকা ও য়োরোপে দেখা দিল তার প্রাচীনতর সংস্করণ। তা হলে কি এশিয়া মানুষের জন্মভূমি নয়? এ দিকে আফ্রিকায় হাবিলিসের আবিষ্কারে আর একটি সূত্র পাওয়া গেল। সব সুদ্ধ আরও অনেকগুলি ছবি যোগ হল চলচ্চিত্রে।… কিন্তু মানুষটির কাহিনী প্রথম থেকে শুরু করাই ভাল।

আফ্রিকার বন জঙ্গল তৃণভূমি ছেড়ে এশিয়া মহাদেশের সাগর প্রান্তর পর্বত পার হয়ে ৮০০০ কিলোমিটার দূরে একেবারে তার পূর্ব প্রান্তে যে দ্বীপপুঞ্জের নাম এখন ইন্‌দোনেশিয়া, তখন তা ওলন্দাজদের উপনিবেশ। সুদূর য়োরোপের পশ্চিম সীমায় সেই ক্ষুদ্র দেশ হল্যান্‌ড থেকে এলেন প্রধান অভিনেতা, নাম ইউজিন দুবোআ। ১৮৮৭ সাল, তখনকার দিনে এই নববিবাহিত তরুণ যে সুদীর্ঘ অভিযানে দুস্তর সাগর পাড়ি দিলেন তার কারণ ক্রমশ তাঁর মাথায় এক দুরন্ত নেশা চেপে গিয়েছিল।

এই উদ্দীপনার যখন সূচনা দুবোআ তখনও স্কুলে। জার্মেনির থেকে বক্তৃতা দিতে এলেন এক সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞানী। বালক তাঁর মুখে শুনে অবাক যে প্রাগৈতিহাসিক বনমানুষ থেকে মানুষের জন্ম। এই নতুন তত্ত্ব নিয়ে খ্রীষ্টীয় জগতে তখন ঝড় বয়ে চলেছে, কিন্তু বাইবেলের বাণী খণ্ডন করতে ডারুইনধর্মী বিজ্ঞানীদের হাতে তখন মানুষ ও বনমানুষের মাঝামাঝি ফসিল বিশেষ কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ডাক্তারী স্কুলের পড়া শেষ করে দুবোআ আম্‌স্‌টার্ডাম শহরের এক স্কুলে শারীরস্থানবিদ্যা শেখাবার কাজ নিলেন, তাতে উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর উৎসাহ আরও বাড়ল। ক্রমে তিনি বুঝলেন যে চেয়ারে বসে এই বিতর্কের মীমাংসা হবে না, মানুষের অভিব্যক্তি প্রমাণ করতে দরকার সেই অনাবিষ্কৃত যোগসূত্র (missing link), অর্থাৎ এমন একটি মধ্যবর্তী প্রাণী যে নিঃসন্দেহে আমাদের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে তখন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে যা কিছু লেখালেখি হচ্ছিল দুবোআ তা অভিনিবেশ সহকারে পড়লেন। সে পর্যন্ত পুরামানবের একমাত্র প্রতিনিধি য়োরোপের নেআনডার্টাল ফসিল, কিন্তু তার চেহারায় কিছু বনমানুষী ছাপ থাকলেও সে মানুষ, যোগসূত্র নয়। সুতরাং যাকে দরকার সে আরও অনেকটা প্রাচীন কালের প্রাণী, কিন্তু তৎকালে য়োরোপ শীতে এমন জর্জরিত ছিল যে তেমন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অতএব তাকে পাওয়া যাবে পৃথিবীর উষ্ণাঞ্চলে।

তা ছাড়া অভিব্যক্তি তত্ত্বের গুরু স্বয়ং ডারুইন অনুমান করেছেল আমাদের পুরোগামীদের চিহ্ন পাওয়া যাবে উষ্ণ জঙ্গলাকীর্ণ দেশে এবং এই তত্ত্বের দ্বিতীয় ও স্বাধীন প্রবর্তক অ্যালফ্রেড ওআলেসও একই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি আট বছর মালয়শিয়ায় বাস কালে লক্ষ্য করেন যে সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপ বর্তমান বনমানুষ গিবন ও ওরাং ওটাঙের বাসভূমি।

ভেবে চিন্তে দুবোআ গন্তব্য স্থির করলেন সুমাত্রা। তখন তাঁর বয়স ২৯, আমসটার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি। সবে নিজের এক ছাত্রীকে বিয়ে করেছেন, সে সন্তানসম্ভবা, এই ঘরছাড়া পাগলামি দেখে তাঁর সহকর্মীরা এবং বিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক গোষ্ঠী অবাক, কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও দুবোআর সংকল্প অটল রইল। চাকরি ছেড়ে তিনি টাকার খোঁজে লেগে গেলেন, কোথাও

সাহায্য পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি ঔপনিবেশিক সেনা বিভাগে ঢুকলেন অস্ত্রচিকিৎসকের কাজ নিয়ে। সদ্যোজাত কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লেন, সাত সপ্তাহ পরে জাহাজ এসে ঠেকল সুমাত্রায়।

অজানার প্রতি কৌতূহল ও আবিষ্কারের আকর্ষণ বাল্য কালেই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। বাড়ির আশেপাশে মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে নদীর ধারে ঘোরাঘুরি, এক চুনাপাথরের গুহায় পুরনো হাড়গোড়ের অনুসন্ধান, গুহার দেয়ালে মধ্যযুগীয় শিল্পীদের খোদাই করা অদ্ভুত মূর্তি ও সাংকেতিক চিহ্নের আবিষ্কার, বাবার কাছে প্রতিটি তরু লতা এমন কি ঘাস শেওলা ইত্যাদির ল্যাটিন নাম শেখা এই সব 'অকাজে' অনেকটা সময় কাটত, পকেটে জমা হত পাথর, খরগোশের খুলি, ছোট জন্তুর কঙ্কাল প্রভৃতি অমূল্য সম্পদ। সুমাত্রায় পৌঁছে সম্পূর্ণ নতুন ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সৈনিকদের চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তিগত বাতিকের বুনো মোষ চরাতে অবসরের অভাব হল না। প্রথম দিকে নিজের খরচে বহু গুহা গহ্বর ও চুনাপাথরের খনিতে অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেলেন তাতে আশ মিটল না, কারণ যথেষ্ট প্রাচীন নয় সেগুলি। এক গুহায় ঢুকে প্রায় প্রাণটি রেখে আসতে হয়েছিল, সরু সুড়ঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতে মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, হঠাৎ এক বিশ্রী গন্ধ নাকে এল, চোখে পড়ল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাড়গোড়—বুঝলেন বাঘের বাসায় ঢুকেছেন। ভাগ্যক্রমে গৃহকর্তা বাড়ি ছিল না, কিন্তু পিছু হটতে গিয়ে দেহ আটকে গেল গুহার মুখে। কিছু স্থানীয় লোক তাঁর সঙ্গে এসেছিল, তবে তারা তখন কাছাকাছি ছিল না, প্রাণপণে ডাকাডাকি করেও তাদের পাওয়া গেল না। দুবোআ ভাবছেন সুড়ঙ্গে বাঘের উচ্ছিষ্টের পাশে অবিলম্বে তাঁর কঙ্কালও স্থান পাবে, ভাগ্যক্রমে পশুর আগেই মানুষ ফিরল এবং পা ধরে টেনে তাঁকে উদ্ধার করা হল।

পরে ম্যালেরিয়ায় ভুগে তাঁর সুবিধা হয়ে গেল। সহৃদয় কতৃপক্ষ আরোগ্যের জন্য তাঁকে পাঠালেন যবদ্বীপের শুষ্কতর আবহাওয়ায় এবং ডাক্তারী কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিলেন, উপরন্তু পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সাহায্য করতে কয়েক জন সহকারীও পাওয়া গেল। সরকারের সহানুভূতি পেয়ে এই কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল, নানা জায়গা খুঁড়ে ফসিল জমা হল, যদিও বাধা বিপত্তির অভাব ছিল না।

যেমন, এক ঘাঁটিতে দুবোআ এক নতুন অবৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। জানা গেল স্থানীয় অধিবাসীরা বহু দিন ধরে হাড়গোড় খুঁড়ে বার করে তা চীনা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে, তারা এই 'ড্র্যাগন অস্থি' গুঁড়িয়ে সর্ব রোগের মহৌষধ বা অলৌকিক তাজ্জব দাওয়াই বানায় অনান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে, যথা বাঘের নখ ও দাঁড়ি গোঁফ, বাদুড়ের বিষ্ঠা ও গণ্ডারের শিং। সুতরাং এই অস্থি-সন্ধানীরা দুবোআর দলকে তাদের পণ্য বেচতে নারাজ, উপরন্তু দেখা গেল দুবোআর কর্মীরাও তাঁর ফসিল সম্পদ রাতের অন্ধকারে চুরি করে ঐ ব্যাপারীদের বিক্রি করছে।

পরীক্ষার পর বাক্স বাক্স ফসিল হল্যানডে পাঠানো হল, তার মধ্যে ছিল কিছু অজ্ঞাত বা লুপ্ত জন্তুর হাড়, কিন্তু প্রথম দিকে মানুষ বা বনমানুষের কাছাকাছি কিছু নয়। অবশেষে দুবোআ এলেন সোলো নদীর কূলে ছোট গ্রাম ত্রিনিলে, যেখানে জলের ধারে মাটির স্তর পর পর উন্মুক্ত। লক্ষণ দেখে শুনে দুবোআর মনে হয়েছিল সম্ভাবনা ভাল। ১৮৯১ অগাসটে কাজ শুরু হল। উপরের স্তরগুলি খুঁড়তেই ১৫ মিটার নিচে দেখা দিল প্রচুর প্রাচীন জন্তুর হাড় এবং পরের মাসে একটি মাত্র বনমানুষতুল্য দাঁত। পরীক্ষায় প্রথমে মনে হল তা কোনও অতিকায় লুপ্ত শিমপানজির আক্কেল দাঁত, কিন্তু পরে ওরাঙের সঙ্গে মিল লক্ষ্য করে দুবোআ মন স্থির করতে পারলেন না। এক মাস পরে একই স্তরে মাত্র এক মিটার দূরে কাটা মাটির থেকে উঁকি দিল এক বাদামী রঙের 'পাথর', দেখতে যেন কচ্ছপের খোলস ; তাড়াতাড়ি ডাক পড়ল দুবোআর, বস্তুটি প্রথমে তিনিও চিনতে পারলেন না, কিন্তু সযত্নে মাটি ও পাথর সরাতে সরাতে দেখা দিল এক খুলির উপরিভাগ। বিশদ অনুশীলনের পর দুবোআ এক প্রবন্ধে লিখলেন দুটি ফসিলই এক বৃহৎ নরোপম বনমানুষের। কিন্তু সারা শীত কালটা পরীক্ষা নিয়ে কাটিয়েও তাঁর শারীরস্থান বিদ্যা প্রাণীটিকে শ্রেণীভুক্ত করতে পারল না।

শীতের শেষে দিন শুষ্কতর হলে পরের বছর ত্রিনিলে আবার একই জায়গায় খনন শুরু হল, নানা জন্তুর হাড় জমে উঠে অবশেষে খুলি আবিষ্কারের ১০ মাস পরে সেই স্তরেই দেখা দিল তৃতীয় ফসিলটি, প্রথমটির প্রায় ১৫ মিটার দূরে। খুলি নয়, দাঁতও নয়, বাম উরুর অস্থি—অমূল্য ফসিল কারণ

দেখেই বোঝা যায় যার দেহে তা ছিল সে সোজা হয়ে হাঁটত। বস্তুত প্রায় সব বিষয়েই হাড়টি আধুনিক মানুষের ঊর্বস্থির মত, শুধু একটু বেশী ভারী। দু মাসের মধ্যে উদ্ধার হল ঠিক আগেরটির মত আর একটি দাঁত। স্বভাবতই মনে হল হয়তো চারটি হাড়ই একই দেহের অবশিষ্ট।

চিহ্ন দেখে ধারণা হয় প্রাণীটির খুলি ছিল মানুষ ও বনমানুষের মাঝামাঝি, কিন্তু পা সম্পূর্ণ সোজা হাঁটার যোগ্য। ইতিপূর্বে প্রখ্যাত জার্মেনীয় বিজ্ঞানী এর্নস্ট্ হাইনরিশ্ হেকেল অনুমান করেছেন মানুষ ঠিক এমনি এক প্রাণীর বংশধর এবং তার উপযুক্ত নামও দিয়েছেন পিথেকান্থ্রপাস—গ্রীসীয় শব্দ পিথেকস ও আনথ্রোপস থেকে। এর সাত বছর পরে দুবোআ জানালেন তিনি বাস্তবিক পিথেকানথ্রাপাসকে পেয়েছেন, এবং ঐ উরুর অস্থির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রজাতীয় পদবি জুড়ে দিলেন ইরেকটাস (খাড়া) অর্থাৎ দ্বিপদ বনমানুষোপম মানুষ। তার পর য়োরোপে এই মর্মে তার পাঠালেন যে তিনি ডারুইন-উল্লিখিত বহুপ্রতীক্ষিত "অনাবিষ্কৃত যোগসূত্র" পেয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এই বার্তা তাঁর আশানুরূপ উৎসাহ উত্তেজনা সৃষ্টি করল না এবং এইখানে এই তরুণ বিজ্ঞানীর জীবনে যে ছায়া পড়ল তার থেকে তাঁর বাকি জীবনের রিক্ততার সূচনা। ১৮৯৫ সালে দেশে ফিরে দুবোআ দেখলেন পিথেকানথ্রপাসের কুল পরিচয় বিশেষজ্ঞরা অনেকে মানছেন না, অধিকাংশের মতে সে এক রকম আদি মানব, বনমানুষ ও মানুষের যোগসূত্র নয়, সুতরাং তার নামটাও ভুল। কেউ কেউ বললেন খুলি ও দাঁতগুলি বনমানুষের এবং ঊর্বস্থি মানুষের, দুইই কাছাকাছি মারা পড়েছে। এক বিজ্ঞানী পরিহাসের ছলে প্রশ্ন করলেন যদি সেখানে বনমানুষের দক্ষিণ উরুর হাড়ের মত একটি হাড় পাওয়া যায় তা হলে প্রাণীটি কি রকম দাঁড়াবে, অথবা বাম উরুর অস্থি আর একটি দেখা দিলে বলব কি যে পিথেকানথ্রপাসের দুটি বাঁ পা ছিল? কিংবা অধিকতর নরতুল্য এক দ্বিতীয় খুলি যদি ১৫ মিটারের মধ্যে উদ্ধার হয় তা হলে হয়তো ধরা হবে যে পিথেকানথ্রপাসের দুটি মুণ্ড ছিল, একটি বনমানুষের আর একটি মানুষের।

রঙ্গ রস বাদ দিয়ে, জাভা মানবকে নিয়ে প্রধান সমস্যা ছিল যে পায়ের

হাড় থেকে দেখা যায় সে তাদেরই মত হাঁটত, অথচ তার খুলি বলছে মগজ ছিল অনেক ছোট, আনুমানিক ৮৫০ সিসি। অসট্রালোপিথেকাস, হাবিলিস ইত্যাদি ক্ষুদ্রমেধা দ্বিপদ আবিষ্কারের পর আজ এটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা গত শতাব্দীর কথা বলছি। সুতরাং তখন প্রশ্ন ছিল সে বনমানুষ না মানুষ—না দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু, যেমন দুবোআ বলেন। প্রথম দিকে জার্মেনির বিজ্ঞানীরা বলতেন সে মানবিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বনমানুষ, ইংরেজদের বিশ্বাস ছিল বনমানুষের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষ—অর্থাৎ ঠিক বিপরীত; মার্কিন বিশেষজ্ঞরা দুবোআরই মত এই দুইয়ের অন্তবর্তী একটি প্রাণীর দিকে ঝুঁকলেন। নিজ বিশ্বাসের সমর্থনে তিনি বললেন যে এই মস্তিষ্ক মানুষের চেয়ে অনেক ছোট, অন্য দিকে দেহ ভারের অনুপাতে বৃহৎ বনমানুষের মগজও এর অনেকটা ছোট।

পণ্ডিতরা যে কেমন উদ্ভট কথা বলতে পারেন তার দৃষ্টান্ত আমরা পরে আরও দেখব, জাভা মানব প্রসঙ্গে কয়েকটি নমুনা লিপিবদ্ধ আছে। এক প্রস্তাব অনুসারে সে মানুষ এবং বনমানুষ পিতা মাতার উৎকট সন্তান। আর একটি অভিমত হল ফসিলগুলি এক ক্ষুদ্রমেধা ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তির। ঊরুর অস্থিতে সামান্য একটি গুটি লক্ষ্য করে এক জন চুল চিরে বললেন তার হাড়ের রোগ ছিল, পরিবারের লোকে তার যত্ন করেছে বলেই সে বেঁচেছে, সুতরাং সে বনমানুষ নয়, মানুষ।

অন্যরা যতই জাভা মানবকে যোগসূত্র বলে মানতে নারাজ দুবোআরও তত জেদ চেপে গেল। এবং নিজের স্থির বিশ্বাসের মতই আঁকড়ে রইলেন ঐ ক'টি অস্থি খণ্ডকে। সেগুলি যে তার কত প্রিয় ছিল দুটি ঘটনার থেকে তা বোঝা যায়। ১৮৯৫ সালে দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, ফসিলভরা বাক্সটি জড়িয়ে ধরে দৌড়ে জাহাজের খোলে নেমে যেতে যেতে দুবোআ এক নিঃশ্বাসে পত্নীকে বললেন, "আমি এটাকে দেখছি, যদি কিছু ঘটে তুমি বাচ্চাদের দেখাশুনো করো।" য়োরোপে ফিরে স্বদেশে বিদেশে সভায় বক্তৃতা করছেন, বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় নিবন্ধ লিখছেন, বিজ্ঞানীদের তাঁর অস্থি সম্পদ দেখাচ্ছেন, বিশেষ কিছু ফল হচ্ছে না, সঙ্গে সর্বদা ক্ষত বিক্ষত সুটকেসটি। এক বার এক ফরাসী বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে বসে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পর দু

জনে কাছেই এক রেস্তরাঁতে খেতে গেলেন, সেখানেও কথা আর ফুরায় না, অবশেষে পরিবেশক জানাল তাকে দোকান বন্ধ করতে হবে, সুতরাং আলাপ শেষ করতে তাঁরা চললেন দুবোআর হোটেলে। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ দুবোআ তাঁর সংগীর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিথেকানথ্রপাস কোথায় ?" তার পর ছুটে রেস্তরাঁয় ফিরে গিয়ে দেখেন দোকানদার দরজায় খিল দিচ্ছে, আবার সেই প্রশ্ন, "পিথেকানথ্রপাস কোথায় ?" হতভম্ব ব্যক্তিটি অর্থ না বুঝে আন্দাজে জানালে একটা বাক্স পেয়ে সে সরিয়ে রেখেছে। ছোঁ মেরে তা উদ্ধার করে দুবোআ ডালাটি খুলে দেখলেন পিথেকানথ্রপাস যথাস্থানে আছে, তবে নিশ্চিন্ত। ফরাসী বিজ্ঞানী পরামর্শ দিলেন বাক্সটি বালিশের নিচে নিয়ে শুতে।

বিশেষজ্ঞ সমাজে সব তদবির ব্যর্থ হওয়াতে দুবোআর মনে ধারণা জন্মাল যে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিরাগ বশত তাঁরা তাঁর যুক্তি মানছেন না। ভগ্নোদ্যম মানুষটি তখন বিরক্ত মনে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে গৃহবন্দী হয়ে রইলেন। গুজব রটল যে তিনি পিথেকানথ্রপাসকে আবার ভূগর্ভে সমাধিস্থ করেছেন—এ বার মেঝের নিচে। ডারুইনবিরোধী বাইবেলপন্থীরা বললেন যে তিনি নীরব অনুশোচনায় অভিব্যক্তি তত্ত্বে বিশ্বাসের পাপ ক্ষয় করছেন। ৩০ বছরের বেশী এই নির্জন বাসের পর ১৯৩২ সালে তিনি জন কয়েক বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীকে বাড়িতে ডাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৌলিক বিরোধের নিষ্পত্তি হয় নি, ১৯৪০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মানলেন না যে পিথেকানথ্রপাস অর্ধমানব নয়, মানুষের জন্মদাতা না হয়ে মানব পরিবারেই তার স্থান। দেশে ফিরে তিনি আবার আমসটার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন, এক যাদুঘরের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। নিজের ছেলেকে মডেল সাজিয়ে দুবোআ পিথেকানথ্রপাসের এক পূর্ণায়তন মূর্তি গড়েন, তা এখন লাইডেন যাদুঘরে রক্ষিত। বিদেশ থেকেও তিনি নানা সম্মান পেয়েছিলেন।

পিথেকানথ্রপাস আজ সর্বসম্মতিক্রমে এক আদি মানব, অন্যান্যদের সঙ্গে তার নতুন নাম হোমো ইরেকটাস। দুবোআর উদ্ধৃত সবগুলি ফসিল একই প্রাণীর কিনা অনেকের মতে তা এখনও অমীমাংসিত। খুলিটি নিঃসন্দেহে এক প্রাক্‌মানবের, কিন্তু অন্তত একটি দাঁত কোনও জাতের ওরাং ওটাঙের হতে

পারে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ সন্দেহ করেন যে উরুর অস্থিটি ছিল উচ্চতর স্তরে এবং তা আরও পরবর্তী মানুষের। কিন্তু ডেভিড পিলবিম বলেন যে তা আধুনিক মানুষের হতে পারে না, কারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এটি খুলির সমবয়স্ক ; উপরন্তু তিনি নিঃসন্দেহ যে সবগুলি অস্থি একই ব্যক্তির।

যে কর্মজীবন এত আশা ও একনিষ্ঠ উদ্যম নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল তার এমন হতাশ ও বিরস পরিণতি খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু মানব অভিব্যক্তির অনুসরণ পথে দুবোআর কীর্তি অমর, শুধু যুক্তিপূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করে দূর বিদেশে গিয়ে (কারও কারও মতে) প্রথম মানুষের প্রথম নজির তিনিই খুঁজে বার করেছেন, যখন এত প্রাচীন মানবিক ফসিল আর জানা ছিল না তখন ঐ অঞ্চলে সন্ধান ও ইরেকটাসের অন্যান্য নমুনা আবিষ্কারের উদ্দীপনা যুগিয়েছে তা। পিথেকানথ্রপাস পৃথিবীতে ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে, মানুষ যে অত প্রাচীন হতে পারে সে কালে তা অনেক বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করতে পারেন নি, পরবর্তী আবিষ্কার সেই সংস্কার দূর করে মানুষের আবির্ভাব অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। পুরাবিজ্ঞানের এই অগ্রদূত যদি আর বছর ত্রিশেক পরে জন্মাতেন তবে হয়তো তাঁকে ঘিরে অত ঝড় বইত না।

চল্লিশাধিক বছর পরে যবদ্বীপ আরও ফসিল দান করেছে। ১৯৩৭-৪১ সালে দুবোআর আবিষ্কার ক্ষেত্রের অদূরে জার্মেনীয় নৃবিজ্ঞানী গুস্‌টাফ্‌ হাইন্‌রিশ্‌ ফন কোএনিগ্‌স্‌হ্বাল্‌ড পাঁচটি খুলির খণ্ড ও অন্যান্য অস্থি উদ্ধার করেন, সেগুলিও সম্ভবত পিথেকানথ্রপাস জাতীয়। এদের থেকে ইরেকটাসের শারীরিক তথ্য আরও পাওয়া গেল, তা ছাড়া ফন কোএনিগসহ্বালড দেখলেন তাঁর প্রাচীনতম ফসিলের বয়স দুবোআর পিথেকানথ্রপাসের চেয়ে বেশ কিছু বেশী।

হোমো ইরেকটাসকে যাদের থেকে আমরা সবচেয়ে ভাল করে জেনেছি তাদের বাস ছিল চীনে। এই পিকিং মানবের ইতিহাস প্রায় গোয়েন্দা উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর—তাতে আছে ক্ষীণ সূত্র থেকে নির্ভুল অনুমানে সম্পূর্ণ বাস্তবিক পুনর্গঠন, রহস্যময় অন্তর্ধান, লুপ্ত ধনের প্রাণপণ খোঁজ, এমন কি খুন পর্যন্ত। মঞ্চে দুবোআর মত এক নিঃসঙ্গ নায়কের পরিবর্তে

আন্তর্জাতিক অভিনেতৃবৃন্দের সমাবেশ। প্রাচীন চীনের জলবায়ু ও ভূগোল আদি মানবের বাসোপযোগী বলে দুই তরুণ বিজ্ঞানী সুইডেনের ভূতত্ত্ববিৎ জন গুনার অ্যান্ডারসন এবং ক্যানাডার শারীরস্থানবিৎ ডেভিডসন ব্ল্যাকের স্থির বিশ্বাস ছিল যে সেই দেশে মানুষের পূর্বপুরুষ বাস করেছে, খুঁজলেই তাকে পাওয়া যাবে। তখন পর্যন্ত সেখানে ফসিল সাক্ষী বলতে ছিল শুধু একটি আদি প্রাইমেট দন্ত, ১৮৯৯ সালে এক য়োরোপীয় চিকিৎসক পিকিং শহরের এক দোকানে তা উদ্ধার করেন, ঠিক যখন অন্যান্য 'ড্র্যাগন অস্থির' সঙ্গে তা গুঁড়িয়ে দাওয়াই তৈরির উদ্যোগ চলছিল। শতাধিক 'ড্র্যাগন অস্থির' সঙ্গে সেটি তিনি পাঠালেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি তা সনাক্ত করলেন হয় মানুষ নতুবা কোনও অজ্ঞাত নরোপম বনমানুষের উপর পাটির বাম দিকের তৃতীয় পেষক বলে এবং লিখলেন খুঁজলে কোনও আদি মানবের কঙ্কালও পাওয়া যেতে পারে।

বেশ কয়েক বছর পর ১৯২১ সালে এই সন্ধান শুরু হল অ্যানডারসনের তত্ত্বাবধানে, পিকিঙের ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে জোকোডিয়েন গ্রামের কাছে। তিনি তখন চৈনিক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগে কাজ নিয়েছেন। মুরগী হাড়ের পাহাড় নামে এক টিলার অদূরে খনন চলছে, এমন সময়ে কর্মীদের আলাপ আলোচনা শুনে অ্যানডারসন বুঝলেন যে গ্রামের উলটো দিকে ড্র্যাগন হাড়ের পাহাড়ে না খুঁড়ে এখানে কাজ হচ্ছে দেখে তারা অবাক। জানা গেল এক পরিত্যক্ত চুনাপাথরের খনির পাশে সেই ক্ষেত্রটি ফসিল-সমৃদ্ধ। সেখানে কাজ আরম্ভ করে তিনি অবিলম্বে পুরস্কার পেলেন খণ্ড খণ্ড স্ফটিক (quartz), চুনাপাথরের সঙ্গে এই শিলা পাওয়া যায় না, সুতরাং অ্যানডারসন বুঝলেন যে সম্ভবত কোনও হাতিয়ারশিল্পী তাদের এনেছে সেখানে। কিন্তু ফসিল চাই—বহু জন্তুর হাড় উদ্ধার হল, তার মধ্যে কয়েকটি স্তন্যপায়ী এখন চীনে বিলুপ্ত এবং শেষ পর্যন্ত এক সহকারী আবার একটি মাত্র পেষক দাঁত পেলেন, কিন্তু অনুমান হল তা বনমানুষের। হতাশার বশে কাজ বন্ধ হয়েছে, অবশেষে ১৯২৬ সালে সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় মনে হল ওটি এবং পরবর্তী আবিষ্কার আর একটি দাঁত আসলে মানবিক। অ্যানডারসন দাঁতগুলি দিলেন ডাক্তার ব্ল্যাকের হাতে।

তিনি পিকিঙে এসেছেন এক নতুন ডাক্তারী কলেজে শারীরস্থান বিভাগ গড়ে তুলতে, অবশ্য প্রধান আকর্ষণ চীনে ফসিল শিকারের সুযোগ মিলবে এই আশা। কিন্তু কাজের চাপে এ দিকে মন দিতে পারছেন না, ছাত্রদের জন্য মানুষের শব যোগাড় করা এক সমস্যা, কারণ সে দেশে কেউ মৃতের দেহ কাটা ছেঁড়া করতে দিতে রাজী নয়। অগত্যা অধ্যাপক আবেদন জানালেন স্থানীয় এক বন্দীশালার কর্তাকে, তিনি অবিলম্বে তিন মৃত্যুদাণ্ডিতের মুণ্ড-হীন ধড় পাঠালেন। ব্ল্যাক জানালেন অখণ্ড দেহ চাই, এ বার এল এক দল জীবন্ত বন্দী, সঙ্গে চিঠি, "আপনার যে ভাবে খুশি এদের হত্যা করুন।"

অ্যানডারসনের প্রেরিত দাঁতগুলি পেয়ে ব্ল্যাকের চেষ্টায় রকেফেলার গবেষণা তহবিলের সাহায্যে এক আন্তর্জাতিক দল ব্যাপক খনন আরম্ভ করল, কর্তা চৈনিক ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. লি; ঐ দেশেরই পুরাজীববিৎ ডবলিউ. সি. পেই পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনিও ছিলেন দলে। ১৯২৭ সালে ১৬ অকটোবর আরও একটি সুসম্পূর্ণ দাঁত (নিচের পাটির পেষক) আবিষ্কারের পর ব্ল্যাক এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এক আদি মানবের আবিষ্কার ঘোষণা করলেন—নাম সিনান্‌থ্রপাস পেকিনেন্‌সিস, অর্থাৎ পিকিংবাসী চীন মানব। ফসিল সম্পদ সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপক পৃথিবী পর্যটনে বার হলেন, ছোট্ট একটি কৌটো তাঁর ঘড়ির শিকলের সঙ্গে বাঁধা, নবলব্ধ দাঁতটি আছে তার মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই শুধু কয়েকটি দাঁতের নজিরে এই নব-মানবকে মানতে রাজী হলেন না। কিন্তু এই অভাব অবিলম্বে মিটল, ১৯২৮ সালে পিকিঙে ফিরে ব্ল্যাক দেখেন সহকর্মীরা গুহার থেকে এক চোয়ালের কয়েকটি খণ্ড উদ্ধার করেছেন, এবং পরের বছর পেই প্রথম খুলিটি আবিষ্কার করলেন। তৎক্ষণাৎ সযত্নে সেটা মুড়ে সাইকেলের ঝুড়িতে রেখে অতি সাবধানে ৪০ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে তিনি হাজির হলেন অধ্যাপকের গবেষণাগারে। শুধু দাঁতের বৈশিষ্ট্য থেকে নতুন জাতীয় মানুষ প্রস্তাব করার সমর্থন পাওয়া গেল খুলির পরীক্ষায়। মগজের মাপ দাঁড়াল প্রায় ১০০০ সিসি, অর্থাৎ জাভা মানবের চেয়ে বেশ কিছু বড়। পিকিং মানব অনেকটা স্পষ্ট মূর্তি নিল, জাভা মানবের সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখা গেল, এখন সেও হোমো ইরেকটাস বলে গণ্য।

পরবর্তী ১০ বছরে জোকোডিয়েনের কাজ আয়োজন উপকরণে এক বিরাট উদ্যোগ হয়ে দাঁড়াল। এক পাহাড়ের পাশটা সম্পূর্ণ চিরে উন্মুক্ত হল প্রায় ৫০ মিটার গভীর স্তর বিন্যাস। ১৯৩৭ সালের মধ্যে মিলল চল্লিশাধিক পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর অবশিষ্টাংশ, তার মধ্যে পাঁচটি খুলি, ন'টি খুলি খণ্ড, ছ'টি মৌখিক হাড়ের খণ্ড, চৌদ্দটি নিম্ন চোয়াল ও ১৫২ দাঁত। শিশুদের অস্থির বৃদ্ধি থেকে প্রজাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় বলে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান। কতগুলি ফাটানো খুলি থেকে খুন ও নর-খাদক বৃত্তি সম্বন্ধে যে জল্পনা হয়েছে তা আমরা পরে দেখব। সংযুক্ত কয়েকটি গুহার বৃহত্তমটির থেকে উদ্ধার হল লাখ খানেক পাথরের হাতিয়ার ও খণ্ড, তা ছাড়া ১০ স্তর ভিটে, তাতে স্পষ্ট আগুনের চিহ্ন। মানুষের ইতিহাসে আগুন ব্যবহারের প্রমাণ প্রথম এই সব গুহায় পাওয়া গেল পোড়া কাঠ ও তার ছাই থেকে, কোথাও কোথাও তা সাত মিটার গভীর, অর্থাৎ গুহাবাসীরা আগুন নিভতে দেয় নি। আরও এক নতুন আবিষ্কার জন্তুর হাড় এবং হরিণের শিং দিয়ে তৈরি অনেক হাতিয়ার।

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক ব্ল্যাক হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিতে জার্মেনির থেকে দু বছর পরে এলেন শারীরস্থানবিজ্ঞানী ফ্রান্‌ৎজ্ হ্বাইডেনরাইশ্‌। কিন্তু কয়েক ঋতু খননের পর প্রত্নসন্ধানীদের কোদালকে হটিয়ে দিল যোদ্ধাদের বন্দুক—জাপান তখন চীন জয় করতে চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গে গেরিলা সংগ্রামীদের হানাহানি শুরু হল সেই অঞ্চলে, তার পর দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল দ্বিতীয় মহাসমরের মেঘ। অগত্যা হ্বাইডেনরাইশ ঘরে বসে খুলির ছাঁচ বানালেন, বিভিন্ন অস্থির নিখুঁত ছবি আঁকলেন এবং তাদের বর্ণনা প্রকাশ করলেন পত্রিকায়। এই সময়ে যবদ্বীপ থেকে ফন কোএনিগসহ্বালডের নতুন আবিষ্কারের খবর এল, এবং ১৯৩৯ সালে তিনি পিকিঙে এলে পর জাভা মানব ও পিকিং মানব পরস্পর পরিচিত হল। মানুষ দুটির অস্থি পাশাপাশি সাজিয়ে দুই জার্মেনীয় বিজ্ঞানী সূক্ষ্ম তুলনা করলেন, প্রতিটি বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করে তাঁরা স্থির করলেন পিথেকানথ্রপাস ও সিনানথ্রপাস নিকট আত্মীয়। দুইয়েরই খুলির হাড় মোটা, ছোট ঢালু কপাল, ভ্রূ-অস্থি সম্মুখে অনেকটা প্রসারিত।

তা শুনে সুদূর হল্যানড থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ দুবোআ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, তাঁর মতে পিথেকানথ্রপাস সব আদি মানব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—কিন্তু তাঁর কথা তখন অরণ্যে রোদন।

যুদ্ধ শুধু অনুসন্ধান বন্ধ করে নি, আরও অপূরণীয় ক্ষতি করল। ১৯৪২ সালে যবদ্বীপ জয় করে জাপান ফন কোএনিগসহ্বালডের তথাকার ফসিলগুলি দাবি করাতে তিনি কিছু তাদের দিলেন, আবার বুদ্ধি করে দিলেন ছাঁচে তৈরি প্যারিস প্লাসটারের প্রতিকৃতি, জাপানীরা এই জালিয়াতি ধরতে পারল না। খাঁটিগুলি রইল দুই বন্ধুর কাছে, তাঁদের দেশ সুইৎসার্ল্যানড ও সুইডেন, দুইই যুদ্ধে নিরপক্ষ। ফন কোএনিগসহ্বালড নিজে বন্দী হলেন যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত, পরে একটি ছাড়া সবগুলি ফসিলই সহজে পুনরুদ্ধার হল, রক্ষকদের এক জন দাঁতগুলি দুধের বোতলে ভরে অন্ধকারে বাগানে পুঁতে রেখেছিলেন। হারানো খুলিটি আসলে সখের বিজ্ঞানী জাপান সম্রাট জন্ম দিনে উপহার পেয়েছিলেন, যুদ্ধের পর সেটি সম্বন্ধে ফন কোএনিগসহ্বালড রচিত এক বিজ্ঞপ্তি পৌঁছাল জাপানে এক তরুণ নৃবিজ্ঞানীর হাতে, নাম লেফ্‌টেনান্‌ট ফেআরসার্ভিস। তিনি তখন জাপানে সামরিক প্রশাসনে কাজ করছিলেন, অবিলম্বে সম্রাটের গার্হস্থ্য সংগ্রহশালা থেকে খুলিটি উদ্ধার করলেন। পরে ফন কোএনিগসহ্বালড যখন নিউ ইয়র্কে, হঠাৎ এক দিন দেখেন ঘরে ঢুকে নমস্কার জানিয়ে লুপ্ত সম্পদ হাতে তুলে দিচ্ছে এক অপরিচিত যুবক।

পিকিং মানবের কপাল এত ভাল ছিল না। ১৯৪১ সালে জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, জাপানী ফৌজ পিকিঙে পৌঁছাবার আগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৈঠক বসল ফসিলগুলি নিরাপদ স্থানে সরানো উচিত কিনা তা নিয়ে। আইনত সেগুলি চীনের সম্পত্তি, সুতরাং অনেকে বললেন সে দেশেই কোথাও তাদের লুকিয়ে রাখতে, শেষ পর্যন্ত চৈনিক বিজ্ঞানীরাই অস্থিগুলি আমেরিকায় পাঠানো স্থির করলেন। বাক্সবন্দী হয়ে তারা প্রথমে এল মার্কিন দূতাবাসে, সেখান থেকে ন' জন মার্কিন নৌসৈনিক বাক্সগুলি নিয়ে বন্দর-অভিমুখী স্বতন্ত্র ট্রেনে চড়ল, জাহাজেও উঠল। কিন্তু জাপানীদের তাড়া খেয়ে জাহাজটিকে শত্রুর অব্যবহার্য করতে তা স্থলে চড়িয়ে দেওয়া হল, নৌসেনারা বন্দী হয়ে ফিরে এল পিকিঙে—কিন্তু তখন থেকে ফসিলগুলি নিখোঁজ।

অসংখ্য অনুসন্ধানীর গোয়েন্দাগিরি এবং দেড় লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাদের পাত্তা পাওয়া যায় নি। জাপানীরা অবিলম্বে পিকিং ডাক্তারী কলেজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল, কয়েকটি পাথুরে হাতিয়ার ছাড়া কিছু পায় নি। ভাগ্যের কথা যে হ্বাইডেনরাইশ যথা কালে তাঁর নকলগুলি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিগুলি কিছুটা ক্ষতি পূরণ করেছে। তা ছাড়া ১৯৬৩ সালে জোকোডিয়েনের অনেকটা দক্ষিণে (পিকিঙের ৯৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে) লান্‌টিয়েন শহরে পেই ও জে. কে. উ একটি খুলি ও চোয়াল পান, তাদের গঠন ইরেকটাসের অন্যান্য ফসিলের তুলনায় প্রাচীন ধরনের। বয়সও জোকোডিয়েনে প্রাপ্ত অস্থির চেয়ে বেশী, পিলবিমের অনুমান পাঁচ লক্ষাধিক থেকে সাত লক্ষাধিক বছর হতে পারে তা।

১৯৬০ দশকে চীনের নতুন সাম্যবাদী সরকারের কাছে খবর পেঁছাল যে নিউ নিয়র্কের যাদুঘরে পিকিং মানবের লুপ্ত একটি খুলি আছে, তাঁরা অভিযোগ করলেন যে যুক্তরাষ্ট্র আসলে তা লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু পরে জানা গেল খুলিটি প্লাসটার-প্রতিকৃতি। ১৯৭১ সালে নিউ ইয়র্কের এক চিকিৎসক দাবি করলেন বাক্সগুলি সর্বশেষ তিনি দেখেছিলেন এবং নিজে বন্দী হওয়ার আগে চৈনিক বন্ধুদের বাড়িতে এবং গুদামে তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কোথায় তারা? ১৯৭৭ নভেমবরে পুরস্কারের ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রায় পাঁচ লাখ বছরের সমাধি থেকে উঠে মাত্র ২২ বছর দেখা দিয়ে অস্থিগুলি আবার কি করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সেই রহস্য নিয়ে জল্পনার অভাব হয় নি। হয়তো সৈনিকরা তাদের ধ্বংস করেছে, হয়তো ঘাট থেকে জাহাজ পর্যন্ত যেতে যেতে মাঝপথে খেয়া ডুবে যায়, হয়তো বা সেগুলি 'ড্রাগনাস্থির' ব্যাপারীদের হাতে পেঁছেছে এবং যথারীতি ওষুধে পরিণত হয়েছে (এমনি কত অমূল্য ফসিল যে মানুষের পেটে ঢুকে পঞ্চভূতে মিলিয়েছে কে জানে)। হ্বাইডেন-রাইশ তাঁর বাকি জীবনটা যুক্তরাষ্ট্রে জোকোডিয়েনের ফসিল সম্ভার সংক্রান্ত অধ্যয়ন আলোচনায় ব্যয় করেছেন, প্রতিকৃতিগুলি ছাড়াও তাঁর নানা গ্রন্থে প্রকাশিত বর্ণনা, হাতে আঁকা ছবি ও আলোকচিত্রের মাধ্যমেই পিকিং মানব আজ প্রায় সর্বাংশে মূর্ত। যে যুদ্ধ তাঁকে প্রথমে এই কাজে মন দিতে বাধ্য করেছে

সেই যুদ্ধই আদি অকৃত্রিম ফসিলগুলি হরণ করেছিল—এই দার্শনিক ভাবনা দিয়ে পিকিং মানবের অস্থি সম্পদের ইতিহাস শেষ করা যেতে পারে।

হোমো ইরেকটাস কেবল এশিয়ার পূব প্রান্তে আবদ্ধ ছিল না, য়োরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেও সে বিচরণ করেছে (অত প্রাচীন কালে আমেরিকা ও অসট্রেলিয়ায় মানুষের পা পড়ে নি), বস্তুত নতুন আবিষ্কারের নির্দেশ অনুসারে এশিয়ায় এদের আবির্ভাব হয়েছে পরে। য়োরোপের প্রথমে ফসিলটি যখন পাওয়া গেল তখনও পিকিং মানবের আবিষ্কার হতে বিশ বছর বাকি। অবশ্য এশীয় ভাইদের মত সে কালে তারও অন্য নাম ছিল। জার্মেনির হাইডেলবার্গ মহানগরের কাছে ছোট গ্রাম মাউএর, তারিখ ২১ অকটোবর ১৯০৭, সেখানে এক ব্যবসায়ীর বালিকূপে দু জন কর্মী মাটির প্রায় ১২ মিটার নিচে খুঁড়ে চলেছে, হঠাৎ এক জনের কোদালে ঘা খেয়ে একটি মস্ত নিম্ন চোয়াল বিভক্ত হয়ে গেল। ইতিপূর্বে সেখানে কয়েকটি ফসিল দেখা দিয়েছে এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানীদের অনুরোধ অনুসারে ওটো শোএটেন্‌জাককে খবর পাঠানো হল। দৌড়ে এসে তিনি দেখলেন অস্থিটি এত মোটা ও চওড়া যে সঙ্গে দাঁত না থাকলে তাকে কোনও বড় বনমানুষের চোয়াল বলে ভুল হত। কিন্তু দাঁত নিঃসন্দেহে মানবিক, আয়তনে আমাদের দাঁতের চেয়ে সামান্য বড় হলেও যে সব বৈশিষ্ট্য বনমানুষ ও আধুনিক মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে তার সবই বর্তমান, যথা ছোট ছেদক ও পেষক (আবিষ্কারের সময়ে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে দন্তপাটি সম্পূর্ণ, কিন্তু পরে দেখা গেল বাঁ দিকের কয়েকটি দাঁত নেই, সেগুলি নাকি কোদালের আঘাতে হারিয়েছে)। চোয়ালের ভিতর দিকের যে অংশ জিভের পেশীর সঙ্গে যুক্ত তা পরীক্ষা করে অধ্যাপক শোএটেনজাকের মনে হল সম্ভবত এই মুখে প্রথম কথা ফুটেছিল।

শুধু একটি চোয়াল ও দাঁত থেকে মানুষটির চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিল, পরীক্ষা করে কেউ কেউ বললেন সে আদি নেআনডার্টাল, অর্থাৎ সাধারণ নেআনডার্টাল মানবের তুলনায় তার মধ্যে বনমানুষের ছাপ বেশী। কেউ পেলিয়োআনথ্রপাস

('পুরামানব') নামে এক নতুন গণ সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু বহু বছর সে শোএটেনজাক প্রদত্ত নতুন প্রজাতি হোমো হাইডেলবার্গেন্‌সিস নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে অধিকাংশের বিশ্বাস সে হোমো ইরেকটাসের য়োরোপীয় সংস্করণ।

এখানে হাইডেলবার্গ মানব ও পূর্বোলিখিত মেগানথ্রপাসের মধ্যে কিছু অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। ফন কোএনিগসহবালড দ্বিতীয়টিরও শুধু প্রকাণ্ড চোয়াল বা সংলগ্ন দাঁত পেয়েছিলেন যবদ্বীপে, যেখানে জাভা মানবের ফসিল উদ্ধার করেছিলেন তার অদূরে, এবং একই যুক্তি দিয়ে বলেন মের্গেনথ্রপাসের প্রাথমিক বাক্‌শক্তি ছিল। এবং দুইয়ের কপালে অবিলম্বে নতুন বৈজ্ঞানিক নামের টিকিট লাগানো হল। অসট্রেলোপিথেকাস ফসিল প্রসঙ্গে আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক গণ বা প্রজাতি সৃষ্টির অদম্য উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করেছি, সাম্প্রতিক নমুনা জোহানসনের অসট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস। হোমো ইরেকটাসের ক্ষেত্রেও প্রতি বার এই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। মেগানথ্রপাস সম্বন্ধেও অনেকের মনে হয়েছিল এই নতুন নামকরণ যুক্তিরহিত, এবং বংশতরুতে তার স্থান এখনও অনির্দিষ্ট। পিলবিম আপাতত তাকে ইরেকটাস দলে রেখেছেন, ল গ্রো ক্লার্ক বলেছেন সে বড় জাতের ইরেকটাস, লুই লীকির মতে আধুনিক মানুষমুখী অভিব্যক্তির সে আর এক নিষ্ফল পরীক্ষা এবং সম্প্রতি ফন কোএনিগসহবালড তাকে অসট্রালোপিথেকাসের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করেছেন। বিভ্রান্তিজনক অবস্থার কারণ চোয়ালটি প্রধানত মানবিক হলেও তা অতিকায় এবং দাঁতে হোমো ইরেকটাস ও অসট্রালোপিথেকাস দুইয়েরই সঙ্গে মিল আছে।

যবদ্বীপ ও ফন কোএনিগসহবালড প্রসঙ্গে চরম ভাগাভাগির আরও নমুনা দেওয়া যেতে পারে, দুবোআ তাঁর জাভা মানবের নাম দিয়েছিলেন পিথেকানথ্রপাস ইরেকটাস, ফন কোএনিগসহবালড নিজের ফসিলগুলির জন্য এই গণের আরও দুটি প্রজাতি বানালেন। এখন জানা গিয়েছে একটির বেলায় শুধু বয়সজাত পার্থক্য বিভ্রম ঘটিয়েছে—অস্থিগুলি এক শিশুর।

এই চুলচেরা ভাগাভাগির রীতি এখনও চলছে, নতুন প্রজাতি এমন কি গণ সৃষ্টির লোভ পণ্ডিতরা অনেকে যে সামলাতে পারেন না তার কারণ

অবশ্য নিজের আবিষ্কারের প্রতি স্বাভাবিক নেকনজর এবং বৈজ্ঞানিক জগতে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা; কখনও কখনও প্রাণীর ল্যাটিন নামের সঙ্গে নিজের পদবিটি জুড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু এক একটি হাড় থেকে এক একটি প্রাণী তৈরি মাঝে মাঝে অতি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। আমেরিকা মহাদেশে প্রাথমিক পুরামানব পাওয়া যায় নি, এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ সেই ক্ষতি পূরণ করতে প্লায়োসিন অধিযুগীয় দাঁতের সামান্য নজির থেকে বানালেন প্রাচীন মানুষ হেস্‌পেরোপিথেকাস, এবং কিছু খণ্ডিত হাড় পেয়ে বললেন তারা হাতিয়ার বানিয়েছে। পরে দেখা গেল প্রাণীটি এক জাতের শুয়োর। স্বাদেশিকতার কি শোচনীয় পুরস্কার!

ভাগদারদের বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাবিরল যোগদাররা আছেন যাঁরা ন্যায়সংগত প্রভেদও মানতে চান না। অবশ্য প্রজাতি বিভাগের পক্ষে কোন বা কতটা প্রভেদ যুক্তিসম্মত ও গ্রহণীয় তার নির্ধারণ যে সহজ নয় সেই আলোচনা আগে হয়েছে। কিন্তু ফসিলের অভাব জল্পনা কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নতুন বৈজ্ঞানিক আখ্যা না বানিয়ে আরও অস্থি ও তথ্য সংগ্রহ পর্যন্ত সবুর করলে অস্পষ্টতা ও তজ্জনিত তর্কাতর্কি কমে। তত দিন পর্যন্ত ডাক নামই চলতে পারে, যেমন জাভা মানব বা হাইডেলবার্গ মানব।

যাই হক, যে শিলা স্তরে হাইডেলবার্গ মানবের ফসিলটি পাওয়া গিয়েছে তাতে কিছু কিছু লুপ্ত পশুর হাড়ও ছিল। জানা আছে তারা পৃথিবীতে ছিল প্রায় পাঁচ লাখ বছর আগে, সুতরাং হাইডেলবার্গ মানবেরও বয়স তাই। প্রথম-প্রাপ্ত হোমো ইরেকটাস জাভা মানবেরও একই বয়স অনুমান করা হয়েছিল। অর্থাৎ দুবোআ সাত সমুদ্র পেরিয়ে যাকে আবিষ্কায় করলেন সে তাঁর ঘরের দুয়ারেই ছিল। য়োরোপে শীত প্রবল বলে তাঁর নজর ছিল উষ্ণ দেশের দিকে, হাইডেলবার্গ মানব প্রথম সাক্ষী যে শীত অগ্রাহ্য করে অত উত্তরে মানুষ ছড়িয়েছে। এর আরও প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে।

ভূমধ্য সাগর উপকূলে ফরাসী রিভিয়েরা ধনীদের বিলাস ভূমি, সেখানে নিস শহরের তের্‌রা আমাতা অঞ্চলে গগনস্পর্শী গৃহ তৈরি হবে বলে ১৯৬৫ সালে মাটি খোঁড়া আরম্ভ হয়েছে (আগে নাম ছিল তের্‌রা মাতা অর্থাৎ

মরা জমি, অধিবাসীরা আপত্তি করায় একটি অক্ষর যোগ করে বিশেষণটির অর্থ দাঁড়াল প্রিয়)। পথচারী দর্শকদের মধ্যে এক তরুণ ব্যক্তি নিবিষ্ট চোখে চেয়ে আছেন, একটি বুলডোজার যখন মাত্র মিটার খানেক মাটি সরিয়েছে, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে সেই দানবিক যন্ত্রটিকে থামতে বললেন। মানুষটি সরকারী প্রত্নবিৎ অঁরি দ লুম্‌লে, তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সদ্য-উনমোচিত মাটিতে চক চক করে উঠেছে কয়েক টুকরো পাথর। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝলেন সেগুলি স্বাভাবিক শিলা খণ্ড নয়, কারও হাতে রূপায়িত।

ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী তখন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আঁদ্রে মাল্‌রো, তাঁর কাছে দরবার করে কিছু দিনের জন্য খানিকটা জায়গায় গৃহনির্মাতাদের খনন বন্ধ করে দেওয়া হল, ১৯৬৬ সালের প্রথমে অনুসন্ধানীদের শাবল কোদাল সাবধানে মাটি সরাতে লেগে গেল। দ লুমলের ডাকে বহু স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এলেন, ছ মাসের মধ্যে তাঁরা মাটির নিচে প্রায় ১৫ মিটার খুঁড়ে এসে পেঁছালেন মানুষের চিহ্ন সম্বলিত এক প্রাচীন সাগর সৈকতে। আরও আড়াই মিটার গভীরে পেঁাছে একের পর এক একুশটি স্তরে পাওয়া গেল প্রায় ৩৫,০০০ নানা জাতীয় সাক্ষী। এগুলি জমেছে কয়েক লাখ বছরে—হাতিয়ার, একেবারে প্রাথমিক বাসা, পোড়া কাঠের ছাই, এমন কি কার যেন একটি পায়ের ছাপ। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, মানুষগুলির একটি অস্থিও না। প্রায় চার লক্ষ বছরের আড়ালে তারা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে থাকলেও আমরা পরে দেখব যে বর্জিত বস্তু থেকে তাদের অনেকটা জানা যায় এবং খুব সম্ভবত তারাও হোমো ইরেকটাস।

পরে দ লুমলে যখন মার্সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তখন তিনি ও তাঁর পুরাবিজ্ঞানী পত্নী মারী-আঁতোআনেৎ এই রিভিয়েরা অঞ্চলেই এক গুহা থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বছর প্রাচীন মানব বা মানবোপম প্রাণীর বসবাসের চিহ্ন উদ্ধার করেছেন। কিন্তু সাগর উপকূলে এক ছোট শহরের কাছে পাহাড়ের গায়ে গাছপালায় ঢাকা এই গুহাটির প্রথম সন্ধান দিয়েছিল এক বালিকা, তার সখ ছিল বিচিত্র পাথর জমানো, চকচকে নমুনার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়ে সে। পুরামানবের কাহিনী অনুসরণ করতে নাবালকদের অনুরূপ আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত আমরা পরে আরও পাব। তার পর কয়েক

বছর ধরে এই গহবরে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় পাঁচ মিটার খনন করে দ লুমলে দম্পতি উদঘাটন করেছেন চকমকি পাথর, হাড় এমন কি হরিণের শিং চোখা করে তৈরি হাতিয়ার এবং নুড়ি থেকে গড়া কাটারি—আদিতম যন্ত্র শিল্পের অন্যতম নুড়ি-হাতিয়ারের প্রাচীনতম য়োরোপীয় নিদর্শন সেগুলি। বস্তুত সেই মহাদেশে সে যাবৎ সবচেয়ে প্রাচীন যে যন্ত্রাবলী পাওয়া গিয়েছিল চেকো-স্লোভাকিয়ার স্ট্রান্‌স্‌কা স্কালা গুহায় তারও বয়স মাত্র সাত লক্ষ বছর।

দ লুমলেরা সাধনীর সঙ্গে আরও পেলেন নানা জন্তুর দাঁত ও হাড়, যথা হাতি সিংহ ভালুক চিতা হায়না নেকড়ে সজারু হরিণ বলগা হরিণ গণ্ডার জলহস্তী এমন কি জলচর প্রাণী সীল ও তিমির। জন্তুদের দাঁত ও চোয়াল পরীক্ষা করে মনে হয় তারা বুড়ো হয়ে পড়েছিল, অধ্যাপক বলেন গুহাবাসীরা এদের মৃত অবস্থায় পেয়েছে অথবা দুর্বল বলেই মারতে পেরেছে, সীল ও তিমি ঢেউয়ের সঙ্গে স্থলে এসে পড়েছে, আসলে তারা শিকার-দক্ষ ছিল না। পশুর দেহাংশ তারা নিজেদের ডেরায় এনেছে মাংস খেতে, কিন্তু এখানেও এই খাদকদের কোনও ফসিল পাওয়া যায় নি। এমন কি তের্‌রা আমাতার মত আগুন অথবা মাংস সেঁকারও কোনও চিহ্ন নেই। গুহায় সম্ভবত একই কালে পাঁচ ছ জন বাস করত, তারা পশুর হাড়গুলি দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়েছে, অস্ত্রাদি ছিল মেঝের মধ্য স্থলে, ক্ষুদ্র কক্ষটি নিশ্চয় সর্বদা আবর্জনার দুর্গন্ধে ভরপুর থাকত। এই গুহাবাসীদের বংশপরিচয় নিয়ে স্বভাবতই জল্পনার অভাব হয় নি। অন্তিম কালের অসট্রালোপিথেকাস কি এখানে এসে ঘাঁটি বানিয়েছিল? কিন্তু তাদের আফ্রিকী জাতভাইদের সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার সঙ্গে হাতিয়ার ও বৃহৎ পশুর সাক্ষ্য মেলে না। পক্ষান্তরে তের্‌রা আমাতার মতই তারা হোমো ইরেকটাস হয়ে থাকতে পারে, ১০ লক্ষ বছর আগে হয়তো আগুনের ব্যবহার জানা ছিল না।

পাথর খনি কাটতে কাটতে অসট্রালোপিথেকাসের ফসিল প্রকাশ পেয়েছিল, নাগরিক উন্নতির কাজে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তের্‌রা আমাতায় ইরেকটাসের নানা চিহ্ন উদঘাটনও দেখেছি, অনুরূপ আকস্মিক আবিষ্কারের আর একটি দৃষ্টান্ত এসেছে পাশ্ববর্তী স্পেইন দেশ থেকে। রাজধানী ম্যাড্রিড শহরের

প্রাপ্ত কিছু কিছু হাবিলিস ফসিলে ক্রমশ ইরেকটাসের সঙ্গে সাদৃশ্য বাড়তে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় ওলডুভাইর দ্বিতীয় স্তরে একই সময়ে জিনজানথ্রপাস ও হাবিলিস ছাড়াও এই প্রাক্-ইরেকটাস বাস করেছে, ক্রমে তার বিকাশ হল যথার্থ ইরেকটাসে।

এইখানে একটি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কীর্তি উল্লেখযোগ্য। নিম্নতম স্তরের মাথার কাছে কার যেন শুধু পায়ের বুড়ো আঙুলের শেষ অস্থি খন্ডটি পাওয়া গেল, মনে হতে পারে এই সামান্য নজিরের তাৎপর্যও সামান্য, কিন্তু পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে বোঝা গিয়েছে যে ঐ অস্থি খন্ডের মালিক সোজা হয়ে লম্বা পা ফেলে হাঁটত এবং তখন তার দেহের ভার চালিত হত হুবহু হোমো সেপিয়েনসের মত। হয়তো সেও ইরেকটাস।

ওলডুভাইর তুলনায় কিনিয়ার তুর্কানা হ্রদে ১৯৭৫ অগাসটে রিচার্ড লীকির এক আবিষ্কার থেকে মনে হয় ইরেকটাসের আফ্রিকী সংস্করণ গড়ার কাজ আরও আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এ যাবৎ প্রাচীনতম এই খুলিটি মাটির নিচে প্রায় ভুরু পর্যন্ত গাঁথা ছিল, রিচার্ড ও তাঁর স্ত্রী কয়েক দিন ধরে অতি যত্নে মাটি সরিয়ে অস্ত্র চিকিৎসকের চিমটে দিয়ে ভঙ্গুর খন্ডগুলি একে একে উদ্ধার করলেন। হার্ভার্ডের এক বিশেষজ্ঞের সুদক্ষ হাত টুকরোগুলি জুড়ে প্রায় সম্পূর্ণ যে নরকপালটি পুনর্গঠন করল তার মেধার পরিমাণ ৯০০ সিসি এবং তা প্রায় পিকিং মানবের প্রতিমূর্তি। অথচ মানুষটি প্রায় ১৫ লাখ বছর প্রাচীন, অসট্রালোপিথেকাস বিদায় নিতে তখনও কয়েক লক্ষ বছর বাকি। এখানে স্মরণযোগ্য যে গত অধ্যায়ে আমরা তুর্কানা হ্রদের ধারে সমপ্রাচীন পদচিহ্ন প্রসঙ্গে জল্পনার উল্লেখ করেছি যে তা ইরেকটাসের হতে পারে। খুলিটি পিকিং মানবের অনুরূপ হলেও যে অনেক বেশী প্রাচীন সে সম্বন্ধে রিচার্ড বলেছেন সে কালে পিকিং মানবের বয়স নির্ধারণে হয়তো ভুল ছিল, আদি অস্থিগুলি হারিয়ে গিয়ে থাকলেও পরে চৈনিক প্রত্নবিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত ফসিলের উপর আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর সংশোধন হতে পারে। বস্তুত এক সাম্প্রতিক খবর অনুসারে পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতিতে কিছু প্রাচীন যবদ্বীপীয় ফসিলের বয়স বর্ধিত হয়েছে

পাঁচ লাখ থেকে ১৯ লাখ বছরে। তুর্কানার এই আবিষ্কারের পর এই প্রশ্ন ওঠে যে তা হলে কি আগুনের ব্যবহারও ১৫ লক্ষ বছর প্রাচীন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে দূর দূরান্তরের সমকালীন মানুষ যে একই কলা কৌশল জানবে, বিশেষ করে সেই দূর অতীতে, তা আশা করা যায় না। আজ যোগাযোগ অনেক বেশী সহজ, তবু বিভিন্ন সমাজে জ্ঞানে ও কুশলতায় কত বৈষম্য।

জাভা মানব আবিষ্কারের পরে অর্ধ শতাব্দীর বেশী কাল ধরে এই প্রজাতি শুধু এশিয়ার মানুষ বলে ধারণা ছিল এবং অনেকের বিশ্বাস ছিল এশিয়াই মানুষের জন্মভূমি। আজ তিন মহাদেশ থেকে হোমো ইরেকটাসের শতাধিক ফসিল উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে আছে খুলির উপরিভাগ, চোয়াল, কণ্ঠাস্থি, বাহু, হাতের কবজি, শ্রোণী ও উরুর হাড়। দূর দূরান্তরের এই সব বিক্ষিপ্ত সাক্ষীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্য অনেক বেশী এবং নৃবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ যে একই প্রজাতি মনুষ্য-অধিষ্ঠিত প্রাচীন জগতের পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উপলব্ধির সঙ্গে নানা স্বাভাবিক প্রশ্ন জড়িত—কোথায় তার উৎপত্তি এবং কোন দেশ থেকে কখন কোন দিকে তার পরিযাণ, কি তার পরিণতি ইত্যাদি।

আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে দেখে, ওলডুভাই থেকে পিকিং পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার, ভারত মহাসাগরের উপকূল ধরে গেলে যবদ্বীপ পর্যন্ত দূরত্বও অনুরূপ। তখন জল পার হওয়ার উপায় কিছু জানা ছিল না, এই মহাপরিযাণে সাগর নদীর পাশ কাটিয়ে শুধু দুটি পায়ের জোরে হোমো ইরেকটাসের দলগুলি হয়তো ১০ লক্ষ বছর ধরে অতি ধীরে দূরে দূরে ছড়িয়েছে। এ যুগের যাত্রীর মত লক্ষ্য স্থান কিছু ছিল না, সম্ভবত জলবায়ু, পানীয় জল, শিকার ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য, আস্তানার উপযুক্ত গুহা বা বন ইত্যাদি যে দিকে সহায় হয়েছে সেই দিকে এগিয়েছে তারা। নিশ্চয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে দলগুলি বংশ পরম্পরায় বাস করেছে, আবার অবস্থার বিপাকে যাযাবর বৃত্তি শুরু হয়েছে, দলের ভাগাভাগি হয়েছে বিভিন্ন দিকে। পথে শীত গ্রীষ্ম খরা ঝড় বৃষ্টি হিংস্র জন্তু ইত্যাদি নানা বিপদ আপদ

সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে টিকে থেকে যারা মহাদেশ থেকে মহাদেশে ছড়িয়েছে তারা নিশ্চয় অতীব সক্ষম সফল প্রজাতি। আগুন আবিষ্কার না করলে উত্তর চীন ও য়োরোপের শীতে নিশ্চয় তারা বাঁচত না।

প্লাইসটোসিনের তুষার যুগে উত্তরের দেশগুলি কয়েক বার বরফে ঢাকা পড়েছে, সেই সময়ে দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চলে হয়তো বৃষ্টিপাত অনেক বেড়েছে। মাঝে মাঝে বরফ সরে গিয়ে য়োরোপ ও এশিয়ার তাপ প্রায়ই চড়েছে বর্তমানের চেয়ে বেশী, তখন উষ্ণ দেশ দীর্ঘ কাল ধরে খরার প্রকোপ ভোগ করে থাকতে পারে। তুষার যুগে কখনও কখনও পৃথিবীর এত জল স্থলে বন্দী হয়ে থেকেছে যে সমুদ্র নেমে গিয়ে স্থানে স্থানে স্থলের সেতু দেখা দিয়েছে। যবদ্বীপের সঙ্গে কিছু কাল এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড যুক্ত ছিল। সিসিলির দু পাশে ভূমধ্য সাগর তলের মাটি মাথা তুলে য়োরোপ ও আফ্রিকা যুক্ত করেছে হয়তো। তেমনি যথেষ্ট বৃষ্টির ফলে উত্তর আফ্রিকার বর্তমান মরুভূমি তখন সম্ভবত হ্রদ ও শ্যামল তৃণভূমিতে বিকশিত হয়ে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। হোমো ইরেকটাসের জন্ম আফ্রিকায় না এশিয়ায়—কিংবা একাধিক ক্ষেত্রে—তা এখনও নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব, কারণ নতুন ফসিল দেখা দিয়ে ক্রমাগত প্রাচীনতমের দাবি খণ্ডন করছে। সুতরাং পুব না পশ্চিম থেকে প্রথম পরিযাণ শুরু হয়েছিল তাও অনিশ্চিত। ইরেকটাসের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতরা বিভিন্ন অনুমান করেছেন, যেমন এশিয়ার রামাপিথেকাস থেকে, আফ্রিকার কিনিয়াপিথেকাস থেকে (চিত্র ৮)।

দেশে মহাদেশে বিক্ষিপ্ত ঘাঁটিগুলির থেকে হোমো ইরেকটাসের চলাচলের পথ বেশ কয়েকটি নির্দেশ করা চলে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের বুকের উপর দিয়ে ইনদোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বন বনানী ও তৃণপ্রান্তর ক্ষেত্র, এই পথে কখনও পুবে কখনও পশ্চিম দিকে বিচরণ করেছে এই মানুষরা, সংখ্যা বৃদ্ধি হলে দল ভাগ হয়ে নতুন পথ খুঁজেছে। যবদ্বীপ থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপের উপর দিয়ে বংশ পরম্পরায় উত্তর দিকে এগিয়ে চীনে পৌঁছে কোনও গোষ্ঠীর যাত্রা শেষ হয়েছে, অবশ্য জোকোডিয়েন ও ল্যানটিয়েনের বাসিন্দারা পশ্চিম দিকে রাশিয়া ও তিব্বতের পথেও এসে থাকতে পারে, যদিও তার সম্ভাবনা কম।

আবার জাভা মানবের এক শাখা চীন পর্যন্ত না গিয়ে ভারতের ভিতর দিয়ে হিমালয়কে ডান পাশে রেখে পশ্চিম এশিয়ার লাটামনে অঞ্চলে পেঁছেছে হয়তো, তার পর সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে য়োরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকায়। ভারতের নানা স্থান থেকে অসংখ্য শিলা যন্ত্র লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পুরা-মানবের সাক্ষ্য দিচ্ছে (এ সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা হবে), ফসিলের অভাবে ইরেকটাসের স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও সম্ভবত এ দেশেও তার বাস ছিল।

অবশ্য এর বিপরীত গতিও সম্ভব। আফ্রিকার উত্তর বা পূব অঞ্চলের আদি ইরেকটাস তুর্কানা ওলডুভাই ইত্যাদি জায়গা থেকে বর্তমান সুএজ খালের স্থল পথ পার হয়ে ভূমধ্য সাগরের পূব উপকূল ধরে পশ্চিম এশিয়ায় পেঁছেছে, সেখান থেকে পশ্চিমে য়োরোপ পূবে এশিয়ার পথ খোলা। আবার উত্তর আফ্রিকা থেকে সিসিলির পথেও ইরেকটাস য়োরোপে পেঁছে থাকতে পারে। আবার পূবমুখী পরিব্রজন এবং এশিয়ায় আরব্ধ বিপরীত-গামী পরিযাণ একই কালে ঘটেছে হয়তো, কারণ কারও কারও মতে সম্ভবত আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি ক্ষেত্রেই ইরেকটাসের উৎপত্তি ঘটেছে, ভারতেও তা সম্ভব।

মানুষের জন্ম কোথায় তা নিয়ে সেই ডারুইনের সময় থেকে জল্পনা কল্পনা চলছে। তিনি যখন অনুমান করেছিলেন এই উৎপত্তির সূত্র পাওয়া যাবে আফ্রিকায়, তখন য়োরোপে নেআনডার্টাল মানব ছাড়া পুরামানবের আর কিছু কোথাও পাওয়া যায় নি। কিন্তু আফ্রিকা যে নরোপম বনমানুষ শিমপানজি ও গরিলার ক্ষেত্র তা জানা ছিল, এবং পূর্ব এশিয়াবাসী ওরাং ওটাং ও গিবনের তুলনায় মানুষের সঙ্গে তাদের অনেক নিকট সম্পর্ক। এ দিকে জাভা মানব আবিষ্কারের পর বহু দিন পর্যন্ত যখন অনেকের ধারণা ছিল যে প্রথম মানুষের ধাত্রী এশিয়া, তখন ভারতে রামাপিথেকাস ও ড্রায়োপিথেকাসের আবির্ভাব এই বিশ্বাসকে আরও সমর্থন করল।

এর পরে নতুন নতুন আবিষ্কারে এক বার এক, এক বার আর এক মহাদেশের দাবি দৃঢ়তর হল—অসট্রালোপিথেকাস, হাবিলিস ও প্রাচীনতর কিনিয়াপিথেকাস (রামাপিথেকাস) ডাকল আফ্রিকার দিকে, পিকিং মানব,

মেগানথ্রপাস ইত্যাদি এশিয়ার দিকে। আমরা দেখেছি মেগানথ্রপাস তার আবিষ্কর্তার মতে অসট্রালোপিথেকাস জাতীয়, তা ছাড়া পরে ঐ যবদ্বীপেই স্থানীয় অনুসন্ধানীরা গভীর খনন করে কিছু হোমোগণীয় ও প্রাচীনতর প্রাক্‌মানবের ফসিল ও দ্বীপের সর্বপ্রথম হাতিয়ার উদ্ধার করেছেন বলে শোনা গিয়েছে। বর্মার পনডনজিয়া ও অ্যামফিপিথেকাস থেকে যে বৃহৎ বনমানুষদের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে তা দেখা গিয়েছে গত এক অধ্যায়ে। ভারতে এ যাবৎ পুরামানবের অস্থি কিছু না পাওয়া গেলেও তাদের তৈরি হাতিয়ারের অভাব নেই। পক্ষান্তরে আফ্রিকার কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন ওলডুভাইতে, ফসিলের গঠন বৈষম্য পরীক্ষা করে মনে হয় যেন সেখানে মানুষ গড়ার কাজ চলছিল, লিটোলি ও তুর্কানার সাম্প্রতিক আবিষ্কারেরও তাই ইঙ্গিত। অবশ্য এই তর্কে ফসিলের প্রাচীনতা খুব স্পষ্ট নির্দেশক নয়, কারণ আদি আবিষ্কারগুলির বয়স কোথাও কোথাও সংশোধিত হয়েছে ও হচ্ছে, যেমন যবদ্বীপীয় ফসিলের বেলায়।

যাই হক, সব মিলিয়ে বর্তমানে আফ্রিকার দিকে পাল্লাটা ঝুঁকে আছে, যদিও এশিয়াপন্থীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। ফন কোএনিগসহ্বালডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আদিতম মানুষের আবির্ভাব এশিয়ায় এবং তাঁর নেকনজর ভারতের প্রতি। যুক্তি এই যে রামাপিথেকাসের ধাত্রী এই দেশ থেকে পুবে যবদ্বীপে ও পশ্চিমে ওলডুভাইর দূরত্ব প্রায় সমান, ভারত মহাসাগরের দুই প্রান্তে অনুরূপ সাক্ষ্য লক্ষ্য করলে মধ্যবর্তী এই দেশে মানুষের জন্ম সম্ভব বলেই মনে হয়। আমরা উপরে দেখেছি এখন অনেকের মতে এই সৃষ্টি একাধিক ক্ষেত্রেও ঘটে থাকতে পারে—হয়তো এক দিন স্পষ্টতর নজির থেকে এই মীমাংসাই প্রতিষ্ঠিত হবে।

হোমো ইরেকটাসের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও সে যে আমাদের সাক্ষাৎ জনক যে বিষয়ে প্রায় কারও সন্দেহ নেই। শুধু এক লুই লীকি বলতেন সে ও হোমো সেপিয়েনস নিঃসম্পর্ক, ইরেকটাসের শাখাটি নেআনডার্টাল মানুষ পর্যন্ত এসে লোপ পেল। আমরা পরে দেখব নেআনডার্টাল মানবও যে একদা লোপ পেয়েছে এককালীন এই সাধারণ ধারণাও বদলেছে এবং সে হয়তো আমাদের মধ্যেই আছে।

হোমো ইরেকটাসের আকৃতি প্রকৃতি কেমন ছিল, কি ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবন রীতি সে বিষয়ে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, এমন কি যেখানে ফসিলের সম্পূর্ণ অভাব সেখান থেকেও। যদিও তাদের হাড় বর্তমান মানুষের চেয়ে কিছু মোটা ও ভারী ছিল, সুতরাং তাদের চালাতে মোটা মাংসপেশী দরকার হত, ঘাড়ের নিচ থেকে সারা দেহে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য ধরা কঠিন। কিন্তু মুখে বনমানুষের ছাপ স্পষ্ট, খুলির থেকে যে মূর্তিটা অনুমান হয় তাতে চওড়া চ্যাপটা নাক, উঁচু জংলী ভ্রূর নিচে চোখ কোটরে ঢুকেছে, তার উপরে মাথা এত ঢালু ও নিচু যে কপাল নেই বললেই হয়। চোয়াল বড় এবং ভারী, দাঁত বড়, চিবুক সামান্য। সুতরাং সব নিয়ে চেহারা খুব সুদর্শন নয়, কিন্তু শুধু বৃহৎ ভ্রূ-অস্থি ছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি অসট্রালোপিথেকাস বা হাবিলিসের চেয়ে কম উচ্চারিত। তবে কয়েক লক্ষ বছরব্যাপী অভিব্যক্তিতে মূর্তিটি ক্রমশ 'মানুষের মত' হল, মগজ বৃদ্ধির সঙ্গে মাথার আকৃতি বদলে কপাল ফুটল কিছুটা, আগুনে ঝলসানো মাংস কাঁচা মাংসের চেয়ে চিবাতে হয় কম, তাই চোয়াল দাঁত ছোট হল, মুখাগ্র আগের মত অগ্রসর রইল না।

এই মেধা বৃদ্ধি মনুষ্যত্বের পথে হোমো ইরেকটাসের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। অসট্রালোপিথেকাসের মেধার মাপ ৬০০ সিসির উপরে যায় নি, হাবিলিসের ৭০০ সিসির নিচে, কিন্তু আমরা দেখেছি ডেভিডসন ব্ল্যাকের দলের উদঘাটিত পিকিং মানবের প্রথম খুলিটির এবং ওলডুভাই ইরেকটাসের একটির মস্তিষ্কাধার প্রায় ১০০০ সিসি। তা পরবর্তী ও উন্নততর প্রজাতি হোমো সেপিয়েনস বা খাঁটি মানুষের মগজের নিম্নতম সীমার ঊর্ধ্বে, অসট্রেলীয় আদিবাসী বা আফ্রিকার বুশম্যান সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী। কিন্তু এ যাবৎ ইরেকটাসের যে বেশ কিছু খুলি উদ্ধার হয়েছে তাদের থেকে মস্তিষ্কের গড় আয়তন দাঁড়ায় ৮০০ সিসির কাছাকাছি, তা হোমো সেপিয়েনসের গড় মাপের চেয়ে প্রায় ৬০০ সিসি কম এবং এই খাঁটি মানুষের ঊর্ধ্ব সীমা প্রায় ২০০০ সিসি পর্যন্ত উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পূর্ব য়োরোপে হাংগেরি দেশে প্রাপ্ত ভের্তশ্‌সোল্‌লোশ নামক জায়গায় প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ বছর প্রাচীন একটি খুলির খণ্ড, যাতে মগজের

মাপ ১৪০০ সিসি, তা মেলে খাঁটি মানুষের গড় মাপের সঙ্গে, যদিও বয়স তার পক্ষে বেশী। দাঁত ও খুলির আকার আকৃতিতে ইরেকটাস ও সেপিয়েনস দুইয়েরই আভাস আছে, বিশেষজ্ঞরা কেউ এ দিকে কেউ ও দিকে ঝোঁকেন; যেমন আমরা প্রাক্-ইরেকটাস ফসিল লক্ষ্য করেছি, তেমনি হয়তো ভের্তেশ-সোললোশ মানবকেও আদি সেপিয়েনস বা প্রাক্-সেপিয়েনস বলা যায়। সেপিয়েনস-সদৃশ অতিপ্রাচীন আরও কিছু মানুষের সঙ্গে এরও পূর্ণতর আলোচনা হবে খাঁটি মানুষের অধ্যায়ে।

বুদ্ধির বিচারে মস্তিষ্কের আয়তনই সব নয়, অন্যান্য গুণেরও যে তাৎপর্য আছে তা আমরা পরে দেখব। এ কালের য়োরোপীয়দের মধ্যেও এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখা গিয়েছে যার মস্তিকের মাপ মাত্র ৮৭৫ সিসি, এবং মাত্র ১০০০ সিসি মেধার অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁস। ইরেকটাস মস্তিষ্কে ক্রমশ কিছু অগ্রগতি হলেও সব মিলিয়ে বর্তমান জগতের তথাকথিত অসভ্যদের চেয়েও তার মেধা নিকৃষ্ট ছিল এমন অনুমানই স্বাভাবিক। শিমপানজি থেকে বর্তমান মানুষের পথে মগজ বড় এবং মুখমণ্ডল ছোট হয়েছে, এই দুই বিষয়ে ইরেকটাসের স্থান প্রায় মাঝামাঝি। তার উন্নত মস্তিষ্ক কি কাজে লেগেছে তা ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

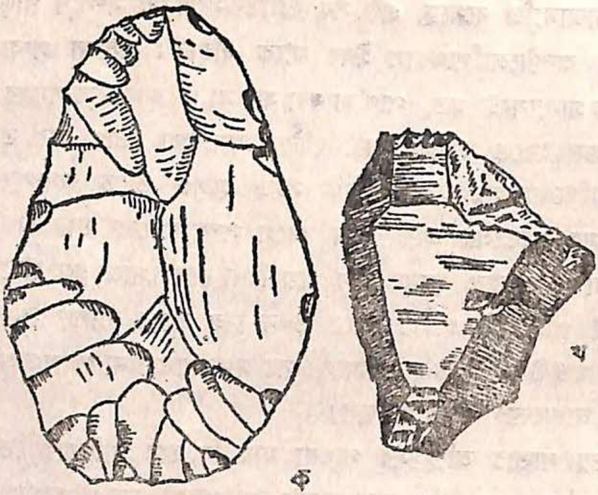
হোমো ইরেকটাস গায়ে পায়েও অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস এবং হাবিলিসের চেয়ে বড়সড় ছিল। দুবোআর প্রাপ্ত উরু-অস্থি একেবারে সোজা এবং একালীন মানুষেরই মত, তার থেকে তিনি বলেন পিথেকানথ্রপাস আমাদের মত খাড়া হয়ে হাঁটত, এবং ব্যক্তিটির ওজন ও দৈর্ঘ্য অনুমান করেন ৭০ কিলোগ্র্যাম ও এক মিটার ৭০ সেনটিমিটারের কাছাকাছি। পরে ইরেকটাসের অন্যান্য ফসিলের পরীক্ষা থেকে ক্লার্ক হাওএল বলেন মেয়েরা হয়তো ছিল দেড় মিটারের সামান্য কম, পুরুষরা দেড় মিটারের অল্প বেশী।

অসট্রালোপিথেকাসের পায়ের হাড় ও শ্রোণীচক্রের গঠন থেকে অনেকের অনুমান দৌড়ে দক্ষ হলেও তার চলনটা আমাদের চোখে ঠিক স্বাভাবিক ঠেকবে না, হংসগমনে হেলে দুলে চলত সে। কিন্তু এ বিষয়ে ইরেকটাস আধুনিক মানুষের কাছাকাছি পেঁছেছে। শ্রোণীচক্র আরও গোলাকার হওয়াতে উরুর হাড়ের সঙ্গে যোগ পিছনে সরেছে, তা ছাড়া মাথাও পিছনে হেলে মেরুদণ্ডের

উপর সোজাসুজি বসেছে, এই সব উন্নতির ফলে দেহ সম্পূর্ণ খাড়া হল, তার তুলনায় অসট্রালোপিথেকাস ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়াত। সোজা লম্বা পা দুটি আধুনিক মানুষেরই মত, পার্থক্য ধরা যায় না। বনমানুষ পায়ের পাতা দিয়ে জড়িয়ে ডাল ধরতে সুবিধা পায়, হাঁটতে অসুবিধা ভোগ করে, তার তুলনায় অসট্রালোপিথেকাসের হাঁটা অনেক সহজ হলেও তাতে অসম্পূর্ণতা ছিল, ইরেকটাসের পদতলের অস্থি গঠন বদলে সম্পূর্ণ দেহ ভার তার উপর রাখা সম্ভব হল। সুতরাং অনেক ক্ষণ ধরে বিনা কষ্টে সোজা হয়ে হাঁটা প্রথম দেখা গেল এই প্রাইমেটে, হাঁটার সময়ে তখন দেহ দুলত পাশাপাশি নয়, বর্তমান মানুষের মত উপরে নিচে। কঙ্কালের সব অংশ পাওয়া না গেলেও অনুমান করা হয় তাও আমাদেরই অনুরূপ ছিল।

হাতের পাতার অস্থি সব পাওয়া যায় নি, তবে হাতিয়ার তৈরির দক্ষতা দেখে মনে হয় হাত দিয়ে ধরার ধরনটা আমাদেরই মত। অর্থাৎ যে কোনও প্রাইমেটের মত ডাল বা অন্য কিছু আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরা ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলির বিপরীত ব্যবহার প্রথম সম্ভব হল যাতে তা দিয়ে দু দিক থেকে চেপে কিছু ধরা যায়, যেমন কলম ধরি আমরা। হাবিলিসও হাতিয়ার বানিয়েছে, কিন্তু তাদের বুড়ো আঙুল ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অন্যান্য আঙুল মোটা, ইরেকটাসের দক্ষতর কাজ দেখে বোঝা যায় আধুনিক মানুষেরই মত তার বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘতর ও তার নড়াচড়া সহজতর ছিল এবং বাকিগুলি ছিল পূর্ববর্তীদের চেয়ে সরু ও সোজা।

জোকোডিয়েনের বৃহত্তম গুহায় যে এক লাখ খণ্ডিত পাথর পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই স্ফটিক কিংবা চার্ট (chert), যদিও সে অঞ্চলে চুনাপাথর ছাড়া আর কোনও শিলা ছিল না। সেগুলি যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে আনা হয়েছে তাতে বোঝা যায় তা হাতে তৈরি হাতিয়ার। তিন মহাদেশেই ইরেকটাসের সাধারণ মৌলিক যন্ত্র কাটারি, হাত-কুড়াল, হাতুড়ি পাথর, চাঁছনি ইত্যাদি, অতীব স্থূল কাটারি থেকে আরম্ভ করে রুক্ষ কিন্তু অধিকতর কার্যকর হাত-কুড়াল পর্যন্ত। পাথর ছাড়া অন্য বস্তুও তারা কাজে লাগিয়েছে—ভুক্ত জন্তুর লম্বা হাড় থেকে লাঠি ও বর্শা, হাতির দাঁত ও কৃষ্ণসার মৃগের শিং থেকে ছোরা, কঙ্কালের নানা অংশ ফাটিয়ে বিবিধ



চিত্র ১১। ক—য়োরোপীয় হাত-কুড়াল, খ—পিকিং মানবের তৈরি এক শিলা যন্ত্র।

সাধনী যা দিয়ে কোদাল, শাবল, বাটালি, ছুরি ইত্যাদির কাজ হয়। কাপালিকের মত তারা খুলি দিয়ে পাত্রের কাজ করেছে এমন সম্ভাবনারও উল্লেখ আছে। উপরন্তু গাছের ডাল থেকে বর্শা এক নতুন সৃষ্টি। পূর্বোল্লিখিত তেরুরা আমাতা, তরালবা, লাতামনে ও ভারত ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গা শুধু এ সব তৈরী বস্তুর গঠন রীতি দেখে ইরেকটাসের বাসভূমি বলে চেনা যায়।

ওলডুভাইতে নুড়ি থেকে গড়া হাবিলিসের সাধনীর চেয়ে ইরেকটাস-সৃষ্ট হাত-কুড়াল ব্যাপকতর ব্যবহারের উপযুক্ত, কারণ এরা হাড় বা শক্ত কাঠের টুকরো দিয়ে ঠুকে ঠুকে পাতলা পাত খসিয়ে কুড়ালের মুখ আরও চোখা এবং ধারগুলি আরও ধারালো করতে পেরেছে। তা ছাড়া আগুনের আবিষ্কারে এদের যন্ত্র বা অস্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ল। মাংস পুড়িয়ে খেতে হোমো ইরেকটাসই প্রথম শিখেছে, হয়তো খেতে বসে আরও কিছু তথ্য তারা আবিষ্কার করল—আগুনে হাড় বা শিং কঠিনতর হয়ে যায় এবং কাঁচা ডাল সর্বদা সবটা পোড়ে না। জোকোডিয়েনে দেখা যায় হরিণের

শিং যার মুখটা তাপ দিয়ে শক্ত করা হয়েছে, যন্ত্রটি সম্ভবত এক আদি হাতুড়ি যা দিয়ে খণ্ডিত পাথরের অসমান ধার থেকে থেকে ঠুকে ঠুকে খসিয়ে ফলা তৈরি হয়েছে। অন্যান্য ইরেকটাস ঘাঁটিতে কাঠের বর্শার মুখটা আগুনে শক্ত করে পাথরের পাত দিয়ে চেঁছে ধার আনা হয়েছে। কাঠির মাথা এ ভাবে শক্ত করে মাটি খুঁড়ে শিকড় সংগ্রহ করতেও সুবিধা।

ইতিপূর্বে শিকারে অসট্রালোপিথেকাস ও হাবিলিসের অস্ত্র ছিল নিজেদের দুখানি হাত, লাঠি ও নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খন্ড। বর্শাধারী ইরেকটাস শিকারীরা যদি তা না ছুঁড়ে হাতে ধরে পশুর গায়ে বিঁধিয়ে থাকে, তবু তাদের দাঁত নখের থেকে কিছুটা দূরে থাকতে পেরেছে, উপরন্তু বর্শা দেহের যে কোনও স্থলে ঢুকলেই জখম করবে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত পাথর ঠিক জায়গায় আঘাত না করলে ফল হবে না, সুতরাং এই নতুন অস্ত্র যে অনেকটা নিরাপদ তা বুঝতে দেরি হয় নি। শিকারীর উন্নত দেহও তাকে সাহায্য করেছে। অসট্রালোপিথেকাস ও হাবিলিসের তুলনায় বেশী লম্বা বলে তার দৃষ্টি আরও দূর পর্যন্ত ছাড়িয়েছে, হাত ও বাহুর গঠনও নির্ভুল ক্ষেপণের অনুকূল এবং পা দুটি ছুটতে দক্ষতর, বৃহত্তর দেহে শক্তিও ছিল বেশী। উন্নততর মস্তিষ্কে খেলেছে ভক্ষ্য জন্তুদের হার মানাবার নতুন নতুন ছল চাতুরি, মনোযোগ ও স্মৃতি শক্তিও বেড়েছে, সুতরাং সম্ভব হয়েছে অভিজ্ঞতার থেকে শেখা, দলগত সমন্বয় ও পূর্বপরিকল্পনা। ফলে ছলে বলে কৌশলে এই শিকারীরা যে বৃহত্তম হিংস্রতম পশুও নিধন করেছে নানা ঘাঁটিতে তার নজির পাওয়া যায়।

অসট্রালোপিথেকাস ও হাবিলিস প্রধানত ছোট জন্তু শিকার করেছে, তাদের আস্তানায় কখনও কখনও বড় পশুর হাড় যা দেখা যায় তা হিংস্র পশুর দ্বারা নিহত প্রাণীর দেহাংশ বলে সন্দেহ করা হয়েছে। কিন্তু জোকোডিয়েনবাসীরা হাতি পর্যন্ত মেরেছে, এই অতিকায় জন্তু, ভয়ংকর খড়্গদন্ত বাঘ বা ক্ষিপ্র সতর্ক হরিণ মারা ইরেকটাসের অসাধ্য ছিল না। তাদের কৌশল অনেকটা অনুমান করা যায় প্রাণীদের ফসিল এবং বর্তমান আদিবাসী জংলী গোষ্ঠীদের পরীক্ষা করে। হয়তো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘিরে ফেলত লক্ষ্য জন্তুকে অথবা পশু দলের যাতায়াতের পথের ধারে

আত্মগোপন করে থাকত। কিংবা পলাতক হরিণ হয়রান হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে চলত, দরকার হলে দিনের পর দিন। আফ্রিকার খর্বকায় পিগমিরা বৃহত্তম স্থলচর জন্তু হাতি মারে কাঠের বর্শা দিয়ে; প্রথম আঘাত খেয়ে হাতি তেড়ে আসে, তখন চার দিক থেকে ঘাতকরা আবার বর্শা বসিয়ে দেয়, এই করতে করতে পশু অবশেষে হার মেনে শুয়ে পড়ে। সে কালের হাতি আরও বড় ছিল, চার মিটার উঁচু, ওজনে ২০ টনের বেশী, শুধু পাথর, হাড় ও কাঠের অস্ত্র দিয়ে ইরেকটাস তাদেরও সম্ভবত একই উপায়ে কাত করেছে। অনেক দিনের রসদ এক বারে সংগ্রহ করার আনন্দ ছাড়াও নিশ্চয় তখন শুধু শিকারের শিহরণে, বুদ্ধি খাটিয়ে এই বিশালাকার শত্রুকে জব্দ করার রোমাঞ্চে তাদের রক্ত নেচে উঠেছে, অদ্যকার শৌখীন শিকারীদের মতই।

ওলডুভাই খাতে আরও এক কৌশলের সাক্ষ্য আছে। গোজাতীয় প্রাণী দলের অবশিষ্ট দেখে মনে হয় শিকারীরা তাদের তাড়িয়ে জলাভূমিতে নিয়ে গিয়েছে, সেখানে কাদায় পা আটকে বন্দী হলে পর তাদের হত্যা করেছে। একটি প্রাণীর পায়ের হাড় আজ পর্যন্ত মাটিতে গেঁথে আছে, নিশ্চয় শিকারীরা বাকি অংশ কেটে নিয়েছিল। অবশ্য বাচ্চাদের ধরা ও মারা সহজ বলে তাদের দিকে যে বেশী নজর ছিল ইরেকটাসের বিভিন্ন ঘাঁটিতে শাবকদের অস্থি প্রাচুর্য তার প্রমাণ।

পরস্পরের মধ্যে মৌখিক কথার যোগ কি শিকার দক্ষতার অন্যতম কারণ? এদের মুখে ভাষা দেখা দিয়েছিল কিনা, দিয়ে থাকলে কতটা তা নিয়ে অনেক জল্পনা ও কিছু কাজ হয়েছে। এ প্রশ্নের সঙ্গে গলা ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত। যুক্তরাষ্ট্রে পোষা শিম্পাঞ্জিদের ছোট কাল থেকে কথা বলতে শিখিয়ে ফুটেছে মাত্র অল্প কয়েকটি বিকৃত শব্দ (এই প্রসঙ্গে শব্দ বলতে আমরা বুঝব কয়েকটি বর্ণের যোগে বিশেষ অর্থবাচক ধ্বনি অর্থাৎ word), যদিও হাত ও অন্যান্য অঙ্গের সংকেতে বেশ কতগুলি মৌলিক শব্দার্থ ও বার্তা প্রকাশ করতে শেখানো সম্ভব হয়েছে। আসলে এই চেষ্টা নিরর্থক কারণ বনমানুষদের মগজে বাক্ কেন্দ্র নেই। আমরা দেখেছি অসট্রালোপিথেকাসের প্রকৃত ভাষা না থাকলেও সম্ভবত কয়েকটি নির্দিষ্ট মৌখিক আওয়াজ ও অঙ্গ ভঙ্গি দিয়ে তারা মনের কথা জানাত—তা বনমানুষের

তুলনায় অগ্রগতি। বর্তমান মানুষের মগজ এবং বাক্ কেন্দ্রগুলি বড়, তা ছাড়া তার গলবিল (শ্বাসনালি ও কন্ঠনালির মিলনস্থলীয় গহ্বর, pharynx) দরকার মত কিছুটা ছোট বড় হয়, জিভ পিছনে গলার দিকে সরেছে এবং চোয়াল ক্ষুদ্রতর। অনেকের মতে হোমো ইরেকটাসের স্বরপথে এত পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নি, তবে পুরোগামীদের তুলনায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং তার দ্বারা আমাদেরই মত সে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করত, যদিও সব নয়।

ভাষা শিখতে মস্তিষ্কের আয়তন ছাড়া তার গঠনও যে তাৎপর্যপূর্ণ তা এই দেখেই বোঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যে সব বামনদের মেধা শিম্পানজির চেয়ে বড় নয় তারাও তা শেখে। কিন্তু ইরেকটাস মেধার মোট আয়তন আধুনিক মানুষের মধ্যে অনেকের চেয়ে কম না হলেও শুষ্ক শূন্য ফসিল খুলি থেকে তার ভিতরের গঠন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। ইরেকটাস খুলি দু পাশে চাপা, খুলির চূড়াও নিচু, সুতরাং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র বা ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা চলে না, তবে সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানী ফিলিপ লিবারম্যান ও এড্মান্ড ক্রেলিন প্রাচীন মানুষের বাক্ শক্তি নিয়ে নতুন গবেষণা করেছেন। নেআনডার্টাল মানব ও আধুনিক বনমানুষের খুলির সঙ্গে সদ্যোজাত আধুনিক মানব শিশুর খুলির তুলনা করে তাঁরা অনেক সাদৃশ্য পেলেন ; বস্তুত দেখা গেল শিশুর খুলিটি একই প্রজাতির সাবালক খুলির সঙ্গে যতটা মেলে, কোনও কোনও বিষয়ে তার চেয়ে বেশী মেলে নেআনডার্টাল ও বনমানুষ খুলির সঙ্গে। লিবারম্যান মনে করেন এ সম্বন্ধে নেআনডার্টাল মানব ও ইরেকটাসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই সব সাদৃশ্যের থেকে কয়েকটি আদি মানবের গলবিল, নাক ও মুখের গহ্বর প্লাসটারে পুনর্গঠন করে তাদের স্বর পথ তৈরি হল, তার পর এই পুনর্গঠিত স্বর পথ ও আধুনিক মানুষের স্বর পথের ধ্বনি-সৃজনী শক্তি কমপিউটার যন্ত্রে তুলনা করে দেখা গেল আদি মানবের গলবিলে যথেষ্ট উন্নতি হয় নি, তা দিয়ে আ, ই এবং উ স্বর বর্ণগুলি ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে দ্রুত যোগ করে উচ্চারণ সম্ভব নয়। লিবারম্যান নানা আধুনিক ভাষার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই তিনটি স্বর বর্ণ সবগুলিতেই অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই গবেষণার থেকে তাঁদের বিশ্বাস

আদি মানবদের মুখে আমাদের চেয়ে অনেক ধীরে কথা ফুটত—হয়তো আমাদের দশটা কথার সময় লাগত একটি কথা বলতে।

নৃবিজ্ঞানী গ্রোভার ক্রানট্জ্ ইরেকটাসের বাক্ শক্তি ও মগজ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন তাদের হাতিয়ার পরীক্ষা করে। তিনি বলেন স্থান কাল নির্বিশেষে এগুলিতে বিশেষ উন্নতি হয় নি, হাজার হাজার বছর একই গঠন রীতি চলেছে, তার কারণ ইরেকটাস কথা বলতে আরম্ভ করেছে বেশী বয়সে এবং যেহেতু আদি মানবরা অনেক স্বল্পায়ু ছিল সেহেতু ভাষায় ভাব বিনিময় করে হাতিয়ার শিল্পের উন্নতি সাধনের সময় পেয়েছে কম। তিনি মনে করেন মেধার আয়তন ৭৫০ সিসি না বাড়া পর্যন্ত কথা ফোটে না, তাঁর হিসাবে ইরেকটাসের মগজ এই মাপে পেঁছেছে ছ বছর বয়স পেরিয়ে। পক্ষান্তরে আধুনিক শিশুরা সেখানে পেঁছে যায় এক বছরে এবং তখন তাদের মুখে কথা ফুটতে আরম্ভ করে।

কিন্তু প্রতিবাদীরা বলেন শিকারে বা হাতিয়ার বানাতে মুখের কথা নিষ্প্রয়োজন। নেকড়ের দল নিঃশব্দে শিকার করে, অনেক জায়গায় আদি-বাসীরা হাত ও আঙুলের ইশারায় সহযোগীদের খবর জানায়, যেমন কোথায় কি জন্তু তারা দেখেছে—তারা অনেক কথা বলে যায় কোনও কথা না বলে। শিকারে দরকার নীরব চলা ফেরা ও লুকোচুরি এবং বিনা বাক্যেও যৌথ সহযোগিতা সম্ভব! তেমনি শুধু দেখে ও অনুকরণ করে নানা বিষয়ের মত হাতিয়ার তৈরিও শেখা যায়, মুখের কথা ফুটবার আগে শিশুরা বড়দের অনুকরণে কত কি শেখে, তা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির বড় অঙ্গ চোখের দেখা। সুতরাং অনেকের ধারণা বাক্ শক্তি দেখা দিয়েছে শিকার ও হাতিয়ার সৃষ্টির পরে কতগুলি সামাজিক বিবর্তনের ফলে, যথা পরিবার গঠন, স্ত্রী পুরুষের যুগ্ম বন্ধন, মা ও শিশুর দীর্ঘতর সম্পর্ক, খাদ্য ভাগ করে খাওয়া। অধ্যাপক রেমনড ডার্টের মতে যথার্থ ভাষার জন্ম আরও পরে, তা মাত্র ২৫,০০০ বছর প্রাচীন, অর্থাৎ তা প্রথম দেখা দিয়েছে আধুনিক মানুষের মুখে, তার আগে বার্তার বাহন ছিল ইঙ্গিত, অঙ্গ ভঙ্গি ও এলোমেলো ধ্বনি।

সুতরাং বাক্ শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, তবে

বিরুদ্ধে তত্ত্বীয় যুক্তি থাকলেও খুলির যে সাম্প্রতিক পরীক্ষা উপরে উল্লিখিত হয়েছে তার থেকে মনে হয় হোমো ইরেকটাস কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। সে ভাষার শব্দ এবং উচ্চারণ মন্থর, কিন্তু তা যতই অমার্জিত হক, এই একান্ত মানবিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় মনের কথা বিনিময়ে সাহায্য করে বাঁচার প্রতিযোগিতায় তার সহায় হয়েছে। শিশুদের লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে অস্পষ্ট একটি প্রাথমিক শব্দ দিয়ে বা তার দু তিনটি জুড়ে অনেক কিছু বলা সম্ভব। কি ছিল প্রাচীন মানুষের সেই আদিতম কথা? স্বাভাবিক অনুমান বলে শিশুদেরই মত সবচেয়ে আগে কথা ব্যবহার হয়েছে বস্তু বোঝাতে (হরিণ, খাদ্য, পাথর), পরে আবেগ (ভয়, ব্যথা, আনন্দ) ব্যক্ত করতে চোখ মুখের ভাব ও হাসি কান্নার পাশাপাশি নতুন নতুন উচ্চারিত শব্দ দেখা দিল। অবশ্য এক ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী ১৯৫৯ সালে এক তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, তদনুসারে কথা আরম্ভ হয়েছে নাম বা বিশেষ্য দিয়ে নয়, ক্রিয়া পদ দিয়ে, যেমন ঘা মারো, মেরে ফেল।

যাই হক, বস্তু, কাজ ও আবেগই ভাষার সব নয়, ডারুইন বলেছিলেন ধারাবাহিক চিন্তার ক্ষমতা এসেছে মুখের কথার ফলে, শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির থেকে তা হতে পারত না ; অর্থাৎ ভাষা শুধু ভাবনার বাহন মাত্র নয়, ভাষাই চিন্তা শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তা হলে এই অক্লান্ত চালকের তাগিদে সেই সামান্য সূচনার সূত্র ধরে আজ শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে দার্শনিক মনন ও বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক ভাবের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তা ভাবলে বুঝতে পারি ক্রমবিকাশের পথে ভাষার উদ্‌গম কত বড় আশ্চর্য ঘটনা। সেই দূর অতীতের তিমিরে নিহিত মুখের কথার তুলনায় লিখিত পাঠ দেখা দিয়েছে এই সে দিন, মাত্র ৫৫০০ বছর আগে।*

হোমো ইরেকটাসের মুখে ভাষা থাকলেও পশুর মাংস সংগ্রহ তখন সহজ ছিল না, দুর্ধর্ষ জন্তুর আক্রমণে অনেক শিকারী প্রাণ হারিয়েছে নিশ্চয়। তা ছাড়া প্রধানত নিরামিষাশী বানর বনমানুষের চেয়ে অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে খুঁজে বেড়াতে হত, আন্দাজ করা হয়েছে তা মাথা পিছু আড়াই হাজার

---

* এই কৌতূহলজনক আবিষ্কারের কাহিনী আছে লেখকের 'সভ্যতার আগে' বইতে।

হেক্টেআরের বেশী (এক হেকটেআর প্রায় আড়াই একার), সুতরাং দলে ৩০ জন থাকলে শিকার ক্ষেত্রের আয়তন ৮০,০০০ হেকটেআরের কাছাকাছি। তাতেও হয়তো সম্পূর্ণ প্রয়োজনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ মিটত, খাদ্যের বাকিটা আসত ফল মূল বীজ বাদাম থেকে। বৃহৎ বা দ্রুতগতি পশু শিকার নিশ্চয় খুব শ্রমসাধ্য ছিল, বিশেষত গ্রীষ্ম দেশে। অনেকের অনুমান এই সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে মানব অভিব্যক্তির আর একটি পথ খুলে গেল ; বনমানুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লম্বা লোম কমে গিয়ে দেহে স্বেদ গ্রন্থি বাড়ল, তা শরীর শীতল রাখতে সাহায্য করল।

যদিও এ বিষয়ে মতভেদ আছে, অসট্রালোপিথেকাস থেকে আরম্ভ করে উষ্ণ অঞ্চলের ইরেকটাস সম্ভবত কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। পরে ধলা জাতির মানুষ দেখা দিল কি করে ? অতিরিক্ত মাত্রায় সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি চামড়ার ক্ষতি করে, গরম দেশে গায়ের কালো রং তা আটকাবার পর্দা। শ্বেতাংগ য়োরোপীয়দের ত্বকে এই রং কম, কারণ তাদের দেশে সূর্যালোক অল্প ও দুর্বল। কিন্তু কিছুটা রোদ না পেলে শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি হবে না, তখন হাড় নরম হয়ে রিকেট্স রোগ দেখা দিতে পারে, শীতলাঞ্চলের লোক কৃষ্ণাংগ হলে তার আশংকা বাড়ে। সুতরাং সম্ভবত উত্তরে পৌঁছে ক্রমশ মানুষের গায়ের রং ফর্সা হল। অবশ্য সূর্যালোক ও গাত্র বর্ণ সর্বদা এই নিয়ম মেনে চলে না, যেমন আফ্রিকার কোনও কোনও উপজাতি ছায়াঘন অরণ্যে বাস করেও কৃষ্ণাংগ। কিন্তু একদা মানুষের রং হালকা হয়েছিল, এবং তা য়োরোপবাসী ইরেকটাসের দেহে হয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

য়োরোপীয় শিকারীরা দিনে দিনে কাজ শেষ করেছে, সন্ধ্যার পর আগুনের আরাম উপভোগ করেছে, আফ্রিকার অন্তত এক জায়গায় নিশাচর শিকারীদের সন্ধান পাওয়া যায়। তার কারণ উষ্ণ দেশে দিনের শেষে মানুষের আগুনের প্রতি টান নেই। এবং তাদের লক্ষ্য ও ভক্ষ্য ছিল যে পশু তারা রাত্রে নিদ্রা দেয়। ঘটনা স্থলের নাম অলর্গেসেইলি, দক্ষিণ-পশ্চিম কিনিয়ায়। সেখানে মাত্র ২০ মিটার লম্বা ও ১৩ মিটার চওড়া একটি জায়গা খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে অন্তত পঞ্চাশটি পূর্ণবয়স্ক ও তেরোটি অল্পবয়স্ক এক জাতের লুপ্ত বেবুনের হাড় এবং তার সংগে এক টনেরও বেশী পাথুরে অস্ত্র ও গোল পাথর। এর

থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে যে বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা কল্পনায় পুনর্গঠন করা সম্ভব, যদিও এখানেও শিকারীদের ফসিল পাওয়া যায় নি।

বেবুন বেশ বড় হিংস্র বানর। মর্দারা আকারে প্রায় মানুষের সমান লম্বা, তীক্ষ্ম ছেদক দাঁত তাদের। গভীর রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শিকারীরা পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়াল জায়গাটি, সেখানে গাছে গাছে এক দল বেবুন ঘুমে অচেতন। তারা সঙ্গে এনেছে গোল গোল পাথর এবং ধারালো অস্ত্র। হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে বেবুনদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল পাথরের গোলাগুলি, চমকে জেগে উঠে তারা নেমে এল এবং ভয়ংকর দাঁত খিঁচিয়ে সচিৎকারে লড়াই শুরু করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অস্ত্রকে হার মানাল মানুষের হাতিয়ার, যদিও ঘাতকরাও কেউ কেউ জখম হল। কিছু বেবুন পালিয়ে বাঁচল, বাকিরা মারা পড়ল লাঠি এবং শিলার বর্ষণে। অতঃপর ছেদনাস্ত্র এবং হাত-কুড়াল দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে ভোজের পর্ব।

এই অভিযানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল শিকারীরা আক্রমণের পরিকল্পনা ভেবে তৈরি করেছে। রাত্রে বেবুনের আড্ডা কোথায় তা অনুসন্ধান করে অন্তত ৩০ কিলোমিটার দূরে খুঁজে বার করেছে এই গোল পাথর যা দিয়ে সহজে কাজ সাধন হবে, সেগুলি বয়ে এনেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, যথেষ্ট অস্ত্র বানিয়েও জমা করেছে। ঘুমের মধ্যে অতর্কিত আক্রমণে যে শত্রুর নিধন সহজসাধ্য হবে তা ভেবে নিয়েছে, বস্তুত নিহতের সংখ্যা থেকেই অনুমান করা হয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে রাত্রে। সে সময়ে যে সব নিশাচর পশু শিকার সন্ধানে বার হয় তাদের অগ্রাহ্য করাও অনেকটা সাহসের পরিচায়ক।

শিকারের কষ্ট মানুষ স্বীকার করেছে নিশ্চয় মাংসের স্বাদ ভাল লেগেছে বলে। বানর ও বনমানুষও ঐ কারণে মাঝে মাঝে ছোট জন্তু মারে যদিও তাদের প্রধান খাদ্য উদ্ভিদজাত, এবং নিয়মিত মাংস খেতে দিলে তারাও অভ্যস্ত হয়ে যায়। চিড়িয়াখানার গরিলাদের মাংস দিয়ে দেখা গিয়েছে প্রথমে তারা তা নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে চেখে দেখে, কিন্তু অভ্যাসটা রাখলে ক্রমশ পাতা বাদাম মূল ইত্যাদির বদলে মাংসের লোভ এত বাড়ে যে কিছুতেই আশ মেটে না। উদ্ভিদভুক্ বনমানুষদের থেকে মানুষের অভ্যাসটা সম্ভবত এ ভাবেই গড়ে উঠেছে, অসট্রালোপিথেকাসের চেয়ে উন্নততর বুদ্ধি ও অস্ত্রের অধিকারী সুতরাং

দক্ষতর ইরেকটাস শিকারীদের জীবনে এই রীতি আরও পূর্ণতা পেয়েছে, শিকারই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। তা বলে তারা উদ্ভিজ্জ ভোজ্য বাদ দিতে পারে নি, পিকিং মানবের গুহায় প্রাপ্ত ফাটানো বীজ তার নিদর্শন, এবং আজও আমাদের খাদ্যে আমিষ নিরামিষ দুয়েরই মূল্য আছে।

রসনার তৃপ্তি ছাড়াও মাংস প্রজাতিকে জীবন সংগ্রামে সাহায্য করেছে। প্রকৃতির অপর্যাপ্ত দান ঘাস পাতা মানুষের পেটে সয় না, কিন্তু যে সব প্রাণীর তা হজম হয় আমিষাশীরা তাদের খেতে পারে, তারা যেন অখাদ্য থেকে খাদ্য তৈরির কারখানা। সুতরাং শিকারী মানুষ মাংসাশী পশুর মতই পরোক্ষে ঘাস পাতাও কাজে লাগাল, তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে তার খাদ্যের সংস্থান অনেক বেড়ে গেল। তা আরও বেড়েছে যখন তারা ঋতু পরিবর্তনে দূরাগত পরিযায়ী জন্তু মেরে খেয়েছে, কারণ তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ভিন্ন, সেখানে উদ্ভিজ্জ খাদ্যও অনেকটা ভিন্ন হতে পারে। তা ছাড়া মাংসে ঘনীভূত প্রোটিন ও চর্বি আছে বলে তার শক্তিমাত্রা বেশী, প্রতি ১০০ গ্র্যামের ক্যালরি সংখ্যা হরিণের মাংসে ৫৭২, কিন্তু সবজি বা ফলে তা সাধারণত এক শো'র বেশ কম। (অধিকাংশ মাংসের চেয়ে নানা বাদামে ক্যালরি বেশী, আদি মানবের তা নিশ্চয় খুব উপকারে লেগেছে, কিন্তু বাদাম সর্বত্র বা সর্ব ঋতুতে পাওয়া যায় না।) সুতরাং সারা দিনের ফল মূল সংগ্রহের সমতুল্য শক্তি যুগিয়েছে একটি মাত্র মাঝারি ওজনের জন্তু। পোড়া বা ঝলসানো মাংসে তার উপকারিতা অনেক বেড়ে গেল, কারণ আগুনের তাপে প্রোটিন ও চর্বি কিছুটা ভেঙে যায় বলে রান্না মাংস পাকস্থলীতে সহজে জীর্ণ হয়। এই খাদ্যের পুষ্টিও বেশী। আদি মানব অবশ্য এত খবর জানত না, কিন্তু বুঝল যে পুড়িয়ে খেতে শিখে খাদ্য সুস্বাদু হল, তার পরিমাণ বাড়ল এবং চর্বণের একঘেয়ে কাজটা কমল। আহারে ও হজমে সময় কম লেগেছে বলে মানুষের অবসর বেড়েছে এবং নরম মাংস খেতে পেরে দুর্বল ও রুগ্নরা বেশী দিন বেঁচেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে মানুষ নিজেই বদলাতে আরম্ভ করল। নরম খাদ্য চিবাতে দাঁত ও চোয়ালের কাজ কম বলে তারা আকারে ছোট হল, ফলে মূর্তিটা সভ্য হল কিছু। ঠিক এই পরিণতিই ঘটে থাকতে পারে যন্ত্র

ব্যবহারের থেকেও, দন্তপাটির কাজ কমেছে যখন ছোট ছোট খণ্ডে মাংস কাটা সম্ভব হল। এংগেল্স্ বলেছেন মাংস খেতে না শিখলে মানুষ কখনও 'সম্পূর্ণ' হত না। কিসের থেকে কি হয়—কোথায় দৈবক্রমে আগুনের ব্যবহার শেখা বা পাথর ভেঙে অস্ত্র তৈরি, আর কোথায় মানুষের চেহারা। এমনি সূক্ষ্ম আকস্মিক সূত্র ধরেই ক্রমবিকাশ কাজ করে।

মাংস পুড়িয়ে খাওয়ার আবিষ্কারটি কেমন করে ঘটল তা জল্পনার বিষয়। হতে পারে যে বনের পশু যখন দাবানলে মরেছে তখন সেই পোড়া মাংস খেয়ে খুব ভাল লেগেছে পুরামানবের। কিংবা হয়তো শীতের দিনে আগুন ঘিরে বসে খেতে খেতে এক খণ্ড কাঁচা মাংস পড়ল তাতে, সেটিকে উদ্ধার করে জুড়িয়ে নিয়ে মুখে দিতেই অবাক কাণ্ড—খেতে আরও ভাল, একটু চিবালেই মুখে মিলিয়ে যায়। শুনে সঙ্গীরাও পরীক্ষা করে দেখল। অতঃপর মাংস আগুনে ফেলে খাওয়াটাই রীতি হয়ে গেল। এই আবিষ্কারের আগেই হোমো ইরেকটাস আগুনকে আরও নানা কাজে লাগিয়েছে, তার সাহায্যে সে যে উন্নততর হাতিয়ার বানিয়েছে তা আমরা আগে দেখেছি। তা ছাড়া আগুন শীত দূর করে, দূরে রাখে অন্ধকারের নামহীন ডর এবং আততায়ী পশু, একই কারণে আজও শিকারীরা তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বেলে রাখে।

মানুষ অবশ্য আগুন সৃষ্টি করে নি, পৃথিবীতে প্রাণ দেখা দেওয়ার আগেই আগ্নেয়গিরির লেলিহান জিহ্বায় তা ছিল। তার পর অনাবৃত কয়লা বা শিলাজড়িত তেলের স্তর স্বতঃই জ্বলে উঠেছে, শুষ্ক তরু শাখার ঘষাঘষিতে বা আকাশের বজ্রপাতে খরাজীর্ণ ঘাসে এবং বনে দাবানল জ্বলে উঠে মড়মড় করে তেড়ে এসেছে, যেমন এখনও ঘটে। অসট্রালোপিথেকাস ও হাবিলিস তখন পশু পাখির মত ছুটে পালিয়েছে, আগ্নেয়গিরির দেশ যবদ্বীপ, সেখানে পিথেকানথ্রপাসও হয়তো তাই করেছে, কারণ তার আগুন ব্যবহারের কোনও নজির নেই। কিন্তু আগুন কাজে লাগাবার আগে মানবেতিহাসের হাজার হাজার বছর কেটে যাওয়ার পর কোথাও কোনও এক ইরেকটাস গোষ্ঠীর কেউ হয়তো পালাতে পালাতে থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে থেকেছে, বিস্ময় ও কৌতূহল জয় করেছে ভয়কে।

লম্ফকম্পমান রক্তিম বহ্নি শিখার দিকে চোখ মেলে থাকলে আমরাও মুগ্ধ হই, সেই সম্মোহনের বশে আদি কালের মানুষও একদা পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে, হয়তো একটা ডাল হাতে নিয়ে দূর থেকে ছোঁয়াল সাবধানে, যখন তা দপ করে জ্বলে উঠল তখন যেন নতুন সৃষ্টির আনন্দ খেলে গেল মনে। অনুমান করা যায় অভিনব হাতিয়ারটি সে ছোঁয়াল শুকনো ঘাসে, নিজের খুশি মত বহ্নি শিখা ছড়াতে পেরে প্রথম ইশারা পেল যে এই রুদ্র দাহক দানবকেও বন্দী করে কাজে লাগানো যায়। বুঝতে দেরি হল না আগুনের পাশে বসলে শীতকম্পিত দেহ জুড়ে আরাম ঘন হয়ে আসে, এই হাতিয়ার হাতে থাকলে হিংস্র পশুদের থেকে দূরে থাকতে হবে না, তারাই ভয়ে পালাবে।

দীর্ঘ রাত্রি, ঘন কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা এবং সর্বোপরি হাড়-কাঁপানো হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রাচীন মানুষ গুহা গহ্বরে আশ্রয় খুঁজেছে, যদিও সেই কনকনে স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়ও খুব আরামদায়ক ছিল না। তা ছাড়া একই কারণে হিংস্র পশুরা আগে থেকেই সেখানে আড্ডা গেড়েছে, সুতরাং এই গৃহ প্রবেশের কাজটাও খুব সহজ হয় নি নিশ্চয়। এ সব সিংহ বা ভালুককে বার করে দিতে—এবং বাইরে রাখতে—নিঃসন্দেহে মানুষের প্রধান সহায় ছিল তার পিতৃপুরুষের দান আগুন। জোকোডিয়েন ও অন্যত্র গুহার প্রাক্তন বাসিন্দারা নিশ্চয় দূরে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ আক্রোশে নবাগতদের লক্ষ্য করেছে।

অগ্নি দানবকে মানুষ ক্রমশ যত বশ করল তত নতুন নতুন কাজে তাকে লাগিয়ে সে নিজের নবলব্ধ ক্ষমতা উপভোগ করল। জ্বলন্ত ডাল বেশী দূর নিয়ে যাওয়া যায় না, যাযাবর জীবনে আগুনকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানো কঠিন—হয়তো জ্বলন্ত কয়লা বা ধীরদহন মশাল নিয়ে ক্রমে তা কিছুটা সম্ভব হয়েছে। মাঝে মাঝে নিশ্চয় এই বন্ধুকে তারা হারিয়েছে, তখন অপেক্ষা করতে হয়েছে নতুন প্রাকৃতিক অগ্নির। কিন্তু একদা দিনের পর দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখেছে হোমো ইরেকটাস, হয়তো গনগনে ছাইয়ে ঘাসের চাপড়া চাপা দিয়ে, যেমন আজও করা হয় পৃথিবীর আনাচে কানাচে যেখানে এখনও দিয়াশলাই দেখা দেয় নি। জোকোডিয়েন গুহায়

এক ভিটের ছাই প্রায় সাত মিটার গভীর, তার তাৎপর্য এই যে বংশানুক্রমে লালিত ছিল অগ্নি, কারণ সম্ভবত ইরেকটাস নিজে আগুন জ্বালতে শেখে নি।

এই কাজটি প্রথম সম্ভব হয়েছিল বিশেষ শ্রেণীর পাথরের গায়ে পাথর ঠুকে, যেমন চকমকি (flint) এবং পাইরাইটিস, যাদের ঠুকলে ফুলকি ছোটে। ইরেকটাসের কোনও ঘাঁটিতে এ জাতীয় শিলা পাওয়া যায় নি। এ যাবৎ প্রাচীনতম অগ্নিশিলাটি এক খণ্ড লৌহ পাইরাইটিস, বহু আঘাতের ক্ষত তার গায়ে, কিন্তু তা প্রায় এ যুগের বস্তু, বয়স মাত্র ১৫,০০০ বছর, তার অনেক আগেই ইরেকটাস বিদায় নিয়েছে।

সুতরাং সম্ভবত আগুন প্রথম জ্বলেছে হোমো সেপিয়েনসের হাতে, কিন্তু সেই আবিষ্কারটি কি করে ঘটল? অনুমান করা হয়েছে চকমকি পাথরে ঘা মেরে হাতিয়ার বানাতে গিয়ে ফুলকি ছুটে পড়ল কাছাকাছি শুকনো পাতা, ঘাস বা পশু চর্মের লোমে, তৎক্ষণাৎ জ্বলে গেল তা আর মানুষের মাথায়ও জ্বলে উঠল আগুন সৃষ্টির বুদ্ধি। কিংবা যেমন বাতাসের ঠেলায় শুকনো গাছে গাছে ঘষাঘষির থেকে বনে আগুন ধরে যায় তেমনি ডালের মুখ ঘষে বর্শা বানাতে গিয়েও মানুষের হাতে প্রথম আগুন জ্বলে উঠে থাকতে পারে। হয়তো এরই থেকে উৎপত্তি বিবিধ কৌশলের যা আজও অনেক প্রাচীন জাতি ব্যবহার করে থাকে; এক লাঠির সরু ফাটলে আর একটি কাঠি কেউ বার কয়েক ঘন ঘন টানাটানি করে, কেউ বা এক খণ্ড কাঠের গর্তে আর একটি কাঠি দু হাতের পাতার মধ্যে সজোরে ঘোরায় তুরপুনের মত। মহাভারতে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে (বনপর্ব, ৫৭ অধ্যায়); যে দণ্ড দিয়ে মন্থন করে আগুন জ্বালা হত তার নাম মন্থ আর নিচের কাঠ অরণি। এই ঘষার কৌশল ছাড়া, চকমকির মত পাথরের স্ফুলিঙ্গই বহু সহস্র বছর ধরে আগুন জ্বালবার একমাত্র উপায় ছিল মানুষের হাতে। এখনও কোনও কোনও আদিবাসী গোষ্ঠী পাথর বা কাঠ থেকে আগুন সৃষ্টি করতে জানে না, তারা পশুপালন ও চাষবাসও শেখে নি, আদি মানবের মতই শিকার ধরে এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহ করে বাঁচে।

এই যে কাঠের মধ্যে লুকিয়ে আছে আগুন এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প বলা যেতে পারে এখানে। গল্পটি নিউ জিল্যানড ও হাওয়াই

দ্বীপাঞ্চলের প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে গড়ে উঠেছে, পাওয়া যায় মাওরি পলিনেশীয় লোক-সাহিত্যে। নায়ক মা-উই তার ছোট বেলায় দেখত যে আগুনের অভাবে দ্বীপবাসীদের বড় কষ্ট—তারা কাঁচা মাছ ও মূল খেয়ে বাঁচে, শীতে কাঁপে ঠক ঠক করে। সুতরাং এক দিন সে নেমে এল পাতালে, সেখানে ছিল তার ঠাকুরমার ঠাকুরমা মা-হুইয়া, তার সঙ্গে দেখা করে আগুন চাইলে। মা-হুইয়া খুশী হয়ে তাকে তার হাতের একটি জ্বলন্ত নখ খুলে দিলে, তাই নিয়ে মা-উই মর্ত্যে এল, কিন্তু নদী পার হতে গিয়ে নখটি জলে পড়ে গেল। অগত্যা তাকে ফিরে যেতে হল পাতালে, মা-হুইয়া আবার একটি নখ দিলে, কিন্তু সেটিও পথে একই ভাবে নষ্ট হল। এমনি করে একে একে সবগুলি নখ দেওয়ার পর যখন শুধু পায়ের নখ একটি মাত্র বাকি তখন বুড়ী রেগে অগ্নিমূর্তি হয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললে তা। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সব, দু জনে দৌড়ে উঠে এল পৃথিবীতে, কিন্তু সেখানেও মাটি জ্বলন্ত, জল ফুটন্ত, বন বনানী খেয়ে চলেছে দাবানলে। ছুটতে ছুটতে মা-উই বৃষ্টির মন্ত্র উচ্চারণ করলে বারে বারে—তাতে পৃথিবী বাঁচল বটে, কিন্তু সব আগুন নিভে গিয়ে একেবারে সর্বনাশ হওয়ার উপক্রম ; বিপদ বুঝতে পেরে বুড়ী তাড়াতাড়ি শেষ শিখাগুলি সংগ্রহ করে গাছের বাকলের ফাঁকে তাদের লুকিয়ে রাখলে—বৃষ্টি সেখানে ঢুকতে পারল না। সে দিন থেকে গাছের গা ঘষে এই আগুনকে বার করতে হয়।

এ জগতে মানুষের ভাগ্য যে অতি নির্দয়, এবং অগ্নির দান হাতে পেয়ে সেই দুর্বহ ক্লেশ যে অনেকাংশে উপশম হয়েছে, মানুষের শক্তি বহু গুণ বেড়েছে, এই রকম ইঙ্গিত মেলে নানা দেশের পুরাণে। সাধারণত কোনও দেবতার বর এই দান, যদিও গ্রীসীয় দেবতারা মোটেই মর্ত্যে আগুন পাঠাবার পক্ষপাতী ছিল না—যক্ষ প্রমিথিউস কেমন তা চুরি করে এনে দিয়েছিল মানুষকে এবং কি নিদারুণ শাস্তি হয়েছিল তার তা সুবিদিত। চীনের এক পুরাকাহিনীতে দেখা যায় সৃষ্টির আদি পুং-শক্তি থকে অগ্নির (এবং পরে সূর্যের), আদি স্ত্রী-শক্তি থেকে জলের (ও চাঁদের) উদ্ভব।

আগুন ব্যবহারের প্রাচীনতম নজির এখন পর্যন্ত শীতপ্রধান য়োরোপে, দক্ষিণ ফ্রানসের এস্‌কাল নামক জায়গার এক গুহায় ইরেকটাস পরিত্যক্ত

ছাইয়ের বয়স প্রায় সাড়ে সাত লাখ বছর। পিকিং মানব জোকোডিয়েনে বাস করেছে চার পাঁচ লাখ বছর আগে, তখন সেখানেও দারুণ ঠাণ্ডা। শীতের প্রকোপ এড়াতে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আগুনের ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়েছে মনে হয়, কিন্তু আফ্রিকার গরমে খোলা জায়গায় বাস করতে কষ্ট হয় নি, সেখানে আদিতম চুলা মাত্র ৫০,০০০ বছর প্রাচীন, তার অনেক আগেই ইরেক-টাসের দিন ফুরিয়েছে। তবে আফ্রিকায়ও আগুনের এক রহস্যময় চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে যা ইরেকটাস-সৃষ্ট হতে পারে। ১৯৭৪ সালে কিনিয়ার কারিংগো হ্রদের কাছে চেসোওআন্জা নামক স্থানে জন গাউলেট ও জ্যাক হ্যারিসের দল চল্লিশাধিক পোড়া মাটির খণ্ড, বেশ কিছু ওলডুভীয় গড়নের পাথুরে অস্ত্র এবং খণ্ডিত ও অখণ্ড পশুর হাড় উদ্ধার করেন। তা ছাড়া সেখানে কয়েক দফায় অসট্রালোপিথেকাস বোআজাইর খুলি ও অন্যান্য অস্থি আবিষ্কার হয়েছে। আগুনের সাক্ষী পোড়া মাটি, কিন্তু ইরেকটাসের ফসিল নেই—তবে ঐ আগুন কার? সাধারণ বৈজ্ঞানিক মতানুসারে অ. বোআজাই আগুন ব্যবহার তো দূরের কথা পাথর ভেঙে অস্ত্রও বানায় নি, তা ছাড়া সে ফল বাদাম খেত, পশুর হাড়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা যায় না। পক্ষান্তরে হোমো ইরেকটাস প্রায় ১৫ লাখ বছর আগেই ঐ অঞ্চলে ছিল, যেমন ৪০০ কিলোমিটার দূরে তুর্কানা হ্রদে। অসট্রালোপিথেকাসও ১০ লাখ বছর আগে পর্যন্ত টিকে ছিল, গাউলেট ও হ্যারিস জল্পনা করেছেন আগুন ইরেকটাসেরই এবং সে হয়তো অসট্রালোপিথেকাসের দেহাবশেষ ঘাঁটিতে নিয়ে এসেছে মাংস খেতে। অবশ্য সেখানে ইরেকটাসের আগে বা পরে অসট্রালোপিথেকাসের স্বাভাবিক মৃত্যুও তার ফসিল রেখে গিয়ে থাকতে পারে।

শুষ্ক তৃণপ্রান্তরে বা বনে যখন দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে মানুষ তখন দেখল ছোট বড় জীব জন্তুর সন্ত্রস্ত পলায়ন। হয়তো এর থেকেই সে শিখল আগুনকে অস্ত্র রূপে কাজে লাগাতে, লেলিহান বহ্নি শিখার ভয় দেখিয়ে বন্য পশুকে আস্তানার থেকে দূরে রাখতে, প্রকান্ড ভালুক ও খড়্গদন্ত বাঘকে তাদের গুহা থেকে তাড়িয়ে নিজে তা দখল করতে। নিশ্চয় তখন তার মনে হল যে এই অস্ত্রের সাহায্যে দল বেঁধে শিকারও সহজ হবে। নীরস প্রান্তর জ্বালিয়ে দিয়ে ছোট প্রাণীদের, বনে আগুন ধরিয়ে বড় পশুদের সে বার করল

বাইরে, সেখানে বৃহত্তম জন্তুকেও কাবু করা যায়। কখনও হয়তো শিকারীরা পশুর দলকে গোল করে ঘিরে আগুন লাগিয়েছে, আতঙ্কিত প্রাণীরা তার থেকে মুক্তি পেতে জ্ঞান হারিয়ে ঘাতকের দিকেই ছুটে এসেছে, তখন অনেকে প্রাণ দিয়েছে বর্শা, লাঠি ও হাত-কুড়ালের আঘাতে। অবশ্য আগুন নিয়ে খেলার যে বিপদ তাও মানুষ টের পেয়েছে, তারও হাত পা পুড়েছে, অনেক শিকারী হয়তো নিজেদের ফাঁদে পড়েছে। সুতরাং আগুনের চরিত্র সম্বন্ধে জানতে হয়েছে তাকে, আজ যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি এই জানার মধ্যে ছিল তার অঙ্কুর। অভিজ্ঞতার থেকে সে সাবধান হতে শিখল, যৌথ সহযোগিতা এবং পূর্বনির্ধারিত সযত্ন পরিকল্পনার ফলে বিপদ কমল, অন্য দিকে এই প্রচেষ্টা সাহায্য করল মেধার বিকাশকে।

সহযোগিতা ও সামাজিক জীবন আরও পরোক্ষ তাগিদ পেয়েছে আগুনের থেকে। শীত আমাদের টানে বাইরের থেকে ঘরের নিবিড় আরামের দিকে, সুতরাং অপরের সান্নিধ্যে। গুহা বা মুক্ত প্রান্তরে ইরেকটাসের আড্ডায় এই প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জ্বলন্ত ডালপালার আশেপাশে, সেখানে শীত ও শত্রু দূরে রেখে চলেছে রান্না, খাওয়া এবং তার পর ছোটদের খেলা, বড়দের গল্প স্বল্প, এ ভাবে দেহের সুখ ও মনের স্বস্তি যুগিয়েছে আগুন। প্রধান আলোচ্য দিনের কৃত কাজ এবং অভিজ্ঞতা, যেমন শিকারের ভাগ্য বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। অনুমান করা হয় এক একটি যাযাবর দলে ২৫ জনের মত লোক ছিল, বিশেষ কোনও নেতা ছিল না তাতে। অনেকটা হাত মুখ নেড়ে আধো আধো ভাষায় বর্ণনার প্রচেষ্টায় নতুন নতুন শব্দ জন্ম নিয়েছে, আগুন বোঝাতে কিছু একটা ধ্বনি আগেই উদভাবিত হয়েছে। সূর্যাস্তের পরেও আগুনের আভায় হাতিয়ার তৈরি বা অন্য কাজ সম্ভব হওয়াতে দিন এবং গৃহজীবন প্রলম্বিত হল। মাঝে মাঝে উঠে কেউ নতুন জ্বালানি খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে অমূল্য অনল। আস্তানা যতই অস্থায়ী হক, হয়তো এই আগুন জিইয়ে রাখতে মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে 'ঘরে' থেকেছে, পুরুষরা দিনের শেষে শিকার কাঁধে করে ফিরেছে, আধুনিক কালের উপার্জকদের মত। বিশ্রাম, আহার, আলাপের পর ক্লান্ত মানুষগুলি পশু চর্ম বিছিয়ে অথবা শুধু তৃণ শয্যায় শুয়ে পড়েছে একে একে।

সুতরাং ভাষা, সাহচর্য, সহযোগিতা, গৃহস্থালি ইত্যাদি সামাজিক বৈশিষ্ট্যের

দিকে আগুন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে মানুষকে অনেকটা এগিয়ে দিল, তাও মস্তিষ্ক বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূল। অবশ্য এই বৃদ্ধিতে বিপদও বেড়েছে। আমরা আগে দেখেছি দ্বিপদ গতি এবং খাড়া দেহে দ্রুত অভিব্যক্তির ফলে নানা সুবিধার সঙ্গে কিছু কিছু দুর্ভোগ আমাদের এখনও চলছে। তেমনি মেধা বুদ্ধিরও দুটি দিক আছে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পূর্ণগঠিত মস্তিষ্ক যার যত বড়, শৈশবে সে তত অসহায়। ঘোড়ার বাচ্চা জন্মের দু এক ঘন্টার মধ্যে দাঁড়ায়, এক দিন পরে মায়ের সঙ্গে ছোটে। সদ্যোজাত বেবুন মায়ের লোম ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, এক বছরে প্রায় স্বাবলম্বী সে, কিন্তু এতটা স্বাধীন হতে মানব শিশুর কেটে যায় প্রায় ছ বছর, তার প্রথম দু বছর সে সম্পূর্ণ মাতৃনির্ভর। এর কারণ আধুনিক মানুষের মস্তিষ্ক জন্ম কালে আকারে পূর্ণ মাপের মাত্র ২৫ শতাংশ, যেখানে সদ্যোজাত শিমপানজির ৬৫ শতাংশ এবং অসট্রালোপিথেকাস ও হোমো ইরেকটাসের যথাক্রমে আনুমানিক ৪০-৫০ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ। গর্ভের বাইরে বৃদ্ধি কালে মস্তিষ্ক শেখে বহির্জগৎকে আয়ত্ত করতে, সুতরাং জন্ম কালে যার আপেক্ষিক আয়তন যত ছোট তার তত দেরি হয় স্বনির্ভর হতে।

কিন্তু মানুষ আরও বর্ধিত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় না কেন? তার কারণ ভ্রূণের মাথাটা দেহের বৃহত্তম অঙ্গ, আরও বড় হলে মায়ের শ্রোণীচক্রের দরজায় তা বাধা পেত, পূর্ণ মাপের অর্ধেক হলেও মা এবং শিশু বাঁচত না। সুতরাং প্রকৃতি মাঝামাঝি একটা রফা করেছে—আয়তনে ও গুণে মানব মস্তিষ্ক অনেক উন্নত হবে, কিন্তু এই বৃদ্ধির অধিকাংশ ঘটবে ভূমিষ্ঠ হয়ে। এর ফলে এক দিকে যেমন শৈশবে মানুষের অসহায়তা বাড়ল, আবার এই পরনির্ভরতার থেকেই সহযোগিতা গড়ে উঠে সমাজ বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে তাকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। অসট্রালোপিথেকাস ও হোমো ইরেকটাসের মগজের সম্পূর্ণ ও জন্মকালীন মাপ তুলনা করে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে ইরেকটাসের কালে সামাজিক অগ্রগতি অনেকটা বেড়ে যাওয়া উচিত, এবং বাস্তবিক প্রত্নতাত্ত্বিক নজিরে তার সমর্থন মেলে।

হোমো ইরেকটাসের সমাজ জীবন ও বিবিধ ক্ষমতার ,এই চিত্রটি যে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নয় তার নজির আছে নানা দেশে। এ বিষয়ে মধ্য স্পেইনে

তরালবা ও আমব্রোনা এবং দক্ষিণ ফ্রানসে তেরা আমাতার কাহিনী আরও বিস্ময়কর, কারণ সে সব ক্ষেত্রে তার ফসিলের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় নি। স্পেইনের ঐ অঞ্চল তখন প্রচণ্ড শীতে জর্জরিত ছিল, ঘাঁটি দুটির বিভিন্ন স্তর থেকে ক্লার্ক হাওএল যে সব হাতিয়ার ও অন্যান্য বস্তু উদ্ধার করেছেন তা সেই প্রাচীন অধিবাসীদের শিকার রীতির অনেকটা পরিচয় দেয়। হাড় দেখে বোঝা যায় হাতি, ঘোড়া, বুনো ষাঁড়, গণ্ডার, হরিণ, বানর, পাখি ইত্যাদি তারা খেয়েছে। দূরে দূরে ছড়ানো পোড়া কাঠ ও কারবনের সাক্ষ্য থেকে হাওএল মনে করেন তারা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে হাতি তাড়া করেছিল, যদি তাকে কাদায় এনে ফেলে থাকতে পারে তো চার দিক থেকে বর্শা বিঁধিয়ে বধ করা অনেক সহজ হয়েছে। এক জায়গায় মাটিতে এক গর্তে প্লাসটার ঢুকিয়ে ছিদ্রটির আকৃতি জানা গেল, তা বর্শার মুখের মত, অর্থাৎ কাঠ পচে শুধু তার ছাপটি রেখে গিয়েছে। এ ছাড়া ছোট ছোট কাঠের খণ্ড থেকেও বোঝা যায় শিকারীদের হাতে পাথুরে হাতিয়ারের সঙ্গে বর্শাও ছিল।

নিহত পশুর হাড়গুলি যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং তাদের আকার আকৃতি ও চেহারা থেকে অনেক নির্দেশ মেলে। মনে হয় শিকারীরা সবচেয়ে সুস্বাদু অংশগুলি কেটে অন্যত্র নিয়ে যেত, সেখানে তা ছোট ছোট টুকরো করেছে এবং কিছু হাড় ফাটিয়ে মজ্জা বার করেছে। এখানে সেখানে ভাঙা ও পোড়া হাড় দেখে অনুমান হয় মাংস কাটার পর ভোজ হত অন্যত্র। হাতির খুলি ভেঙে ঘিলুও খেয়েছে তারা। এই অতিকায় জন্তু যে ছিল এক প্রধান শিকার, অস্থির প্রাচুর্য তার প্রমাণ দেয়। দলে যতই লোক থাকুক বিশ টন ওজনের একটি হাতি এক বারে খাওয়া সম্ভব নয়, হয়তো কাটা মাংস তারা রোদে শুকিয়ে নিত যেমন এখনও অনেকে করে, হালকা বলে শুকনো মাংস বয়ে বেড়াতেও সুবিধা হয়েছে। ফাটানো এবং পোড়া হাড়ের স্তূপ আবিষ্কার হয়েছে, প্রতিটিতে প্রায় সব রকম নিহত প্রাণীর কিছু কিছু অস্থি দেখা যায়, তা বোধহয় নিজেদের মধ্যে সমান মাংস ভাগাভাগির নির্দেশক। আজও শিকারী-সংগ্রাহক গোষ্ঠীদের মধ্যে এ রকম সাম্য বোধ প্রায়ই বর্তমান।

আমব্রোনায় এক স্থলে দেড় মিটার লম্বা একটি হস্তী দন্ত দুই প্রকাণ্ড উরু অস্থির সঙ্গে মুখোমুখি একই রেখায় স্থাপিত ছিল, মনে হয় যেন

সাজানো। প্রশ্ন ওঠে এটা কি কোনও রকম অনুষ্ঠানের চিহ্ন। যারা বৃহৎ জন্তু শিকার করে তাদের মধ্যে এখনও অনেক সময়ে সেই জন্তুর প্রতি ভক্তিও দেখা যায়। কিন্তু কল্পনা করা কঠিন যে হোমো ইরেকটাসের মাথায় এই ধরনের আধ্যাত্মিক চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, বিশেষত যখন হাতির পা ও বুকের হাড় লম্বালম্বি চিরে পাথর দিয়ে ঠুকে ফলক খসিয়ে শাবল, ছেদনাস্ত্র ও হাত-কুড়াল জাতীয় যন্ত্র বানাতেও ভক্তির হানি হয় নি।

তরালবাতে শিকারীরা অন্তত ১০ বার ঘুরে ফিরে এসেছে, কিন্তু হাওএল এবং তাঁর সহকর্মীরা বলতে পারেন না তারা একই দল কিনা অথবা তা ঠিক কত কাল আগের কথা। তবে উদ্ভিদতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের নজির থেকে অনুমান সেখানে তাদের যাতায়াত ছিল অন্তত তিন লাখ বছর আগে, সম্ভবত চার লাখের কাছাকাছি। প্রধান ঘাঁটি থেকে এই যে তারা দূরে দূরে ছড়িয়েছে তা নিশ্চয় শিকার ও খাদ্যের খোঁজে, সেখানে যে আবার ফিরে আসতে পেরেছে তাতে বোঝা যায় তারা পথ চিনতে শিখেছিল। এই গুণটি শিকার সন্ধানের একটি কৌশলেও প্রতীয়মান ; শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যে দিন যে জন্তু চোখে পড়ল তাই মারতে চেষ্টা করে নি এই আদি স্পেনীয়রা, প্রতি বছর কোন ঋতুতে কোন পশু দল স্থান পরিবর্তন করে তা জেনে ভবঘুরের দল সেই পরিযাণ পথে সে সময়ে হাজির হয়েছে। এই স্মৃতি শক্তি উন্নত মস্তিষ্কের পরিচায়ক এবং যাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চল থেকে বংশানুক্রমে দেশ মহাদেশ অতিক্রম করেছে যাযাবর বৃত্তি হয়তো তাদের রক্তের মধ্যেই ছিল।

হোমো ইরেকটাসের বাস কালে ভূমধ্য সাগর কূলে তের্‌রা আমাতা আরও ঠাণ্ডা ও আর্দ্র ছিল, এখন সাগর নেমে গিয়েছে ২৬ মিটার। প্রত্নবিৎ দ লুমলের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে সেখানে যে সব আশ্চর্য ও নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তার কাহিনী তাঁর নিজের উক্তি দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে : "প্রতিটি স্তর যেন বইয়ের এক একটি পৃষ্ঠা, পড়তে পড়তে আমরা আদি মানবের ইতিহাস জানতে পারি।" প্রথম পৃষ্ঠা একটি ভিটে, দৈর্ঘ্যে ১২ মিটার প্রস্থে ছ মিটার, তা ঘিরে ডালপালা দিয়ে গড়া হয়েছিল এক অস্থায়ী আশ্রয় বা ছাউনি। ভিটের মাঝখানে এক জায়গায় আগুন জ্বালা

হয়েছে, তার তাপে সেখানে বালি বিবর্ণ, বাসিন্দারা হাওয়া আটকাতে জায়গাটা ঘিরে যে পাথর সাজিয়েছিল তা আজও যথাস্থানে নীরব সাক্ষী। ঐ অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া এখনও প্রবল। উননের চার পাশে মেঝের কিছুটা অংশ আবর্জনামুক্ত, সম্ভবত অধিবাসীরা আগুন ঘেঁষে ঘুমিয়েছিল বলে। কয়েক পা দূরে কেউ একটা চ্যাপটা পাথর এনে পেতেছে, সেখানে বসে কখনও কোনও মিস্ত্রী সাধনী বানিয়েছে, তার সাক্ষ্য রয়েছে ইতস্তত ছড়ানো হাতিয়ার আর খণ্ডিত পাথরে। এমনি এগারোটি টুকরো জুড়ে অনুসন্ধানীরা একটি সম্পূর্ণ পাথর আবার সৃষ্টি করেছেন। সবচেয়ে অবাক লাগে প্রায় চার লক্ষ বছর আগে কার যেন পা একটু পিছলে গিয়ে মেঝোতে স্পষ্ট তার ছাপ রেখে গিয়েছে, লিটোলি ও তুর্কানার পদচিহ্ন যদি প্রকৃত মানুষের না হয় তবে এ যাবৎ এগুলি প্রাচীনতম।

এই সব ডেরা যে দু দিনের বাসা তা বোঝা যায় এই দেখে যে মেঝে-গুলি পায়ের চাপে চাপে শক্ত হয় নি, সেখানে বর্জিত শিলা খণ্ডগুলির উপর চলাফেরার চিহ্নও সামান্য। দ লুমলের দল স্তরে স্তরে এ রকম একুশটি ভিটে উদ্ধার করেছেন, সম্ভবত এক শতাব্দী ধরে ছাউনিগুলি গড়া হয়েছিল বালুচরে, সাগর উপকূলে এবং বালির ঢিবি বা বালিয়াড়ির উপর। ঢিবির উপর একই স্থলে সম্ভবত একই গোষ্ঠী প্রতি বছর ফিরে এসে ছাউনি বানিয়েছে—ভিটের টানে হয়তো। ঘরগুলি সবই প্রলম্বিত ডিমের আকারে তৈরি, তবে ছোট বড়, প্রায় নয় থেকে ১৫ মিটার লম্বা, চার থেকে ছয় মিটার চওড়া। এদের আকৃতি জানা গিয়েছে খুঁটিগুলির গর্ত এবং হাওয়ার বিরুদ্ধে ডালপালার দেয়াল মজবুত করতে বাইরে তার গায়ে ঠেসানো বড় বড় পাথর থেকে। প্রতি ভিটের কেন্দ্রে আগুন জ্বালবার জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে পাথর বসিয়ে, নয়তো মেঝেটা অল্প খুবলে, প্রতি চুলার পাশে হাওয়া আটকাবার জন্য পাথর সাজানো। এক ভিটেতে চুলার অদূরে একটি বড় পাথরের মসৃণ গায়ে ছোট ছোট কাটা দাগ দেখে দ লুমলে বলেন ওর উপর মাংস কাটা হয়েছিল, আশেপাশে নানা প্রাণীর হাড়ও তার সাক্ষী। ছাউনির মধ্যে এই 'রান্নাঘরের' কাছেই কিন্তু 'পায়খানা', সেখানে অশ্মীভূত মল থেকে মনে হয় জায়গাটা ঐ উদ্দেশ্যে আলাদা করা

ছিল। এই ফসিল পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা জানলেন হোমো ইরেকটাস ছাউনিটি বানিয়েছে বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে; ঐ সময়ে যে সব ফুল ফুটত তাদের পরাগ রেণু চতুর্দিকে ছড়িয়ে মানুষের খাদ্যেও পড়েছে, পেটে গিয়েছে, বিজ্ঞানী এখনও তাদের চিনতে পেরেছেন।

ঐ ঋতুতে তের্‌রা আমাতায় অপর্যাপ্ত শিকারের জন্তু দেখা দিত, সেই লোভেই যে তখন বাসা বাঁধা হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে নানা প্রাণীর হাড়—কচ্ছপ, পাখি এবং অন্তত আট রকম স্তন্যপায়ী। শিকারীরা খরগোশ এবং ঐ জাতীয় প্রাণী খেয়ে থাকলেও তাদের নজর ছিল বৃহত্তর মাংসালো পশুর দিকে। বাচ্চাদের হাড় অনেক দেখা যায়, নিশ্চয় তাদের মারা সহজ বলে। সর্বাধিক হাড় লাল হরিণের, তার পর যথাক্রমে এক জাতের লুপ্ত হাতি, বন্য বরাহ, বুনো পাহাড়ী ছাগল, এক লুপ্ত দুই-শিং গণ্ডার, সবচেয়ে কম হাড় বুনো ষাঁড়ের। এ ছাড়া সমুদ্র থেকে তারা যে খাদ্য সংগ্রহ করেছে তার প্রমাণ দিচ্ছে শামুক ঝিনুক ইত্যাদির খোল এবং মাছের কাঁটা।

এই বালিয়াড়িবাসীদের হাতিয়ারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত পাত যন্ত্র দেখা যায়, অর্থাৎ পাথর থেকে পাত খসিয়ে সেটিকে তারা উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংস্কার করেছে। একটি ফলা আগ্নেয়গৈরিক শিলা থেকে তৈরি, এই পাথর ৪৮ কিলোমিটারের মধ্যে নেই, সুতরাং নিশ্চয় তারা সঙ্গে করে এনেছে। এ ছাড়া হাড়ের অস্ত্রও দেখা যায়। এক মুখ পিটিয়ে সরু করা হাতির পায়ের হাড়, পুড়িয়ে শক্ত করা হাড়, ব্যবহারে ভোঁতা হাড় ইত্যাদি ছাড়া একটি ছিদ্রকর শলার মুখটা এত লম্বা ও তীক্ষ্ন যে মনে হয় তা দিয়ে পশুর চামড়া ফুটো করা হয়েছে, হয়তো কোনও রকম পরিধান বানাতে। একটি বড় চুলার চার পাশে বালিতে স্পষ্ট পশু চর্মের ছাপ থেকে বোঝা যায় গৃহবাসীরা সেখানে তা গায়ে জড়িয়ে বা পেতে বসেছে কিংবা শুয়েছে। যারা বালুচরে ও সাগর সৈকতে বাসা বানিয়েছে তাদের ছাউনিগুলি এই ঢিবি-বাসীদের তুলনায় প্রাচীনতর।

তের্‌রা আমাতায় প্রাপ্ত কয়েক খণ্ড ক্ষয়িত লাল গেরিমাটি থেকে জল্পনা হয়েছে যে এখানে মানুষ রং মেখে অঙ্গ সজ্জা করেছে, হয়তো বা কোনও উৎসব উপলক্ষে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা ব্যবহারিকও হতে পারে, এখনও কোনও কোনও

অঞ্চলে আদিবাসীরা প্রখর সূর্যের থেকে ত্বক বাঁচাতে চর্বির সঙ্গে এই রং মিশিয়ে গায়ে লাগায়।

এক জায়গায় বালিতে একটি গোল ছাপ রয়েছে, ঘটি বসালে যেমন হয়। দ লুমলে মনে করেন তা কোনও পাত্রেরই ছাপ, সম্ভবত কাঠের তৈরি জলাধার। তাঁর জল্পনা আরও দূরে দৌড়েছে; বর্তমানে এক অঞ্চলের রেড ইনডিয়ানরা খাদ্য সিদ্ধ করে তার সঙ্গে মিশ্রিত জলে গরম পাথর ফেলে, তিনি বলেন হোমো ইরেকটাসও এই উপায়ে রান্না করে থাকতে পারে। যাই হক, ইরেকটাস পাত্র ব্যবহার করে থাকলে তা সম্ভবত নানা কাজে লেগেছে। পরিব্রাজক শিকার-সন্ধানীদের নিশ্চয় সঙ্গে কিছু মাংস, জল ও আগুন নিতে হয়েছে, কোথাও পছন্দ মত পাথর দেখলে তাও কুড়িয়ে নিয়েছে তারা। মেয়েরা ও ছোটরা ফল মূল বিচি বাদাম সংগ্রহ করেছে। এই ভবঘুরের দল এ সব কিছু শুধু হাতে করে বয়ে বেড়িয়েছে তা প্রায় অকল্পনীয়। হয়তো চামড়া দিয়ে রুক্ষ থলী, কাঠ পাথর এমন কি মাটি দিয়ে ঘটি বাটি বানিয়েছে তারা। তেমনি উত্তরাঞ্চলে পেঁৗছে শীতের তাড়নায় তারা লোমশ পশু চর্ম থেকে প্রথম পরিধান বা আচ্ছাদনও উদভাবন করে থাকতে পারে। শীতের দেশে ফল ও সবজি কম জুটেছে বলে দায়ে পড়ে শিকারে নির্ভরতা, সুতরাং তাতে দক্ষতাও বেড়েছে নিশ্চয় এবং চামড়াও সংগ্রহ হয়েছে বেশী। শীত নিবারণ ছাড়া এই আবরণ শিকারীদের দেহের ক্ষত বাঁচিয়েছে। লজ্জা বা সজ্জার ধারণা অনেক পরে দেখা দিয়েছে মানুষের মনে।

এত তথ্য জানার পর আমরা তের্রা আমাতায় প্রায় চার লক্ষ বছর আগের একটি দিন কল্পনা করতে পারি। তখন বসন্ত শেষ হয়ে এসেছে, জন পঁচিশ রুক্ষমূর্তি নর নারী ও শিশুর পদযাত্রা শেষ হল ভূমধ্য সাগর কূলে। দেখে শুনে তারা এক বালুঢিবির উপর জায়গা বেছে নিল বাসা বাঁধবে বলে; এখানে অনেক সুবিধা, শিকারীরা দেখল দূরে এক পাল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে, মেয়েরা কাছেই সন্ধান পেল রসালো সবজি, শিকড় ইত্যাদির, তা ছাড়া অদূরে টলটলে জলধারা বয়ে চলেছে, সুতরাং পানীয় জলের অভাব নেই, পিছনে চুনাপাথরের প্রাচীর কনকনে হাওয়া কিছুটা আড়াল করেছে। অতঃপর দলটি কয়েক ভাগ হয়ে কাঠকুড়ানি কাজে গেল, বাসা বানাবার জন্য খুঁজে নিয়ে

এল গাছের চারা, ভাঙা ডাল, মাটিতে শুয়ে-পড়া বা সাগর জলে ভেসে-আসা মরা গাছ আর কিছু পাথর। হাত আর হাত-কুড়াল দিয়ে পাতা এবং সরু ডালপালা ছাড়িয়ে কয়েক জন বানাল খুঁটি, তখন পুরুষরা সকলে মিলে প্রকাণ্ড এক ডিমের আকৃতি অনুযায়ী চারা গাছগুলি বালিতে ঢুকিয়ে ভিতরে আরও বড় গাছের দণ্ড গেঁথে দিল দেয়ালের জোর বাড়াতে, সব শেষে চারা গাছের মাথাগুলি মুখোমুখি বেঁধে ছাত তৈরি হয়ে গেল। বাইরে দেয়ালের গায়ে পাথরগুলি চেপে বসিয়ে সমাপ্ত হল মাথা গুঁজবার ঠাঁই।

এ বার সকলে ভিতরে এসে জুটল, তাদের চোখ এক বুড়ির দিকে, দলের অগ্নিবাহিকা সে। মেঝের কেন্দ্রে বড় বড় গোল পাথর অর্ধবৃত্তাকারে সাজিয়ে বৃদ্ধা ভিতরের অগভীর খোবলে শুকনো ডাল পাতা রাখল, তার পর সকলের দৃষ্টির সামনে এক বাটির উপর থেকে ঘাসের চাপড়া সরিয়ে উন্মুক্ত করল গনগনে ছাই। ফুঁ দিতে দিতে লাফিয়ে উঠল বহ্নির জিহ্বা, তার থেকে উনন ধরাতে দেরি হল না। একাধারে রান্না, আগুন পোহানো ও বন্য পশুকে দূরে রাখার ব্যবস্থা হল। তখন দিন শেষ হয়ে আসছে, মেয়েরা অদূরে বনের দিকে গেল উদ্ভিজ্জ আহার্যের খোঁজে। কিন্তু এক তরুণী কয়েকটি সঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়ে চলল সমুদ্রে, কয়েক পা জলে নেমে ফিরে দাঁড়াল তারা। তাদের নজর মাছের দিকে, যেই ছোট মাছের দল চোখে পড়ে, গা ঠেকাঠেকি করে তিন দিক ঘিরে সাবধানে তাদের তাড়িয়ে পাড়ের দিকে নিয়ে আসে, কিছু পালিয়ে যায় পায়ের ফাঁক দিয়ে, কিন্তু কয়েকটিকে খপ করে ধরে তারা ছুঁড়ে ফেলে বালিতে।

এ দিকে নবনির্মিত বাসার কাছে দাঁড়িয়ে পুরুষরা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বনের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সেখান থেকে কিসের আওয়াজ শুনে বর্শা আর পাথর তুলে নিয়ে তারা ছুটল। ভিতরে ঘরের এক কোণে বসে এক যন্ত্র-শিল্পী তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে, দক্ষ হাতে এক কঠিন পাথর দিয়ে চকমকি বা চুনাপাথরে ঘা মেরে দেখতে দেখতে বেশ কিছু ছুরি কাটারি বানিয়ে ফেলল সে। কোনও কোনও খণ্ড আগুনে শক্ত করা হরিণ শিং দিয়ে সযত্নে ঠুকে ঠুকে তৈরি হল বিশেষ পাতলা বা সরু হাতিয়ার। তার দেখাদেখি এক দল ছেলে পাথর ভাঙতে চেষ্টা করে সৃষ্টি করছে অকেজো ভগ্নাংশ। এদের

চেয়ে কিছু বড়রা বাইরে লাঠির মুখ চোখা করে নিয়ে বর্শা নিক্ষেপ অভ্যাস করছে, কোনওটা বালির গায়ে লক্ষ্যের কাছাকাছি পেঁছালে তাদের আনন্দ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এখনও শিকারীদের দলে ঢুকতে পারে নি তারা, হঠাৎ দূরে তাদের আসতে দেখে সে দিকে ছুটল সবাই। সকলে মিলে যখন ফিরল দেখা গেল শিকারীদের হাতে এক বুনো শুয়োরের বড় বড় খণ্ড, ঘরে বসে তারা সেগুলি সদ্যনির্মিত অস্ত্র দিয়ে আরও ছোট করে কাটল, অখাদ্য অংশ বাদ দিল। দেখতে দেখতে দলা দলা মাংস লাঠির মাথায় চড়ে খোলা চুলার উপর ঝুলল, আগুন ঘিরে বসে অবিলম্বে শুরু হল মাংস মাছ ঝিনুক ফল ইত্যাদি নানা পদের ভোজ। শেষ হতে হতে বাইরে অন্ধকার জমে এসেছে, যে যার পশুর চামড়া পেতে সেখানেই শুয়ে পড়ল, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কনকনে হাওয়া ঢুকছে, কেউ কেউ গায়েও চাপাল চামড়ার কম্বল। সারা রাত ধিকি ধিকি জ্বলবে আগুন।

এখানে মাত্র তিন দিন কাটিয়ে ভিটে ছেড়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়েছিল, বছর বছর ফিরে এসে একই জায়গায় ঘর বানিয়েছে। কিন্তু এক বার গিয়ে আর এল না—এখান থেকে মাঝে মাঝে কোথায় তারা যেত এবং শেষ পর্যন্ত কেন এল না তা কেউ জানে না।

পশ্চিম য়োরোপে হোমো ইরেকটাস অপর্যাপ্ত নীরব সাক্ষী রেখে গিয়েছে, তা জুড়ে জুড়ে অনুসন্ধানীরা তার জীবন রীতির যে একটি বেশ সম্পূর্ণ কাহিনী পুনরায় সৃষ্টি করেছেন তা আমরা দেখলাম। অথচ তার নিজের চিহ্ন স্বরূপ একটি দাঁত পর্যন্ত নেই—যারা মশাল আর বর্শা হাতে হাতি তাড়া করতে করতে তরালবার অরণ্য প্রান্তর চিৎকারে মুখরিত করেছে, সাগর তটের অস্থির বালিতে মানুষের প্রথম ঘর তুলেছে, তারা সব অস্পষ্ট নেপথ্যচারী—এ যেন এক ভূতের নাটক।

কিন্তু পূব দিকে দুই মহাদেশ পার হয়ে চীন দেশে গুহাবাসী হোমো ইরেকটাসের অন্য এক দৃশ্য দেখি, সেখানে প্রত্যক্ষ ফসিল এক নৃশংস নাটকেরও সাক্ষী। প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে সম্ভবত দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চল থেকে সে যখন জোকোডিয়েনে এল তখন শিকারী মানুষের চোখে জায়গাটির কতগুলি সুবিধা নিশ্চয় ধরা পড়েছে—জলের অভাব নেই, নিচেই নদী বয়ে যাচ্ছে,

তার পর তৃণপ্রান্তরে যে সব পশু চরে বেড়াচ্ছে উপর থেকে তাদের স্পষ্ট দেখা যায়, আগুন জ্বালবার কাঠও প্রচুর, গুহার ভিতরে বসে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার থেকে অনেকটা বাঁচা যায়। কিন্তু পশুরাও এই নবাগতদের কাছে এমন আরামের আশ্রয় ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সুতরাং গুহার দখল নিয়ে মানুষ আর পশুর কাড়াকাড়ি চলেছিল অনেক কাল, তার ইতিহাস লেখা আছে স্তরে স্তরে। পাহাড়ের গা উপর নিচে চিরে উনমোচিত এই স্তরগুলিকে তুলনা করা যায় ১৬-১৭ তলা উঁচু এক বাড়ির সঙ্গে, প্রতিটি তলা প্রাকৃতিক আবর্জনায় ঠাসা, যথা বাতাসে বয়ে আনা ধুলো বালি, ছাত থেকে খসে পড়া পাথর, চুনাপাথর থেকে চুঁইয়ে পড়া বস্তু। এর মধ্যে মধ্যে মানুষ ও পশুর নানা অবশিষ্ট। বেশ বোঝা যায় বৃহৎ মাংসাশী পশুরা অনেক কাল ধরে কয়েক বার গুহাগুলি অধিকার করেছে, সে সব স্তরে খড়্গদন্ত বাঘ, গুহাবাসী ভালুক, চিতাবাঘ এবং এক অতিকায় লুপ্ত হায়নার ও তাদের ভুক্ত জন্তুর হাড়। আবার অন্যান্য তলায় মানুষ যে হিংস্র জন্তুদের হটিয়ে জায়গা দখল করেছে তারও স্পষ্ট নজির রয়েছে তার নিজের ফসিল ও হাতিয়ারে, পোড়া হাড় ও ভস্মে। প্রথম দিকে অর্থাৎ নিম্ন তলাগুলিতে প্রায় পর পর মানুষ ও পশুর বাস, উপর দিকে দেখা যায় যে মানুষ জিতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে।

হয়তো পিকিং মানব প্রায় তিন লক্ষ বছর জোকোডিয়েনে ছিল। তার ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে পাওয়া যায় প্রায় ৬০ প্রজাতির হাড়, ছোট জন্তুর মধ্যে ইঁদুর জাতীয় বিভিন্ন রোডেন্ট এবং বাদুড় থেকে আরম্ভ করে ভেড়া শুয়োর ভালুক ঘোড়া মোষ উট গণ্ডার এবং হাতি পর্যন্ত। হাড়ের প্রাচুর্য সাক্ষ্য দেয় যে সবচেয়ে পছন্দ ছিল হরিণের মাংস। অবশ্য এই সব হাড়ের কিছু কিছু মাংসাশী পশুরাও এনে থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের এক বৈপ্লবিক বিচিন্তা উল্লেখযোগ্য। জন কয়েক বিশেষজ্ঞ তাঁদের গ্রন্থে ও নিবন্ধে প্রাক্‌মানব বা মানুষের ফসিলের কাছাকাছি প্রাপ্ত প্রাণীর হাড়ের তাৎপর্য সম্বন্ধে এই মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন যে এদের মধ্যে কে ভক্ষক এবং কে ভক্ষ্য। দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের সি. কে. ব্রেইন এর জবাব খুঁজতে সোআর্টক্রানস গুহায় খুঁড়ে উদ্ভিদভুক্ প্রাণীর এবং অসট্রালোপিথেকাসের অস্থি খণ্ড সংগ্রহ করেন, আজকের বহু পাখি ও স্তন্যপায়ীর

মাংসাহার থেকে জমে-ওঠা হাড় পরীক্ষা করে দেখতে তিনি কখনও কখনও তাদের গুহা ও বাসায় ঢুকেছেন। এই একাগ্র সমীক্ষার থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত হল অসট্রালোপিথেকাস শিকারী নয়, নিঃসন্দেহে তাকেই শিকার করা হয়েছে। অন্য এক বইতে লুইস বিনফোর্ড মানুষের ও পশুর আক্রমণে নিহত প্রাণীর অস্থির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, যেমন এক এসকিমো সম্প্রদায় যখন বলগা হরিণের মাংস কেটে বার করে তখন হাড়ে যে রূপান্তর ঘটে তার সঙ্গে নেকড়ের ভুক্ত জন্তুর অস্থি খণ্ডের আকার আকৃতি ও ক্ষয় ক্ষতির তুলনা করে। এর ফলে তাঁর অভিমত হল বিভিন্ন ঘাঁটিতে পশুর হাড় থেকে যে ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষই শিকার করেছে অথবা কেবল মানুষের কাজের ফলেই হাড় জমে ওঠে তার নিঃসংশয় সাক্ষ্য নেই। পুরামানবের শিকার ও মাংসাহার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে রাখা ভাল, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন পোড়া হাড় থাকলে, মানুষই যে ভক্ষক তাতে সন্দেহ থাকে না। সাধারণত গুহায়, নদী কূলে ও প্রাচীন বিশুষ্ক হ্রদের গায়ে ফসিল পাওয়া যায়, কি করে তা জমে ওঠে তা এখন এক নতুন বিদ্যার বিষয়। আক্রামক প্রাণীর কাজকলাপ, বন্যা বা ভূমিক্ষয় ইত্যাদির প্রভাবে হাড় সরে যেতে পারে ইতস্তত, তার ক্ষতি বা পরিবর্তন ঘটতে পারে, সুতরাং কোনও কোনও জন্তু যেখানে সমাধিস্থ ছিল সেখানে হয়তো মরে নি।

পিকিং মানবের গুহাগুলি পাকাপাকি দখলের সময় থেকে ক্রমাগত আগুন ব্যবহারের প্রমাণও দেখা যায়। কিন্তু সে পশুর মাংস ছাড়া নর মাংসও খেয়েছে কি? গুহাতে মানুষের পোড়া হাড়ও বর্তমান, তা ছাড়া আছে ঘা মেরে ফাটানো খুলি। এগুলির চেহারা দেখে কোনও কোনও প্রত্নবিজ্ঞানী মনে করেন যে মাথাগুলি ফেটেছে খুনীর আঘাতে এবং পরে খুলিকে খোলা হয়েছে যেন ঘিলু বার করবার জন্য, সুতরাং আপন জাতভাইদের মেরে খেতে পিকিং মানবের আপত্তি ছিল না। সভ্য মানুষের চোখে এই রীতি বর্বরোচিত ও জঘন্য ঠেকলেও বহু কাল ধরে নানা উপজাতির মধ্যে নরখাদকবৃত্তি চলে আসছে। উইল ডুরান্ট তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে নরখাদকবৃত্তি প্রায় সব আদিবাসী সমাজে দেখা গিয়েছে, এমন কি আয়ার্ল্যানড, ডেনমার্ক (একাদশ শতাব্দ) ইত্যাদি য়োরোপীয় দেশেও। আফ্রিকার কংগো রাজ্যে জীবন্ত স্ত্রী

পুরুষ শিশু প্রকাশ্যে খাদ্যের বাজারে কেনা বেচা হত, নিউ ব্রিটেন দ্বীপে নর মাংস দোকানে বিক্রি হত। সলমন দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনওটিতে ভক্ষ্য মনুষ্যগুলিকে আগে খাইয়ে দাইয়ে নধর করা হত, যেমন ছাগল ভেড়া গরু শুয়োরকে এখন করা হয়, এবং বিশেষ নজর ছিল নারী মাংসের প্রতি। আবার কোথাও কোথাও জাতি অনুসারে পছন্দ ভেদ দেখা যায়; এক পলিনেশীয় দলপতি একদা ফরাসী পর্যটক পিয়ের লোতিকে জানায় যে ভাল করে ঝলসালে শ্বেতাঙ্গদের মাংস পাকা কলার মত সুস্বাদু হয়; ফিজি দ্বীপে আবার পলিনেশীয় নরমাংস লোভনীয়, সাহেবী পেশী বড় বেশী নোনতা ও শক্ত, য়োরোপীয় নাবিকরা অখাদ্য।

নরখাদক সমাজে এ সম্বন্ধে লজ্জা সংকোচ দেখা যায় না, কারণ তাদের চোখে মানুষের এবং জন্তুর মাংস খাওয়ার মধ্যে নৈতিক পার্থক্য নেই। ব্রেজিলে এক দলপতি মন্তব্য করে, "কেউ মরে গেলে নিশ্চয় তাকে নষ্ট করার চেয়ে খেয়ে ফেলাই ভাল, আমার শত্রু যদি আমায় মেরে ফেলে তো সে আমায় খেল কি না খেল তাতে কিছু এসে যায় না।" সব রকম সংস্কার ও আবেগ বাদ দিয়ে যুক্তির স্বচ্ছ আলোয় দেখলে এই দার্শনিক তত্ত্বের সংগে ঝগড়া করা যায় না। এক সমাজের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য অনুসারে যা গর্হিত দুর্নীতি অন্যত্র তার বিপরীতটাই হয়তো অন্যায়। যে বৃদ্ধ অন্যের বোঝা হয়ে অকেজো দিন কাটাচ্ছিল, মৃত্যুর পর সে তাদের উপকারে লাগল এই চেতনা শেষ জীবনে হয়তো তাকেও কিছু সুখ দিয়েছে। অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত শিশুদের খেয়ে ফেলে কোনও কোনও উপজাতির বিচারে একাধারে খাদ্য সমস্যা সহজ হয় ও জনসংখ্যা আয়ত্তে রাখা যায়। অনেক পৌরাণিক সম্প্রদায়ে মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কিছু নেই, তা নিষ্প্রয়োজন ও অপব্যয়। ১৬ শতকের ফরাসী প্রবন্ধকার মিশেল মঁতেইন পাশ্চাত্ত্য জগতে ধর্মের নামে অত্যাচার করে হত্যার অনেক দৃষ্টান্ত দেখে লিখেছেন এই রীতি মৃত ব্যক্তির মাংস ভক্ষণের চেয়ে বেশী বর্বর।

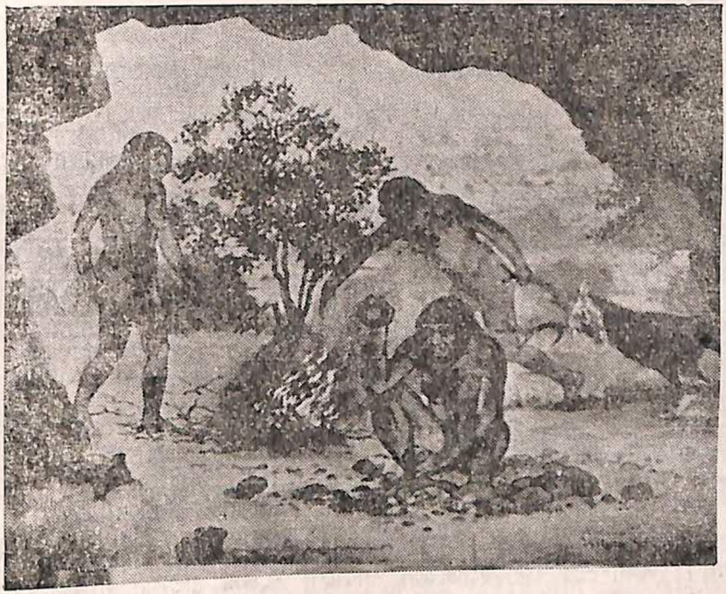
তা ছাড়া নৃবিজ্ঞানীরা বলেন যে আধুনিক নরখাদক সমাজে এই বৃত্তির আনুষ্ঠানিক বা সংস্কারগত তাৎপর্য আছে, পেটের জ্বালা বা অন্ধ হিংসা তার প্রেরণা নয়। নানা উপজাতি নিয়মিত মানুষের রক্ত খেয়ে থাকে, তা তাদের আচার অনুষ্ঠান বা ওষুধের উপাদান, অথবা হত বা নিহত ব্যক্তির

রক্ত পানে তাদের জীবনী শক্তি পাবে বলে। আবার নরখাদক সম্প্রদায়ে এও দেখা যায় যে খুনী নিহত ব্যক্তিকে খেয়ে ফেলল যাতে তার ভূত দেখা না দেয়, অথবা মৃতের আত্মীয়রাই তাকে খেল প্রতিশোধ নেওয়া সহজ হবে বলে। অনেক সমাজে ধারণা শত্রুর মাংস খেলে খাদক তার শক্তি ও সাহস লাভ করবে। ফন কোএনিগসহবালড বলেছেন, "মুন্ডশিকারী শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর খুলি সংগ্রহ করতে পেরেই সুখী নয়, সে তা ফাটিয়ে মগজটি বার করে খায় শত্রুর জ্ঞান ও ক্ষমতা পাবে বলে।" আদি মানব হোমো ইরেকটাসের পক্ষে সেটা চিন্তা শক্তির নিদর্শন বলে ভাবা যায়, তবে তার মাথায় ভাবনা এত দূর এগিয়েছে কিনা তা বলা যায় না।

নরখাদক বৃত্তির দৃষ্টান্ত প্রাচীন 'অসভ্য' সম্প্রদায়েই সীমিত নয়, পেটের দায়ে সুসভ্য শিক্ষিত মানুষ এখনও নর মাংস খায়। বিগত মহাযুদ্ধে অবরুদ্ধ স্টালিনগ্রাড শহরে লোকে এই উপায়ে জীবন রক্ষা করেছে। ১৯৭২ সালে আমেরিকা মহাদেশের অ্যানডিজ পর্বতমালায় এক আকাশযান ভেঙে পড়ে, ক্রমে অনাহারে যাত্রীদের অনেকে মরল, ১৬ জন বেঁচে ছিল মৃত সঙ্গীদের মাংস খেয়ে, ৬৯ দিন পরে তাদের উদ্ধার করা হয়। ১৯৭৯ জুন মাসের খবরে প্রকাশ ক্যানাডার চার জন নাগরিক তাদের ছোট ঘরোয়া বিমানে বেরিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কোনও এক স্থান থেকে একটি কুকুর বাচ্চা সংগ্রহ করতে, এটিও পড়ে যায় এই দেশের এক তুষারাবৃত পর্বতে। এক ব্যক্তি অল্প পরে মারা গেল, বিমান চালক গেল সাহায্য খুঁজতে, রইল মৃত ব্যক্তির অষ্টাদশী কন্যা ও তার ভগ্নীপতি। তাদের সঙ্গে চকোলেট, আলু ভাজা ইত্যাদি সামান্য খাদ্য যা ছিল তা অবিলম্বে ফুরিয়ে গেল, এ দিকে তুষার ঝটিকা বয়ে চলেছে, উদ্ধার অনিশ্চিত, তখন দু জনে মৃত ব্যক্তির দেহাংশ ভক্ষণ করে বেঁচে রইল দু সপ্তাহ, অবশেষে পাঁচ দিন ধরে হেঁটে ফিরে এল লোকালয়ে। ভগ্নীপতির যুক্তি হল ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন কাজটি অন্যায় নয়, নিজের ইচ্ছা জানাতে পারলে শ্বশুরও তাই বলতেন।

পিকিং মানবের জগৎ ও জীবন আমরা অনেকটা এই রকম অনুমান করতে পারি। পাহাড়ের গায়ে গুহায় এক দল রুক্ষমূর্তি লোকের বাস। দিন কাটে আহারের ব্যবস্থায়, কাছেই নদীতে যে হরিণ জল খেতে আসে বোধহয়

তাদের উপরই নজর বেশী। শিকারের প্রধান অস্ত্র লাঠি ও পাথর, এই পাথর ভেঙেই তারা কোপাবার, চাঁছবার, কাটবার উপযুক্ত যন্ত্রও বানিয়ে নিয়েছে। মাংসাহার ছাড়া তারা বাদাম, বন্য তৃণের দানা ও অন্যান্য নানা উদ্ভিজ্জ খাদ্যও সংগ্রহ করে। কখনও কখনও মানুষের মাংস পাতে পড়ে—বিজিত শত্রু, এমন কি কোনও রুগ্ন আত্মীয় কিংবা কচি শিশুর হয়তো। গুহার মুখে বসে তারা আগুনে মাংস পোড়ায়, সারা রাত ধরে তা জ্বলে, তখন এই



চিত্র ১২। গুহাবাসী পিকিং মানব পরিবার।

আগুনই প্রধান ভরসা শত্রুর বিরুদ্ধে।

তের্‌রা আমাতার নড়বড়ে ছাউনিগুলির তুলনায় জোকোডিয়েনের গুহা গহ্বরে হোমো ইরেকটাসের বাস অনেক বেশী পাকা এবং তার সূচনা আরও এক লক্ষ বছর আগে। ডাল আর খুঁটির তৈরি আশ্রয়েই হক আর পাষাণ প্রকোষ্ঠেই হক, বাসা বাঁধতে শিখে মানুষ কতগুলি সুবিধা পেল। নিজেদের ডেরা এমন একটি ঠাঁই যেখানে সংগৃহীত খাদ্য জমিয়ে রাখা যায়, আগুন

বাঁচিয়ে রাখা যায়। সেখানে শিশুদের এবং রুগ্ন ও দুর্বলদের যত্ন করা করা সহজ। আগুনের মত ঘরও কাছে টানে, তাতে পারিবারিক আকর্ষণ বাড়ে, বিশেষত মেয়েদের। পুরুষরা দিনের শিকার সেরে বাইরের নখদন্তবিকশিত নির্দয় জগতের দূরে এই আশ্রয়ে পায় দেহ মনের বিশ্রাম। নিরাপদ নিবিড় আরামে সবাই একত্র বসে আলাপ আলোচনার তৃপ্তি উপভোগ করে, দলীয় সম্প্রীতি গাঢ়তর হয়। জোকোডিয়েনে দীর্ঘ ও স্থায়ী বাস কালে হোমো ইরেকটাস হয়তো নিজ গৃহের মূল্য আরও বেশী বুঝেছে।

কিন্তু স্বত্ব বোধ থেকেই লোভ বাড়ে, কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছা দেখা দেয়, তার থেকে লাগে সংঘর্ষ—আধুনিক জগতে প্রতিনিয়ত তা দেখছি আমরা। অসট্রিয়ার নোবেল পুরস্কৃত আচরণ-বিজ্ঞানী কনরাড লরেন্ট্জ প্রমুখ কয়েক জন বলেন আক্রমণ ও হানাহানির প্রবৃত্তি আমরা পশুদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং তা মানব চরিত্রের অখন্ডনীয় অংশ, তারই তাড়নায় গার্হস্থ্য কলহে থালা বাটি ছুঁড়ে মারা থেকে মহাসমরের মহামারী বোমা। আবার অনেক নৃবিজ্ঞানীর বিশ্বাস আক্রমণ ও সংঘর্ষের প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত নয়, তবে সামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে তা স্বভাবগত হয়ে যেতে পারে। আজ থেকে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ চাষ বাস শিখে নিজের জমিতে পাকা বাসিন্দা হয়েছে, ক্রমে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির লোভে দেখা দিল ছোট খাটো কাড়াকাড়ি হানাহানি, তার পরে ইতিহাসের উষায় জটিলতর সমাজে রাজাদের সমরাভিযান। কিন্তু সামান্যসম্বল হোমো ইরেকটাসের দূর অতীতে সমাজ সাধারণত শান্তিপূর্ণ ছিল বলে অনেকের ধারণা। পক্ষান্তরে জোকোডিয়েনে ফাটানো খুলির প্রত্যক্ষ নজির থেকে বিপরীত ধারণাও সম্ভব।

যারা চির-যাযাবর তাদের পক্ষে অসুস্থ বা অথর্বদের পথে বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকে না, অস্থায়ী ছাউনি বা গুহার আশ্রয়ে তাদের বিশ্রাম ও আরোগ্য সহজতর হয়েছে, সুতরাং মানুষের স্বাভাবিক আয়ু বেড়েছে। তা সত্ত্বেও ইরেকটাস সমাজে খুব কম লোকই চল্লিশে পেঁাছাত এবং পঞ্চাশে সে পাকা বুড়ো। অধিকাংশের দিন ফুরাত অনেক আগে, জোকোডিয়েনে প্রাপ্ত অস্থিগুলির অর্ধেক চৌদ্দনিম্নদের।

আজ যা কিছু আমরা একান্ত মানবিক বলে জানি তার অনেকগুলি গুরুতর ধারার সূত্রপাত করেছে হোমো ইরেকটাস। এখনও মানুষের তিনটি প্রধান মৌলিক প্রয়োজন অন্ন বস্ত্র আশ্রয়—প্রথম দুর্ধর্ষ বৃহৎ পশুর শিকার এবং আগুন ব্যবহার করে পাক শিল্পের প্রবর্তক তারা। উত্তরাঞ্চলে মানুষের উপনিবেশ স্থাপনে তারা পথিকৃৎ, কঠোর শীতের সঙ্গে লড়েছে আগুনের সাহায্যে আর প্রাথমিক পরিধান পশু চর্মের আচ্ছাদনে। হিমেল হাওয়া এড়াতে তারা বাসা বানাতে শিখেছে। তা ছাড়া তাদের মুখেই সম্ভবত প্রথম কথা ফুটল এবং প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠল ভাষা। অনুকূল অবস্থা সংযোগে পরিবার ও সমাজের ভিত হল দৃঢ়তর, প্রশস্ততর। এই বহুমুখী প্রগতির সূত্রগুলি নিহিত যে একটি বৈশিষ্ট্যে তা হোমো ইরেকটাসের বর্ধিত মস্তিষ্ক, গড় মাপের হিসাবে অসট্রালোপিথেকাস আর আধুনিক মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশী পার হয়ে এসেছে তা। এই উন্নত মেধা না পেলে এত কীর্তি সম্ভব হত না, আবার এই সব উদ্যোগের তাগিদেই বহু লক্ষ বছরের অভিব্যক্তিতে ইরেকটাস মস্তিষ্কের আরও বিকাশ ঘটেছে।

এই দীর্ঘ কাল ধরা বাসের পর হোমো ইরেকটাসের কি হল? অধিকাংশের মতে যেমন অসট্রালোপিথেকাস বা হাবিলিস থেকে তার উদ্ভবের চিহ্ন আছে, তেমনি সেও বিবর্তিত হয়েছে হোমো সেপিয়েনসে, হয়তো নেআনডার্টাল মানবের পথে। তিন থেকে দুই লক্ষ বছর আগে এই বিবর্তনের সূচনা, যদিও য়োরোপের ভের্তশসোললোশে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ বছর প্রাচীন খুলিতেই আদি সেপিয়েনসের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে। পরে যথাস্থানে আমরা আরও ফসিল ও অন্যান্য নজিরের আলোচনা করব যা ইরেকটাস থেকে আধুনিক মানুষে অভিব্যক্তি নির্দেশ করে।

৬। বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আদি মানবের সভায় এক ব্যক্তি সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিল যার আসলে সেখানে কোনও স্থান নেই। মানুষটি পিল্‌টডাউন মানব নামে বিখ্যাত—এখন কুখ্যাত, যে দিন থেকে প্রমাণ হয়েছে যে সে আসলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পুরনো পুঁথি পত্রে তার সম্বন্ধে পণ্ডিতদের চুলচেরা আলোচনা ও গুরুগম্ভীর মন্তব্য পড়লে আজ হাসি পায়, তবে এও মনে রাখা দরকার যে তাঁরা এই ব্যক্তিকে সহজে মানতে পারেন নি, নৃতত্ত্বজ্ঞের চোখে মানুষটির মধ্যে অসংগতি ছিল অনেক, যদিও সেই কারণে সন্দেহ না করে বরং বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের মধ্যে সাযুজ্য আনতেই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।

এই কল্প-মানবের গল্প, তার অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস গোয়েন্দা উপন্যাসের মত রোমহর্ষক। বৈজ্ঞানিক কাজে সন্দেহের দাম যে কত বেশী, এবং দরকার হলে বিজ্ঞানীদেরও যে গোয়েন্দাগিরি করতে হতে পারে তাও দেখা যাবে এই কাহিনীতে।

পিলটডাউন মানবের আনুষ্ঠানিক জন্ম তারিখ ১৮ ডিসেমবর ১৯১২, ঐ দিন লনডনে ভূবিজ্ঞান সমিতির এক সভায় বিজ্ঞান জগতের সামনে তাকে উপস্থিত করেন আইনজীবী চার্ল্‌স ড'সন ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভূতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষক আর্থার স্মিথ উডওআর্ড। গল্পের প্রধান নায়ক ড'সন, নিজের পেশায় তাঁর বেশ পসার জমেছে, কিন্তু বাল্য কাল থেকেই ভূতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের নেশায় সব অবসর কেটেছে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ড'সনের তরুণ বয়সেই তাঁর স্থানীয় ফসিলের সংগ্রহ গ্রহণযোগ্য মনে করেছে, এবং সেই সূত্রে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। সভায় তাঁর বিবরণ অনুসারে "কয়েক বছর আগে" তিনি ইংল্যানডের সাসেক্‌স অঞ্চলের ক্ষুদ্র গ্রাম পিলটডাউনের পথ ধরে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন রাস্তাটি মেরামত হচ্ছে এক বাদামী রঙের চকমকি পাথর দিয়ে যা সেখানে পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে জানলেন কাছাকাছি এক খামারের নুড়ি খনি থেকে

তা আনা হয়েছে এবং অবিলম্বে সেখানে গিয়ে মজুরদের বলে এলেন ফসিলের প্রতি কড়া নজর রাখতে। পরে এক দিন খবর নিতে গিয়ে তাদের থেকে পেলেন কোনও এক রকম নরোপম খুলির পাশের দিকের অসাধারণ মোটা একটি খণ্ড।

১৯১১ সালে সেখানে খুলির সামনের একটি হাড়ও পাওয়া গেল এবং পরে নিম্ন চোয়ালের দক্ষিণ অর্ধ। ইতিমধ্যে ড'সন উডওআর্ডকে প্রথম অস্থি খণ্ডগুলি দেখিয়ে তাঁরও উৎসাহ জাগিয়েছেন, তিনি খুলির একটি পশ্চাদংশ উদ্ধার করলেন। ড'সন বললেন সম্পূর্ণ খুলিটি মজুরদের কাজের সূত্রে ভেঙেছে এবং তারা টুকরোগুলির মূল্য না বুঝে ইতস্তত ছুঁড়ে ফেলেছে। এ ছাড়া তিনি কিছু চকমকির হাতিয়ারও সংগ্রহ করলেন। তাঁর অনুমান পিলটডাউন মানব দেখা দিয়েছিল কম করেও প্লাইসটোসিন অধিযুগের শুরুতে অর্থাৎ প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। ল্যাটিন আখ্যা দিতেও দেরি হল না, আবিষ্কর্তার সম্মানে উডওআর্ড নাম প্রস্তাব করলেন ইওআনথ্রপাস ড'সনি অর্থাৎ ড'সনের উষামানব—মানব ইতিহাসের উষা কালে যার উদয়। হাতিয়ারের নাম অবশ্য হল উষাশিলা।

অস্থিগুলির থেকে উডওআর্ড খুলির সম্পূর্ণ মূর্তি বানিয়েছিলেন, তা দেখে সভাস্থ বিশেষজ্ঞরা অবাক। আধুনিক মানুষের মত কপালটি সোজা উপর দিকে উঠেছে, মস্তিষ্কাধারও বড়, অথচ চোয়াল প্রায় অবিকল শিমপানজির অনুরূপ, শুধু পেষক দাঁত ছাড়া। একাধারে নর ও বানর এই অদ্ভুত সংকর প্রাণীটি দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এই কি সেই বহু-প্রতীক্ষিত বন-মানুষ ও মানুষের যোগসূত্র? কিন্তু এ দিকে জাভা মানবে যে ঠিক বিপরীত অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে, তার পায়ের হাড় আধুনিক মানুষেরই মত সোজা, যদিও মগজ অনেক ছোট, যেন ক্রমবিকাশের পথে মেধার তুলনায় দেহের বাকি অংশ অনেক দ্রুত এগিয়েছে। জাভা মানবের বেলায় বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ যেমন বলেছিলেন যে খুলি ও পায়ের হাড় দুই ভিন্ন প্রাণীর, তেমনি পিলটডাউন মানবের খুলি ও চোয়াল নিয়ে একই সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা তা গ্রাহ্য করলেন না, কারণ ফসিলগুলি ছিল মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যে, এইটুকু জায়গায় যার খুলি তার চোয়াল হারিয়ে

গেল আর যার চোয়াল তার খুলির অংশ পাওয়া গেল না এমন সম্ভাবনা নগণ্য। সমস্যা মেটাতে এক পণ্ডিত বললেন প্রাণীটি একই, কিন্তু অস্থিগুলি ভিন্ন ব্যক্তির, তাদের বয়স কম বেশী বলে যত গোলমাল—চোয়াল এক তরুণের, খুলি মধ্যবয়স্কের এবং দাঁত আরও প্রবীণ ব্যক্তির।

উষামানবের নরোপম মাথা ও বনমানুষী চোয়ালের মধ্যে সংগতি আনতে অনেক মাথা ঘামালেন মাথা মাথা ব্যক্তিরা, যথা বিখ্যাত মস্তিষ্ক-বিশারদ গ্রাফ্টন এলিয়ট স্মিথ ও দিকপাল নৃবিজ্ঞানী সার আর্থার কীথ। বিশদ পরীক্ষার পর কীথ লিখলেন যে খুলির খণ্ডগুলি সর্বতোভাবে হোমো সেপিয়েনসের অনুরূপ, কিন্তু দাঁত ও চোয়ালে বনমানুষের সঙ্গে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। এর থেকে আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই প্রকৃত সত্য ধরা পড়ত, কিন্তু অত দূর পর্যন্ত তখন কেউ ভাবে নি। এই সন্দেহ-দোলায়মান অবস্থায় আরও কিছু ফসিল উদ্ধার হওয়াতে বিজ্ঞানীদের দ্বিধা কেটে গেল, অন্তত ইংল্যানডে, এবং আদি মানবের আসরে উষামানবও আসন পেল। ১৯১৩ সালে ফরাসী ধর্মযাজক ও নৃতত্ত্বজ্ঞ পিয়ের তাইলার দ শার্দ্যাঁ একই নুড়ি কূপে কুড়িয়ে পেলেন এক ছেদক দাঁত। অন্য এক দলিল অনুসারে এটিও ড'সনের আবিষ্কার, কিন্তু ধর্মপিতাও যে পিলডাউনের এক উৎসাহী অনুসন্ধানী তা নিঃসন্দেহ, এবং ড'সন লিখেছেন তিনি একটি উষাশিলার আবিষ্কর্তা।

এই ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতটি এক বহুমূল্য নজির বলে গৃহীত হল, তা ওরাং ওটাঙের পেষকের মত লম্বা ও ছুঁচালো। ডারুইনবাদী অনেকে বিশ্বাস করতেন যে একদা নরোপম বনমানুষদের মত পেষক সম্বলিত এক আদি মানব আবিষ্কার হবে, এবং উডওআর্ড পিলটডাউন মানবের অপ্রাপ্ত পেষকটির এক অনুরূপ প্রতিকৃতিও বানিয়ে রেখেছিলেন। নবাবিষ্কৃত ফসিলটি প্রায় হুবহু তার সঙ্গে মিলে গেল। ১৯১৫ সালে ড'সন প্রাক্তন আবিষ্কার স্থলের "কিছু দূরে" পিলটডাউন মানবের এক দ্বিতীয় প্রতিনিধির খুলি খণ্ড পাওয়ার দাবি জানান, সেগুলির সঙ্গে আদি ফসিলগুলির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর পর অনেকেই এই বকচ্ছপটিকে খাঁটি আদি মানব বলে মেনে নিলেন। তখন থেকে প্রায় ৪০ বছর সে অটল রইল। পিকিং মানব আবিষ্কারের পর এক লেখক তাঁর বইতে মন্তব্য করলেন, "কিছু দিন আগেও অনেক বিজ্ঞানী ঐ

চোয়ালকে শিমপানজি বা অন্য কোনও বনমানুষের অংশ বলে ভাবতেন, কিন্তু পিকিং মানব প্রমাণ করেছে যে মানুষের চোয়ালও থুতনিবিহীন হতে পারে, এর থেকে এই মতই প্রতিষ্ঠিত হয় যে পিলটডাউনের চোয়াল ও মাথা মানুষেরই অঙ্গ এবং একই মানুষের অঙ্গ।" আমরা আগে দেখেছি অসট্রালোপিথেকাস যে প্রথমে পণ্ডিতদের কাছে আমল পায় নি তার কারণ তার চেহারাটা ছিল পিলটডাউন মানব থেকে পাওয়া এই বদ্ধ ধারণার বিপরীত যে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মগজ বড় এবং দাঁত ও চোয়াল বনমানুষতুল্য ছিল।

অন্যান্য পুরামানবের পাশাপাশি উষামানবের নামটাও প্রাগিতিহাসের পাতায় পাকা হয়ে যেত, কিন্তু ভাগ্যের কথা এই যে এই কণ্টকল্পিত জোড়াতালি-দেওয়া মানুষটি সম্বন্ধে কারও কারও মনে খুঁৎখুঁতি থেকে গেল, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্রমে নানা পুরামানবের আবিষ্কারে যখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে দেহের বাকি অংশের তুলনায় মগজের অভিব্যক্তি হয়েছে ধীরে তখন পিলটডাউন মানবের অসংগতি আরও প্রকট হয়ে দাঁড়াল। অসট্রালোপিথেকাস, জাভা মানব, পিকিং মানব সকলেরই চোয়াল আধুনিক মানুষের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কিন্তু ভ্রূ-অস্থি বনমানুষের মত উঁচু, পিলডাউন মানবে তা চোখে পড়ে না। অবশেষে প্রকৃত সমাধানটি পাওয়া গেল, তা এতই সহজ যে হয়তো সেই কারণেই পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকে নি। এক কথায়—প্রবঞ্চনা।

এই শতাব্দের মাঝামাঝি জালিয়াতি ধরা পড়ল ব্রিটেনের তিন বিজ্ঞানীর চেষ্টায়। প্রধান উদ্যোক্তা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. এস. ওআইনারকে সন্দেহ পেয়ে বসেছিল, কিন্তু প্রমাণ চাই। পিলটডাউন মানবের পেষক দেখে মনে হয় মানুষের দাঁতের মত তা খাদ্য চর্বণে ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু মোটা লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখেন তাদের মাথায় সরু সরু আঁচড়, ফাইল দিয়ে ঘষলে যেমন হয়। অতঃপর গবেষণাগার থেকে একটি শিমপানজির চোয়াল নিয়ে ফাইল দিয়ে ঘষে পিলটডাউন পেষকের মত চেহারা করে তিনি তা প্রাচীন ফসিলের মত বাদামী রং করলেন এবং শারীরস্থান বিভাগের কর্তা উইলফ্রেড ল গ্রো ক্লার্কের টেবিলে রেখে বললেন, "বিভাগের সংগ্রহে ফসিলটা ছিল, বলুন তো এটা কি হতে পারে?" গ্রো ক্লার্ক আগে জালিয়াতির সন্দেহকে বিশেষ আমল দেন নি, চোখের সামনে অস্থিটির সঙ্গে

পিলটডাউন চোয়ালের আশ্চর্য মিল দেখে তিনি সোৎসাহে ওআইনারের দলে ভিড়লেন।

এ দিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কেনেথ ওক্লি ফসিলে ফ্লুওরিনের পরিমাণ মেপে তার বয়স নির্ধারণের এক উপায় বার করেছেন। মাটির জল থেকে এই মৌলিক পদার্থটি ক্রমশ হাড়ে ঢোকে, সুতরাং তাতে ফ্লুওরিন যত বেশী তত তা প্রাচীন। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন যে পিলটডাউন খুলির ও চোয়ালের বয়স আলাদা, খুলিতে ফ্লুওরিন বেশী এবং চোয়ালটি একেবারে সাম্প্রতিক। পরীক্ষায় আরও জানা গেল যে চোয়ালটি শিমপানজির নয়, ওরাং ওটাঙের, এবং সব অস্থিগুলির গাঢ় বাদামী রং আনা হয়েছে পটাশিয়াম বাইক্রোমেট বুলিয়ে।

২১ নভেমবর ১৯৫৩ তারিখে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পত্রিকায় গ্রো ক্লার্ক ও ওআইনার সব তথ্য প্রকাশ করলেন। সন্দেহ রইল না যে ১৯১০-১৯১৪ সালের মধ্যে কেউ কয়েকটি বিভিন্ন আধুনিক মানুষের খুলির খণ্ড ও বনমানুষের চোয়াল সাজিয়ে সযত্নে পিলটডাউনে এক জালিয়াতির জাল পেতেছিল এবং পন্ডিতরা সেই ফাঁদে ধরা পড়েছেন। এই উদঘাটনের পর বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক উত্তেজনার মধ্যে রঙ্গ রস পরিবেশন করল বিলাতের পানচ্ পত্রিকা—ব্যঙ্গচিত্রে দন্ত চিকিৎসকের চেয়ারে বসে আছে পিলটডাউন মানব, ডাক্তার তার সাঁড়াশি বাগিয়ে বলছে, "ব্যথা লাগবে, কিন্তু সবটা চোয়াল না তুলে উপায় নেই।" অর্থাৎ ঐ মাথায় এই চোয়াল চলতে পারে না। বস্তুত পূর্বোক্ত অসংগতি ছাড়াও দেখা গেল চোয়ালে প্রোটিন জাতীয় জৈব বস্তুর পরিমাণ সাম্প্রতিক হাড়ের সমান, কিন্তু খুলির অস্থিগুলিতে তা সামান্য, তাদের আনুমানিক বয়স ৫০০ বছরের কম।

উষামানব অস্ত গেলেও কিছু প্রশ্ন রেখে গেল যার আজও সর্বসম্মত মীমাংসা হয় নি, যথা প্রবঞ্চক কে এবং তার কি উদ্দেশ্য। সর্বাগ্রে ড'সনের উপর সন্দেহ পড়াই স্বাভাবিক, অনেকের মতে পুরাতত্ত্বে তাঁর যা জ্ঞান ছিল তাতে এই মতলব কাজে পরিণত করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া এখন পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে মনে হয় অস্থি খন্ডগুলি আবিষ্কারের যে বর্ণনা তিনি দেন তাতে স্থান কাল অস্পষ্ট, যা এই ধরনের দলিলে খুবই অস্বাভাবিক। শোনা যায়

জনৈক ব্যক্তি ড'সনের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর দপ্তরের দরজায় করাঘাত না করে ঢুকে দেখেন তিনি হাড়ে রং লাগাতে ব্যস্ত। তা ছাড়া, রোগ শয্যায় আসন্ন মৃত্যুর আগে তিনি নাকি বিড়বিড় করে খুলি সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, কিন্তু তার অর্থোদ্ধার করা যায় নি। মৃত্যুর পরে 'আবিষ্কার' যে বন্ধ হয়ে গেল তাও তাৎপর্যপূর্ণ। জালিয়াতি ধরা পড়ার দু বছর পরে ওআইনার এক বই প্রকাশ করেন, তাতে লিখেছেন কাজটা যে ড'সনের তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেকের মনে সন্দেহ আছে, লুই লীকি লিখেছেন রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও শারীরস্থান সম্বন্ধে কাজ হাঁসিল করবার মত জ্ঞান তাঁর ছিল না। ড'সন মারা যান ১৯১৬ সালে এবং উডওআর্ড ১৯৪৪ সালে। হয়তো ড'সন না জেনে কারও ফাঁদে পা দিয়েছেন। এই পালার অনেক অভিনেতারই এমন ফাঁদ পাতবার মত বিদ্যা ছিল।

অপরাধী যেই হক, বহু যত্নে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনাটি তৈরি হয়েছে। প্রথমত আধুনিক মানুষের খুলির খন্ড ও ওরাঙের চোয়াল সংগ্রহ; তার অর্ধাংশ থেকে ছেদক দাঁতটি খুলে রাখা; পেষকগুলি ফাইল দিয়ে ঘষে ক্ষয় করা; উপযুক্ত রাসায়নিক বস্তুটি বেছে হাড়গুলিতে ঠিক ফসিলের রংটি আনা; লোক চক্ষুর আড়ালে সম্ভবত কিছু দিন পর পর সেগুলি নুড়ি কূপে স্থাপন। ঘটনা ক্ষেত্রে কিছু মেকী পাথুরে হাতিয়ার বসিয়ে রাখতেও ভুল হয় নি যাতে চোয়ালের চেহারা দেখে প্রাণীটিকে অমানুষ বলে সন্দেহ না হয়। এগুলি বহু কাল পরে নবপ্রস্তর যুগের সৃষ্টি, পরে লোহার মরচে দিয়ে রং করে প্রাচীন চেহারা আনা হয়েছে। তা ছাড়া পুরামানবের লীলা ক্ষেত্রে তার ভুক্ত কিছু পশুর হাড়ও থাকা ভাল, আশেপাশে তারও অভাব ছিল না। এক জাতের লুপ্ত হাতির দাঁতে ফ্লুওরিনের পরিমাণ বেশী, তা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিশ্চয় পিলটডাউন মানবের পুরাতনত্ব প্রমাণ করা। রাসায়নিক পরীক্ষার ইঙ্গিত অনুসারে এই দাঁত উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানি। হাতির হাড়ের 'হাতিয়ার' আমাদের সুপরিচিত ইস্পাতের ছুরি দিয়ে কেটে চেঁছে তৈরি।

অজ্ঞাত প্রবঞ্চক চরম চাতুরি দেখিয়েছে চোয়ালের একটি বিশেষ অংশ খুলে রেখে। কন্‌ডিল নামক এই অংশটি থাকে চোয়াল ও খুলির সন্ধি

স্থলে, এর চেহারা দেখে বোঝা যায় চোয়াল খুলির সঙ্গে খাপ খায় কিনা। হয়তো ছেদক দাঁতটিও প্রথমে খুলে রাখা হয়েছিল তার চেহারাটা বড় বেশী বনমানুষী বলে, পরে বিশেষজ্ঞরা যখন সচোয়াল পিলটডাউন মানবকে অনেকটা মেনে নিয়েছেন এবং উডওআর্ড অনুরূপ প্রতিকৃতি বানিয়েছেন তখন তা নতুন করে 'আবিষ্কার' হল।

গোয়েন্দা সর্বদা অপরাধের উদ্দেশ্য খোঁজে, অনেক সময়ে তা অপরাধীর নির্দেশ দেয়। পিলটডাউন জালিয়াতির নানা উদ্দেশ্য সম্ভব। এশিয়ায় জাভা মানব, জার্মেনি ও য়োরোপের অন্যত্র নেআনডার্টাল মানব ও মাত্র বছর পাঁচেক আগে জার্মেনিতেই হাইডেলবার্গ মানব দেখে আমাদের অজ্ঞাত অপরাধী হয়তো বিশেষ এক ইংরেজ পুরামানব চেয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি স্মরণীয় করা যদি মতলব হয়ে থাকে তো সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করবে অবশ্য ড'সনের দিকে। ভূবিজ্ঞান সমিতির সভায় তিনি উল্লেখ করেন যে হাইডেলবার্গ চোয়ালটির প্রতিকৃতি পরীক্ষা করে তাঁর মনে হয়েছিল যে সেটির আকার আকৃতির সঙ্গে পিলটডাউন খুলির সামঞ্জস্য আছে। দুবোআর মত বনমানুষ ও মানুষের যোগসূত্র আবিষ্কারের মোহ তখন সম্ভবত আরও অনেককে পেয়ে বসেছিল, পিলটডাউন মানবে একাধারে এই দুইয়ের স্পষ্ট সংযোগ থেকে মনে হয় এই প্রেরণাই নষ্টের গোড়া। এইখানে জল্পনা করা যায় এই মধ্যবর্তী প্রাণীর সৃষ্টিতে প্রবঞ্চক যদি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কাধারের সঙ্গে মানবিক চোয়াল জুড়ত তা হলে কি হত। অসট্রালোপিথেকাস সহজে স্বীকৃত হত এবং পরে অন্যান্য আবিষ্কারে অভিব্যক্তির যে গতি প্রকাশ পেল তার সঙ্গে সংগতির ফলে পিলটডাউন মানব হয়তো এখনও আদি মানব সমাজে সসম্মানে বেঁচে থাকত। কিন্তু ঠিক চালটি বুঝতে পারা তখন অত সহজ ছিল না। হয়তো অভিসন্ধি ছিল আরও সরল—পণ্ডিতদের বোকা বানিয়ে মজা দেখা; ব্যাপার যখন বেশী দূর গড়িয়ে গেল তখন গণ্যমান্যদের আক্রোশের ভয়ে রসিক ব্যক্তি আর হাটে হাঁড়ি ভাঙতে সাহস করে নি।

পিলটডাউন মানবকে নিয়ে বহু নিবন্ধ ও একাধিক বই লেখা হয়েছে, তাতে লেখকরা সামান্য নজিরের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নানা জনকে সন্দেহের ভাগ দিয়েছেন। ১৯৭৮ সালের শেষে প্রকাশিত এক কাহিনীতে প্রবঞ্চক যেমন

অভাবিত, তেমন তার উদ্দেশ্য। বিশ শতাব্দীর প্রথমে উইলিয়াম জনসন সলাস অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিজ্ঞান ও পুরাজীববিজ্ঞান অধ্যাপনা করতেন। পরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলেন জেম্‌স ডগলাস, তিনি ৯৩ বছর বয়সে ১৯৭৮ ফেবরুআরিতে মারা যান, তার মাত্র মাস কয়েক আগে টেপ-যন্ত্রে তিনি যে পুরাতন স্মৃতি শ্রুতিবদ্ধ করেন তা তাঁর মৃত্যুর পরে বিলাতের সম্ভ্রান্ত নেচার বিজ্ঞান-পত্রিকায় ছাপা হয়।

ডগলাসের কাহিনী অনুসারে, সলাস দেখলেন তাঁর খ্যাতি ক্রমেই খর্ব করছে নৃবিজ্ঞানের তরুণ তারকা উডওআর্ড। ভূতত্ত্ব সমিতির এক সভায় উডওআর্ড যখন সলাস-নিবেদিত একটি নিবন্ধ নিয়ে বিদ্রূপ করলেন তখন প্রবীণ বিজ্ঞানী নির্বাক রাগে লাল হয়ে উঠেছিলেন, তা ডগলাসের চোখ এড়ায় নি। তাঁর মনে হয় সলাস স্থির করলেন অপমানের শোধ নেবেন, প্রতি-দ্বন্দ্বীকে বোকা বানাবেন তাঁর এক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে; সেটা এই যে যথোপযুক্ত প্রমাণের আগেই নতুন আবিষ্কারের দাবি মেনে নেওয়ার দিকে ঝোঁক ছিল উডওআর্ডের। পিলটডাউন মানবের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল, প্রথম অস্থিগুলি হাতে পেয়েই তিনি সোৎসাহে তা খাঁটি বলে মানলেন, জল্পনা কল্পনায় অনেকটা এগিয়ে গেলেন।

ডগলাস বলছেন ১৯৫৩ সালে ওআইনারের পরীক্ষার বিবরণ পড়তেই তাঁর স্মৃতি ছুটে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের আগে একটি দিনে। তিনি তখন সলাসের গবেষণাগারে কাজ করেন, স্পষ্ট মনে পড়ে সে দিন ছোট একটি মোড়ক এসে পেঁছাল, তিনি ও এক সহকারী খুলে দেখেন তাতে আছে পটাসিয়াম বাই-ক্রোমেট। অধ্যাপক এ জিনিসটি আনতে দিয়েছেন দেখে দু জনেই অবাক। তেমনি তাঁদের আশ্চর্য লেগেছে যে ঐ সময়ে অধ্যাপক শারীরস্থান বিভাগ থেকে কিছু বনমানুষের দাঁতও চেয়ে নিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, লনডনে ভূতত্ত্ব সমিতির ঘরে একটি ছবি আছে তাতে দেখা যায় সার আর্থার কীথ পিলটডাউন খুলিটি পরীক্ষা করছেন, তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছেন ড'সনের পাশে উডওআর্ড এবং ব্রিটেনের প্রতিটি অগ্রগণ্য নৃবিজ্ঞানী—এক সলাস ছাড়া। অর্থাৎ 'বোকাদের' দলে তিনি নেই।

প্রবঞ্চক সব কথা ফাঁস করে উদ্দেশ্য সাধন করে নি কেন? ডগলাস মনে

করেন প্রতারণা আশার অতিরিক্ত সফল হওয়াতে সলাস দেখলেন উডওআর্ডের বিপরীত করতে হিত হল। শুধু উডওআর্ড নয়, প্রায় সব শিরোমণি যখন পিলটডাউন মানবকে খাঁটি বলে সুপারিশ করলেন তখন তিনি ভাবলেন মুখ বন্ধ করে থাকাই ভাল, তাঁর মত পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এমন কর্ম স্বীকার করা নিশ্চয় মানহানি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মানুষটিকে নামঞ্জুর করবেন এবং উডওআর্ড মান হারাবে এই আশা বিফল হল।

রোমাঞ্চক পিলটডাউন নাটকের নবতম অঙ্কটি সংযুক্ত হয়েছে ১৯৮০ সালে, তাতে প্রসিদ্ধ মার্কিন পুরাজীববিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুল্ড যাঁর দিকে সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তিনি স্বয়ং ধর্মপিতা তাইলার দ শার্দ্যাঁ। এক বিজ্ঞান-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন যে তরুণ তাইলার তখন ইংল্যানড-নিবাসী এবং ড'সনের বন্ধু। সন্দেহের প্রধান নজির হল যে বহু বছর পরে কেনেথ ওকলিকে লিখিত এক পত্রে ধর্মপিতা জানান যে ১৯১৫ সালে পিলটডাউন মানবের দ্বিতীয় খুলির প্রাপ্তি স্থলে ড'সন নিজে তাঁকে সঙ্গে করে আনেন। গুল্ড বলেছেন তাইলার তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফরাসী সেনা দলের পাদরী, তা অসম্ভব। তাঁর বিশ্বাস তিনিও ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন, অল্পবয়সোচিত এই রসিকতা আশাতীত রূপে সফল হওয়াতে পরে স্বীকারোক্তি কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যেই নানা জনে তাইলারকে জড়িয়ে এই তত্ত্ব খুব যুক্তিসংগত মনে করেন না।

পিলটডাউন মানবের রহস্যাবৃত দীর্ঘ ইতিহাসের নিশ্চয় এখানেই সমাপ্তি নয়। তার জন্মদাতা কে তা নিয়ে জল্পনা চলবে। ব্যক্তিটি যেই হক, নৃতত্ত্ব এখন এত অগ্রসর, ফসিলের বয়স ও অন্যান্য পরীক্ষার এত সূক্ষ্ম পদ্ধতি হাতে এসেছে যে আজকের দিনে ঠিক এই ধরনের ধাপ্পাবাজি অসম্ভব। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, এখনও মাঝে মাঝে তা ঘটে থাকে নানা কারণে, অন্যান্য মানুষের মত বিজ্ঞানীরাও কখনও কখনও খ্যাতি, পদোন্নতি, গবেষণার জন্য আর্থিক সাহায্য ইত্যাদির লোভ সামলাতে পারেন না।

পুরামানব সম্পর্কে প্রাচীনতর আর একটি উদাহরণ দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা যেতে পারে। ১৮৬৩ সালের প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নবিৎ বুশের দ পের্থ সম্ নদীর উপত্যকায় আবেভিল্ নামক জায়গায় খননের কাজ চালাচ্ছিলেন।

আগে ওখানে নাকি তিনি লুপ্ত জন্তুর হাড় ও পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে হাতিয়ার পেয়েছিলেন, যন্ত্রশিল্পীদের সন্ধান মেলে নি, এ বার নতুন করে খোঁজ চলছিল। হঠাৎ এক দিন মুল্‌ঁয়া কিনিয়ঁ নামক এক গর্তে পাওয়া গেল একটি মাত্র দাঁত এবং আরও খুঁড়ে এক চোয়ালের হাড়। বুশের দ পের্থ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে অবশেষে তিনি ঐ মানুষদের পেয়ে গিয়েছেন। খবর শুনে ছুটে এলেন ফরাসী ও ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু অবিলম্বে গুজব রটে গেল যে হাতিয়ারগুলির কিছু অন্তত জাল এবং সম্ভবত হাড়গুলিও তাই। ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌ বিতণ্ডা ও মতান্তর। ইতিমধ্যে চোয়াল কেটে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হল, দেখা গেল অস্থিটিতে তখনও আট শতাংশ জৈব বস্তু বর্তমান, প্রাচীন হাড়ে তা থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও ফরাসীদের বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত টলে নি। ১৯শ শতাব্দীর শেষে সরকারী নথির থেকে এই হাড় দুটির নাম কাটা গেল। জালিয়াতি যদি ঘটে থাকে তো সেটা কার কাজ? বুশের দ পের্থ তখন প্রবীণ ও সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞানী, তাঁকে কেউ সন্দেহ করে নি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আবিষ্কারের অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি মজুরদের মোটা বকশিশের আশ্বাস দিয়েছিলেন, সুতরাং …

৭। আপন জন

এ বার যার সঙ্গে পরিচয়ের পালা সেই নেআনডার্টাল মানবের নাম আমরা ইতিপূর্বে কয়েক বার শুনেছি। প্রাক্‌মানব ও পুরামানবের মধ্যে তারই ফসিল প্রথম আবিষ্কার হয়েছে এবং এখন দেখা যাচ্ছে সে আধুনিক মানুষের আপন জন, যদিও এই সম্মান পাওয়ার আগে বেচারাকে দীর্ঘ কাল অনেক মিথ্যা বদনাম হইতে হয়েছে। তা ছাড়া, যেমন অসট্রালোপিথেকাস ও হোমো ইরেকটাস প্রথম দেখা দিয়েছিল যথাক্রমে আফ্রিকা ও এশিয়ায়, পরে প্রমাণ হল দেশে দেশে তাদের ঘর আছে, তেমনি গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নেআনডার্টাল মানবের য়োরোপে আবির্ভাব থেকে এই শতকের বহু বছর পর্যন্ত ধারণা ছিল সে খাঁটি য়োরোপীয়, কিন্তু পরে জানা গেল পুরোগামীদের মত সেও প্রায় বিশ্বমানব।

অন্যায় অপবাদ ও অবজ্ঞা তার কপালে জুটেছিল নানা কারণে। তখন জানা ছিল শুধু আধুনিক মানুষের খুলি, তার পাশে নেআনডার্টাল খুলি নিতান্তই উদ্ভট, প্রায় পাশবিক ঠেকেছে; কিন্তু অসট্রালোপিথেকাসের সঙ্গে নেআনডার্টাল মানবের পার্থক্য আরও বেশী প্রকট, সুতরাং আপেক্ষিক দৃষ্টিতে এখন সে আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, বিজ্ঞানীদের ভুল ভ্রান্তি, তাঁদের হাতে মার্জিত পরীক্ষার উপযুক্ত যন্ত্র ও কৌশলের অভাব, তৎকালীন গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির সংযোগে অভিশপ্ত হয়েছিল নেআনডার্টাল মানব। কিন্তু নতুন আবিষ্কার ও সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলাফল না মেনে উপায় নেই, অবশেষে শাপমুক্তির পরে দেখা দিল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৈহিক ও মানসিক মূর্তি, জানা গেল পূর্বগামী হোমো ইরেকটাসের চেয়ে সব বিষয়ে সে অনেক অগ্রসর। প্রাক্তন বিশ্বাস অনুসারে নেআনডার্টাল মানব নরবংশতরুর এক বিকৃত নিষ্ফল প্রশাখা। খর্বকায়, কুঁজো, লম্বিত-বাহু, লোমশ এক প্রাণী, হোঁৎকা চেহারা ও চাল চলনে নির্বুদ্ধিতা ও আনাড়ীপনার প্রতিমূর্তি। আজ নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা বদলালেও সাধারণের মনে এখনও এই ছবি গেঁথে আছে, আমরা দেখব আকৃতিতে তা অংশত সত্য

হলেও প্রকৃতিতে সর্বৈব মিথ্যা। নেআনডার্টাল মানবের সংশোধিত চেহারা আমাদের থেকে কিছুটা পৃথক, কিন্তু ক্ষমতা, সমাজ রীতি এমন কি আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় বর্তমান মানুষের সঙ্গে তার আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

১৮২৯ ও ১৮৪৮ সালে পশ্চিম য়োরোপে যথাক্রমে বেলজিয়াম ও জিব্রলটরে এই মানুষটির অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ফসিলগুলি নিয়ে তখন বেশী জানাজানি হয় নি (অধিকাংশে অক্ষত হলেও জিব্রলটার খুলিটির ঐতিহাসিক মূল্য ধরা পড়ে ৬২ বছর পরে)। জার্মেনির ডুস্‌ল্‌ডর্ফ শহরের অদূরে রাইন নদীর নেআনডার শাখা বয়ে গিয়েছে এক খাতের বুক চিরে, এর থেকে নেআনডার্টাল মানবের নামকরণ (টাল=উপত্যকা)। খাতের ঢালু প্রাচীর থেকে চুনাপাথর উদ্ধারের কাজে ১৮৫৬ সালের গ্রীষ্মে বিস্ফোরক ফাটাবার পর দেখা দিল ছোট একটি গুহা এবং তার মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে বেশ কিছু পুরনো হাড়। আজকের দিনে হলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা সেখানে গিয়ে হাজির হতেন, হাড়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার আগে তাদের ছবি তুলতেন মাটি সরিয়ে সরিয়ে বিভিন্ন স্তরে। সর্বত্র ধূলি কণা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হত এক টুকরো দাঁতের খোঁজে, পাথুরে অস্ত্র বা পশুর হাড়ের আশায়, যা কিছু পাওয়া গেল তার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি হত সযত্নে। কিন্তু সে সময়ে মজুরদের নজর ছিল চুনাপাথরের দিকে; আদিপুরুষের দিকে নয়, সুতরাং যা ছিল সম্ভবত এক সম্পূর্ণ কঙ্কাল তার প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেল, শুধু খুলির উপরাংশ এবং পাঁজরা, শ্রোণীচক্র ও হাত পায়ের কিছু অস্থি ছাড়া। ভালুকের হাড় মনে করে খনির মালিক এগুলি দিলেন তাঁর ছেলের বিজ্ঞান-শিক্ষকের হাতে, তাঁর যেটুকু জ্ঞান ছিল তাতে তিনি বুঝলেন হাড় ভালুকের নয়, অতি অদ্ভুত এক প্রাচীন মানুষের, কারণ ভ্রূ-অস্থি উঁচু, কপাল ঢালু, মাথার চূড়া বা চাঁদি চাপা, তা ছাড়া হাত পায়ের হাড় মোটা। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন যে বাইবেল-বর্ণিত নোআর মহাপ্লাবনে ভেসে প্রাণীটি এই গুহায় এসে ঢুকেছিল।

কিন্তু এই কাহিনী পাত্তা পাবে না এমন এক সন্দেহ থাকায় তিনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিষয়ের অধ্যাপক হেরমান শাফ্‌হাউজেনের দ্বারস্থ হলেন। তিনি বললেন হাড়গুলি অতি প্রাচীন কোনও বর্বর জাতির মানুষের

কিন্তু তাঁর অনুমানে এই প্রাচীনতা সামান্য কয়েক হাজার বছর মাত্র। সেই সময়ে মানুষ ও প্রাণীর সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচিন্তার দৌড় যে বেশী ছিল না তা আমরা জানি ('মানুষের আগে' দ্রষ্টব্য)। মানুষ ও প্রাণীদের মূর্তি সর্বদা তাদের বর্তমান বংশধরদের মত ছিল এই ধারণাও সেই বিচিন্তার অন্তর্গত, মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বেয়াড়া হাড় আবির্ভূত হলে তা আকস্মিক বিকার বলে অবজ্ঞাত হত (১৭০০ সালে এবং সম্ভবত তার আগেও অনেক বার অজানা আদিম মানুষের হাড় দেখা দিয়েছে)।

মানুষের প্রাচীনতা ফসিলের চেয়েও বেশী করে প্রমাণ করল তার হাতে তৈরি হাতিয়ার। চাষ করতে, রাস্তা বানাতে এবং অন্য কাজে মাটি খুঁড়তে কয়েক শতাব্দী ধরে এগুলি মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাদের তাৎপর্য কেউ বোঝে নি। অনেক অঞ্চলে ধারণা ছিল আকাশের বাজ এগুলির সৃষ্টি করেছে, ফ্রানস ও উত্তর য়োরোপের চাষীরা দেয়ালে বা চৌকাঠের নিচে রাখত এ সব বজ্রশিলা—বাজ এক জায়গায় দু বার পড়ে না এই বিশ্বাসে। ১৮৩০ দশকে বুশের দ পেৎ্র্ যখন ফরাসী শুল্ক বিভাগের কর্মী তখন তিনি সযত্নে এই রকম বহু খণ্ডিত শিলা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও শ্রেণীবিভক্ত করে ছাপার অক্ষরে জানালেন এগুলি বানিয়েছে মানুষ এবং পাথরগুলি মাটির এতটা নিচে ছিল যে এই সৃষ্টির কাজ হয়েছে লিখিত ইতিহাসের আগে। প্রবাদ বলে জ্ঞানী লোক আপন দেশে আমল পায় না, দ পেৎর্ পেলেন ফরাসী বিজ্ঞানীদের রূঢ় অবজ্ঞা, কিন্তু ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের একটি দল এসে সব দেখে শুনে তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। পরে প্রমাণ হয়েছে তাঁর হাতিয়ারগুলি অন্তত তিন লক্ষ বছর প্রাচীন, এতটা তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি।

এর দু বছর আগে অবশ্য নেআনডার খাতের মানুষটি আবিষ্কার হয়েছে এবং এক বছর পরে প্রকাশিত হল ডারুইনের যুগান্তকর বই 'প্রজাতির উদ্ভব'। তিনি বলেছিলেন তাঁর অভিব্যক্তিবাদ মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করবে, আসলে তা যে হয়েছিল বজ্রপাত সেই কাহিনী সুপরিচিত। এ দিকে শাফহাউজেনের উদ্যোগে নেআনডার্টাল মানব বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত হয়ে এই বজ্রানলে ইন্ধন যোগাল। বর্তমান য়োরোপীদের থেকে চেহারায়

আফ্রিকার হটেনটটদের যতটা পার্থক্য, এই বেঢপ প্রাণীটির প্রভেদ তারও বেশী, একে শ্বেতাঙ্গদের পিতামহ বলে কিছুতেই মানা যায় না। পণ্ডিতরা বললেন অস্থিগুলি প্রাচীন নয়, 'বিকৃত' অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা রকম অভিনব ব্যাখ্যা বার করলেন। এক দলের মতে মানুষটি বিদেশী, খুলির আকৃতি পরীক্ষা করে জনৈক শারীরস্থানবিজ্ঞানী বললেন প্রাচীন ওলন্দাজ, এক ফরাসী বিজ্ঞানীর বিশ্বাস বোকা গোছের সেল্ট জাতীয় লোক। কল্পনার দৌড়ে সকলকে হার মানালেন জার্মানির এক পণ্ডিত; পায়ের হাড় কিছু বাঁকা মনে হওয়াতে তিনি বললেন মানুষটির জীবন কেটেছে ঘোড়ার পিঠে, জাতে মংগোলীয় কসাক, সম্ভবত ছিল রুশ অশ্বারোহী সেনা দলে যারা ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নকে তাড়া করে রাইন নদী পার করে দিয়েছিল; পরে লোকটি দল ত্যাগ করে মৃত্যুর মুখে হামাগুড়ি দিয়ে ঐ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

কেউ বললেন নেআনডার্টাল গুহাবাসীটির বিসদৃশ অবয়বগুলি রোগবিকৃত, তাঁদের এক জন যথার্থ অনুমান করেছিলেন তার রিকেটস রোগ ছিল এবং কনুই ভেঙে আর সারে নি। কিন্তু এই তথ্য থেকে তিনি মস্ত এক হাস্যকর লাফ মারলেন—শারীরিক যন্ত্রণায় ক্রমাগত ভুরু কুঁচকে থাকতে থাকতে তার ভ্রূ-অস্থি উঁচু হয়ে উঠল। এ দিকে ইংল্যানডে ভূবিজ্ঞানী চার্লস লায়াল নেআনডার্টাল খুলির এক নকল বানিয়ে গরিলা ও নিগ্রো খুলির মাঝামাঝি রেখে প্রদর্শন করলেন। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদীদের কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে মধ্যবর্তী যোগসূত্র খুঁজতে অতীতে তাকাবার দরকার নেই; এই দলের এক 'বিশেষজ্ঞ' দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করলেন নিগ্রো এবং জড়বুদ্ধি বা হাবাদের—নিগ্রোরা নাকি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং তাদের পায়ের পাতাও বনমানুষের মত কিছুটা জড়িয়ে ধরতে পারে, এবং হাবাদের মধ্যে বনমানুষ থেকে আধুনিক উন্নত মানুষ পর্যন্ত সব রকম ধাপ পাওয়া যাবে। অবশ্য এই ধরনের ধারণা খুব সমর্থন পায় নি।

নেআনডার গুহার মানুষটির মুখ ও চোয়ালের হাড় না থাকায় এবং কাছাকাছি হাতিয়ার বা পশুর হাড়ের অভাবে তাকে মানুষ বলে চেনা কঠিন হয়েছিল, কিন্তু এর আর একটা বড় কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মনে সনাতন বদ্ধবিশ্বাস। অবশ্য আয়ার্ল্যানডের অধ্যাপক উইলিয়াম কিং এক ধাপে অনেকটা

এগিয়ে নেআনডার্টাল মানবের সরকারী নাম দিলেন হোমো নেআনডার্টালেন্সিস, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই তার আখ্যা ছিল। কিং মানলেন যে সে এখন-অবলুপ্ত এক জাতের মানুষ, তাই হোমো গণভুক্ত। কিন্তু তার বেশী নয়, আধুনিক সেপিয়েনস প্রজাতি তার অনেক উর্ধ্বে, কারণ "নেআনডার্টাল খুলি এতই বানরোপম যে তার মধ্যে পাশবিক ভাবনা ও বাসনার বেশী কিছু খেলত না"। আমরা দেখব আধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণা প্রমাণ করেছে এই ধারণা কতটা ভুল, কিন্তু সেই সময়ে এমন ভুল স্বাভাবিক ছিল।

জার্মেনির মহারথ নৃবিজ্ঞানী রুডল্ফ ফির্শো বললেন যে মানুষটি মোটেই প্রাচীন নয়, একেবারে আধুনিক, তার দৈহিক বিকৃতির কারণ বাল্যে সে রিকেটস রোগে ভুগেছে, পরিণত বয়সে বাতে, উপরন্তু কোনও এক সময়ে তার মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পড়েছে। ফির্শোর এমনই প্রতিপত্তি ছিল যে এর উপর কিং বা অন্য কেউ আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। তা ছাড়া মন বলছে তাঁদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ দেখতে তাঁদেরই মত সভ্যভব্য হবে, বনমানুষী ছাপ থাকলে চলবে না। এমন সময়ে ১৮৬৮ সালে ফ্রানসে প্রায় এই ছাঁচে ঢালা ক্রোমানীয় মানুষ আবিষ্কার হওয়াতে ঐ বিশ্বাস দৃঢ়তর হল। পরে জানা গিয়েছে ক্রোমানীয়রা অনেক নবীন, আধুনিক মানুষের আদি সংস্করণ (আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়)।

কিন্তু নেআনডার্টাল মানব ধামাচাপা বা মাটিচাপা থাকতে রাজী নয়। ক্রোমানীয় ফসিল আবিষ্কারের প্রায় ১৮ বছর পরে বেলজিয়ামের গ্রৎ দ স্পি অঞ্চলের এক চুনাপাথরের গুহা খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক ভিটের থেকে ঐ দেশের এক বিজ্ঞানী দল উদ্ধার করলেন দুটি অসম্পূর্ণ কঙ্কাল, একটির খুলিতে (সম্ভবত স্ত্রী) নেআনডার গুহাবাসীর তুলনায় কিছু বৈষম্য থাকলেও অন্যটি প্রায় মিলে গেল। আকস্মিক মিল, বললেন ফির্শো, এরাও রোগবিকৃত আধুনিক মানুষ। কিন্তু তিনের মধ্যে তিনই আকস্মিক বিকৃতি কেমন যেন শোনায়, তা ছাড়া স্পি কঙ্কালগুলির সঙ্গে রয়েছে রুক্ষ হাতিয়ার শিলা এবং তুষার যুগের লুপ্ত জন্তুর হাড়। অতএব অধিকাংশ বিজ্ঞানী মানতে বাধ্য হলেন যে কোনও বিসদৃশ সংস্করণের মানুষ আদি যুগে পশ্চিম য়োরোপে বাস করেছে। এই দ্বিতীয় দুটি কঙ্কাল থেকে মোটামুটি নেআনডার্টাল মানবের মূর্তিটা

অনুমান করা সম্ভব হল। বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান দেহ, উচ্চতা দেড় মিটার কিংবা সামান্য বেশী, শক্তিশালী হাতে বেঁটে মোটা আঙুল। পায়ের পাতাও অনুরূপ ; মাথা সামনে পিছনে লম্বা, ব্রহ্মতালু চাপা, গাল-ফোলা মস্ত মুখমণ্ডল, দুই ভুরু জুড়ে গিয়েছে উঁচু অস্থির উপর, তার নিচে চোখ দুটি প্রায় ঢাকা পড়েছে, ভারী চোয়াল, বড় বড় দাঁত। অপসৃত কপাল ও ক্ষীণ থুতনির মাঝখানে ঠোঁট নাক মুখ সামনে এগিয়ে আছে। কুশ্রী কদাকার মানুষ স্বীকার করা আর তাকে পূর্বপুরুষ বলে মানা এক কথা নয়, বিজ্ঞানীরা প্রায় এক বাক্যে বললেন ওরা মানব বংশতরুর এক খামখেয়ালী শাখা, আমরা ওদের বংশধর নই, সম্পর্ক থাকলেও তা অতিশয় দূর।

১৮৯১ সালে দেখা দিল জাভা মানব, তার মূর্তি আরও আদিম, মগজ আরও ছোট। এর পর সংখ্যাল্প জন কয়েক বিজ্ঞানী যখন জাভা, নেআনডার্টাল ও ক্রোমানীয় মানবকে এক সূত্রে গেঁথে বংশতরুর প্রধান শাখায় স্থান দিলেন তখন আদিম থেকে আধুনিক মানুষে ক্রমবিকাশের ছবিটি স্পষ্ট রূপ নিল। এই চিত্রটিকে আরও সমর্থন করল হাইডেলবার্গ চোয়ালের আবিষ্কার যখন দেখা গেল জাভা মানবের জাতভাই নেআনডার্টালদের আগে য়োরোপে বাস করেছে। ডারুইন তত্ত্বের নিদারুণ আঘাত সহণীয় হয়ে এল।

যেন মানুষের পঙ্‌ক্তিতে যোগ্য আসন পেয়ে দেখতে দেখতে নানা জায়গায় মাথা তুলল নেআনডার্টালরা। য়োরোপের ফসিলগুলি আবিষ্কার হয়েছে গুহা বা শিলাশ্রয়ে (অর্থাৎ যেখানে পাহাড়ের গায়ে পাথর এগিয়ে এসে ছাত সৃষ্টি করেছে), তার কারণ নেআনডার্টালরা অন্তত এক লাখ বছর আগে দেখা দিলেও তারা প্রধানত শেষ তুষার যুগের মানুষ যা শুরু হয় প্রায় ৭৫,০০০ বছর আগে। এই সময়ে উত্তর য়োরোপ বরফ চাপা পড়ল, মানুষ স্বভাবতই শীত এড়াতে গুহা গহ্বরে আশ্রয় খুঁজত। প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে নেআনডার্টাল মানব যখন বিদায় নিল তখনও তুষার যুগ শেষ হতে অনেক বাকি। ভুক্ত জন্তুর হাড়েও এই শীতার্ত জীবনের নির্দেশ মেলে, যেমন স্পি গুহায় ছিল শপমী গন্ডার, রোমশ ম্যামথ, গুহা ভালুক ও গুহা হায়নার অস্থি। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসে দর্দনিয় অঞ্চল এক বিশেষ ফসিল-উর্বর ক্ষেত্র,

সেখানে আগে অসংখ্য হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে, বর্তমান শতাব্দের প্রথম দশক থেকে শুরু করে আবিষ্কার হল চমৎকার কয়েকটি দেহাবশেষ—লা শাপেল-ও-স্যাঁ গ্রামের কাছে এক গুহায় এক বৃদ্ধের এবং অদূরে ল মুস্তিয়ের নামক জায়গায় আর একটিতে ১৬ বছর বয়স্ক এক তরুণের কঙ্কাল, যদিও খুলিটি চূর্ণ। ল মুস্তিয়ের গুহার ফসিল আবিষ্কারের অনেক আগেই ১৮৬০ দশকে যে হাতিয়ার শিল্প লক্ষিত হয়েছে তার নাম মুসতেরীয়, ফসিলটি পাওয়ার পর অশরীরী শিল্পীরা কায়া পেল। অবশ্য এর আগে স্পি গুহাবাসীদের সঙ্গেও এই জাতের হাতিয়ার দেখা গিয়েছে। লা ফেরাসি এবং লা কিনা শিলাশ্রয়ে আগে পরে পাওয়া গেল স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের বেশ কিছু খুলি কঙ্কাল ইত্যাদি। তা ছাড়া ১৮৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ার ক্রাপিনা শিলাশ্রয়ে সমাধিস্থ অন্যূন দশটি নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষের কয়েক শো অস্থি ও দাঁত উদ্ধার হল, সঙ্গে মুসতেরীয় হাতিয়ার ও পশুর হাড় কয়েক হাজার। এই বিচিত্র অস্থি সম্পদের সাহায্যে নেআনডার্টালদের স্পষ্ট রূপায়ণ আরও সহজ হওয়া উচিত, কিন্তু বিশ্বের সেরা ফসিল-বিশারদ মার্সেল্যাঁ বূল একের পর এক কয়েকটি অবিশ্বাস্য ভুল করে বসলেন—নেআনডার্টাল মানবের দরবারে তিনিই প্রধান অপরাধী।

বূল তখন ফ্রানসের জাতীয় যাদুঘরে কাজ করেন, তাঁর উপর ভার পড়ল লা শাপেল কঙ্কাল থেকে নেআনডার্টাল মানবের প্রতিনিধি মূর্তি গড়ে তোলার। মেরুদণ্ডের কয়েকটি খণ্ড ও কিছু দাঁত ছাড়া সবই তাঁর ছিল, তথাপি পুনর্গঠিত প্রতিকৃতিটি হয়ে দাঁড়াল আপাদমস্তক প্রায় বনমানুষ। যথা বনমানুষের মত পায়ের বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের মধ্যে অনেকটা ফাঁক, যার থেকে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি যে নেআনডার্টাল মানব পায়ের পাতার বাইরের দিকে ভর করে হাঁটত। পা দুটি সম্পূর্ণ সোজা হত না, তাই হাঁটু কিছুটা মুড়ে থাকত। আমরা অনায়াসে সোজা হয়ে দাঁড়াই শিরদাঁড়ায় ঢেউ-খেলানো বাঁক আছে বলে, দেখা গেল নেআনডার্টাল প্রতিমূর্তিতে তা নেই, সুতরাং মাথাটা ঘাড়ের কাছাকাছি এত ঝুঁকে আছে যে দু হাত সামনে দোদুল এবং ভারসাম্যের অভাবে তার মুখ থুবড়ে পড়া উচিত, আকাশের দিকে তাকালে ঘাড় মচকে যাবে। এই সমস্যা এড়াতে

কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তকের ছবিতে নেআনডার্টাল মানুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে—যেন খাড়া থাকতে হলে তাকে ক্রমাগত হেঁটে যেতে হবে। সুতরাং নমুনাটি হয়ে দাঁড়াল কুঁজো কদর্য আনাড়ী এক প্রাণী যার মানব নামটা নাম মাত্র। বুদ্ধিতেও বুলের বিচারে সে স্থান পেল আধুনিক মানুষের তুলনায় বরং বনমানুষের দিকে। তার কারণ যদিও মস্তিষ্কের পরিমাণ আমাদের হার মানায়, বিচারকের নজরটা ছিল শুধু খুলির আকৃতির দিকে। হোমোগণীয় হলেও এমন মানুষের অদৃষ্ট হল নির্ঘাত অবলুপ্তি, নরোত্তম ক্রোমোনীয়দের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই সম্ভব নয়। বুলের সুখ্যাতি এতই অবিসংবাদিত ছিল যে তাঁর ভুলও পাকা হয়ে রইল, তিনটি মোটা মোটা বইতে তিনি যখন নেআনডার্টালদের সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন তখন তাঁর সৃষ্ট মূর্তিটাই গেঁথে রইল সাধারণ লোক ও বিজ্ঞানীদের মনে—মুষ্টিমেয় জন কয়েক ছাড়া। ১৯২০ দশকে বিখ্যাত ইংরেজ বিশেষজ্ঞ এলিয়ট স্মিথ এই "কিম্ভূতকিমাকার ও বিতৃষ্ণাজনক" মানুষটির চেহারার বর্ণনায় লিখলেন চ্যাপটা নাকটি মুখমণ্ডলে স্পষ্ট পৃথক নয়, ফলে মুখাগ্র অনেকটা জন্তুর ছুঁচালো প্রলম্বিত মুখের মত দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, তিনি বললেন তার প্রায় সারা দেহ লোমে ঢাকা, হাত অপটু কারণ বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের সহযোগিতা আমাদের মত সহজ নয়, ইত্যাদি।

বুলের প্রভাব ছাড়াও ভুল ধারণার আর এক কারণ হল নেআনডার গুহার মানুষটি যখন বিশ্বের কাছে পরিচিত হল তার অল্প পরেই ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ জানাল মানুষ ও বনমানুষ একই পূর্বপুরুষের বংশধর; সুতরাং সাধারণের কল্পনায় ও চিত্রকরদের তুলিতে এই প্রাচীন মানুষ তার জ্ঞাতি ভাই গরিলা ও শিমপানজির মূর্তি নিল। চেহারা ছাড়াও নেআনডার মানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক অস্বীকার করবার কারণ ছিল। তার আর ক্রোমানীয় মানবের মাঝামাঝি কোনও ফসিল পাওয়া যায় নি। ক্রোমানীয়দের হাতিয়ারও তুলনায় অনেকটা মার্জিত, উপরন্তু কোনও কোনও গুহা খুঁড়ে পর পর স্তর উদঘাটিত করে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে হাতিয়ারহীন স্তর পাওয়া গেল, যেন তখন গুহায় কেউ বাস করে নি। ফলে জোর পেল এই যুক্তি যে নেআনডার্টাল ও ক্রোমানীয় মানবের মধ্যে যোগসূত্র নেই, একের থেকে অন্যের উদ্ভব হয় নি।

কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটির ফসিল পূবে ক্রাইমিয়া ও রুমানিয়া থেকে পশ্চিমে স্পেইন ও জার্সি দ্বীপ পর্যন্ত সারা য়োরোপে দেখা দিতে লাগল। তার পর ১৯২১ সালে আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে সুদূর উত্তর রোডীসিয়ায় (এখন জ্যাম্বিয়া) ব্রোক্‌ন্ হিল নামক টিলার গুহায় নেআনডার্টাল-সদৃশ ফসিল পাওয়া গেল, সঙ্গে প্রাচীন হাতিয়ার ও লুপ্ত পশুর হাড়। খুলির ভ্রূ-অস্থি য়োরোপীয় ভাইদের এমন কি যে কোন পুরামানবের চেয়ে উঁচু ও মোটা, অথচ হাত পায়ের হাড় আরও সোজা ও সরু, সুতরাং আধুনিকের দিকে। দাঁতগুলি অত্যধিক ক্ষয়ে গিয়েছে (সম্ভবত বেশী মধু খাওয়ার ফলে)। ফির্শো যথারীতি বললেন, রোগবিকৃত কিন্তু আধুনিক মানুষ। পক্ষান্তরে ব্রিটেনের এক বিশেষজ্ঞ বিপরীত মত জানালেন যে রোডীসীয় মানব নেআনডার্টালদের তুলনায় শিমপান্‌জি ও গরিলার আরও নিকট। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাকে নেআনডার্টালদের আফ্রিকাবাসী সংস্করণ বলে ভাবলেন। সেই মহাদেশের উত্তরে ভূমধ্য সাগর উপকূলেও নেআনডার্টালদের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল, যদিও ফসিল নয়।

তার পর সুদূর ইজ্‌রেলে (তখন প্যালেস্‌টাইন) ১৯২৫ সালে গ্যালিলী হ্রদ তীরে উদ্ধার হল কয়েক খণ্ড খুলি যা দেখে অনেকে ভাবলেন তা এক জাতীয় নেআনডার্টালের। তখন প্রশ্ন উঠল নেআনডার্টালরা এসেছে পূব না পশ্চিম দিক থেকে, মানুষের জন্ম এশিয়ায় এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী পূব দিকে নির্দেশ করলেন। যেন তাঁদেরই সমর্থনে ১৯৩১ সালে দুবোআর ক্ষেত্র যবদ্বীপে সোলো নদীর তীর খুঁড়ে পাওয়া গেল এগারোটি খুলি, তাদের আকার আকৃতিতে নেআনডার্টাল মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চিহ্ন দেখা যায়, যদিও খুলির হাড় আরও মোটা বলে মনে হয় প্রাচীনতর। য়োরোপ ও যবদ্বীপের মধ্য পথে রাশিয়ার উজ্‌বেকিস্তানে ইতিহাসবিশ্রুত সমরকন্দ শহরের ১২৬ কিলোমিটার দূরে তেশিক-তাস পাহাড়ের গুহায় এক স্পষ্ট নেআনডার্টাল বালকের দেহাবশেষ পাওয়া গেল। সবচেয়ে উত্তেজক আবিষ্কার ঘটল ১৯৩০ দশকের প্রথমে ইজ্‌রেলের কার্মেল গিরির দুটি গুহায়, এই ফসিলগুলির বেশ কিছু আধুনিক বৈশিষ্ট্য অবাক করল এবং অনেক বদ্ধ ধারণা দূর হল। এক ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান প্রথমে টাবুন গুহায় উদ্ধার করল একটি স্ত্রী-কঙ্কাল যা নিঃসন্দেহে

নেআনডার্টাল হলেও কপাল অনেকটা খাড়া ভ্রূ-অস্থি অপেক্ষাকৃত হালকা, খুলি সামান্য বেশী উঁচু এবং পিছনে আরও গোল। তার পর স্খুল গুহায় দেখা দিল দশটি মানুষের ফসিল, কেউ কেউ সনাতন য়োরোপীয় নেআনডার্টালদের মত, অন্যরা কিছুটা আধুনিক এবং এক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি হোমো সেপিয়েনসের বেশ সন্নিকট—মুখমণ্ডল ক্ষুদ্রতর, মোটা ভ্রূ-অস্থির চিহ্ন মাত্র বর্তমান, কপাল অনেকটা খাড়া, ব্রহ্মতালু উচ্চতর, পশ্চিম য়োরোপীয় খুলি পিছনে যে খোঁপার মত ফুলে থাকে তা আগোচর, চোয়াল অপেক্ষাকৃত হালকা, থুতনি স্পষ্টতর এবং পায়ের হাড় আরও লম্বা ও সোজা; খুলির আকৃতিতে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

উত্তর ইরাকের গিরি শ্রেণীর শানিডার নামক জায়গায় এক গুহায় তরুণ মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রাল্‌ফ সলেকি ও তাঁর দল ১৯৫১ সালে খনন আরম্ভ করে ক্রমে অনেকগুলি প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল উন্মুক্ত করেন। বছর ৪০ বয়সের এক ব্যক্তির খুলি দেখে বোঝা যায় তার মৃত্যু হয়েছিল অপঘাতে, ছাত থেকে প্রকাণ্ড পাথর ভেঙে পড়ে, গুহাবাসীদের মাথায় সর্বদা এই বিপদের আশংকা ঝোলে। ৪৪,০০০ বছর ধরে সমাধিস্থ অস্থির পরীক্ষায় আরও জানা যায় যে তার ছিল বাত এবং পচা দাঁত, তা ছাড়া একটি বাহু শুকিয়ে পঙগু। মানুষটির এক মিটার ৬০ সেনটিমিটার উঁচু দেহ পশ্চিম য়োরোপীয় ভাইদের মত গাঁট্টাগোট্টা, কিন্তু ভুরুর হাড় উপরোক্ত টাবুন গুহাবাসী মহিলাটির মতই কিছুটা কম মোটা ও ভারী, ফলে মুখের উপরাংশের চেহারা আধুনিকের দিকে। বস্তুত প্রতিটি শানিডার খুলির উপর দিকে আধুনিকতার চিহ্ন, টাবুন মহিলার সঙ্গে কিছু পার্থক্য থাকলেও তাকেও এদেরই দলে ফেলা হয়েছে। শানিডার গুহায় প্রায় ৬০,০০০ বছর ধরে নেআনডার্টালদের বাস ছিল (অর্থাৎ প্রায় ২০০০ বংশ), তাদেরই মত কনকনে হিমেল হাওয়া থেকে বাঁচতে এখন স্থানীয় কুর্দীয় মেষপালকরা শীত কালে সেখানে আশ্রয় নেয়। এই অঞ্চলেই মাত্র হাজার দশেক বছর আগে পশুপালন ও কৃষির আবিষ্কার দিয়ে নবপ্রস্তর যুগের সূচনা।

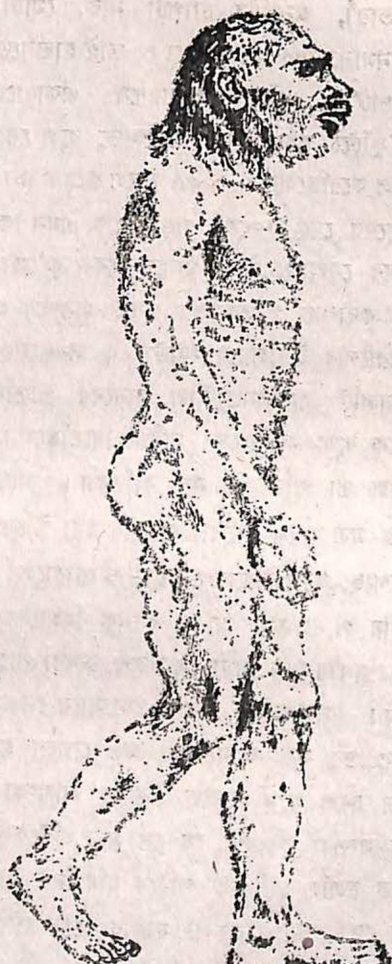
সাম্প্রতিক কালে পূর্ব য়োরোপ (চেকোস্‌লোভাকিয়া, হাংগেরি, গ্রীস ইত্যাদি দেশ) এবং মধ্য ও উত্তর আফ্রিকায় প্রাপ্ত ফসিলে বিশেষত্বগুলি

পশ্চিম য়োরোপীয়দের মত অত প্রকট নয়—দীর্ঘতর লঘুতর দেহ, হাত পা কম খাটো, মাথার চূড়া কিছু উঁচু, মুখমণ্ডল সামান্য ছোট, সুতরাং সর্বাঙ্গীণ মূর্তি অপেক্ষাকৃত মনোরম। স্খুল গুহাবাসীরা ক্রমবিকাশের পথে হোমো সেপিয়েনসের দিকে সবচেয়ে বেশী এগিয়েছে। তা হলে নেআনডার্টালরা তো মানব বংশতরুর নিষ্ফল প্রশাখা হতে পারে না। কোনও কোনও নরবিজ্ঞানী বললেন কার্মেল গিরির লোকদের জন্ম নেআনডার্টাল ও স্থানীয় কোনও অজ্ঞাত আধুনিক মানব গোষ্ঠীর যৌন মিলন থেকে, কিন্তু এমন সংযোগ ছিল বিরল ও অভিব্যক্তির মূল সূত্র থেকে পৃথক। লুই লীকি মন্তব্য করলেন এই মিশ্র সংগম থেকে খচ্চরতুল্য বন্ধ্য সংকর সন্তান সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। পিলবিমের মতে স্খুলবাসীরা সম্ভবত স্থানীয় ও য়োরোপীয় আধুনিক মানুষের জন্মদাতা, কিন্তু অন্যত্র আমাদের পূর্বপুরুষ হতে পারে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ভারতের কোনও অজ্ঞাত সম্প্রদায়। অনেকে বিশ্বাস করতেন—এখনও কেউ কেউ করেন—যে আধুনিক মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বহু লক্ষ বছর আগে এবং আমরা তাদেরই অবিমিশ্র ও সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। মার্সেল্যাঁ বুল দুটি প্রাচীন মানুষের উদাহরণ দিলেন ইটালিতে আবিষ্কৃত এক জোড়া গ্রিমাল্ডি মানব ও ইংল্যানডের পিলটডাইন মানব। এই ছদ্মবেশীর কাহিনী আমরা জানি এবং আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে গ্রিমালডি মানব নেআনডার্টালদের চেয়েও নবীন। কিন্তু প্রাক্-নেআনডার্টাল আধুনিক চিহ্নিত ফসিল কিছু আছে, আমরা একটু পরে তাদের সঙ্গে পরিচয় করব।

নেআনডার্টাল ফসিলের প্রাচুর্যও তাদের ন্যায় বিচারে সাহায্য করল। উপরে উল্লিখিত ঘাঁটিগুলি ছাড়াও এশীয় হোমো ইরেকটাসের মত যবদ্বীপের পরে চীনে নেআনডার্টালদের অস্থি মিলেছে। আজ সব নিয়ে এদের শতাধিক ব্যক্তির ফসিল আছে বিজ্ঞানীদের হাতে, তাঁরা বুলের ভুল ধরতে আরম্ভ করলেন। অবশ্য একই অস্থির থেকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পুনর্গঠনে কিছু পার্থক্য থাকবেই, তার কারণ ফসিলে শুধু হাড়ই পাই, তার উপর রক্ত মাংসের মূর্তিটি গড়ে তুলতে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়, ব্যক্তিগত ধারণার প্রভাবও পড়ে। সুতরাং একই নেআনডার্টাল খুলি থেকে দুটি বিভিন্ন মুখ তৈরি করা সম্ভব—একটিতে আধুনিক ছাপ স্পষ্ট যদিও ভুরু

উঁচু এবং চোয়াল ভারী, অন্যটির চ্যাপটা নাক, মোটা ঘাড়, রোমশ বুক ইত্যাদি দেখতে বনমানুষদের মনে পড়ে। তাই হার্ভার্ডের এক নৃবিজ্ঞানী বলেছিলেন নেআনডার্টাল খুলিতে অনায়াসে একাধারে শিমপানজি ও দার্শনিকের চেহারা ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু বুল নেহাত আনাড়ীর মত কতগুলি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে কয়েক জন বললেন সদ্য হাঁটতে শিখেছে এমন শিশুদের দেহ সম্পূর্ণ খাড়া থাকে, এমন কি বনমানুষ দু পায়ে দাঁড়ালে তাদেরও, তবে নেআনডার্টাল মানুষ কেন কুঁজো হয়ে চলবে। দু বছর পরে বুল-সৃষ্ট কদাকার প্রতিকৃতির গায়ে মারাত্মক আঘাত হানলেন দুই শারীরস্থানবিৎ যুক্তরাষ্ট্রের ইউলিয়াম স্ট্রাউস ও লনডনের এ. জে. ই কেভ। লা শাপেলের কঙ্কালটি নেআনডার্টাল মানবের প্রতিনিধি স্থানীয় ধরা হয়েছিল বলে সেটিকে বুল রক্তমাংসের মূর্তি দিয়েছিলেন, স্ট্রাউস ও কেভের পরীক্ষায় দেখা গেল তা প্রতিনিধি নয়, ব্যতিক্রম। অস্থিগুলির সন্ধি স্থলে বিকৃতি দেখে বুলের মত সুদক্ষ পুরাবিজ্ঞানীর ধরা উচিত ছিল যে মানুষটি সাংঘাতিক বাতে ভুগেছে, ফলে মেরুদণ্ডের হাড় ও চোয়ালের গঠন অস্বাভাবিক। এই গবেষকরা বুলীয় পুনর্গঠনে আরও অনেক বিশ্বাসের কারণ খুঁজে পেলেন না, যেমন হাড় ও শ্রোণীর হাড় বনমানুষ-সদৃশ, অথবা পায়ের পাতা তাদের মত জড়িয়ে ধরতে সক্ষম। সংশোধিত ধারণা অনুসারে নেআনডার্টালরা সম্পূর্ণ পায়ের পাতার উপর ভর করে আমাদেরই মত সোজা হয়ে দাঁড়াত ও হাঁটত, সামনে ঝুঁকে চলার ফলে মুখ থুবড়ে পড়বার আশংকা ছিল না। এই সব সাদৃশ্য থেকে তাঁরা মন্তব্য করলেন যে সে মানুষটিকে পুনর্জন্ম দিয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করিয়ে চলতি পোশাক পরিয়ে যদি নিউ ইয়র্কের পাতাল রেলে চড়িয়ে দেওয়া যায় তো অন্য কোনও যাত্রীর চেয়ে তার দিকে বেশী নজর পড়বে কিনা সন্দেহ।

সংশোধনের ফলে নেআনডার্টালরা আমাদের জন্মদাতা হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন আবার মাথা তুলল, এই অধ্যায়ের শেষে সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখা যাবে তা খুবই সম্ভব। যাই হক, সন্দেহ নেই যে যে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয় সে অবশেষে পেয়েছে তার যোগ্য অধিকার। বুলীয় সংস্কার বাতিল করে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে নেআনডার্টাল মানব লাভ করেছে হোমো সেপিয়েনস



চিত্র ১৩। নেআনডার্টাল মানব।

নামের মর্যাদা, এবং যা ছিল তার প্রজাতীয় আখ্যা তা এখন উপপ্রজাতীয়—সব মিলিয়ে হোমো সেপিয়েনস নেআনডার্টালেন্‌সিস। এটুকু দরকার পরবর্তী খাঁটি মানুষের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে, যার পুরো নাম হোমো সেপিয়েনস সেপিয়েনস। নেআনডার্টালদের মধ্যে প্রভেদ নির্দেশ করতে রোডেসিয়েন্‌সিস

ও সোলোএন্‌সিস উপপ্রজাতীয় নামও চলছে। এই প্রভেদ ছাড়াও আধুনিক মানুষের মতই নেআনডার্টালরা সম্ভবত নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল, য়োরোপে জিব্রলটার ও ক্রাপিনায়, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ ফ্রানসের খুলির মধ্যে আমরা এই ধরনের পার্থক্য দেখি।

আমরা দেখেছি হোমো ইরেকটাস বিদায় নিয়েছে আজ প্রায় তিন লক্ষ বছর হল, এ যাবৎ তার শেষ চিহ্ন মিলেছে য়োরোপে, সেখানে নেআনডার্টাল মানব দেখা দিয়েছে এক লক্ষ বছর কি আরও হাজার দশেক বছর আগে। এদের মধ্যবর্তী কালের যারা ছিল এখানে ওখানে তাদের কিছু ফসিল ও প্রচুর হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। হাড়ের গঠনে তারা নেআনডার্টালদের চেয়ে আদিম হলেও ইরেকটাসের তুলনায় কিছু বৈশিষ্ট্য আধুনিক। এই মানুষদের এখন এক সঙ্গে বলা হয় আদি হোমো সেপিয়েনস, তাদের মধ্যে যেন নানা প্রকার-ভেদ নিয়ে প্রকৃতির পরীক্ষা চলেছিল, যার থেকে আগে নেআনডার্টাল ও পরে আধুনিক খাঁটি মানুষের সৃষ্টি।

এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ১৯৩০ দশকের দুটি আবিষ্কার, কারণ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তারা পণ্ডিতদের ভাবিয়ে রেখেছিল। লনডনের অদূরে টেম্‌স উপত্যকায় সোআন্‌সকুম গ্রামের কাছে এক খুলির উপরাংশ পাওয়া যায়, সম্ভবত এক স্ত্রীলোকের, ভূতাত্ত্বিক নজির অনুসারে তার বয়স প্রায় আড়াই লাখ বছর। সম্ভবত কোনও এক তরুণীর আর একটি খুলি আবিষ্কার হয় জার্মেনির ষ্টুটগার্ট শহরের সন্নিকটে ষ্টাইনহাইম অঞ্চলের এক নুড়ি খাতে, তাতে মুখের সম্মুখভাগ অনেকটা বর্তমান। খুলি দুটির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য, তারা প্রায় সমপ্রাচীন, মুশকিল হল শ্রেণীবিভাগ নিয়ে, কারণ নৃতাত্ত্বিকরা তাদের মধ্যে একাধারে আদিম ও আধুনিক চিহ্ন লক্ষ্য করলেন; যথা মোটা হাড় ও উঁচু ভ্রূ-অস্থি প্রাচীনতা নির্দেশ করে, অথচ খুলির পিছন দিক আধুনিক মানুষের মত গোল। অনেকের মনে সন্দেহ দৃঢ়তর হল যে হোমো সেপিয়েনস নেআনডার্টালদের চেয়েও প্রাচীন, আবার এমন অভিমতও শোনা গেল যে এই দুইয়ের বর্ণসংকর ইংল্যানড ও জার্মেনির এই মানুষ দুটি। বহু কাল ধরে চুলচেরা মাপজোক ও নিষ্ফল আলোচনার পর ১৯৬৪ সালে কেম্‌ব্রিজের বিজ্ঞানী

এদের এবং বিভিন্ন নেআনডার্টাল খুলির নানা মাপ কম্পিউটার যন্ত্রে বিশ্লেষণ করলেন অভিব্যক্তিগত পারস্পারিক সম্পর্কের খোঁজ। যন্ত্র জানাল সোআনসকুম ও স্টাইনহাইম খুলির 'আধুনিকতা' আসলে চোখ-ভোলানো, প্রাচীনতার অনুপাতে তাদের গঠনও আদিম। নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগে এই ভাবে পুরাতত্ত্বের চিরাগত অস্পষ্টতা অনিশ্চয়তা এখন কেটে যাচ্ছে, পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে।

ফরাসী বিজ্ঞানী অঁরি দ লুমলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তের্‌রা আমাতায় হোমো ইরেকটাস ঘাঁটি আবিষ্কার সম্পর্কে, ১৯৭১ সালে তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী মারী-আঁতোআনেৎ ফ্রানসের পিরেনে পর্বতের নিম্নাংশে তোতাভেল নামক জায়গায় এক গুহা খুঁড়ে উদ্ধার করলেন এক প্রাচীন শিকারীর ভাঙা খুলি, তার বয়স ছিল কুড়ির কাছাকাছি, বাস প্রায় দু লাখ বছর আগে। কিছু হাতিয়ার ও দুটি ভারী চোয়ালও পাওয়া গেল, একটির পেষক দাঁতের অল্প ক্ষয় দেখে মনে হয় যেন তাও কোনও তরুণের। খুলির পরীক্ষায় দেখা গেল মুখাগ্র সামনে প্রসারিত হলেও প্রসারণের অনুপাত ইরেকটাসের চেয়ে কম এবং নেআনডার্টালদের চেয়ে বেশী; কপাল ঢালু কিন্তু ভ্রূ-অস্থি ইরেকটাসের তুলনায় কিছু কম উঁচু; চোয়াল ও দাঁত নেআনডার্টালদের চেয়ে বড়; মেধার পরিমাণ ইরেকটাসের চেয়ে বেশী, নেআনডার্টালদের চেয়ে কম। সুতরাং ক্রমবিকাশে এই শিকারী দলের স্থান হোমো ইরেকটাস ও নেআনডার্টাল মানবের মাঝামাঝি। তোতাভেলের খুলি ও চোয়ালের সঙ্গে সোআনসকুম ও স্টাইনহাইম ফসিলগুলির সাদৃশ্যও স্পষ্ট।

আমরা দেখেছি দ লুমলের দল তের্‌রা আমাতার উন্মুক্ত বালিয়াড়ির উপর ইরেকটাসের গঠিত ছাউনির সাক্ষ্য লক্ষ্য করেছিলেন, তোতাভেলের আবিষ্কারের পরে দ লুমলে দম্পতি দক্ষিণ ফ্রানসে লাজারে নামক স্থানে এক গুহার ভিতরে প্রায় দেড় লাখ বছর প্রাচীন তাঁবু জাতীয় আশ্রয়েরও চিহ্ন পেয়েছেন মেঝেতে খুঁটির গর্তে। দু দিকে দুটো খুঁটি পুঁতে তাদের মাথায় একটা ডাল বসিয়ে তার গায়ে সরু সরু ডাল হেলিয়ে কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল, বাসিন্দারা তা ঢেকেছিল পশুর চামড়া দিয়ে। সম্ভবত মাটির কাছে চামড়ার উপর পাথর চাপা দিয়ে তা ধরে রাখা হত। গুহার মধ্যে তাঁবু খাটাবার প্রয়োজন হয়েছে

হয়তো বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রাখতে অথবা গুহার ছাত থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়া জল আটকাতে। তা ছাড়া উদ্দেশ্য ছিল কনকনে হাওয়া রোধ করা, কারণ তাঁবুর প্রবেশ পথ গুহার মুখের ভিন্ন দিকে ফেরানো ছিল। দ লুমলেরা আর এক আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কার করলেন—প্রতিটি তাঁবুর প্রবেশ পথের ঠিক ভিতরে একটি করে নেকড়ের খুলি রক্ষিত। একই ভাবে রাখা এই খুলিগুলি যে বর্জিত জঞ্জাল নয় তা স্পষ্ট, যদিও এদের তাৎপর্য এখনও রহস্যাবৃত। হয়তো যাযাবর শিকারীরা অন্য কোথাও যাওয়ার আগে খুলি স্থাপন করে যেত ঘর পাহারা দেবে বলে।

আদি সেপিয়েনসদের মুখখানা অনেকটা বনমানুষদের মত হলেও সবল দেহের গঠন আধুনিক এবং মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল প্রায় আধুনিক মানুষের সমান, প্রধানত তারই খাতিরে তারা সেপিয়েনস প্রজাতিভুক্ত। প্রায় দু লক্ষ বছর আগে তৃতীয় তুষার যুগের সূচনায় য়োরোপের হাওয়ায় হিমের পরশ লাগল, তখন থেকে প্রায় ৭৫,০০০ বছর বংশ পরম্পরায় তাদের অনেক কষ্ট সয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে বাঁচতে হয়েছে। সোআনসকুম মানবের বাসভূমি ইংল্যানডে ভরা গ্রীষ্মের দিনে প্রায়ই জল জমে বরফ হয়ে যেত। তুষার যুগের য়োরোপে বন বনানী সরে গিয়ে দেখা দিল বৃক্ষহীন প্রান্তর, তরু লতা জন্তু জানোয়ার বদলে গেল, তাদের অনেক প্রজাতি লোপ পেল, কেউ কেউ বেঁচে থাকবার যোগ্যতা পেল গায়ে লম্বা পশম গজিয়ে, যেমন গণ্ডার ও গুহাবাসী ভালুক। প্রকৃতির দেওয়া এই সব কম্বল নিহত ও ভুক্ত পশুর দেহ থেকে উদ্ধার করে শিকারীরাও সম্ভবত নিজের দেহ আচ্ছাদন করেছে শীত আটকাতে, গুহা গহবরে আশ্রয় খুঁজেছে। অবশ্য তুষার যুগের আগেই যে হোমো ইরেকটাস এই শীতপ্রধান মহাদেশে এ সব উপায় গ্রহণ করে থাকতে পারে তা আমরা দেখেছি।

প্রতিকূল পরিবেশে শিকার ও জীবন ধারণের অন্যান্য কাজে প্রাক্-নেআনডার্টাল সেপিয়েনসদের সহায় ছিল কয়েক লক্ষ বছর প্রাচীন আশীলয় হাতিয়ার, প্রধানত পাথর থেকে ঠুকে ঠুকে ফলক (flake) খসিয়ে ফেলে অবশিষ্ট অষ্ঠিটি (core) হল রুক্ষ হাত-কুড়াল বা কাটারি। মাংস কাটা, ছাল ছাড়ানো, তা পরিষ্কার করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধিত হত এই সব

চিরাগত অস্ত্র দিয়ে, কিন্তু হাতিয়ার শিল্পে কিছু উন্নতিও দেখা যায়; যেমন পাথরের হাতুড়ির বদলে হাড়, শিং অথবা কাঠ দিয়ে মৃদুতর আঘাতের ফলে চকমকি বা কোআর্টজাইট শিলা থেকে আরও ধারালো এবং সোজা হাতকুড়াল সৃষ্টি সম্ভব হল। তা ছাড়া কোনও কোনও চতুর উদ্যোগী যন্ত্রশিল্পী পাথর থেকে খসানো ফলক দিয়ে আরও মার্জিত অস্ত্র বানিয়েছে, তোতাভেল গুহায় অধিকাংশ এই লেভালোআ শ্রেণীর। প্রাক্তন অষ্ঠি শিল্পে অস্ত্রটি ক্রমশ চোখের সামনে মূর্তি নেয়, ফলক শিল্পে অগ্রিম অনুমান অনুযায়ী হঠাৎ প্রায় তৈরী বস্তুটি বেরিয়ে আসে, আগে জানতে হয় কোন পাথরে কোন দিক থেকে কত জোরে ঘা দিলে অভীষ্ট আকার আকৃতির ফলক খসবে, সুতরাং এই শিল্পীদের বুদ্ধিও উন্নত। ফলক শিল্পের সঙ্গে পরে আমরা আরও ভাল করে পরিচয় করব।

তার পর প্রায় ১,২৫,০০০ বছর আগে য়োরোপের হাওয়া উষ্ণতর হতে আরম্ভ করল। বরফ অপসরণ করল পাহাড়ের চূড়ায়, বন্ধ্য প্রান্তরে আবার বন দেখা দিল, প্রায় ৫০,০০০ বছর ধরে উত্তরাঞ্চলে বাস সহজ হল মানুষের। এই সময়ের কিছু ফসিলেও হোমো সেপিয়েনসের ক্রমাগত আধুনিকীকরণের চিহ্ন মেলে, যথা দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসে ফঁতেশ্ভাদ শহরের কাছে এক গুহায় প্রাপ্ত এক খুলি খণ্ডের সম্মুখাংশে ও ভ্রূ-অস্থিতে। এই ফসিল সম্ভবত ১,১০,০০০ বছর প্রাচীন, গড়নে তোতাভেল খুলির চেয়েও আধুনিক।

একাধারে নবীন-প্রবীণ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে য়োরোপের প্রাচীনতর আরও দুই মানুষ তাৎপর্যপূর্ণ, আগে হোমো ইরেকটাস সম্পর্কে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের খবরে বলে উত্তর গ্রীসে ক্ষুদ্র গ্রাম পেট্রালোনার গুহায় খনন করে পুরাবিজ্ঞানী আরিয়েস পুলিয়ানস পেয়েছেন এক খুলির উপরাংশের কয়েক খণ্ড ও মেরুদণ্ডের একটি মাত্র গিঁট, এবং পাথুরে হাতিয়ার ও পশুর হাড়। তিনি বলেন মানুষটি মারা গিয়েছে সাত লক্ষাধিক বছর আগে, তা হলে "এ যাবৎ আদিতম য়োরোপীয়"। কিন্তু পরে চার জন জার্মেনীয় বিজ্ঞানী অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বয়স পেয়েছেন ২,৪০,০০০ থেকে ১,৬০,০০০ বছরের মধ্যে। ফসিল পরীক্ষা করে কিছু ইরেকটাসের কিছু আদি সেপিয়েনসের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে। এ ছাড়া

পূর্ব য়োরোপেই হাংগেরি দেশের রাজধানী বুডাপেস্ট শহরের ৪৮ কিলো-মিটার পশ্চিমে ও হাইডেলবার্গের ৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূবে ভের্তেশ-সোললোশে অধ্যাপক লাস্লো ভের্তেশ্ এক প্রাগৈতিহাসিক ঘাঁটি উদঘাটন করেছেন। ১৯৬৫ সালে সেখানে এক পাথর-খাতে একটি খুলি পাওয়া যায়, কিছু দাঁতও উদ্ধার হয়েছে।

পেট্রালোনার মানুষটির বয়স সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কিন্তু ভের্তেশসোললোশ মানব যে প্রায় পাঁচ কক্ষ বছর প্রাচীন তা নিয়ে মতানৈক্য নেই। তখনও পৃথিবীতে ইরেকটাসের দিন শেষ হতে অন্তত দু লক্ষ বছর বাকি, তাই এই ফসিলের আধুনিকতা আরও অপ্রত্যাশিত ও আগ্রহজনক। সবচেয়ে আশ্চর্য মস্তিষ্কাধারের মাপ ১৪০০ সিসি, তা বর্তমান মানুষের গড় মাপের সমান, ইরেকটাসের গড় মাপের চেয়ে ৬০০ সিসি বড়। খুলির আকার আকৃতি লক্ষ্য করে কেনেথ ওকলি ও জন নেপিয়ার বলেন সে খাঁটি হোমো সেপিয়েনস, ডেভিড পিলবিমের কথায় ইরেকটাস ও সেপিয়েনসের মধ্যে যে সীমা রেখা টানা যায় ভের্তেশ-সোললোশ মানবের স্থান তার সন্নিকটে। সেআনসকুম ও ষ্টাইনহাইম মানবের চেয়ে অনেক প্রাচীন হয়েও এই নবীনতা নিশ্চয় অভিনব। অবশ্য তাকে পুরোপুরি সেপিয়েনস্ দলভূক্ত করতে কিছু দ্বিধার কারণও আছে, খুলিটি এই প্রজাতির মত গোলাকার হলেও দাঁতে এশীয় ইরেকটাসের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। তা ছাড়া ভের্তেশসোললোশে অনেক ফলক ও কাটারি পাওয়া গিয়েছে, তা এত আদিম ধরনের যে তাদের ওলডুভীয় বলা চলে, যদিও জোকোডিয়েনের হাতিয়ারের সঙ্গেও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে। ভের্তেশসোললোশ মানব যদি অতি উন্নত হোমো ইরেকটাস হয়ে থাকে তো সে এই প্রজাতির অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মেধাবলম্বী সমকালীন গোষ্ঠী অন্যত্র যে অস্ত্রাবলী বানিয়েছে সেই মানে পেঁছাতে পারে নি। এই ঘাঁটিতে বেশ কয়েকটি পৃথক বাস্তু স্তর উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেগুলি বেশী পুরু নয় বলে মনে হয় অধিবাসীরা ক্রমাগত দীর্ঘ কাল থাকে নি। ভিটায় বস্তুর গায়ে পোড়া দাগ নিয়মিত আগুন ব্যবহার নির্দেশ করে, প্রায় ১৫ প্রজাতির জন্তুর ফাটানো হাড়ও উদ্ধার হয়েছে।

য়োরোপের বাইরেও কিছু আধুনিক-চিহ্নিত প্রাচীন ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। কিনিয়ার কানাম ও কান্জেরায় প্রাপ্ত চোয়াল ও খুলি খণ্ডে

সেপিয়েনস-সদৃশ লক্ষণ দেখা যায়। অস্থিগুলি সুপ্রাচীন কিন্তু বয়স ও শ্রেণীবিভাগ অনির্দিষ্ট।

আদি সেপিয়েনসদের পরে প্রাথমিক নেআনডার্টালদের ফসিল পাওয়া গিয়েছে দুই প্রস্তর খাতে। জার্মেনির এরিংগস্‌ডর্ফ গ্রামের কাছে এবং ইটালির টিবের নদীর তীরে, এগুলি প্রায় এক লক্ষ বছর প্রাচীন। আফ্রিকায় রোডীসীয় ও এশিয়ায় সোলো মানব সম্ভবত আরও আগে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাদের বয়স নির্ধারণ কঠিন।

সামনে পিছনে লম্বা, পিছনে বেশী চওড়া, উপরে চাপা নেআনডার্টাল খুলি থেকে মানুষটিকে পুরোগামী ও পশ্চাৎগামীদের থেকে পৃথক করে চেনা সহজ, তার মস্ত মুখমণ্ডলও এমনি আর এক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে স্বল্প কপাল ও থুতনি এবং উঁচু ভ্রূ-অস্থিতে ইরেকটাস ও আদি সেপিয়েনসের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং আধুনিক মানুষের সঙ্গে পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয়ে নেআনডার্টাল মানব ইরেকটাসকে অনেকটা পিছনে ফেলে আমাদের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে—মস্তিষ্কের পরিমাণ আদি সেপিয়েনসদের থেকে আরও কিছুটা বেড়ে নেআনডার্টালরা হল আমাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ, গড় মাপ আধুনিকদের ১৪০০ সিসির চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। সর্বোচ্চ মাপ ১৬০০ সিসির ঊর্ধ্বে, অবশ্য প্রাচীনদের মগজ অনেকটা ছোট, এগারোটি সোলো খুলির আয়তন গড়ে ১০০০ সিসির সামান্য বেশী, রোডীসীয় মানবের ১২৫০-১৩০০ সিসি যা আদি সেপিয়েনস সোআনসকুম খুলির পর্যায়ভূক্ত।

সুতরাং নৃতাত্ত্বিকদের চোখে নেআনডার্টালরা এমন মানুষ যার খুলিটি বিসদৃশ অথচ ভিতরে ঘিলু আধুনিকদের সমান। কারও কারও মতে আদি সেপিয়েনসের তুলনায় তার দেহের ওজন বেড়েছিল, সেই অনুপাতে মগজও বেড়েছে, সেটা উন্নততর বুদ্ধির নির্দেশক নয়, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস যে মস্তিষ্কের আয়তন ও বুদ্ধির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। তা বলে সব বিষয়ে নেআনডার্টাল মগজ আধুনিক মানুষের সমকক্ষ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না, কারণ তার মাপই একমাত্র মাপকাঠি নাও হতে পারে। পরিমাণের মত মস্তিষ্কের একটা গুণের দিকও আছে, তার

বিভিন্ন অংশ পৃথক উদ্দেশ্যে ভাগ করা, যেমন শ্রুতি দৃষ্টি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বোধের জন্য, সুতরাং অংশগুলির বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের সর্বাঙ্গীণ গঠনও তাৎপর্যপূর্ণ। কল্পনা করা যায় নেআনডার্টাল খুলি এমন জায়গায় টোল-খাওয়া যে মানুষটির চেতনা প্রখর হলেও জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। আবার যাঁরা খুলির আকৃতির সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক মানেন না তাঁরা বলবেন নেআনডার্টাল মস্তিষ্ক কোনও অংশে আমাদের চেয়ে হীন ছিল না।

আদি মানবের খুলি থেকে আমরা মস্তিষ্কের পরিমাণ এবং কিছুটা আকার আকৃতি জানছি মাত্র, বস্তুটি দেখতে পাচ্ছি না, পেলেও গবেষণাগারে তার পরীক্ষা থেকে বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিচার সহজ নয়। তবে এখন বিশেষজ্ঞরা অনেকে মনে করেন এই বিচারে তিনটি বিবেচনার প্রয়োজন আছে—মস্তিষ্কের ওজন, দৈহিক ওজনের তুলনায় তার আনুপাতিক ওজন এবং তার ভিতরের গঠন। বলা যায় যে এই তৃতীয় বিষয়ে আধুনিক মানুষ নেআনডার্টালদের উপর টেক্কা দিয়েছে, তার কপাল ঢালু নয়, গোল করা, ফলে মগজের বেশী অংশ সেখানে স্থান পেয়েছে, এবং আমরা জানি যে মস্তিষ্কের সম্মুখাংশ বাড়লে মনন শক্তির উন্নতি দেখা যায়। গঠনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এখানে এক শ্রেণীর বামনের উল্লেখ করা যায়, তাদের মগজ ৩০০-৪০০ সিসির বেশী নয় এবং তারা বুদ্ধিতে খাটো, কিন্তু খর্ব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুপাত স্বাভাবিক, তারা ভাষা শিখতে পারে এবং তাদের আচরণও মানবিক। তা সম্ভব হয়েছে কারণ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কও মানুষের মতই গঠিত, বনমানুষের মত নয়।

কিন্তু মগজের আয়তন যদি না বাড়ল তবে পরবর্তী আধুনিক মানুষের খুলির আকৃতি এতখানি বদলাল কেন? পিলবিমের ধারণা এর শুরুতে আছে গলার উপরাংশে গলবিলের অভিব্যক্তি যার থেকে মুখে বিচিত্রতর ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব হল; গলবিলের বৃদ্ধি হওয়াতে মাথার ভিতরের গঠনে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল (যেমন সামনে প্রসারিত মুখাগ্র পিছনে সরে এল), যার ফলে মগজের স্থান সংকোচ ঘটল, এই অভাব পূরণ করতে খুলির চূড়া ও দু পাশ সোজা হয়ে ভরে উঠল, কপাল খাড়া হল—তৈরি হল ক্রোমানীয় ছাঁচ।

আর একটি প্রশ্ন—মস্তিষ্ক যদি এত মূল্যবান সম্পদ তবে লক্ষ বছর আগে তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল কেন? এর এখনও কোনও সদুত্তর নেই, কেউ কেউ জল্পনা করেছেন যে নেআনডার্টাল আমলে বুদ্ধিমান দলনেতাদের সংখ্যা এত বেড়েছিল, ভাষার সাহায্যে বুদ্ধি দানও এত সহজ হয়েছিল যে বেঁচে থাকা আর আগের মত আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল না, তাই বৃহত্তর মস্তিষ্কের প্রয়োজন কমে গেল। কিন্তু অনেক নৃবিজ্ঞানীর ঝোঁক বেশী এই সব তত্ত্বীয় অনুমান ছেড়ে হাতিয়ার ইত্যাদি বাস্তবিক নজির থেকে তার মগজের গুণ বিচারের দিকে।

ক্রোমানীয়দের তুলনায় তাদের অস্ত্রপাতি অমার্জিত হলেও আশলীয় ও আদি লেভালোআ শিল্প থেকে শুরু করে নেআনডার্টালরা ক্রমশ অতি উন্নত দক্ষতা অর্জন করেছিল। চিরাগত আশলীয় হাত-কুড়ালের অভিব্যক্তি হল আরও মার্জিত সংস্করণে, সযত্নে ছোট ছোট খণ্ড খসিয়ে ধারটি সমান করে তা তৈরি হল নানা আকার আকৃতিতে, তাদের সমতা ও সৌকর্য দেখলে মনে হয় যেন নিছক প্রয়োজন ছাড়াও সৌন্দর্যের প্রেরণা ছিল। লেভালোআ কৌশল পূর্ণবিকশিত হল খাঁটি নেআনডার্টাল আবিষ্কার মুস্তেরীয় ফলক শিল্পে। প্রথম দিকের ফলক-শিল্পীরা ঘা মেরে তা খসিয়েছে, পরে কাঠ শিং ও হাড়ের যন্ত্র দিয়ে চেপেও কাজ উদ্ধার করতে শিখল।

হোমো ইরেকটাস যখন এক খণ্ড পাথরের ধারে ধারে খসিয়ে হাত-কুড়াল বানিয়েছে তখন খসা ফলকও হয়তো সে ছুরির মত ব্যবহার করেছে, কিন্তু নেআনডার্টালদের লেভালোআ ও মুসতেরীয় শিল্পে যন্ত্রীর নজর ছিল শুধু ফলকের দিকে, অবশিষ্ট অষ্ঠি সে বর্জন করেছে। লেভালোআ পদ্ধতিতে এক তাল পাথর থেকে দু তিনটি ফলক সৃষ্টি হত, নেআনডার্টালরা পেল অনেক বেশী, কারণ তারা আরও ভাল শিখল বিশেষ আকৃতি অনুযায়ী খন্ড খসাতে কোন জাতের পাথরে ঠিক কেমন আঘাত বা চাপ দিতে হবে। পাথরের ধারে ধারে ভেঙে এক পুরু বেলন (cylinder) তৈরি করে তার পাশে পাশে ঘা দিলে একের পর এক ফলক খসে পড়ত, শেষে বাকি থাকত সামান্য একটু অষ্ঠি। খসা ফলকের ধারগুলি সংস্কার করতে এবং হাতিয়ারটিতে হাতে ধরবার উপযুক্ত আকৃতি আনতে যন্ত্রশিল্পী তখন ঠুকত আরও নরম

হাতুড়ি দিয়ে, যেমন আগুনে শক্ত করা হাড় ও হরিণের শিং। তার পর ফলাটা একই বস্তু দিয়ে ঘষে ঘষে ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো করত সে।

আঘাতের জোর ও দিক বদলে এই মুসতেরীয় যন্ত্রীরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন আকার আকৃতির ফলক খসাতে শিখল, সুতরাং গড়ে উঠল নানা কাজের উপযোগী বিশেষ সাধনী এবং তাদের বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে এই শিল্পীরা পূর্ববর্তীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেল। কাটবার চাঁছবার খুবলাবার ও ফুটো করবার বিশেষ ধরনের যন্ত্র ষাটের বেশী সনাক্ত হয়েছে। কুড়াল কাটারি ছুরি সূঁচ রেঁদা বাটালি জাতীয় সাধনী ছাড়াও নেআনডার্টালরা ধারালো মুখটিতে করাতের মত দাঁত কাটতে শিখেছিল, বানিয়েছিল ছুরি যার এক দিক ভোঁতা যাতে সে দিকে সহজে চাপ দেওয়া যায়, এবং পাতলা ঝিনুকের মত চাঁছনি। হয়তো কাঠের বর্শারও উন্নতি হয়েছিল মাথায় চোখা পাথুরে ফলা গুঁজে বা সরু চামড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে।



১৪। নেআনডার্টাল হাতিয়ার, মুসতেরীর ক্লিণ্ট ; ক—ছুরি, খ—চাঁছনি, গ—বর্শার ফলা।

কাঠের ব্যবহার অবশ্য একেবারে আদি কাল থেকেই চলে আসছে—হয়তো পাথুরে হাতিয়ারেরও আগে—কিন্তু তা অবশ্য প্রায় সব এখন ক্ষয়ে গিয়েছে। তরালবায় ঐ বস্তুর তিন লাখ বছর প্রাচীন অবশিষ্টাংশ যে পাওয়া গিয়েছে তা আমরা দেখেছি, সম্ভবত নেআনডার্টাল কালের এক কাঠের বর্শাও হাতির পাঁজরায় বিদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার হয়েছে। হাড় বা শিং আরও অক্ষয়,

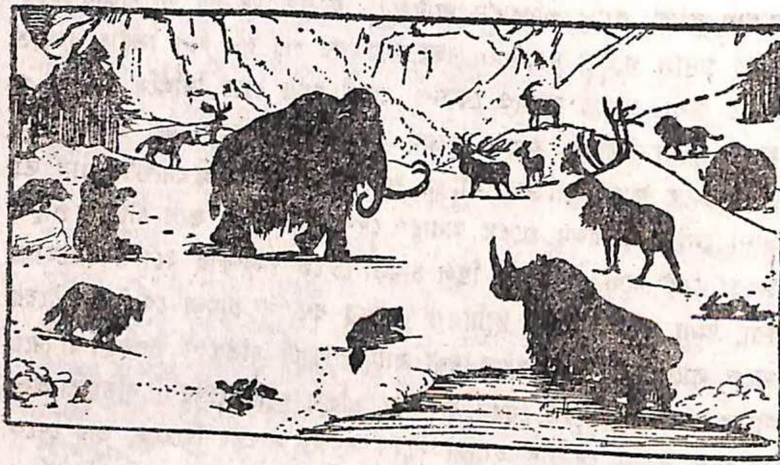
নেআনডার্টালদের শেষ আমল থেকে তা এখনও কিছু টিকে আছে, যথা সরুমুখী হাড় এবং বর্শার মত তীক্ষ্ন করা পাঁজরা খন্ড। হাড় বা হাতির দাঁত থেকে তৈরি হাতিয়ারের অনেক নজির মেলে নেআনডার্টাল কালে। তুষার যুগের য়োরোপে গাছ কমে যাওয়াতে নেআনডার্টালরা সম্ভবত কাঠের বদলে হাড় ও শিং নিয়ে পরীক্ষা করেছে, কিন্তু এ দিকে যে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে নি তা বোঝা যায় এ সব বস্তু থেকে ক্রোমানীয়দের আশ্চর্য সূক্ষ্ম সৃষ্টি দেখলে। নেআনডার্টালদের সবচেয়ে যথার্থ পরিচয় তাদের অক্ষয় শিলা বস্তু। আফ্রিকায় সাহারার দক্ষিণে রোডীসীয় মানবের উষ্ণতর ভূমিতে উপযুক্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল যা মুসতেরীয় নয়, কিন্তু য়োরোপ থেকে চীন, দক্ষিণে সাহারা পর্যন্ত মুসতেরীয় ক্ষেত্র—এই শিল্প এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে ফসিলের অভাবেও শুধু হাতিয়ার থেকে নেআনডার্টাল ঘাঁটি নিশ্চয় করে চেনা যায়, যেমন উত্তর চীনের অর্ডসে এবং সাইবেরিয়ার বাইকাল হ্রদের দক্ষিণ সীমায়, হিমাক্রান্ত য়োরোপের মত এ সব অঞ্চলেও নেআনডার্টালরা চরম শীত সহ্য করেছে।

নেআনডার্টাল কালে হাতিয়ারের উন্নতি ও রকমারি আবিষ্কার নির্দেশ দেয় কি করে তারা প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করে বেঁচে থেকেছে। পশ্চিম য়োরোপে তিন দিকে সমুদ্র এবং জমাট বরফের বাধার মধ্যে মানুষ বন্দী, তুষার যুগে গাছপালা কমে যাওয়াতে উপযুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাব, খালি শিকার করে পেট ভরাতে হচ্ছে, তার জন্য চাই নতুন অস্ত্র, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র, এই তাগিদে উদভাবন এগিয়ে চলল। ফ্রানসের লা কিনা শিলাশ্রয়ে এক স্থানীয় চিকিৎসক অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন কয়েকটি চুনাপাথরের গোলক; দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও গোষ্ঠী নানা ওজনের কয়েকটি (সাধারণত দুই থেকে পাঁচ) পাথরের প্রতিটির সঙ্গে লম্বা চামড়ার ফালি জুড়ে বিপরীত মুখগুলি একত্র বাঁধে, এই বোলা অস্ত্র পলাতক জন্তুর পা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে, জল্পনা হয়েছে লা কিনার গোলকগুলি বোলার প্রথম সংস্করণ।

ব্যবহৃত হাতিয়ারের মধ্যে স্থান কাল ভেদে পার্থক্য দেখা যায়; সমকালীন গোষ্ঠীরা সর্বত্র সব রকম সাধনী ব্যবহার করে নি, আবার একই

গুহায় কালে কালে পরিবর্তন ঘটেছে। ফ্রানসে দর্দনিয় উপত্যকার ঊর্ধ্বে কম্ব গ্রনাল গুহায় ৮৫,০০০ বছর ধরে পর পর ৬৪ বাস ভিটায় ব্যবহৃত বিচিত্র অস্ত্র যন্ত্রের কোনও কোনও শ্রেণী বারে বারে মিলিয়ে গিয়েছে ও আবার দেখা দিয়েছে, কখনও কয়েক হাজার বছর পরে। এর কারণ একই বংশে কালে কালে হাতিয়ার রীতির পরিবর্তন না বিভিন্ন গোষ্ঠীর বাস তা জানা নেই। এ রকম প্রভেদ অন্যত্রও দেখা যায়। যে স্তরে চাঁছনির প্রাচুর্য হয়তো সেই দলের বৈশিষ্ট্য ছিল চামড়া চেঁছে পরিষ্কার করে ব্যবহারযোগ্য করা, অন্য স্তরে প্রধানত ছুরি ও ছিদ্রকর যন্ত্র যা চামড়া কেটে সেলাইয়ের কাজে লাগে, আর এক স্তরে দেখা যায় ধাপকাটা দাঁতালো উপকরণ যা দিয়ে কাঠের কাজ সহজ হত, যেমন বর্শা বা তাঁবুর খুঁটি তৈরি। দাঁতালো অস্ত্র য়োরোপে বুনো ঘোড়ার হাড়ের সঙ্গে সর্বদা পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে মনে হয় সেখানে শিকারীরা বিশেষ জন্তুর উদ্দেশ্যে বিশেষ অস্ত্র বানিয়েছে। এর আগে মানুষ যখন যা পেয়েছে তাই মেরে খেয়েছে, এখন যেন নানা রকম মাংসের মধ্যে পছন্দ দেখা দিল। লা কিনা ও য়োরোপে অন্যত্র ফসিলের নজির থেকে ঘোড়ার মাংস সবচেয়ে সমাদৃত মনে হয়।

তুষার যুগের য়োরোপ ছিল নানা বৃহৎ জন্তুর স্বর্গ। খড়্গদন্ত বাঘ তখনও বর্তমান। ছিল চিতা ও দু মিটার ৭৫ কিলোমিটার লম্বা গুহাবাসী ভালুক এবং আফ্রিকার বর্তমান সিংহের চেয়েও অন্তত ২৫ শতাংশ বড় গুহাবাসী সিংহ; গুহার হায়না যার জন্ম ভারতে ১০ লক্ষ বছর আগে; বুনো মোষ বা বাইসন যার শিং দুটির মধ্যে এক মিটার ২০ সেন্টিমিটার ফাঁক; ১৭শ শতাব্দে বিলুপ্ত তিন মিটার ৬৬ সেন্টিমিটার লম্বা বুনো ষাঁড় অরক্স্ বর্তমান শান্তশিষ্ট পোষা গরুর পিতামহ হলেও ছিল ভয়ংকর জন্তু; দুই শিং যুক্ত রোমশ গন্ডার, সামনের শিংটির মাপ এক মিটারের কাছাকাছি, তা দিয়ে বরফ সরিয়ে সে ঘাস পাতা খুঁজত; আর ছিল অবশ্য অতিকায় লোমশ হাতি ম্যামথ, অরকস যতটা লম্বা ততটা উঁচু সে, ওজন আট টন। তুষার যুগের অবসানে জল বায়ু ও বাস ভূমির পরিবর্তনের ফলে এই সব দানবদের অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। নেআনডার্টাল মানুষ এদেরই জগতে বাস করেছে, এদের তুলনায় আয়তনে সে তুচ্ছ এবং নিজেই মাংসাশীদের



চিত্র ১৫। নেআনডার্টাল কালের প্রাণী, বৃহৎ পশু দুটি ম্যামথ ও গন্ডার।

লোভনীয় ভক্ষ্য, তবু অনেকে গিয়েছে তার পেটে। একটি বড় জন্তু মারলে বহু লোকের খিদে মেটে, তাই তাদের দিকেই নজর ছিল শিকারী দলের।

একই রকম গুহা গহ্বরে আশ্রয় খুঁজত মানুষ এবং বিশাল ভল্লুক ও সিংহ, এদের হটে যেতে হয়েছে অগ্নিজ্ঞানী অস্ত্রবাহী মানুষের কাছে। অসট্রিয়ার একটি গুহাতেই ৩০,০০০ ভালুকের অস্থি পাওয়া গিয়েছে। অরকস প্রচুর মেরেছে নেআনডার্টালরা। হিমাক্রান্ত য়োরোপে বাইসনের মত বলগা হরিণও দল বেঁধে চরে বেড়াত, ভুক্তাবশিষ্ট দেখে বোঝা যায় তারাই ছিল প্রধান ভক্ষ্য, তা ছাড়া মানুষের হাতে মারা পড়েছে বর্তমান বৃহত্তর হরিণ এল্ক্, পাহাড়ী ছাগল আইবেক্স্ এবং পাহাড়ী কৃষ্ণসার মৃগ শ্যামোআ। ঘোড়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। অনেক জায়গায় পশুদের ভাঙা হাড় দেখে মনে হয় ফাটিয়ে মজ্জা বার করা হয়েছে। অবশ্য ক্ষুদ্রতর প্রাণীও বাদ পড়ে নি, ইঁদুর খরগোশ থেকে ম্যামথ পর্যন্ত খেয়েছে নেআনডার্টালরা, জলো পাখি, মাছ ও শামুক ঝিনুকের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়েছে কোথাও কোথাও। উষ্ণতর দেশে আহার্য ছিল কিছু ভিন্ন ধরনের, তা পরে দেখা যাবে।

শিকারে নানা কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। বসন্ত কালে প্রতি বছর বলগা হরিণ দলের পরিযাণ চলে একই পথে, কাছাকাছি লুকিয়ে থেকে তাদের বাগে পাওয়া সহজ, তখন হয়তো এত মাংস জোটে যে খেয়ে শেষ হয় না। আফ্রিকার পিগমিরা হাতি শিকারে আর এক কৌশল ব্যবহার করে, অনেকে মনে করেন নেআনডার্টালেরা হয়তো এই উপায়ে ম্যামথ মারত। তা যদি হয় তো ম্যামথের জন্য তারা ওত পেতে অপেক্ষা করত কোথাও, সে কাছে এলে একই সঙ্গে অনেকগুলি বর্শা এসে বিঁধত তার পেটে। অতিকায় জন্তু তাতে মরত না, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে পালাত, শিকারীরাও ছুটত পিছনে পিছনে, দিনের পর দিন, যত ক্ষণ না রক্ত ক্ষয়ে বা ঘায়ের বিষে জর্জরিত হয়ে অবশেষে ঘায়েল হত শত্রু। কখনও বা শিকারীরা গণ্ডার বা ম্যামথের মত বড় জন্তুকে তাড়া করে জলা জায়গায় বা নরম মাটিতে এনেছে, যাতে কাদায় তাদের পা বসে যায়। অথবা পশুর দলকে তাড়িয়ে এনেছে পাহাড়ের খাড়া প্রান্তে কিংবা কোনও গভীর ফাটলের দিকে, খাতের নিচে সঙ্গীরা বর্শা আর মোটা লাঠি হাতে প্রস্তুত; ভীত ত্রস্ত গরু মোষ ঘোড়া বা পাহাড়ী হরিণের পাল হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ে পা ভেঙেছে, তখন অনায়াসে তাদের খুঁচিয়ে বা পিটিয়ে মেরেছে শিকারীরা। আবার সমতল ভূমিতে হয়তো একলা শিকারী বড় পাথরের আড়ালে বসে অপেক্ষা করেছে, মাঠে চরতে চরতে পশু যেই কাছাকাছি এসেছে অমনি দৌড়েছে তার দিকে, ছুটন্ত পা লক্ষ্য করে বোলা ছুঁড়ে মেরেছে, লাঠির ঘায়ে সাবাড় করেছে পতিত জন্তুকে। দুর্ধর্ষ পশু যে পথে জল খেতে যায় সেখানে শিকারীরা মাটি খুঁড়ে ডালপালা দিয়ে ঢেকে ফাঁদ পেতে রেখেছে। হয়তো অপেক্ষাকৃত ছোট ও অহিংস্র জন্তুদের অথবা শাবক বা বৃদ্ধ পশুদের তারা কাবু করত অতর্কিত আক্রমণে, যখন এরা নদী পার হচ্ছে বা জল খেতে এসেছে। হয়তো অনেক সময়ে মানুষ নিজের হাতে মারেই নি, পশুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে মরেছে, সেই মৃতদেহ সে টেনে এনেছে গুহায়, অথবা হিংস্র জন্তুর শিকারে ভাগ বসিয়েছে।

শিকার অনুসন্ধান ও অনুসরণ করতে আজ শিকারীরা যে সব সংকেত কাজে লাগায় তার কিছু কিছু নেআনডার্টালরাও নিশ্চয় শিখেছিল। বরফের উপর জন্তুর পায়ের ছাপ সহজেই চোখে পড়ে, কোথাও হয়তো সে যে ডাল

ভেঙে পাতা খেয়েছে তা পড়ে আছে, অথবা গাছের গায়ে গা ঘষে স্পষ্ট চিহ্ন রেখে গিয়েছে, এ সব দেখে অনুসরণকারী বুঝেছে কোন দিকে যেতে হবে। শিকার নজরে পড়লে অদূরে সঙ্গীদের তার খবর জানাতে মুখের কথার বদলে হাতের ইশারা বা পাথর ঠুকে শব্দ করেছে সে। সতর্ক পশু মানুষের গন্ধ পেলেই পালাবে, তাই হাওয়ার উলটো দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে, শিকারী তার নিজের চর্ম বস্ত্র থেকে কিছু লোম ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে বাতাসের দিক নির্ণয় করতে।

প্রাক্-নেআনডার্টাল মানুষদের নিশ্চয় এই ধরনের কৌশল ও শিকার পদ্ধতি কিছু কিছু জানা ছিল। পুরাপ্রস্তর যুগের এ সব দৈনন্দিন ঘটনার চাক্ষুষ নজির এখন বিশেষ কিছুই নেই, নৃবিজ্ঞানী দৃশ্য গড়ে তোলেন অনেকাংশে বর্তমান প্রাচীন উপজাতিদের রীতি নীতি সমীক্ষা করে। হিমশীতল সাইবেরিয়ার এমন এক গোষ্ঠীর বিধি নিয়ম থেকে আমরা ৬০,০০০ বছর আগে বলগা হরিণ শিকারের একটি দৃশ্য অনুমান করতে পারি। স্থান মধ্য য়োরোপ, তখন ভরা তুষার যুগ। সকাল বেলা পুরুষরা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, হাতে লাঠি, শুধু শিকারের জন্য নয়, আক্রামক পশুর থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্রও তা, কারও কারও বর্শাও আছে। গায়ে মোটা পশু চর্মের আচ্ছাদন, তা কাঁধেও নিয়েছে কিছু, কারণ বাইরে রাত কাটাতে হতে পারে। শিকারের ভাগ্য সে দিন কেমন হবে কেউ জানে না, শীতের শেষে মাঝে মাঝে দিনান্তে খালি হাতে ফিরতে হয়, ঝরা বরফের নিচে পশুর খাদ্য ঢাকা পড়ে বলে সহজে তাদের সন্ধান মেলে না। সে দিন ভাগ্য সদয় ছিল, বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখা মিলল এক দল হরিণের, লুকিয়ে কাছাকাছি এসে আক্রমণ করতেই তারা ছুট দিল, কিন্তু একটি দুটি দুর্বল প্রাণী পিছিয়ে পড়ল। শিকারীরা তাড়া করে চলল তাদের, পশু ক্রমশ ক্লান্ত ও মন্থরগতি হয়ে অবশেষে বর্শার আঘাত খেয়ে বসে পড়ল এবং অবিলম্বে মাথায় ভারী লাঠির ঘা খেয়ে প্রাণ হারাল।

এ বার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটার পালা, কিন্তু শিকারীরা উপযুক্ত অস্ত্র সঙ্গে আনে নি। এক জন গুহায় ফিরে গেল কাটারি ইত্যাদি আনতে, সঙ্গে করে মেয়েদের নিয়ে এল, তারা কাটা মাংস বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য

করবে। শিকারের পর সেখানে বসেই আহার শেষ করত না নেআনডার্টালরা, হয়তো বাইরে অসহ্য শীত বলে, কিন্তু ঘরেও তা বলে সম্পূর্ণ লাশটা টেনে আনত না—ঠ্যাং বা কাঁধের হাড়ের তুলনায় গুহাতে পাঁজর বা মেরুদন্ডের হাড় খুব কম, অর্থাৎ মুখরোচক অংশগুলিই তারা বেছে এনেছে। কাঁচা ও সেঁকা মাংস দুইই খেয়েছে নেআনডার্টাল মানব, হাড় চিরে মজ্জাটুকু, খুলি ফাটিয়ে মেধাটুকু খেতে যে খুব ভালবাসত তারও প্রমাণ সে রেখে গিয়েছে। এবং ইটালি ও যুগোস্লাভিয়ায় প্রাপ্ত কোনও কোনও খুলি দেখে মনে হয় শেষের দিকে সে মানুষের মগজও খেয়েছে পিকিং মানবের মত।

কিন্তু যে দিন ভাগ্য মন্দ, শিকার পেতে অনেকটা চলে আসতে হয় সে দিন, কাজ ও দুর্ভোগ বেড়ে যায়। কাছাকাছি পাথর কুড়িয়ে তার থেকে হাতিয়ার বানিয়ে নিতে হবে, খাওয়া শেষ করে অবশিষ্ট মাংস পাহারা দিতে হবে, নতুবা হয়তো তা সিংহ বা হায়নার পেটে যাবে, খোলা প্রান্তরে কনকনে রাত কাটাতে একটা কিছু আশ্রয় বানাতে হবে। সেই কাজ তারা জানে কারণ ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন শিকার ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে পাততাড়ি গুটিয়ে দূরের পথে বেরিয়ে পড়া তাদের চিরাচরিত রীতি, তখন সন্ধ্যার আকাশ তলে অস্থায়ী আশ্রয় বানিয়ে নেয় তারা। আমরা দেখেছি দেড় লাখ বছর আগেই আদি সেপিয়েনসরা গুহার মধ্যে চামড়ার তাঁবু খাটাত, তার চিহ্ন আছে খুঁটির গর্তে ; কম্ব গ্রনাল গুহায়ও অনুরূপ একটি গর্ত আছে, ১৪শ স্তর থেকে ২১ম স্তর ভেদ করে দু মিটার ১২ সেন্টিমিটার গভীর এই গর্ত নিশ্চয় কোনও এক রুক্ষ কাঠামোর অবশিষ্ট চিহ্ন। গুহার ভিতরে তাঁবু খাটাবার যথেষ্ট জায়গা না থাকলে নেআনডার্টালরা তার মুখে পর্দা টানিয়ে দিত।

খোলা আকাশের নিচেও যে তারা ঘর বানাতে অভ্যস্ত ছিল তার চিহ্ন আছে মলডোভা ও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে। এক জায়গায় কয়েকটি চুলাকে ঘিরে চক্রাকারে অবস্থিত ভারী ভারী হাতির হাড় ও দাঁত, এগুলি দিয়ে চামড়া আটকাবার কাঠামো তৈরি হয়ে থাকতে পারে, সঙ্গে ডালের খুঁটিও ছিল হয়তো। অসট্রেলীয় আদিবাসী ও আফ্রিকার বুশম্যানরা চামড়ার বদলে

ডাল আর ঘাস দিয়ে দু দিনের ঘর অথবা হাওয়া আটকাবার বাসা মাত্র বানায়, নেআনডার্টালরাও নিশ্চয় যা পাওয়া যায় তা দিয়ে পথের আশ্রয় বানাত, ফেলে চলে গেলে দেখতে দেখতে তা মিলিয়ে যেত।

পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষকে প্রায়ই গুহা-মানব বলা হয়, কিন্তু যখন সম্ভব হয়েছে তখন বাইরেই থেকেছে সে, গুহাতে বসবাসের চিহ্ন অনেকটা অক্ষত থেকে গিয়েছে বলেই সে দিকে আমাদের নজরটা বেশী। গুহাবাসের কতগুলি সুবিধা ছিল বটে, যেমন হিংস্র পশু ও কনকনে হাওয়ার থেকে বাঁচা, কিন্তু এই ডেরা খুব আরামপ্রদ বা স্বাস্থ্যকর ছিল না এবং সম্ভবত তুষার যুগের আগমনে অনেকটা বাধ্য হয়েই মানুষ গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। তার আগে প্রায়ই হিংস্র জন্তুদের বার করতে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দখল করেও পাথর খসে পড়ে মাথা ভাঙবার বিপদ সদা বিদ্যমান। দেয়াল থেকে চুঁইয়ে, ছাত থেকে টপ টপ করে জল ঝরেছে, তাই লাজারে গুহার মত তাঁবু খাটিয়ে তা এড়াবার চেষ্টা। ভিতরটা সর্বদা অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, উপরন্তু আগুনের ধোঁয়া জমে থাকে সেখানে, আর আছে মানুষগুলির গা থেকে, মল মুত্র থেকে দুর্গন্ধ। এ অবস্থায় নানা রকম ব্যারাম ধরা স্বাভাবিক, কোনও কোনও কঙ্কালে যে বিকৃত হাড় থেকে বাত ধরা পড়েছে তা আমরা জানি। ফসিলের নজির থেকে এও বোঝা যায় যে পশ্চিম য়োরোপীয় নেআনডার্টালরা অনেকে রিকেটস রোগে ভুগেছে, তার কারণ তুষার যুগের স্বল্প সূর্যালোকও তাদের ভারী পোশাকে বাধা পেয়েছে, ফলে দেহে প্রয়োজন মত ডি ভিটামিন তৈরি হয় নি, এই ভিটামিনযুক্ত খাদ্যও যথেষ্ট খায় নি তারা। এক সাম্প্রতিক প্রকল্প অনুসারে রিকেটস রুগীরা ঝুঁকে চলত, সুতরাং তাদের অস্থি থেকে সমস্ত জাতটাই কুঁজো বদনামটি পেয়ে থাকতে পারে।

পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ অবশ্য আলো পেতে ও ধোঁয়া এড়াতে যথাসম্ভব গুহার মুখের দিকে সময় কাটাত, সামনে উঠানের মত একটু জায়গা পেলে দুর্যোগের দিন ছাড়া কাজ কর্ম সেখানে সারা হত। তবে ঐ যুগের শেষ কালে খাঁটি মানুষ গুহার দুরধিগম আঁধার অন্তঃপুরে ঢুকে ছবি এঁকেছে, অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেছে—তার বিস্তৃত আলোচনা হবে পরে। তুষার

যুগের শেষ পর্যন্ত খাঁটি মানুষ গুহার আশ্রয় একেবারে ছাড়ে নি, এমনকি আজকের জগতের স্থানে স্থানে গুহাবাসী সম্প্রদায় দেখা যায়। স্পেইন দেশের গ্রানাডা অঞ্চলে কয়েক হাজার লোক এ ভাবে বাস করে, সেখানে সাক্রামনতে পাহাড়ের গায়ে তাদের সরু লম্বা চুনকামকরা কন্দরগুলিতে বিদ্যুৎ, রেডিও, রেফ্রিজারেটারের পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে—আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ির খাতিরেও এই আবাস তারা ছাড়তে রাজী নয়। (এই গুহাবাসীরা প্রধানত বিদেশী পর্যটকদের নাচ দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে, ভাষায় কিছুটা সংস্কৃতের প্রভাব আছে—কারও কারও মতে অতীতে তারা ভারতবাসী ছিল, পরে ইরান ও মিশরের পথে গিয়েছে ও দেশে।) বিংশ শতাব্দীর এত সুখ সুবিধা প্রস্তর যুগের মানুষ তার গুহায় পায় নি বটে, তবু দক্ষিণ য়োরোপের মাদলেনীয় গুহাগুলিতে বাস ব্যবস্থার পারিপাট্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

নেআনডার্টালরা গুহার মেঝে খুঁড়ে চুলা বানাতে শিখেছিল। দক্ষিণ ফ্রানসের পেশ্ দ লাজ্ নামক জায়গায় পুরাবিজ্ঞানীরা অন্য ধরনের বেশ বড় এক চুলার অবশিষ্টাংশ পেয়েছেন; মাটিতে জুড়ে জুড়ে পাতা কতগুলি পাথর, লক্ষণ আছে সেগুলি বার বার তপ্ত হয়েছে, তার থেকে মনে হয় প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে তাদের উপর কাঠ জ্বেলে প্রকাণ্ড আগুন তৈরি হত, পাথর তেতে উঠলে বৈঠার মত লম্বা কাঠ দিয়ে তা এক পাশে সরিয়ে উত্তপ্ত শিলা খণ্ডের উপর তাল তাল মাংস সাজিয়ে দিলেই হল। এই পাক পদ্ধতি এখনও বয় স্কাউটরা শেখে। এই ভাবে সেঁকা মাংস বেশী সুস্বাদু, তা ছাড়া তা চিবিয়ে খেতে সময় লাগে কম, সুতরাং অন্য দিকে অবসর বাড়ে।

মাংসাহার সূত্রে আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বাঁ হাতের চেয়ে সহজে ডান হাত ব্যবহার করে, নেআনডার্টালরাও দক্ষিণ হস্তে বেশী অভ্যস্ত ছিল কিনা তা যদি দাঁত দেখে বলতে হয় তা হলে মনে হতে পারে যে শার্লক হোমসকে ডাকতে হবে। কিন্তু কোনও কোনও দন্তপাটির সম্মুখাংশে এক পাশ থেকে আর এক পাশে সোজা সোজা কতগুলি আঁচড় থেকে বোঝা যায় তা সৃষ্টি হয়েছে পাথুরে ছুরির ঘষায়। সুতরাং বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে মাংস খণ্ডের এক দিক দাঁতে চেপে আর দিক হাতে ধরে অন্য হাতে ছুরি চালিয়ে মাংস কেটে যাওয়া ছিল তাদের রীতি। মাঝে মাঝে অস্ত্রটি

দাঁতে ঠেকেছে, সেই দাগের কোন দিক নিচে কোন দিক উঁচুতে তা দেখে জানা যায় খাদক আমাদেরই মত ডান হাতে ছুরি চালিয়েছে।

প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই দুই হাত ব্যবহারে এই পার্থক্য আছে এবং একমাত্র মানুষই কথা বলে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী এই দুই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্ক সন্দেহ করেছেন, যদি তা হয় তো হস্তদক্ষতার প্রভেদ আরও তাৎপর্যপূর্ণ। পুরামানবের বাক্‌ শক্তি নিয়ে লিবারম্যান ও ক্রেলিন যে জটিল গবেষণা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা হোমো ইরেকটাস প্রসঙ্গে পেয়েছি। নাক, মুখ ও গলার বায়ু পথ নানা ভাবে খুলে ও বন্ধ হয়ে ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাঁরা লা শাপেলের নেআনডার্টাল খুলিটিতে এই স্বর পথের গঠন পরীক্ষা করে স্থির করেছেন মানুষটির গলবিল হোমো সেপিয়েনসের তুলনায় অনেকটা অবর্ধিত, যার ফলে তার মুখে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সীমিত ছিল, বাক্‌ শক্তি ছিল আনুমানিক আমাদের ১০ শতাংশ মাত্র। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। হতে পারে পশ্চিম য়োরোপের নেআনডার্টালরা নিজেদের ভাষায় ভালই ভাব বিনিময় করত, নয়তো তাদের এই ক্ষমতা ছিল সামান্য। কিন্তু লিবারম্যান ও ক্রেলিন পরে ভিনদেশী দুটি খুলিও পরীক্ষা করেছেন—আফ্রিকার রোডীসীয় খুলিটির গলবিল লা শাপেলের তুলনায় কিছুটা বেশী আধুনিক এবং পশ্চিম এশিয়ায় স্‌খুল গুহায় প্রাপ্ত এক খুলির স্বর পথ প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক। এই গবেষণা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তো হাজার হাজার কি লক্ষ বছর প্রাচীন স্বর বা বাক্য পুনর্গঠন করে হয়তো আমরা এক দিন শুনতে পাব।

দাঁতের গায়ে সামান্য আঁচড় থেকে আরম্ভ করে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। এই রকম ছোট খাটো ইঙ্গিত বিভিন্ন ঘাঁটিতে নৃবিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে, যার থেকে তাঁরা নানা রকম জল্পনা করেছেন। আবার দাঁতই ধরা যাক, লা ফেরাসি খুলিটির সামনের দাঁতে যে ধরনের চরম ক্ষয় লক্ষিত হয়েছে তা বর্তমান এসকিমো ও অন্য শিকারী জাতির মধ্যেও দেখা যায়। পোশাক বানাতে এরা পশু চর্ম চিবিয়ে নরম করে, তারই ফলে ক্রমশ এই ক্ষয়। সুতরাং অনুমান পশ্চিম য়োরোপে অন্তত কোনও কোনও অঞ্চলে নেআনডার্টালরা শিকারে নিহত পশুর চামড়া থেকে পরিধেয় তৈরি করেছে। নেআনডার্টাল ফসিলের সঙ্গে যে প্রায় সর্বদা প্রচুর মুসতেরীয় চাঁছনি পাওয়া তাও তার আর

এক নির্দেশ। আমরা কল্পনা করতে পারি মাংস কেটে বার করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট ছালটি মেয়েরা প্রথমে মাটিতে পেতে চার দিকে খুঁটি দিয়ে আটকাল, তার পর চর্বি ইত্যাদি যা লেগে আছে তা চেঁছে ফেলে দিল। পরিষ্কার চামড়াটি হয়তো আগুনের কাছে ধীরে ধীরে শুকানো হবে, পরে ধোঁয়া খাওয়ালে তা শক্ত হবে, ছিদ্রাণুগুলি বন্ধ হয়ে সহজে জল ঢুকবে না, পরিধেয় ক্রমশ সংকুচিত হবে না। অতঃপর জামা তৈরি, মেয়ে দরজি মানুষটির বুক পেট ঘিরে চামড়াটি বসিয়ে দুই প্রান্তে সারি সারি ফুটো করল চোখা যন্ত্র দিয়ে, তার পর সেই সব ছিদ্রে সরু লম্বা চামড়ার ফালি জুতোর ফিতের মত পরিয়ে দিল। নেআনডার্টালদের কেউ কেউ হয়তো পাও ঢেকেছে। চরম শীতে সম্ভবত লোমশ চামড়ার সমাদর ছিল বেশী। মানুষ কাপড় বুনতে শিখেছে অনেক পরে, মাত্র হাজার আষ্টেক বছর আগে তা নবপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার। (এই লেখকের 'সভ্যতার আগে' দ্রষ্টব্য)।

যেমন শীতক্লিষ্ট য়োরোপে তেমনি প্রায় মরু দেশেও নেআনডার্টাল মানুষের বাস ছিল, ইজ্রেলের রৌদ্রদগ্ধ নেগেভ অঞ্চলে মুসতেরীয় হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পুরামানব চির কাল হ্রদ নদী ঝর্ণার অদূরে থাকতে চেষ্টা করেছে জল ছাড়া চলে না বলে। ঐ হাতিয়ারের সঙ্গে উটপাখির ডিমের খোসাও ছিল, দূরের যাত্রায় বিরল জলাশয় পর্যন্ত এই বড় বড় পাত্রে স্থানীয় নেআনডার্টালরা হয়তো জল ধরে নিয়েছে। এ ছাড়া সংগৃহীত খাদ্য বয়ে নিতে সর্ব দেশে সর্ব কালে পাত্র দরকার হয়েছে পুরামানবীদের, বীজ বাদাম ফল মূল তো শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে আনতে পারে নি, নিশ্চয় হাতে করেও বারে বারে বাস স্থলে নিয়ে আসে নি। গাছের ছাল, পশুর চামড়া এমন কি তাদের মূত্রাধার ও পাকস্থলী দিয়ে নেআনডার্টালরা ডালা বা থলির কাজ সুসম্পন্ন করে থাকতে পারে।

তুষার যুগে বায়ুমণ্ডলের জল পৃথিবীর উত্তরাংশে বরফে বন্দী হয়ে জমছিল কিলোমিটারের উপর কিলোমিটার; তাই অল্পতর বৃষ্টির ফলে দক্ষিণে নানা জায়গায় বন জঙ্গল কমেছে, মরু প্রসারিত হয়েছে। অন্য অঞ্চলেও নেআনডার্টালরা মরুর প্রান্তে বাস করেছে, যেমন পূর্ব আফ্রিকায়, সেখানে তাদের প্রধান ভক্ষ্য ছিল গাজলা হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ এবং মোষ। আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিষুব রেখার উত্তরে দক্ষিণে ঘন জঙ্গল তখনও কিছু ছিল, তাতে রোজ

অল্প বৃষ্টি হয়, তাপাঙ্ক আশির ঘরে, হাতিয়ারের নজির থেকে মনে হয় ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল কাঠ কাটার যন্ত্র, যেন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে চলতে হত বলে। শিকারের পশু অল্প, তাড়া করতে ডাল পালার বাধা, সম্ভবত সেখানে খাদ্য ছিল প্রধানত উদ্ভিজ্জ, ফল মূল বীজ, চাক থেকে মধু আর নানা জাতের জংলী পোকা। কিন্তু শুষ্ক মরু বা আদ্র অরণ্য কোনওটাই খুব আরামপ্রদ নয়, জঙ্গল কমে গিয়ে আফ্রিকায় এশিয়ায় নানা ক্ষেত্রে, বিশেষত সাহারার পূর্বে ও দক্ষিণে এবং পূর্ব এশিয়ায় দেখা দিয়েছিল প্রায় উন্মুক্ত তৃণপ্রান্তর, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন, আরও প্রাচীন কালে এই অনুকূল পরিবেশেই মানুষের জন্ম। আকাশ প্রায় সারা বছর পরিষ্কার, শীতের কষ্ট নেই, গায়ে কিছু পরতে হয় না, খোলা জায়গায় রাত কাটানো চলে, তবে আগুন জেবলে রাখতে হয় আক্রামক পশুর ভয়ে। শিকার অফুরন্ত, আফ্রিকায় এ সব অঞ্চলে নেআনডার্টালদের লক্ষ্য ছিল জেব্রা জিরাফ জলহস্তী বেবুন বনমানুষ ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপে নেআনডার্টালরা তুষার যুগের চরম প্রকোপ ভোগ করে নি, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, গ্রীষ্ম ঋতু রৌদ্রোজ্জ্বল, বিস্তীর্ণ ঘাস জমিতে হ্রদের আশেপাশে তারা শিকার করেছে গরু, হরিণ, জলের পাখি, কিন্তু আরও উত্তরে প্রায় ৭৫,০০০ বছর আগে সূচিত হল সুদীর্ঘ মহাশীত, বছর বছর বরফ জমে উত্তর থেকে হিমবাহ গড়িয়ে এল দক্ষিণে, বন সরে গিয়ে বর্তমান জার্মেনি ও উত্তর ফ্রানসের অনেকাংশে রুক্ষ প্রান্তর দেখা দিল। আদিগন্ত উন্মুক্ত প্রায় বন্ধ্যা ভূমি জুড়ে খ্যাপা হাওয়া মাসের পর মাস ঝরা বরফ তাড়িয়ে বেড়ায়, বসন্ত কালে সেই বরফ গলতে আরম্ভ করলে রসসিক্ত ধরণী রাতারাতি জেগে ওঠে। গ্রীষ্মের তাপও কদাচিৎ ১০ ডিগ্রির উপরে চড়ে। এই পরিবেশে বছরের উষ্ণতর ঋতুতে নেআনডার্টালরা বাস করেছে উত্তরে স্থায়ী তুষার সীমার প্রান্ত পর্যন্ত। চরম শীতাঞ্চলে হয়তো বর্তমান এসকিমো বা ল্যাপল্যানডবাসীদের মত জীবন ধারা ছিল অনেকটা।

শিকার, ঋতু বদল ইত্যাদির তাগিদে প্রায় সর্বত্র নেআনডার্টালদের ছিল যাযাবর জীবন। দক্ষিণ ফ্রানসের কয়েকটি গুহায় বসন্তে সদ্যোজাত শাবক থেকে আরম্ভ করে সব বয়সের বলগা হরিণের দাঁত পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং সারা বছর তারা ঐ সব গুহায় কাটিয়েছে। অতীব প্রচুর শিকার এবং শিকারীদের অসাধারণ

দক্ষতা থাকলেই তা সম্ভব, ঐ অঞ্চলে শীতের প্রকোপও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কিন্তু তুষার যুগে উত্তরীদের বছর কাটত ঋতু চক্র অনুসারে। আবার আমরা ৬০,০০০ বছর অতীতে তাদের একটি দলের সঙ্গে জুটে গ্রীষ্ম জীবন দেখে আসতে পারি। বর্তমান জার্মেনিতে মে মাস পড়েছে, গুহাবাস ছেড়ে মানুষগুলি উত্তরে যাত্রা শুরু করল নতুন শিকার ক্ষেত্রের খোঁজে। সঙ্গে থাকল কিছু পথের খাদ্য, হয়তো খরগোশ ও পাখি, তা ছাড়া তাঁবু খাটাবার ও রাত্রে মুড়ি দেওয়ায় চামড়া, কাঁচা মাটির রুক্ষ পাত্রে গনগনে ছাইয়ের আগুন, কিছু লাঠি ও বর্শা এবং অল্প কয়েকটি পাথুরে অস্ত্র; অধিকাংশ হাতিয়ারই তারা ফেলে এসেছে কারণ যত্র তত্র বা বানিয়ে নেওয়া সহজ। স্ত্রী পুরুষ শিশুর এই মিছিল প্রতি সন্ধ্যায় থামে, এক রাতের আশ্রয় তৈরি করে রান্না হয় দৈনিক শিকার বা সঞ্চিত মাংস।

চলার পথে দিনে দিনে গাছপালা কমে এসেছে, অবশেষে সপ্তাহ শেষে তুষার রেখার অদূরে মুক্ত প্রান্তরে তাদের গ্রীষ্মাবাসে পৌঁছাল তারা। গত হেমন্তে যখন জায়গাটা ছেড়ে গিয়েছে তখন মাটির গায়ে উদ্ভিদের রং ছিল বাদামী, হলুদ, লালচে, এখন নতুন ঘাস, নিচু নিচু ঝোপ, পাথরে ও মাটিতে মস্ ও লাইকেন জাতীয় শেওলা মিলে তাজা সবুজ রং ফুটেছে, মধ্যে মধ্যে নানা বর্ণের ছোট ফুল। শীতের বরফ গলে হ্রদ ও জলধারা রোদে ঝলমল করছে। শিকারের লোভেই এত দূর আগমন, নানা রকম মাংস জুটল অনায়াসে। উদ্ভিদভুক্ প্রাণীরা এই সময়ে বাচ্চা দিচ্ছে, তাদের অনেকে ধরা পড়ল; মানুষেরই মত গ্রীষ্ম কাটাতে নানা জাতের হাঁস ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ থেকে উড়ে এসে নামছে হ্রদে ও পুকুরে, ঢিলের ঘায়ে মারা পড়ে তারা; বালক বালিকা ও তাদের মায়েরা মাটিতে পাখির বাসা থেকে বাচ্চা ধরে আনে; সরু সরু ডাল দিয়ে নিচু বাঁধ বানিয়ে অগভীর জলে মাছ ধরা যায়। দেখতে দেখতে দলের লোকেরা মোটা হয়ে উঠল।

বাস ব্যবস্থা সম্ভবত মলডোভার মত—বড় হাড় ও ডাল দিয়ে তৈরি কাঠামোর উপর চামড়া বসিয়ে 'ঘর' বানানো হয়েছে, তার আশেপাশে জমেছে চেরা হাড় ও ভোজের অন্যান্য উচ্ছিষ্ট। তার লোভে চুপি চুপি শেয়াল এবং অন্য ছোট জন্তু আসবে জেনে ছেলেরা কড়া নজর রাখে, কিছু কিছু

শিকারও করে। কিন্তু এখানেও জীবন বিপদসংকুল, বড় জন্তুর শিকার সহজ নয়। এক দিন দলটি এক গন্ডারকে জখম করেছে, দুর্বল রক্তাক্ত পশুটি তখন অনড়, এক শিকারী এগিয়ে এল বুকে বর্শা ঢুকিয়ে চরম আঘাত হানতে—হঠাৎ মুমূর্ষু প্রাণীটি তার পেট ফুটো করে দিল সামনের শিং দিয়ে। সঙ্গীরা তাকে আস্তানায় বয়ে এনে পাতার সঙ্গে মাটি মিশিয়ে লাগাল ক্ষতে, কিন্তু রক্ত ঝরেই চলল, বাঁচানো গেল না লোকটিকে। তার লাঠি, বর্শা এবং পরলোকের জন্য কিছু খাদ্য সঙ্গে দিয়ে দলের অন্যান্যরা কবর দিল শবটি, তার পর অন্যত্র সরে গিয়ে ঘর বাঁধল। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী—বরং স্ত্রীলোক—গেল দলের এক একলা পুরুষের শয্যায়।

যেন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল গ্রীষ্ম, সেপটেম্বরে সৃষ্টির ব্যস্ত পালা শেষ হয়ে ঘাস পাতা শেওলার রং আবার বদলে গেল। এক দিন সকালে তাঁবুর গায়ে হালকা বরফের প্রলেপ দেখে বোঝা গেল কনকনে হিমেল হাওয়া আসন্ন, সুতরাং পাততাড়ি গুটিয়ে আবার দক্ষিণমুখী যাত্রা। পথে শিকারের অভাব হল না, একদা আর একটি দলের সঙ্গে দেখা, সবাই মিলে এক পাল ঘোড়া পাহাড়ের খাড়া ধারে তাড়িয়ে নিচে ফেলল। দুই দলের কিছু তরুণ তরুণী জোড় বাঁধল। চলতে চলতে চোখে পড়ে আবার কিছু বড় গাছপালা, অবশেষে দেখা দেবে সেই পরিচিত ক্ষেত্র, খুঁজে নিতে হবে শীত কাটাবার গুহা। বদ্ধ, ধোঁয়াভারাক্রান্ত গুহায় বাস করতে ভাল লাগবে না, কিন্তু এ অঞ্চলে বন বনানীতে বাধা পেয়ে শীতের হাওয়া অত তীব্র নয়। যারা বেঁচে থাকবে আগামী বসন্তে আবার সহজ শিকারের লোভে উত্তর মুখে পা চালাবে তারা। প্রকৃতির সেই নির্দয় ক্ষেত্রেই, স্থায়ী তুষার রেখার সীমায়, নেআনডার্টাল মানুষ চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই কাহিনী সম্পূর্ণ আনুমানিক নয়। উত্তরের খোলা প্রান্তরে যে নেআনডার্টালরা সারা বছর কাটায় নি তার নজির আছে জার্মানিতেই, একটি ঘাঁটির পরীক্ষায় দেখা যায় যে সেখানে কয়েকটি গ্রীষ্ম কয়েক সপ্তাহ করে কাটিয়েছে তারা। মৃতের সযত্ন সমাধির প্রমাণ আছে নানা দেশে, অবিলম্বে তার পরিচয় পাব আমরা।

তিন মহাদেশ জুড়ে প্রায় মেরু থেকে মরুর জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিপার্শ্ব জয় করে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থেকেছে এই নেআনডার্টালরা, খাদ্য ও বাস ব্যবস্থা প্রয়োজন মত বদল করেছে গ্রহণ করেছে, উদভাবন করেছে হাতিয়ার, শিকার ও শীত নিবারণের কৌশল, প্রকৃতিকে বশ মানাতে পূর্বপুরুষদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে, আদি সেপিয়েনসরাও তুষার সীমার এত কাছাকাছি বাস করে নি। তারা নিশ্চয় সামান্য বনমানুষোপম প্রাণী নয়। কিন্তু এই প্রাথমিক অপবাদ যে তাদের প্রাপ্য নয় বোধহয় তার আরও আশ্চর্য নির্দেশ আছে মনোজগতে। নেআনডার্টাল মানসে দেখা যায় প্রকৃত মানবিকতা, এমন কি আধ্যাত্মিক ভাবনার অংকুর। আবার এমন রীতি নীতিও অন্তত কোথাও কোথাও ছিল যা এখন সভ্য মানুষের দৃষ্টিতে বর্বর।

মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি পশ্চিম য়োরোপের পুরুষ ও স্ত্রী ফসিলের পৃথক সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, হাড়ের গঠন থেকে এই পার্থক্য ধরা যায়, দেখা গেল পুং ফসিল সংখ্যায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশী। এর থেকে সন্দেহ করা হয় যে দলের লোকেরা অতিরিক্ত স্ত্রী শিশুদের জন্ম কালেই মেরে ফেলত, সম্ভবত নিজেরা বেঁচে থাকার দায়ে। পুরুষ শিকার করে, মেয়েরা উদ্ভিদজাত খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু ঐ অঞ্চলে তা কম, সুতরাং মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা প্রায় বসে বসে শিকারীর কষ্টার্জিত মাংস খাবে; এই পরিণামের কথা ভেবে হয়তো দলের লোকে প্রথমেই আপদ বিদায় করেছে। অধিকাংশ পশ্চিম য়োরোপীয় নেআনডার্টাল দাঁতের ক্ষয় যে অপেক্ষাকৃত কম তাতেও এই ধারণার সমর্থন মেলে, কারণ রুক্ষ উদ্ভিজ্জ খাদ্য চর্বণে তা বেশী ক্ষয়ে যায়, সুতরাং মনে হয় তাদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। নেআনডার্টালরা কখনও কখনও পুরুষ শিশুও হত্যা করে থাকতে পারে যাতে দল বেশী ভারী না হয়ে পড়ে।

এমনি আর এক 'বর্বরতা' নরখাদক বৃত্তি, হোমো ইরেকটাসের আমলেই তা আমরা দেখেছি, নেআনডার্টাল গোষ্ঠীতেও তার যথেষ্ট চিহ্ন বর্তমান। য়ুগোসলাভিয়ার ক্রাপিনায় যে অনেকগুলি নানা বয়সের নেআনডার্টাল পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় তাদের খুলি ভেঙে টুকরো টুকরো

করা হয়েছে এবং পা ও বাহুর হাড় লম্বালম্বি চেরা, সম্ভবত মজ্জা বার করতে। পোড়ার চিহ্নও দেখা যায়, যেন নর মাংস পাক হয়েছে। ফ্রানসের অর্তুস গুহায়ও অন্তত ২০ ব্যক্তির পোড়া ও খণ্ডিত হাড় আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৫ সালে। সঙ্গে ছিল পশুর হাড় ও ভুক্তাবশিষ্ট, যেন অধিবাসীরা মানুষের এবং বাইসন বা বলগা হরিণের মাংসে কোনও পার্থক্য করে নি। এই দু জায়গায় নৃশংস হত্যার লক্ষণ দেখে কয়েক জন নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে ক্ষুধার তাড়না ছাড়া তার আর কোনও কারণ ছিল না, তাঁরা বলেন এক দল নেআনডার্টাল শিকারের অভাবে প্রতিবেশীদের মেরে খেয়েছে। নরখাদক বৃত্তির বিকল্প ও আনুষ্ঠানিক কারণ সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

যবদ্বীপে সোলা নদীর কূলে প্রাপ্ত এগারোটি খুলিতে আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। এগুলি এক লক্ষ বছর কি আরও বেশী প্রাচীন, খুলি ও পায়ের দুটি হাড় ছাড়া কোনও অংশ উপস্থিত ছিল না। শুধু এতগুলি বিদেহ মুন্ড দেখে প্রধান উদ্দেশ্য মাংসাহার বলে মনে হয় না। তা ছাড়া খুলির নিচে যে ছিদ্র দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে দুটি ছাড়া আর সব খুলিতে হাতিয়ারের ঘা মেরে তা অনেকটা বড় করা হয়েছে। আধুনিক নরখাদকদের মধ্যেও এই রীতি লক্ষিত হয়েছে, উদ্দেশ্য ঘিলু বার করে তার আচারসংগত ভক্ষণ; যেমন নিউ গিনির এক মুন্ডশিকারী গোষ্ঠীর বিধি অনুসারে শিশুর জন্ম হলে তার নামকরণের আগে অন্য গোষ্ঠীর এমন কাউকে হত্যা করতে হবে যার নাম জানা আছে। হত্যার পর নবজাতকের বাবা বা নিকটাত্মীয় কেউ তার মুণ্ডচ্ছেদ করে তাতে উপরোক্ত ছিদ্র বাড়িয়ে ঘিলু বার করবে, এই বস্তু তখন সাগুর সঙ্গে সেঁকে খাওয়া হবে। এমনই অভাবনীয় হতে পারে সামাজিক রীতি নীতি। আবার বর্তমান জগতের কোনও কোনও সমাজে মৃত আত্মীয়দের খুলি স্মৃতিচিহ্ন রূপে রাখার রীতি আছে, তারাও একই উপায়ে মগজ বার করে খুলি পরিষ্কার করে। কিন্তু যবদ্বীপীয় খুলিগুলি এই ধরনের আদৃত বস্তু বলে মনে হয় না, কারণ প্রতিটির সম্মুখাংশ গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে, একটিও চোয়াল বা দাঁত যথাস্থানে নেই, এবং এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় মাথার পিছনে দারুণ আঘাত লেগে।

দেহহীন নর মুণ্ড য়োরোপীয় নেআনডার্টালরাও রেখে গিয়েছে, সুতরাং

বিজ্ঞানীরা কোনও রকম বিশ্বজোড়া মুণ্ডকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সন্দেহ করেছেন। জিব্রলটারের গুহায় যিনি পাঁচ ছ বছরের এক শিশুর খুলি আবিষ্কার করেন অন্য কোনও অস্থির অভাবে তিনি বললেন তা কোনও রকম বিজয় চিহ্ন বা পবিত্র স্মারক বস্তু, বিশেষ উদ্দেশ্যে ওখানে রাখা হয়েছে। জার্মেনির এরিংসডর্ফ গ্রামে এক ১০ বছরের নাবালকের অবশিষ্টাংশ, এক বয়স্ক ব্যক্তির চোয়াল এবং এক স্ত্রীলোকের খুলি পাওয়া যায়, মেয়েটির কপালে বারে বারে কঠিন কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং মাথাটি কেটে সুষুম্নাকাণ্ডের ছিদ্র বড় করা হয়েছে।

ইটালির মন্তে চির্চেও পাহাড়ে আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্য আরও স্পষ্ট। রোম শহরের প্রায় ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর তীরের এই স্থলে গ্রীসীয় পুরাণের মায়াবিনী সার্সি নাবিকদের শুয়োর বানাত। ১৯৩৯ সালে এক হোটেল তৈরির কাজে চুনাপাথর খুঁড়তে খুঁড়তে এক গুহার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হল, প্রত্নবিজ্ঞানীদের ভাগ্যক্রমে দূর অতীতে ধস নেমে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোটেলের মালিক এবং তাঁর জন কয়েক বন্ধু সংকীর্ণ পথে হাত পায়ের উপর গুঁড়ি মেরে চলতে চলতে পৌঁছালেন এক কক্ষে যেখানে সম্ভবত ৬০,০০০ বছর মানুষের পা পড়ে নি। লন্ঠনের আলোয় তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন পিছনের দেয়ালের কাছে কিছুটা খুঁড়ে তৈরি হয়েছে গুহার মধ্যে ছোট্ট গুহা, সেখানে বর্তমান একটি মাত্র খুলি, তা ঘিরে পাথর সাজানো ডিম্বাকারে। পরীক্ষায় দেখা গেল খুলিটি মাথার পাশে ঘা মেরে নিহত বছর চল্লিশ বয়স্ক এক নেআনডার্টালের, তারও সুষুম্না-কাণ্ডের ছিদ্রটি চওড়া করা হয়েছে। তা ছাড়া ঐ সাজানো পাথরের সারি আরও প্রমাণ দিচ্ছে যে গুহায় কোনও এক রকম রীতিসংগত ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয়েছে। আবিষ্কারের সময়ে খুলির সম্মুখাংশ মাটিতে ঠেকে ছিল, যেন প্রথমে তা এক কাঠির মাথায় খাড়া করে অধিষ্ঠিত হয়েছে, পরে পড়ে গিয়েছে এবং কাঠি ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই স্থির নীরব সাক্ষীর সামনে সে কালের মানুষ কি বিশ্বাসে কি 'তান্ত্রিক' ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

নরখাদক বৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য যে হিংসা বা রসনার তৃপ্তি না হয়ে

আনুষ্ঠানিক হতে পারে তার সমর্থনে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নৃবিজ্ঞানী হিসাব করে দেখিয়েছেন যে মানুষের দেহ থেকে ১০ শতাংশের কম উপকারী প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে, একটি ম্যামথ বা বাইসনের তুলনায় তা অতি সামান্য। শিশু হত্যার প্রেরণাও হয়তো দলের বৃহত্তর স্বার্থ জাত, এবং শিকারের শ্রম ও বিপদ লাঘব করতে এই রীতিতে মেয়েদেরও সমর্থন থেকে থাকতে পারে। তা ছাড়া নেআনডার্টালদের এক ধাপ উপরে প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আধুনিক মানুষের সমাজেও যে নরখাদকতা আছে তা সুবিদিত, তেমনি শিশু নিধনও নানা উপজাতির মধ্যে ছিল—কখনও তা সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিবিধ উপায়ের অন্যতম, কখনও তার প্রেরণা অন্ধসংস্কার, যথা পঞ্জিকা মতে কুক্ষণে অথবা ঝড়ো দিনে জন্মালে সেই শিশু অরক্ষণীয়।

খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি কারণে অথবা যাযাবর সমাজে ছোটরা বোঝা বলে যেখানে প্রেরণা ছিল সংখ্যা হ্রাস সেখানে সাধারণ গর্ভরোধ বা গর্ভপাতের মামুলী প্রথায় কাজ না হলেই শিশু হত্যার রীতি ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ভিকটোরিয়া অঞ্চলে এক গোষ্ঠী জন্ম কালে অর্ধেক শিশু মেরে ফেলত, দক্ষিণ আমেরিকার এক উপজাতি প্রতি পরিবারে সাত বছরে একটি শিশু বাঁচতে দিত, আর এক সমাজে প্রথা ছিল গৃহপ্রতি শুধু একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, বাকি সকলের আবির্ভাবের সঙ্গেই বিদায়। ভারতে ইংরেজ শাসন কালে ও তৎপূর্বে পানজাবের উচ্চতম পুরোহিত শিখদের বলা হত কুরি-মার (কন্যা-হন্তা) কারণ তারা নাকি অধিকাংশ মেয়ে শিশুদের মেরে ফেলত; বালিকারা উচ্চতর বংশে বিয়ে করবে, কিন্তু সমাজে তেমন বংশ নেই, তাই নাকি এই অদৃষ্ট। চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের আগে নানা সমাজে শিশু হত্যার প্রচলন ছিল। হত্যারও নানা রীতি নানা দেশে দেখা যায়, যথা বাইরে আকাশ তলে ফেলে রেখে, গলা টিপে, জলে ডুবিয়ে, জীবন্ত কবর দিয়ে। চীনে ভারতেরই মত গরিব চাষী পরিবারে পুত্র সন্তানের আদর ছিল বেশী, কারণ তারা মাঠের কাজ ভাল পারে; কন্যারা বোঝা, বিয়ের পর দূরে চলে যায়, সেখানেও খেটে মরে এবং আরও খেটে সন্তান প্রসব করে। সুতরাং মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে স্ত্রী শিশুকে খেতে ফেলে রাখা হত, সেখানে রাত্রে শীত বা পশুর কবলে মারা পড়ত তারা, কিন্তু এই প্রথায় পাপ ছিল না। দুর্ভিক্ষ বা তার আশংকা

দেখা দিলে অনেক সমাজে সদ্যোজাতদের গলা টিপে শেষ করা হত, স্ত্রী শিশুই প্রাণ হারাত বেশী। কিন্তু এ সব প্রাচীন সম্প্রদায়ে সাধারণত জন্মের কিছু দিনের মধ্যে প্রাণ না গেলে ফাঁড়া কেটে যেত, তখন অসহায় শিশুর প্রতি বাপ মায়ের মায়া পড়ে গিয়ে প্রায়ই আরও আদরে মানুষ হত সে।

অতীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উৎস গ্রীস ও রোমে জন সংখ্যা বজায় রাখবার উপায় ছিল শিশুদের বাইরে ফেলে রাখা। পরে আইন করে শুধু পুং শিশু নিধন নিষিদ্ধ হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে নর বলি অনেক দেশেই দেখা যায়, কিন্তু ফিনিসীয়রা জীবন্ত শিশু পুড়িয়ে আহুতি দিয়েছে। নিকটবর্তী আরব দেশে কয়েক শো বছর পরে যুদ্ধে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পেলে নারীর সংখ্যা কাছাকাছি আনতে স্ত্রী শিশু হত্যার প্রথা ছিল।

আরও সাম্প্রতিক কালে একাধারে শিশু নিধন ও নরখাদকতার দৃষ্টান্ত আছে। অস্ট্রেলীয় আদিবাসী সমাজে যখন শিশু হত্যার প্রথা ছিল তখন মায়েরাও কখনও কখনও আপন সন্তানের মাংস ভক্ষণ করেছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে এসকিমোরা সর্বাগ্রে বাচ্চাদের মেরে খেত, কারণ তাদের মা বাপ আবার সন্তান সৃজন করতে পারবে।

নৃতত্ত্বজ্ঞরা বলেন ঐতিহাসিক ও পরবর্তী কালে এই সব সামাজিক শিশু নিধনে বিদ্বেষ বা নৃশংস প্রবৃত্তি ছিল না। নেআনডার্টালদের শিশু বধ ও নরখাদক বৃত্তির সমর্থন না করেও এটুকু বলা যায় যে বর্তমান প্রাচীন উপজাতীয় প্রথার মতই তার প্রেরণা ছিল প্রধানত ব্যবহারিক। অবশ্য তাদের মধ্যেও খুন ও হানাহানি ছিল। স্খুলে প্রাপ্ত একটি ফসিলে দেখা যায় এক বর্শার ফলা মানুষটির উরু ও নিতম্বের হাড় ভেদ করে ঢুকেছিল, কাঠের বর্শা অবশ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আছে শুধু মারাত্মক ক্ষতের চিহ্ন। এক শানিডারবাসীর পাঁজরার হাড়ে অনুরূপ তীক্ষ্ন অস্ত্রের গর্ত আছে, অস্ত্রের মুখ তার বুকে প্রবেশ করে সম্ভবত একটি ফুসফুস ফুটো করেছিল, কিন্তু লোকটি মরে নি, কারণ ক্ষত সেরে যাওয়ার লক্ষণ আছে হাড়ে। আদি আবিষ্কার জার্মেনির নেআনডার গুহাবাসীরও অনুরূপ ইতিহাস আছে। নিদারুণ জখম হয়েও সে বাঁচল, তবে সম্পূর্ণ সারে নি, বাঁ হাতের কনুইয়ের হাড় এত বিকৃত যে হাতটি সে মুখ পর্যন্ত তুলতে পারে নি, তবে মানুষ

না পশুর আক্রমণে এই ক্ষতি হয়েছে তা অনির্ণেয়। ৬০,০০০ বছর আগে অসভ্য মনুষ্য সমাজে ব্যক্তিগত বা দলগত সংঘর্ষ না থাকাই অস্বাভাবিক, আশ্চর্য এই যে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজেও হিংসা দ্বেষ হানাহানি কমে নি, বরং বেড়েই চলেছে।

পক্ষান্তরে নেআনডার্টাল মানসের বিপরীত দিকের কীর্তি দিয়ে বিচার করলে তাদের মানবিক অগ্রগতি অবাক করে, কয়েক বছর আগেও তা পন্ডিতদের অকল্পনীয় ছিল। নেআনডাটালরা অসহায় ও পঙ্গুদের সেবা করেছে; মৃত্যুর পরে পরলোক কল্পনা করে সযত্নে সেই মহাপ্রস্থানের পথে পাঠিয়েছে; আচার উপচারের প্রভাবে ভাগ্যের সহায়তা চেয়েছে; চারুশিল্প ও সৌন্দর্য প্রীতির প্রথম ক্ষীণ চিহ্নও রেখে গিয়েছে তারা। যেন সম্পূর্ণ মানব প্রকৃতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে নেআনডার্টাল সমাজে।

বর্তমান ইরাকে বগদাদ শহরের ৪২০ কিলোমিটার দূরে শানিডার গুহা ৩৬ বছরের তরুণ মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রাল্‌ফ্‌ সলেকির আবিষ্কারে আজ প্রসিদ্ধ। গুহার একটি কঙ্কালের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে জন্মাবধি মানুষটির ডান বাহু ও কাঁধ অগঠিত বলে ঐ হাতটি অকেজো ছিল। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৪০, নেআনডার্টাল আয়ু অনুপাতে তা বর্তমানের ৮০ বছরের তুল্য। এর মধ্যে কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রচিকিৎসক কনুইর উপর পর্যন্ত হাতটি কেটে বাদ দিয়েছে। উপরন্তু সে ছিল বাতগ্রস্ত ও এক চোখে কানা। বয়স ও দৈহিক অবস্থা থেকে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস মানুষটি ছিল পরনির্ভর, তাঁদের অনুমান অন্যরা তার যত্ন করেছিল বলেই সে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচেছে। সম্মুখ দাঁতের অতিশয় ক্ষয় দেখে মনে হয় সে হয়তো এক হাতের অভাবে দাঁত দিয়ে ধরত, আবার এও হতে পারে পরিধেয় বানাবার আগে চামড়া চিবিয়ে নরম করবার কাজে মানুষটি অনেক সময় কাটিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে মরেছিল সম্ভবত মাথায় পাথর ভেঙে পড়ে।

লা শাপেলবাসী মানুষটিরও বয়স হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি বাতে যে দেহ ঝুঁকে পড়েছিল তা তার কঙ্কালে প্রতীয়মান। শিকারে যাওয়া তো দূরের কথা, দুটি ছাড়া সব দাঁত হারিয়ে আহারও কঠিন ছিল তার পক্ষে। আরও কয়েক হাজার বছর আগে জন্মালে এই অকর্মা অক্ষম মানুষটি হয়তো

অনাহারে প্রাণ হারাত, কিন্তু তার নেআনডার্টাল সংগীরা অত হৃদয়হীন ব্যবহার করে নি। দলের লোক তার থেকে কিছু না পেলেও নিঃস্বার্থ ভাবে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, হয়তো নিজেরা মাংস চিবিয়ে কিছুটা নরম করে দিয়েছে। যে সমাজে গায়ের রক্ত জল করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, যাযাবর জীবনে বাস ব্যবস্থা অস্থায়ী, সেখানে অক্ষম ও অসহায়ের প্রতি এই মমতা সামান্য নয়। রোডীসীয় মানবের উপরও কেউ অস্ত্রোপচার করেছিল বলে মনে হয়। তার খুলির পাশে একটি গর্ত আছে, সেটি কাটা হয়েছিল জীবিত অবস্থায়, কারণ ক্ষত সেরে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। জল্পনা হয়েছে যে উদ্দেশ্য হয়তো ছিল ফুটো দিয়ে ভূত ছাড়ানো।

এই যত্ন ও মমতা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান মৃতের সমাধি প্রথায়, নানা স্থানে তার প্রমাণ আছে, যদিও নেআনডার্টাল মানব আবিষ্কারের পর অর্ধ শতাব্দী কেটে গেল তা উপলব্ধি করতে। তাদের দেহাবশেষ যে এত জায়গায় পাওয়া গিয়েছে তার একটা কারণ তারাই প্রথম কবর প্রথার সূচনা করে। তখন থেকে এই রীতি আজও চলছে, এ দেশেও প্রাচীন কালে আর্যদের মধ্যে কবর প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে কাঠের প্রাচুর্য দেখে তারা দাহ আরম্ভ করে। তখনও কিন্তু দগ্ধ অস্থিকে মাটিতে নিহিত করা হত, সেই জায়গাকে বলা হত শ্মশান, অর্থাৎ যেখানে শব শুয়ে থাকে—সুতরাং এই শব্দটির মধ্যেও সমাধির ইঙ্গিত রয়েছে।

এখন প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় ১৮৫৬ সালের আদি আবিষ্কার নেআনডার গুহাবাসীকে তার সঙ্গীরা কবর দিয়েছিল। অন্যত্র অন্তত কোনও কোনও দেহকে যে সযত্নে ও বিশেষ ভঙ্গিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। কয়েকটি কবরে মাথার নিচে কখনও পাথরের বালিশ, তা ছাড়া পাশে ও উপরে পাথরের পাটা দিয়ে দেহকে বাঁচানো হয়েছে মাটির চাপ থেকে। কবর খোঁড়া হয়েছে গুহাস্থিত চুলার কাছাকাছি, আগুনের তাপে হিমশীতল শবে প্রাণ সঞ্চারের ব্যর্থ প্রয়াস হয়তো ছিল এই প্রথার মধ্যে। বেলজিয়ামের পূর্বোক্ত স্পিগুহার দেহ দুটি পূব পশ্চিম বরাবর রাখা এবং চিহ্ন আছে যে তাদের উপরে আগুন জ্বালা হয়েছিল, তাও সম্ভবত মৃত্যুর শৈত্য প্রতিরোধের চেষ্টায়। ফ্রানসের লা শাপেল গুহা খুঁড়ে এক অগভীর

খাতে যে মানুষটির শেষ শয্যা তৈরি হয়েছিল সে শায়িত ডান হাতে মাথা রেখে, হাঁটু দুটি ভাঁজ করা, সঙ্গে রাখা ছিল পশুর হাড় ও চকমকির হাতিয়ার, হাতের কাছে এক বাইসনের ঠ্যাং, পাশে সাজানো বারোটি ঝিনুক জাতীয় বস্তু, তখনকার দিনে যা বহুমূল্য। বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু প্রাচীন সম্প্রদায় ভক্ষ্য, পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সমাধিতে রেখেছে, তবু ঐ সব আবিষ্কারের পর বিশেষজ্ঞদের সেই সম্ভাবনার কথা মনে হয় নি। ল মুসতিয়ের গুহায় উদঘাটিত তরুণটির দেহ সযত্নে পাশ ফিরে শোয়ানো, পা দুটি মোড়া, মাথা রক্ষিত এক স্তূপ চকমকির ফলকে, সঙ্গে ছিল আরও হাতিয়ার ও মাংস যার অবশিষ্ট আছে শুধু হাড়। দেহের ভঙ্গি দেখে মনে হয় মৃত্যুকে এক ধরনের ঘুম বলে ভাবা হত, যদিও খাদ্য ও অস্ত্র পরলোকে বিশ্বাস নির্দেশ করে।

লা ফেরাসির অগভীর গুহায় বহু বছরের অনুসন্ধানে অনেক আশ্চর্য ও রহস্যময় তথ্য প্রকাশ পেল, তার বিবরণের পর পশ্চিম য়োরোপীয়রা যে মৃতের সমাধি দিয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কাঁকর মেশানো লালচে মাটির মেঝে খুঁড়ে দেহ রাখবার জন্য বার বার খাত কাটা হয়েছে, ৪০,০০০ বছর আগে গুহাটি যেন ছিল পারিবারিক গোরস্থান। সবসুদ্ধ ছয় ব্যক্তির ফসিল পাওয়া গিয়েছে—চারটি নাবালকের, দুটি সাবালক মেয়ে পুরুষের, সম্ভবত বাপ মা ও তাদের সন্তান। বয়স্ক দেহ দুটি মাথার দিকে মাথা করে লম্বালম্বি রাখা হয়েছিল, পুরুষটির সঙ্গে চকমকির ফলক ও চেরা হাড়ের টুকরো রেখে কাঁধ ও মাথার উপরে একটি চ্যাপটা পাথরের পাটা স্থাপন করেছিল সঙ্গীরা—হয়তো তাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে, অথবা আবার সঞ্জীবিত হয়ে ফিরে আসা বন্ধ করতে। স্ত্রীলোকটির হাঁটু মুড়ে বুকের সঙ্গে ঠেকানো, যেন চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল—এ রকম ভাঁজ করা দেহ অনেক নেআনডার্টাল কবরে (এবং পরবর্তী কালেও) দেখা যায়। এর উদ্দেশ্যও এক হেঁয়ালি, হয়তো প্রেরণা কোনও সংস্কার, যেমন এখনও অনেক প্রাচীন গোষ্ঠী মৃতদেহ বাঁধে যাতে তারা ফিরে এসে জীবিতদের জ্বালাতন বা ক্ষতি না করে। কিন্তু কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে কারণটা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক—ভাঁজ করা দেহ কম জায়গা নেয় বলে কবর বানাতে পরিশ্রম কম; সেগুলি তৈরি হয়েছিল মাটিতে কিছুটা গর্ত করে,

এবং পাথরের ও কাঠের যন্ত্র দিয়ে মাটি খোঁড়া কষ্টসাধ্য কাজ।

যাই হক, স্ত্রীলোকটির (মায়ের ?) পায়ের কাছে ছিল সযত্নে সমাধিস্থ দুটি শিশুর কঙ্কাল, তার পরে আবার এক রহস্য—সুন্দর সারিবাঁধা গোল গোল ন'টি ঢিবি, তিন সারিতে তিনটি করে। শুধু একটির ভিতরে পাওয়া গেল সম্ভবত সদ্যোজাত এক শিশুর অতি ক্ষুদ্র হাড়, সঙ্গে তিনটি সুদৃশ্য ফলক। অন্য ঢিবিগুলিতে হাড় বা ফলক নেই, যদি এগুলিও কবর হয় তবে হয়তো হাড় কোনও কারণে ক্ষয়ে গিয়েছে কিংবা গুহার হায়না বা অন্য কোনও জন্তু দেহগুলিকে খেয়ে ফেলেছে। তিন সারিতে কবর তৈরির কোনও আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছিল কিনা তা নিয়ে শুধু জল্পনাই চলতে পারে। শেষের কবরটিতে বছর ছয়েকের এক শিশুর মুণ্ড ও কঙ্কালের নিম্নাংশ প্রায় এক মিটার তফাতে রক্ষিত অল্প ঢালু করে কাটা এক খাতে, মুণ্ডটি ঢাকা এক চ্যাপটা ত্রিকোণ চুনাপাথর দিয়ে, তার তলার দিকটা খোবলানো, সেখানে বাটির মত গোটা কয়েক ছাপ, তা ছাড়া ছিল দুটি চকমকির চাঁছনি ও একটি ছুঁচালো ছিদ্রকর যন্ত্র। এক বিশেষজ্ঞ জল্পনা করেছেন শিশুকে মেরে কোনও জন্তু ধড়টি খেয়েছে, কবরে মাথা ও নিম্ন দেহের মধ্যে ফাঁক রাখা হয়েছিল লুপ্ত অংশ পরলোকে আবার তাদের সঙ্গে জুড়বে বলে, এবং এই সংযোজনার সুবিধা করতে মাটি ঢালু করে কাটা। পাঁচটি দেহই পূব পশ্চিমে লম্বালম্বি সাজানো, হয়তো সূর্যোদয় ও অস্তের সম্পর্ক ছিল এর সঙ্গে। কবরে গুহার লালচে মাটির সঙ্গে চুলার কালো ছাই সমান পরিমাণে মেশানো দেখা যায়। সুতরাং অনেক কিছুরই সাংকেতিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

প্রায় সব পশ্চিম য়োরোপীয় কবরে চাঁছনির অনুপাত বেশী, অন্য শ্রেণীর হাতিয়ার, যেমন হাত-কুড়াল বা দাঁতকাটা ফলক, কম দেখা যায়। এর থেকে ফরাসী হাতিয়ার-বিশেষজ্ঞ ফ্রাঁসোআ বোর্দ অনুমান করেন যে সেখানে সব নেআনডার্টাল সম্প্রদায় কেবল মাত্র সমাধির পথে পরলোক গমন বিশ্বাস করত না ; যেমন এখন এ বিষয়ে নানা সমাজে নানা রীতি, তেমনি যারা প্রধানত অন্য ধরনের সাধনী বানাত তারা কেউ হয়তো শব রাখত গুহার বাইরে মঞ্চের উপর অথবা গাছে (যেমন কোনও কোনও পৌরাণিক গোষ্ঠী এখনও রাখে), কেউ বা তা দাহ করে থাকতে পারে। বোর্দ

বলেন একই অঞ্চলে বাস করলেও এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।

পূর্ব য়োরোপেও নেআনডার্টাল সমাধি পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়ার ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে কীক-কোবা গুহায় প্রায় এক মিটার তফাতে একটি এক বছর বয়স্ক শিশুকে ও এক সাবালক পুরুষকে কবর দেওয়া হয়েছিল, দুটি দেহই পা মুড়ে পাশ ফিরে শায়িত, দ্বিতীয়টি পুব পশ্চিম বরাবর রক্ষিত। কার্মেল গিরির স্খুল গুহায় ছিল পাঁচটি পুরুষ, দু জন স্ত্রী ও তিনটি শিশুর অগভীর কবর, ৪৫ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ দু হাতে ধরে আছে এক বিশাল বরাহ-চোয়াল—হয়তো এই পশুর কবলে তার মৃত্যু হয়েছে, হয়তো শিকারী নিজেই তাকে মেরেছে, অস্থিটি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে পরলোকে শৌর্যের এই নিদর্শন দেখাবে বলে। আরও পুবে মধ্য এশিয়ার উজবেক পর্বতমালার তেশিক-তাক গুহায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশ পেল আর এক অদ্ভুত দৃশ্য—এক বালকের কবর প্রায় গোল করে ঘিরে মাটিতে গাঁথা রয়েছে ছ' জোড়া খুলি-সংযুক্ত ছাগলের শিং। কেউ বলেন শিংগুলি মাটি খুঁড়বার যন্ত্র মাত্র, কিন্তু তারা বৃত্তাকারে সাজানো দেখে আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য সন্দেহ হয়। প্রসঙ্গত, পাহাড়ী ছাগের মত তৎপর ও ক্ষিপ্র পশুর শিকার অতীব দক্ষতার পরিচায়ক।

সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য নেআনডার্টাল সমাধি উদঘাটিত হয়েছে পূর্বোক্ত শানিডার গুহায়। সেখানে সলেকির দল দু বছর চেষ্টার পর ১৯৫৩ সালে প্রথম ফসিল আবিষ্কার করে এক কচি শিশুর অস্থি, বয়স ১২ মাসও পূর্ণ হয় নি তার; ১৯৬০ সালে যখন কাজ শেষ হয় তখন সংগৃহীত হয়েছে মোট ন'টি মানুষের ফসিল। গুহার একেবারে পিছনে, ৬০,০০০ বছর প্রাচীন স্তরে পাওয়া গেল এক কবর, তাতে খুলিটি বেশী রকম ভাঙা। সলেকি যথারীতি কবরের কিছু মাটি পরীক্ষার জন্য পাঠালেন প্যারিসের নৃবৈজ্ঞানিক যাদুঘরে এক সহকর্মিণীকে, তাঁর নাম আর্লেৎ লরোআ-গুরঁ। আট বছর পরে একদা গবেষণাগারে অণুবীক্ষণের নিচে তা পরীক্ষা করতে করতে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন তাতে প্রচুর পরাগ, কিছু কিছু থোকায় থোকায় জুড়ে আছে, মাঝে মাঝে ফুলের পরাগবাহী অংশও বর্তমান। পরাগ থেকে আট রকম

বর্ণোজ্জ্বল ফুল সনাক্ত হল। লরোআ-গুরুঁ পুরাউদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তিনি খুঁজছিলেন নেআনডার্টাল কালীন উদ্ভিদের চিহ্ন, কিন্তু বুঝলেন যে একসঙ্গে এত অপর্যাপ্ত পরাগ এবং যে অবস্থায় তারা বর্তমান তা স্বাভাবিক নয়। বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে গুহার ভিতরে ঐ সব ফুল গাছ গজায় নি, পাখি জন্তু বা বাতাসেও পরাগ বয়ে আনে নি। সুতরাং এনেছে মানুষ, প্রিয় জনকে ফুলশয্যায় শুইয়ে বিদায় দিতে। লরোআ-গুরুঁর বিশ্বাস এই শয্যা তৈরি হয়েছিল পাইন শাখা ও ফুল দিয়ে, কিছু ফুল হয়তো দেহের উপরও ছড়ানো হয়েছিল।

শানিডারে পঙ্গু ব্যক্তির চিকিৎসা ও যত্নের নজির আমরা আগে লক্ষ্য করেছি।-মৃতের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্প সজ্জা ও অর্ঘ্যের প্রথা আমাদের এখনও আছে। নেআনডার্টাল মানবই কি তার সূচনা করেছে গুহার কাছাকাছি বুনো পাহাড়ী ফুল কুড়িয়ে এনে সযত্নে সমাধি সাজিয়ে? তাদের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে তা কষ্টকল্পনা নয়। প্রসিদ্ধ নৃবিজ্ঞানী কার্লটন কুন মন্তব্য করেছেন যে শানিডারবাসীরা শুধু তাদের আচরণের খাতিরেই হোমো সেপিয়েনস আখ্যার যোগ্য। শানিডারের এই আবিষ্কারের আরও এক তাৎপর্য থাকতে পারে, ঐ জাতীয় কোনও কোনও ফুল গাছ এখনও ইরাকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হয়, হয়তো গুহাবাসীরা ফুল সংগে দিয়ে ভেবেছে ওষুধের গুণে বিদায়ী ব্যক্তি পরজীবনে সুস্থ হয়ে উঠবে।

মনে হয় নেআনডার্টাল কালেই মৃতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনার সূচনা হয়েছিল। শবের সংগে তারা জিনিস যা দিয়েছে তা সম্ভবত অন্য অজানা জগতে ব্যবহারের জন্য, কিন্তু এমনও হতে পারে যে তখনও মানুষ মৃত্যুকে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, ভেবেছে তা দীর্ঘ ঘুম মাত্র—আবার প্রিয় ব্যক্তিটি জেগে উঠবে, তখন দরকার হবে খাবার দাবার, অস্ত্র শস্ত্র, নিজস্ব সেই কাটারি পাথরটি।

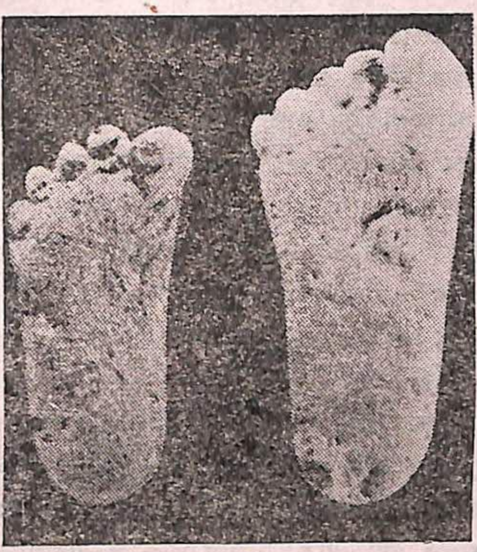
ঝিনুক বা ঐ ধরনের জলজ খোলকের কি যে সাংকেতিক অর্থ ছিল তাদের মনে কে জানে। কড়ির সংগে যোনির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তা ছিল উর্বরতা বা সন্তান সম্ভাবনার প্রতীক। কোনও রকম রক্ষাকবচ বা মৃতসঞ্জীবনীও হয়ে থাকতে পারে তা। তাৎপর্য যাই হক, দূর দূরান্তর

পর্যন্ত তারা যে ও সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছে তাতে মনে হয় বিশ্বাসটা খুব দৃঢ় ছিল।

মৃতের সমাধি ও নরখাদকতার অনুষ্ঠান দেখে স্বভাবতই মনে হয় জীবনের নানা গুরুতর সন্ধি ক্ষণ সম্বন্ধেও নেআনডার্টালদের লোকাচার ছিল হয়তো, যেমন এখন প্রায় সব আদিবাসী সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণ। শিশুর জন্ম কালে নিরাপদ প্রসব, তাকে স্বাগত জানিয়ে নামকরণ, তার ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রভৃতির ব্যবস্থায় উৎসব ; সাবালকতা প্রাপ্তি, শিকারী জীবনে দীক্ষা, 'বিবাহ' অর্থাৎ তরুণ তরুণীর যুগ্ম জীবনের সূচনা, দলনেতা নির্বাচন, কঠিন পীড়ায় 'দেবতাদের' দয়া ভিক্ষা বা দুরাত্মা ভূতটাকে তাড়িয়ে রোগ মুক্তি ইত্যাদি উপলক্ষে রীতি নীতি আচার উৎসব অনুমান করা যায়। এ সব ক্ষেত্রে অবশ্য সাক্ষ্য কিছু নেই, তবে জীবনের সবচেয়ে জরুরী কাজ যার সঙ্গে মরণ বাঁচনের যোগ তা হল শিকার, সে সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশু মেরে খাদ্য সংগ্রহ নিত্যকার কৃত্য, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হতে পারে নানা কারণে, তাই পশুর যেন অভাব না হয়, শিকার সহজ ও নিরাপদ হয় এই সব আশায় তুকতাক দিয়ে অদৃশ্য শক্তিকে তুষ্ট করার চেষ্টা স্বাভাবিক ; যাদুর প্রভাবে শিকার ভাগ্য সদয় করা পরবর্তী মানুষের জীবনে আবশ্যিক অংশ ছিল, সম্ভবত নেআনডার্টালরা এই রীতির প্রবর্তক।

ইটালিতে জেনোআ শহরের পশ্চিমে ডাইনীর গুহা নামে এক গুহা আছে। প্রবেশ পথের প্রায় ৪৬০ মিটার ভিতরে গভীর গহনে চুনাপাথরের স্তূপ জমে উঠেছিল অস্পষ্ট পশুর আকারে। মাটির গুলি বানিয়ে নেআনডার্টাল শিকারীরা সেই স্তম্ভের গায়ে ছুঁড়ত, উদ্দেশ্য যদি হয় কোনও রকম খেলা বা অস্ত্র ক্ষেপণ রপ্ত করা তো কষ্ট করে অত দুরধিগম জায়গায় যাওয়ার দরকার ছিল না, তাই এর মধ্যে কোনও সাংকেতিক তাৎপর্য অথবা যাদু থাকতে পারে। আজ দেশে দেশে তীর্থ বা অতিলৌকিক ক্ষেত্র দুর্গম স্থানে স্থাপিত, যেন যত কষ্ট তত পুণ্য—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

১৯৭০ সালে পশ্চিম এশিয়ায় লেবাননের এক গুহায় সলেকি আর এক অভিনব অনুষ্ঠানের নজির পেয়েছেন। ছোট জাতীয় এক হরিণের খণ্ডিত কঙ্কালের হাড়গুলি পাথরের উপর গুছিয়ে সাজানো, তাদের গায়ে লেগে



১৬। ইটালির এক গুহায় প্রাপ্ত নেয়ানডার্টাল মানবের পদচিহ্ন ছাঁচ।

আছে লাল গেরিমাটি। নেআনডার্টাল সমাজে এই বস্তুর সম্ভবত সাংকেতিক অর্থ ছিল, প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে তাই কাটা হরিণ মাংসের উপর তারা এই রং ছড়িয়েছিল, প্রায় নিঃসন্দেহে তা রক্তের প্রতীক; কাছেই পাথুরে হাতিয়ারও রাখা আছে। সলেকি বলেন ভবিষ্যৎ সার্থক শিকারের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান, একটি হরিণ যেন সব হরিণের প্রতীক। পরবর্তী খাঁটি মানুষ মৃতের অন্ত্যেষ্টিতে লাল গেরিমাটি বা আকরিক ব্যাপক ব্যবহার করেছে দেখা যায়।

এই খাঁটি মানুষদের সমাজে, এমন কি বর্তমান আদিবাসী মাংসাশী সম্প্রদায়ে শিকারে সাফল্যের আশায় যেমন আনুষ্ঠানিক বা যাদুকরী ক্রিয়া-কলাপ লক্ষিত হয় নেআনডার্টালদেরও যে তা ছিল এই ধারণার সমর্থনে স্পষ্টতম নজির উদঘাটন করলেন জার্মেনির এক নৃবিজ্ঞানী, ১৯১৭-২৩ সালে সুইৎসাল্যান্ডের আল্‌প্‌স পর্বতের গায়ে ১২২০ মিটার উঁচুতে ড্রাখেনলখ্‌

গুহা খনন করে। এই গভীর গহ্বরের সামনের দিকে নেআনডার্টালেরা মাঝে মাঝে বাস করত, ভিতরে তিনি উদ্ধার করলেন পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে তৈরি এক চৌকোণ সিন্দুক, তার এক পাশ এক মিটার লম্বা, উপরে প্রকাণ্ড একটি পাথরের ঢাকনা। তা খুলে দেখা গেল সাতটি ভালুকের খুলি, প্রতিটি চেয়ে আছে গুহার মুখের দিকে। ভিতরে আরও ছ'টি খুলি দেয়ালের ধারে ধারে 'কুলুঙ্গিতে' বসানো, কোনও কোনওটির সঙ্গে পায়ের হাড়ও রয়েছে; কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেই হাড় ও খুলি একই ভালুকের নয়। একটি তিন বছর বয়স্ক ভালুকের খুলিতে গাল ভেদ করেছে ক্ষুদ্রতর আর একটির পায়ের হাড়, এই যুক্ত বস্তুটি বিভিন্ন ভালুকের আর দুটি অস্থির উপর রক্ষিত।

অস্ট্রিয়ার এক জায়গায় চুয়ান্নটি পদাস্থি সাজানো দেখা যায়, আর এক গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিয়াল্লিশটি খুলি ও কয়েকটি ঊরুর হাড়। এ ছাড়া ফ্রানসের রগুর্দু ঘাঁটিতে এক লম্বা চৌকোণ গর্তের উপর চাপানো প্রায় এক টন ওজনের এক পাথর সরিয়ে যে অস্থি-সঞ্চয় উদঘাটিত হল তা এসেছে কুড়ির বেশী ভল্লুক দেহ থেকে। জার্মেনি ও যুগোসলাভিয়াতেও ভালুক খুলি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত আছে।

এই ক্ষিপ্ত দুর্ধর্ষ গুহা ভালুক এখন লুপ্ত, তাদের শিকার সহজ হয় নি, প্রকান্ড দেহের দৈর্ঘ্য লেজ থেকে নাক পর্যন্ত দু মিটার ৭৫ সেনটিমিটার, দু পায়ে দাঁড়ালে প্রায় আড়াই মিটার উঁচু, ওজন ৬৮০ কিলোগ্র্যাম, সম্ভবত শিকারীরা তাদের আক্রমণ করেছে যখন শীতাগমে দুর্গম গুহায় ঢুকে তারা কয়েক মাস লম্বা ঘুম দিত। এই পশুর চরিত্র ও বর্তমান ভালুক শিকারীদের কৌশল থেকে সে কালের ঘটনা কিছুটা অনুমান করা যায়। আক্রমণের আগে দলের লোকেরা গুহায় গুহায় গোয়েন্দাগিরি করেছে, পাথর বা জ্বলন্ত ডাল ছুঁড়েছে আঁধার অভ্যন্তরে, বিরক্ত গর্জন শুনে বুঝেছে অধিবাসী কে; সিংহ, হায়না ইত্যাদি জন্তু বাদ দিয়েছে তারা, এমন কি বাচ্চা নিয়ে মাদি ভালুকও, তাদের চাই নিঃসঙ্গ মরদ। গুপ্তচর ফিরে গিয়ে খবর দিল, পরে তুষারাবৃত দুরূহ গিরি পথে চড়ে এক দুপুরে দলবল এসে পৌঁছাল, হাতে কাঠের বর্শা ও গনগনে ছাই। ভারী ভারী পাথর সংগ্রহ করে দুই শিকারী গুহার ছাতে চড়ল, অন্যরা পাইন গাছের ডাল ভেঙে তা জেবলে

ছুঁড়তে লাগল ভিতরে। চাপা গর্জনে জানা গেল শীতঘুমন্ত দানবের হুঁশ ফিরে আসছে, এ দিকে শিকারীরা গুহার দু পাশে বর্শা বাগিয়ে প্রস্তুত। ধোঁয়াভরা গুহা ছেড়ে ক্ষিপ্ত পশু দন্ত বিকশিত করে বিকট চিৎকার সহ যেই বার হল অমনি শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। শিকারীরা জানত উপবাসে চর্বি কমে গিয়ে শত্রুর দেহ দুর্বল, সদ্য ঘুম ভেঙে সম্পূর্ণ সজাগ নয় সে, গহন অন্ধকারের পর দ্বিপ্রহরের তুষার-প্রতিফলিত হঠাৎ-আলোর ঝলকানি ক্ষণ কাল তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। চকিতে বিশাল শিলা পড়ল মাথায়, দু দিক থেকে বর্শা বিঁধল দেহে। কিন্তু রক্তাক্ত দানব সহজে হার মানে না, দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে উৎকট গর্জন করতে করতে উন্মত্ত পশু হাত দুটি ছুঁড়ে দিয়াশলাইর কাঠির মত ভাঙতে লাগল বর্শা। হঠাৎ এক ব্যক্তির হাত ধরা পড়ল তার মুখে, মটাশ শব্দে তাও ভাঙল। বিপর্যস্ত যোদ্ধাদের লক্ষ্য তার মাথা, চোখ আর গলার দিকে, অবশেষে মারাত্মক আঘাতে ছিন্ন হল গলার এক শিরা, অবিলম্বে কাত হল ভালুক।

মাংস কেটে আস্তানায় নিয়ে এল শিকারীরা, পরে শীতের শেষে তারা ছিন্ন মস্তকটি নিয়ে যাবে অনেক দূরে সেই গুহায় যেখানে পাথরের সিন্দুকে জমেছে আরও কয়েকটি। প্রবাদ বলে সেইখানে কোন দূর অতীতে তাদের গোষ্ঠীর আদি পূর্বপুরুষ প্রথম গুহা ভালুকটি মেরেছিল। এই সঞ্চিত মুণ্ডের ভান্ডার যে শুধু বীরের জয়চিহ্ন নয় তার ইঙ্গিত মেলে উত্তর মেরু উপকণ্ঠে ল্যাপল্যানড, সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের নানা শিকারী উপজাতির মধ্যে। কোনও কোনও সাইবেরীয় সম্প্রদায় ভালুক পূজা করে প্রাবাদিক আদি মানুষ বলে এবং নিধনের আগে তার কাছে বিনীত ক্ষমা ভিক্ষা করে। অন্যরা ভালুককে মানুষ ও ভাগ্যনিয়ন্তা অদৃশ্য শক্তির মধ্যে মধ্যস্থ বলে ভাবে। আমাদের পুরাণে ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কথা আছে, তার রাজধানী ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, অরুণাচল প্রদেশের আকা উপজাতীয়রা নিজেদের ভালুকের বংশধর বলে দাবি করে।

উত্তর জাপানের আইনু সম্প্রদায় চেহারায় পশ্চিম য়োরোপীয়দের মত, তাদের শিকারীরা একটি ভালুক বাচ্চা ধরে প্রায় সারা বছর তার যত্ন করে

সম্মানিত অতিথির মত, এমন কি মেয়েরা বুকের দুধও খাওয়ায়, তার পর শীত কালে দীর্ঘ অনুষ্ঠানের পর তাকে বলি দিয়ে পুরুষরা রক্ত খায় আর পুরোহিত সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে। তাদের বিশ্বাস ভালুকটির আত্মা আবার বনে ফিরে এসে আতিথ্যের খবর জানাবে, খুশী হয়ে বনদেবতারা পরের বছর শিকারের সুযোগ করে দেবে। নেআনডার্টালরা হয়তো আরও সরল বিশ্বাসে ঐ খুলিগুলি জমিয়েছে সাজিয়েছে, কিন্তু সম্ভবত তার সঙ্গে সৃষ্টির নিয়মের কোনও যোগ ছিল। মানুষ ও ভালুক একই আশ্রয় খুঁজত, ভালুকও দুই পায়ে দাঁড়ায়, এর থেকে দুইয়ের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকতে পারে। যাই হক, আরও সহজ শিকার সর্বত্র অনেক ছিল, সুতরাং শুধু মাংসের লোভ নয়, কোনও এক প্রবল বিশ্বাসের বশেই যে এত ক্লেশ ও বিপদ অগ্রাহ্য করে এই ভয়ংকর পশু শিকার করেছে তারা তার যথেষ্ট নজির আমরা পেলাম। আজও সুসভ্য শিকারী পশুর চামড়া শিং মাথা দিয়ে সগর্বে ঘর সাজায়, নেআনডার্টাল আমলেই এই জয়চিহ্ন সংগ্রহের সূচনা। তখন থেকে প্রায় ৪০,০০০ বছর ধরে ভালুকের খুলি নিয়ে আচার অনুষ্ঠান দেখা যায় পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ দিকে আধুনিক মানুষের সমাজ পর্যন্ত।

আর এমন যদি হয় যে নেআনডার্টাল আমলেই কোনও রকম অনৈসর্গিক বা অতিলৌকিক শক্তির ধারণা মানুষের মনে উঁকি দিয়েছে এবং ঐ খুলি ও হাড় তার বা তাদের তুষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তবে তা আরও বিস্ময়কর। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রকৃতির নানাবিধ আকস্মিক ও ভয়াবহ খেয়াল বুঝতে না পেরে মানুষ প্রথমে শুধু আতঙ্কিতই হয়েছে হীনতর প্রাণীদের মত। কিন্তু ক্রমে ঝড় বিদ্যুৎ মেঘ গর্জনের আড়ালে কি সব অদৃশ্য কিন্তু সচেতন শক্তি সে অনুমান করেছে, বজ্রপাতের সময়ে তার কল্পনায় দেবতারা ডেকে উঠছে থরথরিয়ে কেঁপে; হঠাৎ যে আকাশটা কালো হয়ে এল, তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে দিয়ে ভয়ংকর গর্জন করে উঠল, তার পর গাছপালা ভেঙে অবিশ্রান্ত উন্মাদ জলঝাপটায় মানুষ ও পশুকে ব্যস্ত, উদভ্রান্ত করে তুলল এ নিশ্চয় কোনও দুষ্ট মানব বা রুষ্ট দেবতার কাজ। এদের তুষ্ট করার সম্ভাবনা ক্রমে মনে জেগেছে, সাংকেতিক দ্রব্য আর তুকতাক দিয়ে। আদিতে

মানব মনের ভীতি ও অজ্ঞতা দেবতাদের সৃষ্টি করেছে, এ কথা বলতেন ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক দেনিস দিদেরো ও তাঁর সমগোষ্ঠীয়রা।

আরও পরে এই আশ্চর্য শক্তিরা এক এক দেবতার রূপ নিয়ে দানা বেঁধেছে মানুষের মনে, তাদের স্তুতির মন্ত্র ও অনুষ্ঠান যুগে যুগে জটিলতর হয়ে উঠেছে, এর দৃষ্টান্ত পরে আমরা আরও দেখব। এমনি কোন অস্পষ্ট অতীতে, হয়তো লক্ষাধিক বছরের ও পারে নিহিত আমাদের পরিচিত অনেক প্রাকৃতিক দেবতার (nature gods) অংকুর। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা স্তব গেয়েছেন অনন্ত আকাশের দেবতারূপ বিশ্বপিতা দ্যৌস্পিতার, ইনিই গ্রীসীয়দের দেবপতি জেউস, যার রোমীয় নামান্তর জুপিটার; আর্যরা সূর্যের উপাসনা করেছে ভারতে মিত্র নাম দিয়ে, ইরানে মিথ্র; মেঘ বৃষ্টির কর্তা ইন্দ্র বেদের প্রধান দেবতা। জনৈক বাঙালী লেখকের কথায় "অধিকাংশ দেবতার কল্পনাই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাকৃতিক লীলার অনুভূতি হইতে", এবং দেশে দেশে প্রাগৈতিহাসিক দেবতারা প্রায় সবই প্রাকৃতিক। (আমাদের শিব দুর্গা প্রভৃতি অ-প্রাকৃতিক দেবতা বৈদিক নয়, পৌরাণিক—অনেক পরের সৃষ্টি।) ঈশ্বরবাদ ঐতিহাসিক কালের ঘটনা হলেও এরও উদ্ভব প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রাকৃতিক অনুভূতির মধ্যেই এমন কথাও হয়তো অনেকে বলবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ডস্‌টয়েভ্‌স্‌কি রচিত এক উপন্যাসের কয়েকটি কথা; ঐ ভাবটি প্রকাশ করতে গল্পের এক ব্যক্তি সংক্ষেপে বলেছিল, "ঈশ্বরের সংস্কার এসেছে বজ্র বিদ্যুৎ থেকে।" ব্যক্তিটি এক আধুনিকা তরুণী, বাংলা খবর-কাগজী ভাষায় যাকে বলে 'আলোকপ্রাপ্তা'।

মানুষকে এ জীবন সম্বন্ধে প্রথম ভাবতে বাধ্য করেছে এ জীবনেরই অবসান—মৃত্যু। এই দুর্বোধ্য রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিস্মিত বিহ্বল উদভ্রান্ত হয়েছে, চেতনার গভীরে হঠাৎ অনুভব করেছে পরিচিত দিনগত ভাবনা চিন্তার বাইরে আহার আশ্রয় ক্ষুধা নিদ্রার অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্পষ্ট আভাস। মৃতের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা পশুদের মত অত সহজ হয় নি, কারণ স্বপ্নে তারা বার বার ফিরে এসেছে (যেমন এখনও আসে)। শুভ এবং অশুভ আত্মা বা ভূত প্রেতে বিশ্বাস হয়তো এরই থেকে উদ্ভূত। এদের এড়াবার উদ্দেশ্যেই হয়তো মৃতের অন্ত্যেষ্টির বিভিন্ন ব্যবস্থা—মাটির

নিচে চাপা দিয়ে, পুড়িয়ে বা অন্য ভাবে ধ্বংস করে, কিংবা শুধু মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে। প্রথমে সামান্য কড়ির থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগে যে বহুমূল্য বস্তু সব রাখা হয়েছে কবরে তাও হয়তো এদের তোষণ করে দূরে রাখবার জন্যই। এই সব অবোধ্য ভীতিকর অতিলৌকিক শক্তির ভাবনা মানুষের মনে ঢুকেছে তার দেহের রোগ জ্বালার থেকেও। একটা সুস্থ মানুষ যে হঠাৎ জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল তা নিশ্চয় কোনও অপদেবতার কাজ, নয়তো দেবতার রোষের ফল। সে কালের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে কতখানি ভয় আর কতখানি মমতা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়; এ কালের শান্তি স্বস্ত্যয়ন ব্যবস্থার মূলেও ভয়ের চিহ্ন আছে।

মৃত্যুর দর্শনে পশুও ক্ষণ কালের জন্য বিহ্বল হয়, কিন্তু মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক মৃত্যুকে অত সহজে ভুলতে পারে নি। জীবন যে অনিত্য, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী ও সর্বনাশী তা মেনে নেওয়া তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। এই ভয়ংকর বস্তুটাকে জয় করবার জন্যই সম্ভবত জীবাত্মার পরিকল্পনা—এমন একটা কিছু যা বিনষ্ট হয় না, যা মৃত্যুর অতীত। কোন অতীতের এই বিশ্বাস আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ, আজও অধিকাংশ মানুষ অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাসী, এবং তারই পরিণতি স্বরূপ জন্মান্তরবাদ অনেকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মানুষের মনে ধর্ম দর্শনের সূচনা ও প্রাথমিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হল এখানে, তার অর্থ এ নয় যে নেআনডার্টাল যুগেই এই ধারার সূত্রপাত। সে সময়ের যা সাক্ষ্য তা অপেক্ষাকৃত সামান্য। কিন্তু ভালুকের খুলি বা কড়ির পিছনে শিকারের যাদু ও দেবতার পূজা যাই থেকে থাক, নেআনডার্টাল মানুষ যে একটা কিছু বিশ্বাস বা মতবাদ—যাকে বলে ideology—আশ্রয় করেছিল জীবনে, সে যে প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সংকীর্ণ গণ্ডিটা অতিক্রম করেছিল অল্প মাত্রায় হলেও, এই চিন্তাই আমাদের মুগ্ধ করে।

যে সব মহৎ গুণ মানুষকে মনুষ্যত্বের চরম শিখরে তুলেছে সৌন্দর্য প্রীতি ও সৃষ্টি তার অন্যতম। পরবর্তী ক্রোমানীয়রা এ ক্ষেত্রে প্রায় অবিশ্বাস্য কীর্তি রেখে গিয়েছে গুহাচিত্র, উৎকিরণ ইত্যাদিতে। প্রাগিতিহাসের নাচ গান বা অন্যান্য চারুকলা সম্বন্ধে কিছু জানবার উপায় নেই, তবে

সম্ভবত শিকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে দলীয় নৃত্য প্রচলিত ছিল, এরও সূচনা করেছে হয়তো নেআনডার্টাল শিকারীরা। কিন্তু হাতের কারুকাজে তারা নিঃসন্দেহে অনেক পিছনে পড়ে ছিল, যদিও কতগুলি আবিষ্কার নির্দেশ করে যে শোভন বস্তুর প্রীতি ও সৃষ্টির প্রেরণা তাদের মনেও উঁকি দিয়েছে।

হাংগেরির টাটা নামক জায়গার এক গুহায় ম্যামথের দাঁত থেকে তৈরি একটি বস্তু পাওয়া গিয়েছে, দাঁতের খণ্ড কেটে চেঁছে নেআনডার্টালেরা তা ডিম্বাকারে এনেছে, তার পর ঘষে মেজে মসৃণ করে তার গায়ে রঙিন গেরিমাটি মাখিয়েছে। আর ছিল কয়েক কোটি বছর আগে লুপ্ত সামুদ্রিক প্রাণী নুমুলাইটের ফসিল, কোনও শিল্পী তারও আকার বদলে পালিশ করেছে নিজের খুশি মত। ফ্রানসের আর্সি স্যুর ক্যুর নামক গুহায়ও দুটি সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল এবং পেশ্ দ লাজ্ গুহায় একটি চিত্রিত পশুর হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই হাড় ও সামুদ্রিক ফসিল হয়তো কবচের মত পরেছে তারা। এই সব ছোট ছোট বস্তুর কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নেই, যেন আশেপাশে সুদৃশ্য কিছু চোখে পড়লে তৎকালীন মানুষ তা কুড়িয়ে নিয়ে রেখেছে, কিংবা অবসর সময়ে পাথরের ছুরিটি নিয়ে বসে এটা সেটার থেকে মনোরম কিছু গড়ে তুলেছে, অনুভব করেছে মৌলিক সৃষ্টির রোমাঞ্চ, যদিও তা খেয়ালের বশে অকেজো সৃষ্টি।

তা ছাড়া নেআনডার্টাল ঘাঁটিতে লাল ও হলদে গেরিমাটি এবং প্রায় কালো ম্যাংগানিজ্ অক্সাইড ইত্যাদি প্রাকৃতিক রং পাওয়া গিয়েছে। কখনও কখনও তা দেখা যায় পেনসিলের মত বা হাতে ধরবার উপযুক্ত ভিন্নাকৃতি খণ্ডে, তাতে নরম কিছুতে—যেমন মানুষের গায়ে—ঘষার চিহ্ন আছে। পাথরের খোবলে এবং ফাঁপা হাড়েও রং লেগে আছে, তা আরও দুটি পদ্ধতির ইঙ্গিত করে; পাথুরে শিল নোড়ায় খণ্ডগুলি গুঁড়ো করে জল কিংবা তৈল বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে জড়ো-করা লোম বা আঁশ দিয়ে তা গায়ে মাখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাড় বা ফাঁপা ডাঁটার মধ্যে গুঁড়ো রং ভরে ফুঁ দিয়ে গায়ে নকশা কাটা হয়েছে (এই প্রলেপন প্রথা এখন আধুনিক কারিগরী শিল্পে সুপ্রচলিত।) প্রকৃতির নিয়মে নেআনডার্টাল ললনারা কি রং মেখে অঙ্গ সজ্জা করেছে? হয়তো পুরুষরা শিকার বা দলীয় সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে দেহ রঞ্জিত

করেছে, হয়তো এমন নকশা এঁকেছে যা দেখে শত্রুরা বা ভীত পশুরা সম্মোহিত হয়ে পড়বে। কড়ির মত এরও কোনও সাংকেতিক অর্থ থাকা অসম্ভব নয়। আর যদি এমন হয় যে দুইই অলংকার মাত্র, তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষ এমন জিনিসের প্রতি মন দিতে আরম্ভ করেছিল যার কোনও প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক সার্থকতা নেই। এ সব বস্তুর ব্যবহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের নির্ভুল নিশানা—বানর বা বনমানুষ যত চালাকই হক কখনও কড়ি দিয়ে ঘর সাজাবে না। নেআনডার্টালদের ব্যবহারিক সৃষ্টিতেও চারু প্রবৃত্তির ব্যঞ্জনা থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু চিত্র বা নকশার চিহ্ন কিছু অবশিষ্ট নেই।

টাটা গুহায় কয়েকটি পাথরে খাঁজ কাটা দেখা যায়। পেশ দ লাজের এক ষাঁড়ের পাঁজরায় কারা যেন জোড়ায় জোড়ায় কতগুলি আঁচড় কেটেছে, তা মাংস কাটার দাগ বলে মোটেই মনে হয় না। হতে পারে এ সব অলস মুহূর্তের অর্থহীন কাজ, কিন্তু আবার কিছুর প্রতীক বা সংকেতও হতে পারে, যেমন গণনার। লেখায় ও রেখায় মানুষ আজ যে আশ্চর্য সম্পদ গড়ে তুলেছে এগুলি কি তার ক্ষীণতম পূর্বাভাস? যাদের মনে প্রথম আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ তাদের মধ্যে তা অসম্ভব নাও হতে পারে।

নেআনডার্টাল মানুষের এই নানা বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখলে, মৃতের প্রতি তার যত্ন মমতার চিহ্ন দেখলে তাকে আমাদের আপন জন বলে ভাবতে কষ্ট হয় না। আজ মানুষ তার ধ্যান ধারণা, আচার বিচার, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানসতা নিয়ে যে প্রাণী, প্রকৃতির তুলি তার বহিররেখা এঁকে ফেলেছিল নেআনডার্টাল মানবের চরিত্রে। আজ বিশ্বাস করা কঠিন যে তার সেই কুঁজো কদাকার নির্বোধ পাশবিক ভাবমূর্তিটি বহু কাল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু নেআনডার্টাল মানব কোথায় গেল, কি তার পরিণতি এই শেষ প্রশ্নের জবাব নিয়ে আজও নানা মুনির নানা মত। জন কয়েক রুশ বিজ্ঞানীর মতটি সবচেয়ে সরস ও চমকপ্রদ। ১৯০৭ এপ্রিলে ঐ দেশের অভিযাত্রী বারাডিন ও তাঁর দল মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে দিনের শেষে তাঁবু খাটাচ্ছেন, সারা দিন শিলাকীর্ণ বালুকাময় পথে চলে তাঁরা ক্লান্ত। হঠাৎ এক ব্যক্তির

চিৎকার শুনে সবাই তাকিয়ে দেখেন অদূরে এক টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে এক প্রকাণ্ড ন্যুব্জ লোমশ দেহ, পিছনে অস্তগামী সূর্য। বেশ কিছু ক্ষণ মানুষগুলির দিকে চেয়ে থেকে সে উলটো দিকে পালাল, যাত্রীরা তাড়া করেও তার নাগাল পেল না।

এই ঘটনার থেকে জন্ম নিল ইয়েতি বা তুষার মানবের কিংবদন্তী। চৌদ্দ বছর পরে ইংরেজ আরোহী হাওআর্ড বেরি হিমালয়ের এভারেস্ট শিখর পর্যবেক্ষণে বরফের গায়ে বিশাল পদচিহ্ন দেখেন, তখন ইয়েতি বিখ্যাত হল বিশ্বে। পরে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, পদচিহ্নের ছবি, শিরচর্ম ও চুল ইত্যাদি নানা নজির জমে উঠেছে; ইয়েতিকে বন্দী করতে, অন্তত তার ছবি তুলে আনতে গিয়ে অভিযাত্রীরা ব্যর্থ হয়েছেন—সে সব কাহিনী আজ সুবিদিত। ইয়েতির প্রকৃত পরিচয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন, রুশ বৈজ্ঞানিক নথি পত্রে মংগোলীয় অভিযাত্রী, তিব্বতী সন্ন্যাসী ইত্যাদির সূত্রে অনেক তথ্য জমে উঠেছে, যথা লালচে লোমে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, চোয়াল প্রকাণ্ড, কপাল ঢালু, মুখে বাক্য নেই, শুধু জন্তুদের মত আওয়াজ, হাঁটু বেঁকিয়ে নুয়ে চলে সে, ছোট পশু আর মূল খেয়ে বাঁচে। এই বর্ণনা প্রায় হুবহু মেলে নেআনডার্টাল মানবের সাবেক ছবিটির সঙ্গে, সুতরাং কয়েক জন রুশ নৃবিজ্ঞানী বলেন এশিয়ার রুক্ষ জনবিরল অংশে এখনও বংশ রক্ষা করছে তাদের কেউ কেউ। সেখানে বর্তমান জগতের নির্দয় মানুষের উৎপাত নেই, প্রকৃতি নির্দয় হলেও তাতে তারা চির দিন অভ্যস্ত।

তত্ত্বটি মুখরোচক ও রোমাঞ্চক, তবে বরফ অল্প গললে পায়ের ছাপ আয়তনে বাড়ে, আকারে বদলায়। ইয়েতির বিশ্বাসযোগ্য কোনও আলোক-চিত্র নেই। সবচেয়ে বড় কথা উপরের বর্ণনা নেআনডার্টালদের সংশোধিত সভ্য ভব্য, ঋজুদেহ মূর্তির সঙ্গে মোটেই মেলে না। সুতরাং ইয়েতির অস্তিত্ব স্কটল্যানডের হ্রদের প্রাবাদিক জলচর সরীসৃপ নেসির মতই সন্দেহময়।

কিন্তু শুধু রুশ বিজ্ঞানীরা নয়, ব্রিটেনের নৃবিজ্ঞানী মায়রা শ্যাক্লিও অনেকটা উপরোক্ত বিশ্বাসের সমর্থক। ১৯৭৯ সালে আল্‌তাই পর্বতমালায় গবেষণা করে পরের বছর প্রকাশিত তাঁর বইতে তিনি প্রস্তাব করেন যে

নেআনডার্টাল মানব এখনও দক্ষিণ রাশিয়া ও বহির্মংগোলিয়ার উত্তুংগ গিরিশ্রেণীতে টিকে আছে। ঐ অঞ্চলের এক বনমানুষোপম মানুষের স্থানীয় নাম আল্মাস্টি, তাদের চেহারায় নেআনডার্টালদের সংগে আশ্চর্য সাদৃশ্য। শ্রীমতী শ্যাকলি বলেন তারা ইয়েতি নয়, চীন দেশে যে প্রাচীন বনমানুষ জাইগ্যানটোপিথেকাস এখনও চোখের আড়ালে টিকে আছে বলে কথিত হয়েছে তাও নয়; খাঁটি মানুষ যখন নেআনডার্টালদের শিকার ভূমি দখল করল তখন তাদের কিছু কিছু ঐ সব দুর্গম নির্জন ক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়ে কষ্টক্লিষ্ট অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই মতবাদের সমর্থনে তিনি নজির উল্লেখ করেছেন যে অনেক সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞানী ও বিশ্বাসযোগ্য পশুপালক তাদের প্রত্যক্ষ দেখেছেন; দ্বিতীয়ত পর্বত চূড়ায় চিরতুষার সীমার কাছাকাছি পর্যন্ত মুসতেরীয় পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে, কিছু কিছু যেন বেশ সম্প্রতি তৈরি; তা ছাড়া দেখা যায় মস্ত পদচিহ্ন, যদিও অস্থি একটিও নয়। প্রসঙ্গত, ১৯৮২ মার্চ মাসের খবরে প্রকাশ চীনের উত্তরে হুবেই প্রদেশের সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে চৈনিক অভিযাত্রীরা কিছু কিছু লোমশ বনমানুষোপম প্রাণীর দেখা পেয়েছেন, এক জল্পনা অনুসারে তারা জাইগ্যানটোপিথেকাস।

আরও প্রামাণিক সাক্ষ্যের অপেক্ষায় এই সম্ভাবনা স্থগিত রেখে এখন বড় প্রশ্ন হল নেআনডার্টালরা কি ডাইনোসরদের মতই সম্পূর্ণ নির্বংশ হয়েছে, না আমরা তাদেরই রূপান্তরিত বংশধর। এ সম্বন্ধে নানা মতবাদ দেখা যায়, যথা নেআনডার্টালরা সর্বত্র আধুনিক মানুষে বিবর্তিত হয়েছে; সর্বত্র নয়, কোথাও কোথাও তা হয়েছে; কোথাও হয়তো আধুনিকদের সংগে যৌন মিশ্রণে আপন সত্তা হারিয়েছে; এবং তারা সর্বত্র বিলুপ্ত, আধুনিকদের উদ্ভব অন্যত্র, তারা এসে নেআনডার্টালদের জায়গা দখল করেছে। যদিও মাত্র কয়েক বছর আগে শেষোক্ত ধারণা প্রায় নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে এই মতবাদীরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু নেআনডার্টালদের অদৃষ্ট এখনও প্রত্নবিজ্ঞানের প্রায় বৃহত্তম হেঁয়ালি।

এই বিতর্কের সমাধানে বিশেষজ্ঞদের নির্ভর শুধু হাতিয়ার ও ফসিল। মধ্য পুরাপ্রস্তর অর্থাৎ মুসতেরীয় শিল্প, এবং পূর্ব এশিয়ার, আফ্রিকার ও অন্যান্য আঞ্চলিক পাথুরে হাতিয়ার প্রধানত চ্যাপটা ফলক; উচ্চ পুরাপ্রস্তর কালের

(অর্থাৎ যা মাটির উচ্চতর স্তরে পাওয়া যায়, সুতরাং আরও সাম্প্রতিক) মানুষ শিল্প আরও সংস্কার করে লম্বা পাতলা উন্নততর পাত বানিয়েছে। অনুসন্ধানীরা দেখলেন যে গুহায় ও শিলাশ্রয়ে নেআনডার্টালদের শেষের দিকে হাতিয়ারের সংখ্যা ও উৎকর্ষ কমে আসছে, তার পর উচ্চতর স্তরে কোনও রকম সাধনী বা বাস বসতির চিহ্ন নেই, আরও উপরে হঠাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধারার হাতিয়ার শিল্পের আবির্ভাব। এর থেকে ধারণা হয়েছিল যে অকস্মাৎ বিজাতীয় মানুষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি কোথাও কোথাও এই স্তর পরম্পরার ব্যতিক্রম প্রকাশ পেয়েছে, যেমন কোনও কোনও ঘাঁটিতে যন্ত্র শিল্পের নৈপুণ্য কমে নি, বরং বেড়েছে। তা ছাড়া নেআনডার্টাল ও ক্রোমানীয় উপকরণের মধ্য স্থলে সর্বদা হাতিয়ারবিহীন স্তর নেই, বরং ক্রমাগত বসতির লক্ষণই বেশী দেখা যায়। উপরন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, যন্ত্র শিল্পের পার্থক্য সর্বদা প্রমাণ করে না যে তারা সম্পর্কহীন, একটির থেকে অন্যটির উদ্ভব সম্ভব। সম্প্রতি নেআনডার্টাল ফসিলে আধুনিক মানুষের দিকে অভিব্যক্তির নজির প্রকাশ পাওয়াতে বিজ্ঞানীরা এই পথে যন্ত্র শিল্পের দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনাও বিচার করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসে আধুনিক মানুষ ক্রোমানীয়দের আদিতম শিল্প ওরিনাসীয় ও পেরিগর্দীয় (জায়গার নাম থেকে)। স্থানীয় মধ্য পুরাপ্রস্তর—অর্থাৎ নেআনডার্টালকালীন—ধারার সঙ্গে প্রথমটির কোনও মিল নেই, পূর্ব য়োরোপীয় সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে মনে হয় সম্ভবত তার আমদানি সে দিক থেকে। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে একই দাবি করা হয়েছে, কিন্তু তার স্থানীয় উৎপত্তির সাক্ষ্য ক্রমে বাড়ছে। মনে হয় তার সোজাসুজি উদ্ভব হয়েছে মুসতেরীয় শিল্পের সবচেয়ে জটিল ও কুশলী ধারার থেকে। কয়েকটি য়োরোপীয় ঘাঁটিতে নেআনডার্টালদের শেষ দিকে পর পর স্তরে ক্রমশ পাতের অনুপাত বাড়ছে, মধ্যে এমন কোনও ছেদ নেই যার থেকে প্রাচীন শিল্পের বা মানুষের তিরোধান এবং নতুনের আবির্ভাব সন্দেহ করা যায়। পূর্ব য়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার কোনও কোনও ঘাঁটিতেও শিল্প ধারার স্থানীয় অভিব্যক্তির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তবে তার সম্পূর্ণ পরীক্ষার আগে বিশেষজ্ঞরা জোর করে কিছু বলছেন না।

হাতিয়ারের চেয়ে ফসিলের সাক্ষ্য আরও প্রত্যক্ষ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে নেআনডার্টাল ও আধুনিক মানুষের সন্ধি ক্ষণের অস্থি সামান্য। এ যাবৎ প্রাপ্ত নবীনতম নেআনডার্টাল ও প্রাচীনতম আধুনিক ফসিলের নির্ভরযোগ্য বয়স যথাক্রমে ৪০,০০০ বছরের বেশী ও ৩০,০০০ বছরের কম—এই ক্রোমানীয় অস্থি প্রায় ২৬,০০০ বছর প্রাচীন, পাওয়া গিয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ায়। কোনও কোনও ফসিলের প্রাচীনতা এর মাঝামাঝি হতে পারে, কিন্তু তাদের তারিখ এখনও সুনির্দিষ্ট নয়, বোর্নিওতে এক খাঁটি সেপিয়েনস নাবালকের খুলি আবিষ্কারের দাবি করা হয়েছে, তেজস্ক্রিয় কারবন পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট পোড়া কাঠের বয়স প্রায় ৪০,০০০ বছর। সুপ্রতিষ্ঠিত তারিখের অন্তর্বর্তী প্রায় ১৫,০০০ বছরের কুহেলী কেটে গেলে এক থেকে অন্যের ক্রমবিকাশ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কোথায় এবং কি ভাবে তা পরিষ্কার হত। এই অল্প সময়ে এতটা রূপান্তর সম্ভব কিনা তাও এক বড় প্রশ্ন, আমরা দেখেছি দেহ প্রায় আমাদেরই মত হলেও নেআনডার্টাল মাথায় ও মুখে স্পষ্ট বনমানুষী ছাপ ছিল এবং আদিতম আধুনিক অর্থাৎ ক্রোমানীয়রা কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত বর্তমান মানুষের প্রতিচ্ছবি।

সমস্যা কিছুটা সহজ হয় যদি আমরা মনে রাখি যে আজ আধুনিক মানুষের মধ্যে যেমন নানা জাতি বর্ণ ভেদ তেমনি নেআনডার্টালরাও সবাই এক ছাঁচে গড়া ছিল না। সনাতন বিশ্বাস অনুসারে নেআনডার্টালদের চেহারা বৈষম্যহীন, বিশেষত পশ্চিম য়োরোপে, কিন্তু এখন খুলির ব্যাপক পরীক্ষায় নানা তারতম্য ধরা পড়েছে, যেমন কোনও কোনও নেআনডার্টালের থুতনি স্পষ্ট, কপাল অপেক্ষাকৃত খাড়া, আবার কারও বা সুস্পষ্ট ভ্রু-অস্থি এবং কিছুটা ঢালু কপাল। পরিসংখ্যান পদ্ধতি দিয়ে খুলির বিভিন্ন অংশের ভেদাভেদ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে দুই সীমার মধ্যে এই ভেদের ব্যাপ্তি বর্তমান মানুষের ভেদ-ব্যাপ্তির সঙ্গে অংশত মিশে যায়; অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যে খুঁজলে দু একটি নেআনডার্টাল বৈশিষ্ট্য এখনও দেখতে পাব, যদিও কারও মধ্যে সবগুলি লক্ষণ পাব না।

বংশকণিকার প্রভেদজাত এই বৈষম্য যত বেশী, তত বেশী ছোট ছোট

পরিবর্তনের ধাপে ধাপে ক্রমবিকাশের সুযোগ সম্ভাবনা, তাই প্রাক্তন ধারণা অনুসারে এক ছাঁচে ঢালা নেআনডার্টালরা অভিব্যক্তির অন্ধগলিতে ঢুকে মারা পড়েছে। নেআনডার্টাল ও ক্রোমানীয়দের মধ্যবর্তী তমসাবৃত ফাঁকটি এই পরিবর্তনের পথে ভরেছিল কিনা পরিসংখ্যান বিজ্ঞান এ যাবৎ তার স্পষ্ট জবাব দেয় নি, তবে এখন অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর সন্দেহ যে ঘটনার সূত্রটি তাই, অর্থাৎ অধিকাংশ নেআনডার্টাল গোষ্ঠী খাঁটি মানুষের জন্ম-দাতা। পৃথিবীর নানা অংশে এই ধারণার সমর্থনে ফসিলের সাক্ষ্যও কিছু আছে। আধুনিকের দিকে ক্রমিক অগ্রগতি সবচেয়ে স্পষ্ট পশ্চিম এশিয়ার কার্মেল গিরির ফসিলে, বিশেষত স্‌খুল গুহার খুলিতে। এরই ফলে কথা উঠেছিল যে তা নেআনডার্টাল ও ক্রোমানীয়দের যৌন মিশ্রণজাত হতে পারে, কিন্তু এই দু রকম মানুষ যে একই কালে বাস করেছে এ পর্যন্ত তার কোনও নজির নেই, সুতরাং মনে হয় এখানে নেআনডার্টালি ও আধুনিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রমবিকাশের যোগ আছে, যদিও সংখ্যাল্প কয়েক জন এখনও তা মানেন না। এশিয়ার পূব-দক্ষিণে অসট্রেলিয়ায় কিছু নবাবিষ্কৃত ফসিলে যবদ্বীপীয় সোলো মানবের খুলি ও অসট্রেলীয় আদিবাসী আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম ফসিলের মধ্যে যোগসূত্রের ইঙ্গিত আছে। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু রুক্ষমূর্তি খাঁটি মানুষের অস্থি আবিষ্কার হয়েছে যার বয়স ৪০,০০০ বছরের বেশী হতে পারে, এ দিকে সাম্প্রতিক গবেষণার নির্দেশ এই যে রোডীসীয় মানব হয়তো অনেক বেশী প্রাচীন, সুতরাং দুইয়ের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক সম্ভব; কয়েক জন নরবিজ্ঞানী সন্দেহ করেন যে নেআনডার্টালরা আফ্রিকাতেই প্রথম চৌকাঠ পেরিয়ে আধুনিক হয়েছে। পূর্ব য়োরোপে নবীনতম নেআনডার্টালরাও সেই দিকে কিছুটা অগ্রসর, তা ছাড়া উপর পার্টির একটি চোয়াল পাওয়া গিয়েছে যার চেহারা দুইয়ের মাঝামাঝি মনে হয়।

শুধু পশ্চিম য়োরোপের দৃশ্যটি বিসদৃশ, নেআনডার্টাল অস্থির এই উর্বর ক্ষেত্রে একাগ্র অনুসন্ধানের পরেও মধ্যবর্তী ফসিল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বরং সেখানে শেষের দিকে বিপরীত অভিব্যক্তির কিছু লক্ষণ দেখা যায়—মানুষগুলি যেন আরও বেঁটে খাটো, মোটাসোটা, তাদের ভ্রূ-অস্থি

যেন আরও প্রকট। কেউ কেউ বলেন চরম হিমের সঙ্গে লড়তে গিয়ে দেহ বদলেছে, কারণ গোলগাল খর্ব আকার এবং খাটো হাত পা ভিতরের তাপ খরচ করে কম। আবার সীমিত পরিধির মধ্যে বংশবৃদ্ধির ফলেও তা ঘটে থাকতে পারে। অনেকের মতে তুষার-প্রাচীর পূর্বাঞ্চলীয় জাতভাইদের সঙ্গে যোগাযোগে—সুতরাং বংশকণিকার মিশ্রণে—বাধা দিয়ে তাদের অভিব্যক্তির অন্ধগলিতে ফেলেছে। এখন অধিকাংশ (কিন্তু সব নয়) নৃতাত্ত্বিকের ধারণা পশ্চিম য়োরোপীয়রা নির্বংশ, এবং এই বিলোপের কারণ সম্বন্ধে রোগ, জলবায়ু ও আক্রমণ সংক্রান্ত সম্ভাবনার উল্লেখ হয়েছে। ঐ অঞ্চলের অতিশীতাক্রান্ত অংশে রোদের অভাবে অনেকে অবশ্য রিকেটস রোগে ভুগেছে, কিন্তু পশ্চিমে সর্বত্র প্রকৃতি অত নির্দয় ছিল না, সুতরাং এই রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে বলা যায় না। তুষার যুগের শেষে যখন তাপ বাড়তে লাগল তখন শীতে অভ্যস্ত পশ্চিম য়োরোপীয়রা তা সইতে পারল না এই প্রস্তাবও গ্রহণীয় নয়, কারণ তুষার যুগেও মাঝে মাঝে বেশ কিছু কাল শীতে ভাঁটা পড়েছে, তখন তারা মরে নি।

সম্প্রতি নেআনডার্টালদের বাক্ শক্তি সম্বন্ধে লিবারম্যান ও ক্লেলিনের গবেষণার পর আর এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাদের বাক্‌পটুতা আমাদের মাত্র ১০ শতাংশ গবেষণার এই সিদ্ধান্ত অনেকে না মানলেও এ বিষয়ে তারা ক্রোমানীয়দের পূর্ণ সমকক্ষ ছিল না হয়তো। নেআনডার্টাল ও আধুনিক খুলির আশ্চর্য পার্থক্যের বিচার প্রসঙ্গে আমরা ডেভিড পিলবিমের অভিমত লক্ষ্য করেছি যে খুলির আকৃতি পরিবর্তনের ফলেই পূর্ণ বাক্ শক্তি সম্ভব হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস যে হয়তো এক পশ্চিম য়োরোপ ছাড়া সর্বত্র নেআনডার্টালদের এই আধুনিক-অভিমুখী অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই দলীয়দের যুক্তি হল জীবন যুদ্ধের চরম সহায়ক এই বচন ক্ষমতা এক পরম সম্পদ, তাই প্রথম প্রকাশের পর তার বিকাশ ঘটল দ্রুত; সমষ্টির থেকে প্রকৃতি বাছাই করল বাক্যবাগীশদের, ছাঁটাই হল আনাড়ীরা। এই কারণে এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে নেআনডার্টাল থেকে আধুনিকে রূপান্তর। এই মতবাদীরা বলেন পশ্চিম য়োরোপে দৈহিক বিবর্তনে বাধা পড়ল, খুলির পরিবর্তন হল না, তাই সেখানে নেআনডার্টালদের বার্তা

বিনিময়ের ক্ষমতা গড়ে ওঠে নি, ফলে ক্রোমানীয়দের মুখোমুখি হয়ে তারা মস্ত অসুবিধায় পড়েছে, এই অসামর্থ্যই তাদের ধ্বংসের কারণ।

আদি ধারণা ছিল পশ্চিমে নেআনডার্টাল নাটকের শেষ দৃশ্যে পূব দিক থেকে দলে দলে এল এক নতুন মানুষ, উন্নত মানুষ, কোথায় কাদের থেকে তাদের উদ্ভব তা কেউ জানে না, তাদের চেহারা সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ধরন ধারন আলাদা, হাতে বিচিত্র ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র, তারা নিপুণতর শিকারী। গুহা ও শিলাশ্রয় বেদখল করল এই নবাগতরা, তুষারাবৃত মুক্ত প্রান্তরে শীত, উদর পূর্তি, রোগ ইত্যাদি সংকটে পড়ে জীবন সংগ্রামে, এমন কি হাতাহাতি যুদ্ধে (যদিও তার কোনও নজির নেই) হার মানল বেচারা নেআনডার্টাল মানব, প্রায় ৭০,০০০ বছর আধিপত্যের পর দেখতে দেখতে পৃথিবীর থেকে বিদায় নিল সে। আজকের অধিকাংশ নাট্যকাররা নবীনদের পরিচয় দেবে ভিনদেশী নেআনডার্টালদেরই বংশধর বলে, কেউ বা বলবে পশ্চিম দেশ জয় বা অধিকার করতে তাদের সবচেয়ে বড় সহায় ছিল বাক্‌ শক্তি। কিন্তু নেআনডার্টালদের অন্তিম পরিচ্ছেদ এখনও কুহেলীময়, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশে এই সন্ধি ক্ষণের ফসিল বা অন্য কোনও সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি—ভারতেও না, যদিও সেখানে প্রগল্‌ভ প্রকৃতি দিয়েছে অপর্যাপ্ত শিকার, দিয়েছে উষ্ণ জলবায়ু ঠিক যেমন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পছন্দ করেছে পুরামানবরা। সুতরাং নেআনডার্টালদের তিরোধান ও আধুনিকদের আবির্ভাব নিয়ে আবার নতুন পর্ব রচিত হতে পারে, প্রাগিতিহাসের মহাকাহিনীতে যেমন হয়েছে বারে বারে।

৮। সেরা মানুষ

পুরাপ্রস্তর যুগের অন্তিম পর্বে এ বার যে মানুষটি আমাদের সম্মুখীন সে আমাদেরই আদি সংস্করণ। নাম হোমো সেপিয়েনস সেপিয়েনস, ধাম সমগ্র বসুন্ধরা। প্রাণী জগতে অভিব্যক্তি থেমে থাকে না, কিন্তু এই মানুষটির আবির্ভাব থেকে এই ৪০,০০০ বছরে তার দৈহিক পরিবর্তন নগণ্য। প্রাচীনতর অনেক ফসিলের মত এই খাঁটি মানুষের প্রথম কংকালগুলিও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসের লেজেইজি গ্রামে। সেই কাহিনীর আগে তার এই অন্যতম প্রধান লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বিগত ১০০ বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসের দর্দনিয় অঞ্চলে যত পুরা-মানবের দেহাবশেষ ও ব্যবহৃত বস্তু আবিষ্কার হয়েছে আর কোনও সমপরিমাণ ভূখণ্ডে সম্ভবত তা হয় নি। পাহাড়ের নিচে নিচে কয়েকটি নদী বয়ে গিয়েছে, তাদের ধারা সৃষ্টি করেছে উপত্যকা, কোটি বছরেরও আগে সেখানে ছিল সমুদ্র, তখন অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণীর চুনাক্ত খোলক যুগ যুগ ধরে জমেছে বিশাল স্তূপে। স্থল যখন মাথা তুলল তারা দেখা দিল পাহাড় রূপে। তার পর এই নরম চুনাপাথরের সরু সরু রন্ধ্রে নদীর জল ঢুকে ক্রমশ তা ক্ষয় করেছে, সৃষ্টি হয়েছে গুহা গহ্বর শিলাশ্রয়, এখন পর্যটকের দল দেখতে আসে পাথরের দেয়ালে এই সব অন্ধকার গর্ত। প্রাগিতিহাসের নীরব সাক্ষী তারা, কারণ নেআনডার্টাল এবং প্রাচীনতর কাল থেকেই তুষার যুগের শীত এড়াতে মানুষ এ সব কক্ষ কন্দরে বাসা বানিয়েছে। ক্রোমানীয়রা হয়তো এখানে নেআনডার্টালদের ব্যবহৃত বস্তু পেয়েছে, পেয়ে কি ভেবেছে কে জানে।

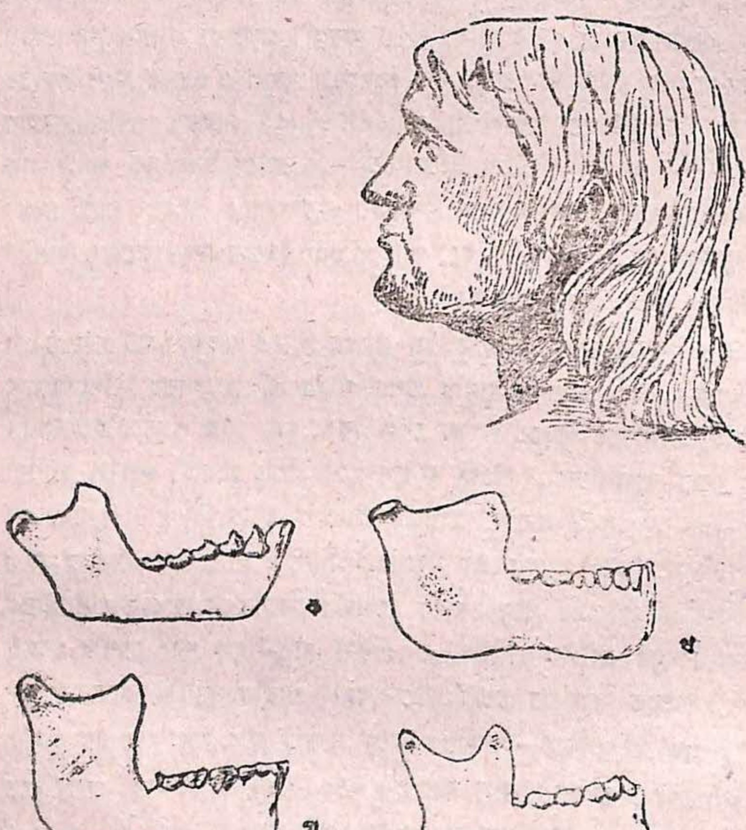
দর্দনিয় যে এত উর্বর ফসিল ক্ষেত্র তার বড় কারণ শীতে আরামপ্রদ এমন সব আশ্রয়ের প্রাচুর্য। উপরন্তু গ্রীষ্ম কালে এই অঞ্চল অপর্যাপ্ত বলগা হরিণ, ঘোড়া, বাইসন ইত্যাদির বিচরণ ভূমি, অনেক দক্ষিণমুখী গুহা গহ্বরে তারাও কনকনে উত্তরী হাওয়ার প্রকোপ থেকে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মাংস ছাড়া ভেজ্রের নদীতে ছিল মাছ। সুতরাং অন্যত্র দেশে দেশে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ঋতুচক্র অনুসারে শিকারের খোঁজে যাযাবর জীবন যাপন করলেও দর্দনিয়ের

ভাগ্যবানরা সম্ভবত বছরের অধিকাংশ পাকা বসবাস করতে পেরেছে। তাই আশ্চর্য নয় যে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষ যখন প্রথম লেজেইজির আশে-পাশে পাহাড় উপত্যকায় দেখা দেয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই বাসভূমি সে ছাড়ে নি। রোমীয় সেনা দল এখানে প্রাচীর তুলেছে, য়োরোপীয় মধ্য যুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গিরি গাত্রে দুর্গ অট্টালিকা গড়েছে, গুহা গহ্বরে গোলা বারুদ ও অন্যান্য মাল মজুদ করেছে, বহু শতাব্দী ধরে ডাকাতের দল গুপ্ত আশ্রয় পেয়েছে। আজ শান্তিপ্রিয় ফরাসী গৃহস্থরা এখানে শিলাশ্রয়ের খোপে মনোরম বাসা বানিয়েছে, তার পিছনের দেয়াল ও ছাতের অংশ প্রকৃতির সৃষ্টি। লেজেইজির প্রসিদ্ধতম হোটেলটিও এই দলের। প্রাগিতিহাসের অনেক সম্পদ এখনও দর্দইনে মাটির নিচে সুপ্ত রয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা অবৈজ্ঞানিকের আকস্মিক আবিষ্কারের অপেক্ষায়। আমরা পরে দেখব এক কুকুর খুঁজতে গিয়ে কি করে প্রায় ১৫,০০০ বছরের অন্ধকার থেকে আশ্চর্য সুন্দর চিত্র সম্ভার উদ্ধার হয়েছে।

১৮৬৮ সালে সেখানে লেজেইজি গ্রামের প্রান্তে পাহাড় কেটে রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। এক জায়গায় মাথার উপর পাথর এগিয়ে আশ্রয় সৃষ্টি করেছে, নিচে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রকাশ পেল কিছু হাড় আর পাথুরে হাতিয়ার। ডাক পড়ল বিজ্ঞানীদের। তাঁদের অনুসন্ধানে অন্তত চারটি কঙ্কাল পাওয়া গেল—এক মধ্যবয়সী পুরুষ, আরও অল্পবয়স্ক একটি কি দুটি পুরুষ, এক তরুণী ও দু তিন সপ্তাহের এক নবজাতক শিশু। প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে এই সমাধিস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল চকমকির অস্ত্র ও যন্ত্র, সামুদ্রিক শামুক ঝিনুক জাতীয় খোলক ও পশুর দাঁত—এই দুই শ্রেণীর বস্তুই ছিদ্রিত, সম্ভবত অলংকার তৈরির উদ্দেশ্যে। প্রাচীন স্থানীয় ভাষায় শিলা-শ্রয়টির নাম ক্রো-মানিয়ঁ—আক্ষরিক অর্থে 'বিরাট' বলে, ভিন্ন মতে এক স্থানীয় সন্ন্যাসী একদা সেখানে বাস করেছেন বলে। এই আবিষ্কার জার্মানিতে নেআনডার্টাল মানব উদঘাটনের মাত্র ১২ বছর পরে।

পরীক্ষায় অবিলম্বে মনে হল এই কঙ্কালগুলির গায়ে যখন রক্ত মাংস ছিল তখন মানুষগুলি দেখতে প্রায় পরীক্ষকদের মতই ছিল। পরে খ্রীষ্টীয় জগৎ যখন শুনল তারা কত প্রাচীন তখন সেটাই হল আশ্চর্য খবর, কারণ

পৃথিবী ও প্রাণী কুলের বয়স সম্বন্ধে তখন দৃষ্টি সীমিত ('মানুষের আগে' দ্রষ্টব্য), ২৫,০০০ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে এসেছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। এই সুদর্শন মানুষটি বিশ্রী নেআনডার্টাল মানবের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার প্রকৃত পরিচয়ে কেমন বাধার সৃষ্টি করল তা গত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তখন পুরামানব আর কিছু জানা ছিল না। নৃবিজ্ঞানীরা



১৭। ক্রোমানীয় মানব (উপরে) এবং চোয়াল ও চিবুকের ক্রমবিকাশ ; ক—শিমপানজি, খ—হাইডেলবার্গ মানব (ইরেকটাস), গ—নেআনডার্টাল মানুষ, ঘ—আধুনিক মানুষ।

অবাক হলেন যে ডারুইনের অভিব্যক্তি তত্ত্ব সত্য হলেও এই মানুষের মূর্তিতে বানর বনমানুষের আদল আদৌ নেই, নেই নেআনডার্টাল মানবের প্রকট ভ্রূ-অস্থি। এই বনমানবের কপাল ও চিবুক সুস্পষ্ট, বর্তমান য়োরোপীয়দের ভিড়েও তার প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি পড়বে। মাথা ঈষৎ বড় ছিল, হয়তো মগজও, কারও কারও ভ্রূ-অস্থি একটু বেশী উচ্চারিত, পুরুষদের গড় উচ্চতা এক মিটার ৭০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ হয়তো বর্তমান মাপের একটু কম। অস্থিগত সাদৃশ্য থেকে বিজ্ঞানীদের অনেকে বলেন বাইরের বৈশিষ্ট্যগুলিও একই রকম ছিল, যথা গায়ের রং ফর্সা, লোমের পরিমাণ সমান, এবং আজ পশ্চিম য়োরোপের নানা দেশের মানুষে যেটুকু পার্থক্য, য়োরোপীয়দের তুলনায় ঐ প্রাচীনদের প্রভেদ তার বেশী নয়। বর্তমান য়োরোপীয়রা অবশ্য এই ক্রোমানীয়দেরই বংশধর হতে পারে, কিন্তু তা প্রমাণসাধ্য নয়; আমরা জানি না তাদের ঠোঁট মোটা ছিল না পাতলা, চুল কোঁকড়ানো না সোজা, এমন কি বর্তমান মংগোলীয়দের মত সরু চোখ ছিল কিনা। শুধু অস্থি থেকে সম্পূর্ণ মূর্তিটি গড়ে তোলার বিপদ আগে আলোচিত হয়েছে।

পশ্চিম য়োরোপের এই সাচ্চা মানুষরা কোথা থেকে এল তা যে এখনও রহস্যময় তা আমরা আগে দেখেছি। অন্যত্র নেআনডার্টালদের থেকে আধুনিক মানুষের অভিব্যক্তির যেমন নজির পাওয়া যাচ্ছে এখানে তাও নেই, কারও কারও অনুমান তাদের আদি নিবাস পশ্চিম এশিয়ায়, হয়তো স্খুলবাসীদের কাছাকাছি অঞ্চলে। এখানে বলা দরকার যে সনাতন প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থে ক্রোমানীয় বলতে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসের এই আদি আধুনিক মানুষ বোঝালেও নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণত সারা পৃথিবীর প্রাথমিক খাঁটি মানুষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন। চেহারায় তারা সকলেই নেআনডার্টালদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমাদের অতি সন্নিকট। লেজেইজিতে এই মনের মত মানুষটির প্রথম কঙ্কালগুলি উদ্ধার হওয়ার পর থেকে তাকে বর্তমান য়োরোপীয়দের যোগ্য পূর্বপুরুষ মেনে অনুসন্ধানীদের নজর ছিল য়োরোপের নিকটবর্তী ক্ষেত্রের দিকে, সেখানে আবিষ্কার জমে উঠেছিল। কিন্তু পরে এই আদি আধুনিকরা দেখা দিল জগৎ জুড়ে—পূর্ব য়োরোপের হাংগেরি ও রাশিয়া, ছাড়িয়ে পশ্চিম এশিয়া, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বোর্নিও,

আফ্রিকার উত্তরে দক্ষিণে, আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায়, এমন কি উত্তরে মেরু দেশ পর্যন্ত। মানুষের ইতিহাসে এরাই প্রকৃত বিশ্বমানব। সর্বত্র এই খাঁটি মানুষদের দেহে সুনির্দিষ্ট চিবুক ও উন্নত কপাল ছাড়াও পূর্বগামীদের থেকে ভিন্ন কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রতীয়মান—বর্তমান মানুষের মত হাড় বেশী হালকা, দাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট এবং গলবিলে পূর্ণ বাক্‌পটুতার যোগ্য বিবর্তন।

অবশ্য ফসিলে কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়, অনেকের ধারণা আজকের তুলনায় তখন প্রকার ভেদ হয়তো বেশী ও স্পষ্টতর ছিল, কারণ চলাফেরা ও যোগাযোগ সহজ ছিল না বলে এত সংমিশ্রণ হয় নি। প্রথম দিকে কোনও কোনও পণ্ডিত এই সব পার্থক্যের উপর বর্তমান জাতিদের বিভিন্ন পিতামহ মূর্তি গড়বার লোভ সামলাতে পারলেন না, হাড়ের গায়ে মাংস চর্ম চুল পরিয়ে কতগুলি অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হল। যেমন দক্ষিণ ইটালির গ্রিমালডি গুহার ফসিল দুটির চোয়াল দেখে নিগ্রো সম্পর্ক এবং ফ্রানসের সংসলাদ অঞ্চলে প্রাপ্ত এক ব্যক্তির চওড়া গণ্ডাস্থি ও ভারী নিম্ন চোয়াল থেকে এসকিমো সম্পর্ক ধরে নেওয়া হয়েছিল। তখন অনেকে মনে করলেন যে য়োরোপের এই প্রতিবেশীদের বংশধররা এক দিকে আফ্রিকা, অন্য দিকে য়োরোপ অতিক্রম করে সাইবেরিয়া, সেখান থেকে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। পরে ভুল ধরা পড়ল যখন জানা গেল যে গ্রিমালডি মানবদের যে ভাবে গোর দেওয়া হয়েছে তাতে হাড় বিকৃত হয়েছে এবং উপরোক্ত এসকিমো বৈশিষ্ট্য আরও অনেক সম্প্রদায়ে দেখা যায়। আসলে নিগ্রো বা মংগোলীয়দের পূর্বপুরুষ গোষ্ঠী এখনও স্পষ্ট চেনা যায় নি।

কিন্তু দেশে দেশে ভেদাভেদ যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, যেমন চিবুক বা ভ্রূ-অস্থির স্পষ্টতা, মাথার আকৃতি ইত্যাদিতে। বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক তথ্যে বিশুদ্ধ জাতি বলে কিছু নেই, তিন চারটি আদি জাতির সংমিশ্রণে এখন মনুষ্য সমাজে নানা পার্থক্য দেখা যায়। তবে দেশ ভেদে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য স্পষ্ট ; য়োরোপ ও উত্তর ভারতে ককেশয়েড বিশেষত্ব, যথা ফর্সা রং সরু নাক, পাতলা ঠোঁট, সোজা বা ঢেউ-খেলানো চুল ; মধ্য এশিয়া, চীন, জাপানে এবং আমেরিকার রেড ইনডিয়ানদের মধ্যে মংগোলয়েড বৈশিষ্ট্য, যথা চ্যাপটা

মুখ, সরু চোখ ; আফ্রিকায় নিগ্রয়েড লক্ষণ—কালো রং, চ্যাপটা নাক, পুরু ঠোঁট, কালো চোখ, পাকানো চুল। অনুরূপ বিশেষত্ব অসট্রালয়েডদের (অসট্রেলীয় আদিবাসী, দক্ষিণ ভারতের ভেডয়েড উপজাতি) মধ্যেও প্রতীয়মান, যদিও নিগ্রয়েডদের সঙ্গে এই জাতির কোনও সম্পর্ক নেই, অনেকে বলেন তা প্রথমোক্ত তিন জাতির চেয়ে প্রাচীন।

বিশেষজ্ঞ কার্লটন কুন সমীচীন যুক্তি সহকারে বলেছেন যে জাতিগুলির অভিব্যক্তি হয়েছে অন্তত জাভা মানব কালে, হয়তো আরও আগে। নৃবিজ্ঞানী-দের সাধারণ বিশ্বাস যে তা না হলেও ক্রোমানীয়দের প্রথম দিকেই নিশ্চয় মানুষের জাতি ভেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন বংশকণিকার পুঁজিও বাড়ল, ফলে বৈচিত্র্য বিকাশের সুযোগ আরও খুলল। জাতি বিভাগের প্রধান কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু, তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে মানুষ (যেমন অন্যান্য প্রাণী) বিভিন্ন ছাঁচে ঢালাই হয়েছে, ডারুইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনেই প্রজাতি সৃষ্টির মত প্রজাতির মধ্যে জাতির সৃষ্টি। বিভিন্ন অবস্থায় যে যে বংশকণিকা বাঁচতে সাহায্য করে তারা প্রশ্রয় পায়, অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি আছে সে বংশবৃদ্ধি করে, অন্যদের ভাগ্য বিপরীত, তারা ক্রমশ ছাঁটাই হয়। এ ভাবে বংশ-পরম্পরায় পরিবেশের অনুকূল বংশকণিকা জমে উঠে স্থানে স্থানে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মূর্তিগুলি গড়ে উঠেছে। গ্রীষ্ম দেশে সূর্য প্রখর, নিগ্রোর কালো রং ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মিকে বাধা দেয়, এই মেলানিন রং সৃষ্টির উপযুক্ত বংশকণিকা আছে তার দেহকোষে ; য়োরোপীয়দের ত্বকে মেলানিনের অভাব বলে বেশী রোদ পোহালে চামড়া খসে পড়ে, কর্কট রোগও দেখা দিতে পারে। আফ্রিকীদের মাথায় ঘন পাকানো চুলও সূর্যের বিরুদ্ধে বাধা। পৃথিবীর উত্তরাংশে মংগোলয়েড অঞ্চলে শীত বেশী, সেখানে বরফে প্রতি-ফলিত ধাঁধানো আলোর থেকে চোখ বাঁচাতে আছে তার উপরে চামড়ার ভাঁজ যাতে চোখ সরু হয়ে খোলে, চ্যাপটা নাক ও উঁচু গণ্ডাস্থি ঠাণ্ডা থেকে বাঁচায়, গোলগাল খাটো দেহ তাপ সংরক্ষণে সহায়ক। পক্ষান্তরে লম্বা পাতলা নিগ্রো দেহ সহজে তাপমুক্ত হয়ে জুড়াবার উপযুক্ত।

আদি আধুনিকদের সুগঠিত সুদর্শন দেহের সঙ্গে মিল রেখে মনে ও

বুদ্ধিতে প্রগতির নানা নিদর্শন দেখা যায়। মস্তিষ্কের পরিমাণে নেআনডার্টালরা এদের থেকে খুব খাটো ছিল না, কিন্তু এই নতুন মানুষে মগজের গুণগত সম্ভাবনা প্রথম বর্তমানের সমকক্ষ হল। কথা ব্যবহারের উপযুক্ত মানসিক ও দৈহিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে মুখে যে আমাদেরই মত বাক্‌স্ফূর্তি হয়েছে তা প্রায় সকলেই মানেন। লিবারম্যান ও ক্রেলিন ক্রোমানীয় গলা ও নাকের রন্ধ্রের বিন্যাস, দীর্ঘতর গলবিল এবং জিভের নমনীয়তা পরীক্ষা করে মনে করেন প্রাচীন মানুষের তুলনায় এদের শব্দ গঠন ও উচ্চারণ ছিল আরও ব্যাপক ও দ্রুত। অবশ্য এই লাভের পরিবর্তে আধুনিক মানুষকে এক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—তার গলবিল খাদ্যনালিরও কাজ করে বলে প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র সেই গলায় খাদ্য আটকে মরতে পারে।

নানা স্থানে নানা ক্ষেত্রে আদি আধুনিকরা আপন উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। যদিও আরও প্রায় ৫০,০০০ বছর তারা পাথর হাড় কাঠ ইত্যাদি থেকেই যন্ত্রপাতি বানিয়েছে, সম্ভবত উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার পর আজকের জটিল সমাজে মানিয়ে নিতে অপারগ হত না। মানুষ তখনও চাষ ও পশুপালন করে নিজের খাদ্য ব্যবস্থার নিয়মন শেখে নি, তখনও সে অনেকটা সন্ধানী যাযাবর, উদর পূর্তির তাগিদে ছড়িয়েছে দূরে দূরান্তরে, গিয়েছে যেখানে পুরোগামীদের পা পড়ে নি। নব নব উন্নত অস্ত্র বানিয়ে কৌশল ও কুশলতার জোরে নূতন বা পুরাতন দেশে, কোথাও কোথাও কঠিন নির্দয় পরিবেশে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

আমেরিকা মহাদেশের সব দিক ঘিরে সাগর, তার উত্তর-পশ্চিম কোণ প্রাচীন জগতের নিকটতম, কিন্তু সেখানেও সাইবেরিয়ার পূবে ৯০ কিলোমিটার চওড়া বেরিং প্রণালী। সুতরাং বহু বছর ধরে ধারণা ছিল যে তুষার যুগ শেষ হওয়ার পরে মানুষ যখন অন্যত্র জলযান বানাতে শিখেছে তখন পর্যন্ত, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১০,০০০-১২,০০০ বছর আগেও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই বিশাল ভূখণ্ড ছিল জনমানবহীন। এই বিশ্বাসে প্রথম ঘা দিল ১৯২৬ সালের এক আকস্মিক আবিষ্কার। নিউ মেক্সিকো রাষ্ট্রের ফল্‌সম নামক জায়গায় এক নিগ্রো পশুপালক হারানো গরু খুঁজে বেড়াচ্ছিল, পুরাতত্ত্ব জানত

না সে, কিন্তু তার ছিল নজর ও কৌতূহল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ঢালু পাড়ে উপর থেকে প্রায় সাড়ে ছয় মিটার নিচে মাটিতে গেঁথে আছে লম্বা লম্বা হাড় এবং পাথরের তৈরি তীরের ফলা। অধিকাংশ পণ্ডিত এই আবিষ্কারের তাৎপর্য সহজে মানলেন না, কিন্তু পরীক্ষায় যখন দেখা গেল হাড়গুলি বাইসনের যারা বরফ সরে যাওয়ার সঙ্গে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে লোপ পেয়েছে এবং একটি তীরের ফলা দুই পাঁজরার হাড়ের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, তখন সন্দেহ দূর হল। ঐ রাষ্ট্রের আর একটি ঘাঁটি ক্লোভিস, সেখানে ১৯৩২ সালে লুপ্ত জন্তুর হাড় ও পাথুরে ফলা পাওয়া যায়, তেজী কারবন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর ১৯৪০ দশকে ফল্‌সম ও ক্লোভিস কৃষ্টির বয়স নির্ণীত হয়েছে যথাক্রমে ১১,০০০ ও ১২,০০০ বছর। নিউ মেক্সিকো আমেরিকার উত্তর সীমার অনেকটা দক্ষিণে, সুতরাং অনুমান হল যে আগন্তুকরা সাইবেরিয়া ত্যাগ করেছে প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে।

তখনও সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকা হিমানীমণ্ডিত, কিন্তু তুষার যুগের অন্ত্য পর্বে কিছু কাল পর পর শীতের জোয়ার ভাঁটা এসেছে, ঠাণ্ডা যখন বেড়েছে তখন বাতাসের জলীয় বাষ্প বরফ হয়ে জমেছে পাহাড়ে ও সমতল ক্ষেত্রে, ফলে সমুদ্র নেমে গিয়ে স্থানে স্থানে স্থল দেখা দিয়েছে। বেরিং প্রণালীর জল সরে গিয়ে ১৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া দেশ মাথা তুলেছিল, ভূবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন বেরিন্‌জিয়া। প্রথমে হয়তো চীন থেকে সাইবেরিয়ায় পেঁছে, শিকারের সুযোগ অনুসরণ করে নবমানবরা পায়ে হেঁটে এই সেতু পার হল। তার পর ক্রমশ বর্তমান অ্যালাস্‌কা অতিক্রম করে তারা এগিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত।

এই ধারণা আজও প্রচলিত, তবে নতুন আবিষ্কারে আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশের তারিখ পিছিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার অদূরে সান্‌টা রোজা দ্বীপে লুপ্ত ম্যামথের ফাটানো ও পোড়া হাড় এবং উত্তর ক্যানাডার য়ুকন অঞ্চলে প্রাপ্ত বলগা হরিণ অস্থির তৈরি চাঁছনির তেজী কারবন-নির্ধারিত বয়স যথাক্রমে ২৯,০০০ ও ২৭,০০০ বছর। হাড় পুড়ে থাকতে পারে প্রাকৃতিক দাবানলে, চাঁছনির অস্থি প্রাচীন হলেও হয়তো তার উপর কারিগরি হয়েছে অনেক পরে, এই ধরনের সন্দেহ সত্ত্বেও ক্রমে বিজ্ঞানীরা ভাবতে আরম্ভ করলেন

যে ২৫,০০০ বছরেরও আগে আমেরিকায় মানুষের পদার্পণ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে উৎসাহ জাগাল এক খুলির উপরাংশ, ১৯৩৬ সালে ক্যালিফর্নিয়ায় লস এন্জেলিস শহরের কাছে নর্দমা খুঁড়তে খুঁড়তে তা উন্মুক্ত হয়, তার পর বহু বছর যাদুঘরে পড়ে থাকে, কারণ তেজী কারবন মাপতে গেলে ফসিলের প্রায় সবটাই খরচ হয়ে যেত। পরে মার্কিন গবেষণাগারে এক নতুন পদ্ধতির উদভাবন হল, মৃত্যুর পর প্রাণী দেহের স্বাভাবিক বামমুখী অ্যামিনো অ্যাসিড ক্রমশ দক্ষিণমুখীতে রূপান্তরিত হয়ে দুটির পরিমাণে সমতা আসে, সুতরাং এদের অনুপাত মেপে মৃত্যুর তারিখ জানা সম্ভব। এই উপায়ে ১৯৭১ সালে ফসিলটির বয়স জানা গেল অন্তত ২৩,৬০০ বছর, হয়তো আরও বেশী।

এই প্রাচীনতা বিশেষজ্ঞরা অনেকটা অনাগ্রহে মেনেছেন, কারণ অস্থিটি এত কাল পরীক্ষার অপেক্ষায় পড়ে ছিল, তা ছাড়া এই পদ্ধতির দোষ হল পরীক্ষার বস্তুটি তার অতীত ইতিহাসে কতটা তাপ সয়েছে তার উপর ফলাফল নির্ভর করে। এমন দাবিও করা হয়েছে যে এই পদ্ধতি অনুসারে ফসিলটির বয়স অন্যূন ৪৮,০০০ বছর, কিন্তু তখন বেরিনজিয়া জলমগ্ন ছিল; প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে আবার সেখানে স্থলের সেতু ছিল, সুতরাং জল্পনা হল হয়তো সেই সময়ে, অর্থাৎ নেআনডার্টাল কালে, আমেরিকায় মানুষের প্রথম প্রবেশ। লুই লীকি এবং সহকর্মীরা দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় ক্যালিকো গিরির পাদদেশে দেড় শতাধিক বস্তু পেয়েছেন যা তাঁরা মানুষের তৈরি বলে মনে করেন; লীকি বললেন সেগুলির বয়স ৩৫,০০০ থেকে এক লাখ বছরের মধ্যে, সম্ভবত ৬০,০০০-৮০,০০০ বছর, অর্থাৎ তারা নেআনডার্টাল আমলের। এই ধরনের দাবি আরও আছে, সন্দিহানরা বলেন বস্তুগুলি আসলে প্রাকৃতিক, তাতে মানুষের হাত নেই। সন্দেহের আরও এক কারণ এ যাবৎ আমেরিকায় প্রাপ্ত সব মানবিক ফসিলে খাঁটি মানুষের ছাপ।

সুতরাং ধরে নিতে হয় যে মানুষ ঐ মহাদেশে ঢুকেছে মোটামুটি ৪০,০০০ থেকে ২৫,০০০ বছর আগে, এর মধ্যে সম্ভবত ৩৬,০০০ থেকে ৩২,০০০ এবং পরে ২৮,০০০ থেকে ১৩,০০০ বছর আগের দুই ফাঁকে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পায়ে চলার পথ খোলা ছিল এবং তখন স্থলবন্দী জল

বেড়ে উত্তর আমেরিকার অনেকটা গভীর বরফে ঢেকে গিয়েছিল। প্রাচীনতর কালাংশই এখন বেশী গ্রহণীয় মনে হয়, কারণ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা অংশে শিলা খন্ড পাওয়া গিয়েছে যা রুক্ষ চাঁছনি, কাটারি ইত্যাদি হতে পারে, তাদের কিছু কিছু ৩৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ বছর প্রাচীন। তা হলে পৃথিবীর মঞ্চে আবির্ভাবের অল্প পরেই নবমানব মেরুর কঠিন শীত জয় করে সাইবেরিয়া থেকে অ্যালাসকায় ঢুকেছে, সেখান থেকে বরফের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে অল্প কয়েক হাজার বছরে মহাদেশের অন্তরস্থলে পেঁছেছে।

কিন্তু খাঁটি মানুষ অকস্মাৎ য়োরোপে দেখা দিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণে আফ্রিকায় ও পুবে এশিয়ায় ছড়িয়েছে এবং বেরিং স্থল-সেতু পেরিয়ে আমেরিকায় প্রবেশে করেছে এই প্রচলিত ধারণায় আঘাত হেনেছেন মার্কিন নৃবিজ্ঞানী জেফ্রি গুডম্যান। ১৯৮০ সালে এক বইতে তিনি বলেন ঘটনার গতি আসলে এর ঠিক বিপরীত হতে পারে; অনূ্যন ৫০,০০০ বছর আগেও আধুনিক মানুষ আমেরিকায় ছিল, প্রাবাদিক ইডেন কানন সম্ভবত দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায়, সেখান থেকে তাদের শিল্প ও সংস্কৃতির সম্পদ সঙ্গে নিয়ে হয়তো তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এই প্রকল্পের সমর্থনে গুডম্যান বলেন প্রত্নতাত্ত্বিক নজির অনুসারে ৩৮,০০০ বছরেরও আগে আমেরিকা মহাদেশে পাথুরে অস্ত্র তৈরি হয়েছে, তা ছাড়া রেড ইনডিয়ান ও ক্রোমানীয়দের আচার অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে এই তত্ত্ব অসম্ভব না হলেও আরও প্রমাণসাপেক্ষ। প্রাচীন জগতে পশ্চিম এশিয়ায় কৃষির সূচনা দিয়ে নবপ্রস্তর যুগের উদয় আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে, নবীন জগতে চাষের আদিতম নিদর্শন দেখা যায় অন্তত ১০০০ বছর পরে মেকসিকো ও পেরুতে, উত্তর আমেরিকা বা বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক দেরিতে।

খাঁটি মানুষের আগে অসট্রেলিয়াও জনশূন্য ছিল, সেই সাগর-পরিবৃত মহাদ্বীপেও যে অবিলম্বে তারা উপনিবেশ গড়েছিল তার কিছু চিহ্ন আছে। কিন্তু কি করে যে অভিযাত্রীরা জল পার হল তা এখনও এক হেঁয়ালি। তুষার যুগে সমুদ্র ১২০ মিটার পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল, ফলে বড় বড় দ্বীপ বোর্নিও, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ পরস্পর যুক্ত হল, অনেক নতুন দ্বীপও

দেখা দিল, তবু অসট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে প্রায় ১০০ কিলোমিটার প্রশস্ত সমুদ্র থেকে গেল, তা ৮০০০ মিটার পর্যন্ত গভীর। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অনেক দিন ধরে ধারণা ছিল যে বর্তমান অসট্রেলীয় আদিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এশিয়ার থেকে এসেছিল মাত্র ১০ সহস্রক আগে, সিন্ধুগামী জলপোত বানাতে শিখে। কিন্তু ১৯৩০ দশক থেকে প্রাচীনতর নজির দেখা দিতে লাগল, মেলবোর্ন শহরের কাছে ৩১,০০০ বছর আগে তৈরি হাতিয়ার আবিষ্কারের খবর শোনা গেল ১৯৬৭ সালে এবং পরের বছর নিউ সাউথ ওএল্স প্রদেশে মুংগো হ্রদের কাছে খুঁড়ে প্রকাশ পেল ৩২,০০০ বছর প্রাচীন এক নারী কঙ্কাল এবং কিছু নির্মিত বস্তু। বর্তমান নজির অনুসারে মানুষ এর অনেক পরে নৌকা ব্যবহার করেছে।

সুতরাং অনুমান করা হয় ৩০,০০০ বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোনও রকম জলযান বানানো হয়েছিল। হয়তো স্থলের অদূরে মাছ ধরবার জন্য বাঁশ আর খাগড়ার তৈরি ভেলা, অথবা ঐ অঞ্চলের মেলানেশীয় দ্বীপ-বাসীরা গাছের গুঁড়ি খুবলে যে শালতি বানায় তাই। কিন্তু এই সব হালকা যানে যাত্রীরা কি করে কালাপানি পাড়ি দিল সেটাই আশ্চর্য। বেসামাল স্রোত কি তাদের দূরে টেনে নিয়েছে? এক কষ্টকল্পনা অনুসারে তুফান-জনিত প্রচণ্ড তরঙ্গের মুখে তারা অসহায় ভাবে ভেসে গিয়েছে; ভূমিকম্প থেকে এমন ঢেউ দেখা দিতে পারে, ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও যবদ্বীপের অন্তর্বর্তী ক্রাকাটোআর আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণে যখন ৩৬,০০০ লোক মারা যায় তখন সমুদ্রে এমনি মাতাল ঝড় উঠেছিল। আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ প্রথম অসট্রেলিয়ায় গিয়েছে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে না। আদি অসট্রেলীয়দের এই রহস্য আরও ঘনিয়ে ওঠে যখন দাবি শোনা যায় যে আমেরিকার মত এই মহাদেশেও আরও অনেক আগে মনুষ্য সমাগম হয়েছে। ১৯৭৮ সালের খবরে প্রকাশ যে পশ্চিম অঞ্চলে মুর্চিসন নদী তীরে চার জায়গায় দুই অসট্রেলীয় বিজ্ঞানী ত্রিশের বেশী পাথুরে হাতিয়ার উদ্ধার করেছেন, তাঁদের মতে সেগুলি লক্ষ বৎসরাধিক প্রাচীন। এই 'হাতিয়ারে' সত্যিই মানুষের হাত আছে কিনা সেই সাবেক প্রশ্ন এখানেও সমীচীন।

অসট্রেলিয়া থেকে পৃথিবীর প্রায় বিপরীত মাথায় উত্তর মেরু অঞ্চলের

সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিমণ্ডলেও নবমানব উপনিবেশ গড়েছিল। সেখানে প্রকৃতি কঠিন ও প্রতিকূল, চরম শীতে এক মিটার নিচে মাটি সারা বছর জমে কঠিন, তার ভিতর শিকড় পথ পায় না, কিন্তু উপরের স্তরে গজায় ঘাস আর ছোট গাছপালা, তা মানুষের অখাদ্য হলেও পরিযায়ী পশুদের পরম লোভনীয়। সুতরাং মানুষ প্রায় কেবল আমিষ খাদ্যের উপর নির্ভর করে পরোক্ষে সদ্ব্যবহার করেছে অনাহার্য উদ্ভিদের। নিরামিষ খাদ্যের অভাব মেটাতে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিচরণরত বড় বড় পশু শিকার করেছে, তা সম্ভব হয়েছে প্রখর বুদ্ধি ও উন্নত অস্ত্রের সাহায্যে। তাই উত্তর মেরু অঞ্চলের বিরুদ্ধ নির্দয় জগতেও ঘাঁটি বানিয়েছে, বংশবৃদ্ধি করেছে সে।

পশ্চিম য়োরোপে প্রকাণ্ড তৃণভোজী জন্তুরা দলে দলে চরে বেড়াত, শিকারীরা ওত পেতে থেকেছে পরিযায়ী বলগা হরিণের পথে, যেমন উত্তর জার্মেনিতে, ম্যামথ ঘায়েল করেছে রাশিয়া বা চেকোসলোভাকিয়ায়। মাংস ছাড়াও এই অতিকায় পশুর দেহাংশ নানা কাজে লাগিয়েছে মানুষ, যেমন লোমশ চামড়া দিয়ে পোশাক বা তাঁবু, লম্বা দাঁত ব্যবহার হয়েছে তাঁবুর কাঠামো বানাতে, তার প্রান্ত মাটিতে চাপা দিতে এবং আমরা দেখব এমন কি আগুন জ্বালতে। চর্বি দিয়ে দীপ জ্বালা হয়েছে। রোমশ ম্যামথ য়োরোপ ছাড়া এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাতেও ছিল প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগের থেকে।

সাইবেরিয়ার পশ্চিমে ইয়েনিসাই নদীর অববাহিকা থেকে পূবে কাম্‌চাট্‌কা পর্যন্ত এলাকায় সোভিয়েট প্রত্নবিজ্ঞানীরা গোটা ১৫ জায়গায় মানব বসতির নানা চিহ্ন উদ্ধার করেছেন, সেগুলি সম্ভবত ৩০,০০০ বছর প্রাচীন। সাইবেরিয়ার শীত আজ প্রসিদ্ধ, কিন্তু তখন এই ঋতু আরও দীর্ঘ আরও হিমশীতল ছিল, উন্মুক্ত তৃণপ্রান্তর জুড়ে দিকদিগন্তে ধাবমান কনকনে হাওয়ার পথে বড় গাছপালার বাধা প্রায় ছিল না। এরই মধ্যে শিকারীর দল যে স্থান করে নিয়েছিল তার প্রমাণ তাদের বসতির আশেপাশে বলগা হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ, বুনো ঘোড়া, ম্যামথ ও বাইসনের সুউচ্চ অস্থি-স্তূপ, তাদের মধ্যে কদাচিৎ কখনও ভালুক ও সিংহের হাড়। এ ছাড়া শেয়াল ও নেকড়ের হাড়ও দেখা যায়, তারাও তার পেটে গিয়ে থাকতে পারে, তবে

সম্ভবত সবিশেষ নজরটা ছিল তাদের মোটা গরম চামড়ার দিকে—তা দিয়ে পোশাক বানিয়ে পরতে ভারি আরাম।

কয়েকটি ঘাঁটির আবর্জনায় পাখি ও মাছের হাড়ও ছিল। শীত কালে নদীগুলি পুরু বরফে ঢাকা পড়ত, সুতরাং সম্ভবত মাছ শিকার ছিল গ্রীষ্মের কাজ। পাখি প্রধানত টার্মিগান, তা মাটিতে থাকে ও ধীরে ওড়ে বলে ধরা অনেকটা সহজ। ম্যামথ দাঁতের তৈরি উড়ন্ত বুনো হাঁসের ছোট মূর্তি অনেক পাওয়া যায়। কোনও কোনও নৃবিজ্ঞানী বলেন সাইবেরীয়রা মাঝে মাঝে জলের পাখিও শিকার করেছে, হয়তো বলাকার দিকে কিছু ছুঁড়ে মেরে অথবা ফাঁদ পেতে, যেমন এখন এসকিমো সম্প্রদায়ে দেখা যায়। আবহাওয়ার চরম দুর্যোগে তারা চামড়ার তৈরি আবাসের আরামে আশ্রয় নিয়েছে, তার পাথরের ভিটে মাটির নিচে প্রায় ৭৫ সেনটিমিটার গভীরে পর্যন্ত গাঁথা।

রাশিয়ার ইউক্রেইন অঞ্চলের একই রকম কঠিন পরিবেশেও অধিবাসীরা এই ধরনের আরও বড় বড় বাড়ি বানিয়েছিল, তা ১৫ থেকে ২০ জনের বাসযোগ্য। নানা চিহ্ন থেকে তাদের জীবন চিত্রটি অনেকটা ফুটে উঠেছে। মেঝের পিছনে হিমশীতল ভাঁড়ারে অনেক দিনের মত মাংস মজুদ থাকত, তার কিছুটা ঠাণ্ডায় জমাট, কিছু রোদে বা ধোঁয়ায় শুকানো। ঘরের ভিতর চক্রাকারে আগুন জেবলে নিবিড় আরামের আওতায় বাসিন্দারা দীর্ঘ শীতের দিন কাটাত নানা কাজে গল্পে—হাড় কেটে চেঁছে যন্ত্র বা অলংকার গড়া, বন্ধুদের সঙ্গে শিকারের উপকথা কথন, ছোটদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

কেউ মারা গেলে তাকে সস্নেহে সযত্নে কবর দেওয়া হত, বাইকাল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে মাল্টা ঘাঁটির এক সমাধি ক্ষেত্রে চার বছর বয়স্ক একটি বালিকার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, গজদন্তের তৈরি নানা আভরণে সজ্জিত ছিল সে, মাথা ঘিরে শিরসাজ, হাতে বালা, গলায় ১২০ ছিদ্রিত দানা দিয়ে গড়া হার। যারা তাকে ভালবাসত তারা কাছাকাছি রেখেছে হাড় ও পাথরের নানা উপহার। এখানে অধিবাসীরা রেখে গিয়েছে মেরু শেয়াল, হরিণ, পশমী গণ্ডার এবং কিছু ম্যামথের হাড়, তা ছাড়া পাথর-পাত ও হাড়ের বিবিধ হাতিয়ার, তার অনেকগুলি খোদাই করা। ম্যামথের দাঁত খোদাই করে এরা গড়েছে উদ্ভট স্ত্রী মূর্তি (এদের তাৎপর্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে), পাখি ইত্যাদি।

অন্যান্য শীতার্ত অঞ্চলেও নবমানবের বাস ছিল, যথা মস্কো শহরের প্রায় ২১০ কিলোমিটার উত্তরে সুংগির ঘাঁটিতে পৃথিবীর তৎকালীন তুষার মুকুটের সীমা ঘেঁষে। সেখানে রুশ অধ্যাপক ও. বাডার এবং তাঁর সহকর্মীরা বেশ কিছু ফসিল আবিষ্কার করেন। অস্থিগুলি অন্তত ২৩,০০০ বছর প্রাচীন, বাডার বলেন প্রায় ৩০,০০০ বছর। প্রথমে ১৯৬৪ সালে উদ্ধার হল এক পুরুষের কঙ্কাল, তার আনুমানিক বয়স ছিল ৫৫-৬৫, অর্থাৎ সে কালের আয়ু অনুসারে বেশ বৃদ্ধ। মনে হয় সাড়ম্বর অনুষ্ঠান সহযোগে কবরখানার মত এক জায়গায় সুসজ্জিত দেহটি সমাধিস্থ করা হয়েছিল, মাথা ঘিরে ম্যামথ এবং মেরুবাসী শেয়ালের দাঁতে খোদাই করে গড়া এক শিরসাজ, সারা দেহ জুড়ে প্রায় ৩৫০০ ম্যামথ অস্থির ছিদ্রিত দানা ; দেখে বোঝা যায় সেগুলি পোশাকের সঙ্গে সেলাই করা ছিল, আবিষ্কর্তারা সেই পরিধান পুনর্গঠন করে বর্তমান সুমেরু-আঞ্চলিক আদিবাসীদের বেশভূষার সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ১৯৬৯ সালে লাল গেরিমাটির ক্ষীণ চিহ্ন অনুসরণ করে এই অনুসন্ধানকারীরা আর একটি অগভীর কবর আবিষ্কার করেন। সেখানে প্রায় আট এবং ১২-১৩ বছরের দুটি বালকের কঙ্কাল মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে শায়িত, তাতে সংলগ্ন প্রচুর ম্যামথ হাড়ের দানা, বাডার অনুমান করেন সেগুলিও সেলাই করা ছিল লোমশ চামড়ার চমৎকার আঁটো পোশাকের সঙ্গে—জামা, পাজামা ও তার সঙ্গে সেলাই করে জোড়া জুতো এই নিয়ে সম্পূর্ণ দেহাবরণ। দুটি ছেলেরই বুকের উপর একটি করে হাড়ের পিন পড়ে আছে, সম্ভবত তা দিয়ে জামা আটকানো হত। মাথায় হাড়ের দানা ও শেয়ালের দাঁতে সজ্জিত টুপি, কবজিতে হাড়ের বালা, আঙুলে হাড়ের আংটি। পুরাপ্রস্তর কবরে এই নাকি প্রথম আংটি দেখা গেল। আর একটি নতুন বস্তু ম্যামথ দাঁতের তৈরি একেবারে সোজা সুন্দর দুটি বর্শা, যদিও সেগুলি দু মিটার ৪২ সেনটিমিটার লম্বা, সুতরাং এই প্রকাণ্ড বাঁকা দাঁত সোজা করবার কৌশলটি সেই প্রাচীন কালেও জানা ছিল। এ ছাড়া এই কবরে পাওয়া গিয়েছে একই বস্তুর ছোরা, আর ছিল সে কালের রহস্যময় এক উপকরণ, নৃতাত্ত্বিকরা তার নাম দিয়েছেন আদেশদণ্ড, কর্তৃত্বের প্রতীক সন্দেহ করে। এই দণ্ড সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

মসকোর প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূবে কস্‌টেংকি নামক স্থানে ২০,০০০ বছর প্রাচীন এক বৃহৎ ঘাঁটিতে নানা আবিষ্কার হয়েছে। এখানে শিকারীরা অসংখ্য জন্তু মেরেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি ম্যামথ, তাদের মাংস খেয়ে, চামড়া দিয়ে পোশাক ও ঘর বানিয়ে দাঁত, হাড় ও শিং দিয়ে তারা বানিয়েছে নানা অস্ত্র যন্ত্র সূচ অলংকার, ছোট ছোট মূর্তি, এমন কি আগুন জ্বালানি। তাদের ছিল আধা-যাযাবর জীবন, শীতের ইশারা পেলে ডন নদীর কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়ে তারা ঘর বানাত, এই উপত্যকায় প্রবল কনকনে হাওয়ার তেজ কম বলে। কয়েকটি খুঁটি কাত করে বসিয়ে তাদের মাথাগুলি চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা হত, অল্প দূরে দূরে এই রকম গোটা তিনেক কাঠামো বানিয়ে সবগুলি জুড়ে বৃহৎ পশুদের চামড়া ছড়িয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তৈরি হত লম্বা ঘর, তার ভিতর সারা শীতটা কাটত সম্ভবত সম্পর্কিত কয়েকটি পরিবারের। দীর্ঘ কাল পর বসন্তের সূচনায় দলটি নদীর উপকূল ছেড়ে চলে আসত উচ্চভূমিতে, সেখানে তখন মাঠভরা ঘাস ও ঝোপ-ঝাড়ের লোভে দেখা দেয় পালে পালে ঘোড়া, বাইসন মোষ, বলগা হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ ইত্যাদি। দিগন্ত পর্যন্ত প্রায় খোলা বলে শিকার সন্ধান সহজ। সংক্ষিপ্ত উষ্ণতর ঋতুতে অনেক কাজ, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সশস্ত্র শিকারীরা শীতের রসদ অতিরিক্ত মাংস সংগ্রহে ব্যস্ত। মাংস কাটার পর পশুর ছাল মাটিতে ছড়িয়ে মেয়েরা তার ভিতরটা চেঁছে পরিষ্কার করছে, তার পর হয়তো ধোঁয়া খাইয়ে তা সঞ্চয় করে রাখছে। কিছু চামড়া দিয়ে ছোট ছোট অস্থায়ী তাঁবু তৈরি হয়েছে, এগুলি হাওয়ার আড়াল ছাড়া বেশী কিছু নয়, শিকারের খোঁজে অন্যত্র যাওয়ার সময়ে মুড়ে সঙ্গে নেওয়া চলে। তাঁবুর খুঁটির মাথার সঙ্গে চামড়ার দড়ি বাঁধা, তাতে সরু সরু মাংস খণ্ড ঝুলছে। শুকিয়ে গেলে এরও অংশ শীতের জন্য তুলে রাখা হবে।

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল গ্রীষ্ম, কসটেংকির দলটি আবার ফিরে এল ডন নদীর কাছে তাদের সাবেক বাসায়, কয়েক বছর ধরে এখানেই তারা শীত কাটিয়েছে। অকটোবরের প্রথমেই তখন মাটি ইতস্তত পালকের মত হালকা বরফের ছোঁয়ায় সাদা, ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় ফাটাফুটো। মেয়েরা বস্তা খুলে চামড়া বার করল, তা কেটে তালি সেলাই করে দেবে। জোয়ান

পুরুষরা ভারী ম্যামথ দাঁত ও হাড় নিয়ে ঘরের চার পাশে চামড়ার দেয়ালে চাপা দিল মাটির সঙ্গে শক্ত করে আটকাতে। ভিটের সামনে কেউ মাটি খুঁড়ে গর্ত করছে, সেখানে জমা থাকবে মাংস, হাড় ও বাছা বাছা ম্যামথ দন্ত যা দিয়ে দীর্ঘ শীতের অবসরে সূক্ষ্ম কারুকাজে তৈরি হবে নানা বসন ভূষণ। গর্তে সব কিছু ভরা হলে শিকারীরা এই ভাণ্ডারের উপর চাপাবে গোটা কয়েক বিশাল অস্থি, জন্তুদের চুরি থেকে বাঁচাতে। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে ন মিটারের সামান্য বেশী, প্রস্থে প্রায় আড়াই মিটার, এর চেয়ে বড় আশ্রয় তৈরি করা ও গরম করা কঠিন। মেঝেটা একাধিক পরিবারের মধ্যে ভাগ করা, তাদের কেন্দ্র স্থল মাটিতে এক একটি অগভীর খোবল, সেখানে আগুন জ্বলে।

অন্যত্র অধিকাংশ ক্রোমানীয় গোষ্ঠী নানা কাজে কাঠ ব্যবহার করেছে, কিন্তু কসটেংকির মত শীতাঞ্চলে চতুর্দিকে প্রায় নিষ্পাদপ ধু ধু প্রান্তর। এক দিকে কাঠের অভাব এবং যথেষ্ট জ্বালানি না পেলে ঐ ঠাণ্ডায় বসবাস অসম্ভব, অন্য দিকে অপর্যাপ্ত শিকারের আকর্ষণ; অধিবাসীরা এই লোভ ছাড়ে নি, বরং জ্বালানি সমস্যার সমাধান করে সেখানে যে বেশ আরামেই দিন কাটিয়েছে তা খাঁটি মানুষের উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক। হাড়ের অভাব ছিল না, প্রধানত প্রকাণ্ড ম্যামথ অস্থি কেটে কেটে তারা চুলা জ্বেলেছে, আর ছিল শুষ্ক পশু বিষ্ঠা, অর্থাৎ প্রায় আমাদের ঘুঁটে। হাড় সহজে পোড়ে না বলে তারা মাটিতে চুলার সঙ্গে জুড়ে সরু নালি কেটে দিয়েছে যাতে যথেষ্ট হাওয়া ঢোকে। আগুন ঘিরে শীত নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজ, যথা হাড় দাঁত শিং কেটে খোদাই করে জামার সাজ, বাহুবন্ধ, গলার হার, আরও কত কি অলংকার গড়া বা নতুন ধরনের অস্ত্র উপকরণ তৈরি যার সংখ্যা ও সূক্ষ্মতা এ যুগে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি ম্যামথের দাঁত কেটে বানাচ্ছে এক পুথুলা নারী মূর্তি—শুধু শিল্পীর খেয়াল নয় তা, হয়তো পুজো, সন্তান কামনা বা আর কোনও গূঢ় প্রেরণায়। মেয়েরা চামড়া কেটে জামা বানাচ্ছে, কেউ হয়তো এক তাল ঘোড়ার মাংস ম্যামথ হাড়ের শিকে গেঁথে সেঁকছে। বাচ্চারা হাড় ও শিঙের খণ্ড দিয়ে মুহূর্তে নিজেদের খেলা উদভাবন করে মেতে উঠছে। কাজের অভাবে আছে অকাজ, যেমন মসৃণ হাড়ের গায়ে ফুটকি এঁকে তৈরি ঘুঁটি চেলে কোনও রকম ভাগ্যনির্ভর ক্রীড়া; নয়তো গল্প গাথার আদান প্রদানে অবসর বিনোদন।

মাসের পর মাস ঘরে বসে দীর্ঘ দিন যাপন হয়তো কখনও কখনও কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভিতরের আরাম ছেড়ে তারা সহজে হিমানীমণ্ডিত বহির্ভূমিতে পা বাড়ায় নি, বেরিয়েছে কেবল টাটকা মাংস এবং রোমশ পশু চর্মের আকর্ষণে। শীত আটকাতে প্রকৃতি এই সময়ে নেকড়ে, মেরু শেয়াল ও খরগোশকে দেয় নরম গরম লোমের পুরু আবরণ, এখনও সভ্য মানুষ এই ধরনের বস্তু থেকে যে পরিধান বানায় শীত নিবারণে তার জুড়ি নেই। কসটেংকির শিকারীরা এই পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে গভীর বরফে পা ফেলে চলেছে হয়তো যেখানে আগে ফাঁদ পেতে রেখেছে সে দিকে, ভাগ্য ভাল থাকলে দেখেছে এক শেয়াল কিংবা অন্য কিছু ধরা পড়েছে, হাতের মোটা হাড়টি দিয়ে মাথায় মেরে তাকে শেষ করেছে। মানুষের উদভাবিত প্রাচীনতম এক ফাঁদে একটি সরু গাছের মাথায় দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য মাথায় ফাঁস বানিয়ে গাছটি বেঁকিয়ে সেই ফাঁস মাটি পর্যন্ত নামানো হত, তার ভিতর একটি লোভনীয় হাড় ঢুকিয়ে তাতে পাথর চাপা দিয়ে আটকানো থাকত; হাড় খেতে গেলে পাথর সরে যেত, গাছ এক লাফে সোজা হত আর ফাঁসে আটকে তার সঙ্গে ঝুলত জন্তুটি।

রাশিয়ার বাইরে পূর্ব য়োরোপে বর্তমান চেকোসলোভাকিয়ার মোরাভিয়া অঞ্চলের নানা ঘাঁটিতে আধুনিক সমাজের এক প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, কারণ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে সাজ সরঞ্জাম ও অন্যান্য চিহ্ন প্রায় অক্ষত অবস্থায় উন্মুক্ত হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ম্যামথ মাংসের প্রতি অধিবাসীদের পক্ষপাতিত্ব। প্রেড্মস্ট নামক জায়গায় তারা যে প্রায় ১০০০ ম্যামথের খণ্ড কেটে এনেছিল তার সাক্ষ্য আছে, পাভ্লভ্ শহরের কাছে খুঁড়ে এক বিশাল স্তূপে এই জন্তুর শতাধিক দেহাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। ম্যামথ শিকারীরা গুহা ভালুকের সঙ্গেও লড়েছে। এই সম্প্রদায় ছোট বড় বাসা বানিয়েছে, বড়গুলি একাধিক পরিবারের জন্য বিভক্ত। সারিবাঁধা চামড়ার তাঁবুতে বাস, কাছেই প্রকাণ্ড চুলা ও আঁস্তাকুড়। খাওয়ার পর হাড়গুলি সযত্নে ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে রাখা হত—ম্যামথের দাঁত, চোয়াল, ভাঙা খুলি (ঘিলু ছিল পরম লোভনীয় বস্তু) সব পৃথক স্তূপে, যখন যে হাড় দরকার তা পেতে একটুও দেরি হত না। দাঁত ও হাড়ের ছোট

ছোট খণ্ড গর্ত করে বহু যত্নে তৈরি হয়েছে গলার হার, হাতের বালা, আরও কত অলংকার। হাড় ও দাঁতের উপর নানা রকম জটিল নকশাও দেখা যায় যার হয়তো কোনও সাংকেতিক অর্থ ছিল। আর গহনা ছাড়াও বাসিন্দারা দেহ সাজাত সাদা, লাল এবং হলদে রং মেখে—সাক্ষী রয়েছে রং গুঁড়ো করবার বাটি ও নোড়া, এখনও রঙের চিহ্ন গায়ে। এক ফাঁপা হাড়ে যে যেন ভরেছিল লাল রঙের চূর্ণ, এত কাল পরে তাতে আবার মানুষের হাত লেগেছে।

এক সাম্প্রদায়িক কবরে আটটি শিশু ও বারোটি বয়স্ক ব্যক্তির দেহ এক সঙ্গে রক্ষিত, কবরের উপরে নিচে পাথরের গাঁথনি, এক দেয়ালের গায়ে ম্যামথের চোয়াল সোজা করে বসানো, অন্য দেয়ালে কাঁধের হাড় সারি দিয়ে সাজানো। বহু কাল খোলা জায়গায় বসবাসের পর শীতের তাড়নায় শেষ কালে এদের গুহায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ম্যামথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এল নানা জাতের হরিণ। তার পর অকস্মাৎ একদা এই মানব গোষ্ঠীও উধাও হয়ে গেল।

বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের সন্ধানে এ বার আমরা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী পার হয়ে যাব দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের এক প্রশস্ত গুহায়। কেপ টাউন শহরের প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পূবে ভারত মহাসাগর উপকূলে এই নেলসন বে (Bay) গুহা, বর্তমান সাগর তটের প্রায় ২০ মিটার ঊর্ধ্বে এক বালু-পাথরের প্রাচীরের গায়ে এই কন্দর মোটামুটি ৩০-৪৫ মিটার গভীর ও ন মিটার উঁচু। প্রায় ১৮,০০০ বছর আগে শুরু করে এখানে মানুষের বাস ছিল ৪০০ পুরুষ ধরে, তার কারণ প্রাপ্তব্য খাদ্যের মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও কত-গুলি স্বাভাবিক সুবিধা পেয়েছে তারা। যথা, গুহার একেবারে পিছন দিকে এক ফোয়ারার থেকে হাতের কাছেই অফুরন্ত পানীয় জল পাওয়া যেত।

উত্তরের মেরুসন্নিধ অঞ্চলের তুলনায় শীত অনেকটা মৃদু। গুহার দক্ষিণ-মুখী প্রবেশ দ্বার ৩০ মিটার চওড়া, সমুদ্র তখন ৮০ কিলোমিটার দূরে। নিচে খোলা তৃণপ্রান্তর, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গাছ। এই ছিল প্রথম ৬০০০ বছরের দৃশ্য। মেঝের তৎকালীন স্তরে সামুদ্রিক ফসিল কিছু নেই, সুতরাং মনে হয় গুহাবাসীরা খাদ্যের খোঁজে অত দূরে যায় নি।

মেয়েরা সংগ্রহ করে এনেছে ফল মূল বীজ, শিকারীরা মেরেছে প্রান্তরের অপর্যাপ্ত বলগা হরিণ, উটপাখি, বেবুন এবং লুপ্ত অতিকায় মোষ এবং অন্য জন্তু। আর ছিল কদাকার হিংস্র বরাহ, তাদের মুখের দু পাশে বেরিয়ে আছে ভয়ংকর দুটি দাঁত, তাড়া করলে তারা দল কে দল শিকারীদের আক্রমণ করে, কিন্তু তাদেরও খেয়েছে এই আফ্রিকীরা। হয়তো মাঝে মাঝে শিকার সন্ধানে দূরে গিয়েছে অধিবাসীরা, কিন্তু তা ছাড়া পাকা বসবাস করেছে গুহায়। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে চুলাগুলির চার পাশে পাথর দিয়ে ঘিরেছে এবং পরে যে হাওয়া আটকাতে কোনও এক রকম বাধা খাড়া করেছে—হয়তো চামড়া, ডালপালা বা চারাগাছ দিয়ে—তা খুঁটির গর্ত দেখে বোঝা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা তখন বর্তমানের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল, সুতরাং শীত কালে হাওয়া আড়াল করে আরাম অনেকটা বেড়েছে, বিশেষত রাত্রে। গুহার বাইরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমেছে হয়তো।

প্রায় ১২,০০০ বছর আগে এই গুহার অধিবাসীদের জীবন ধারা দেখতে দেখতে বদলে গেল। চার পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণতর হচ্ছিল, পাহাড়ের বরফ গলে সমুদ্রে জমল, তার জল গ্রাস করল গুহার নিম্নবর্তী তৃণপ্রান্তর। নতুন বিচরণ ক্ষেত্রের খোঁজে জন্তুরা গেল ভিতরের দিকে, তাদের অনুসরণে শিকারীদের ঘর ছেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা হল না, কোনও কারণে, হয়তো 'ভিটের টানে', তারা থেকে গেল, যদিও সাংবৎসরিক বাস সম্ভব হল না। গ্রীষ্ম কাটত দূরে দূরে শিকার ও নিরামিষ আহার্যের সন্ধানে, শীতে ফিরে আসত তারা গুহায়, তখন নির্ভর ঘরের দুয়ারে মহাসাগর। মেয়েরা বীজ বাদাম মূলের সন্ধান ছেড়ে ভাঁটার সময়ে সংগ্রহ করত সমুদ্রের পরিত্যক্ত দৈনিক দান—২৩ সেন্টিমিটার লম্বা চ্যাপটা হাড়ের ছুরি দিয়ে পাথরের গা থেকে খসাত শামুক ঝিনুক জাতীয় খোলকপ্রাণী, দেখতে দেখতে ভরে উঠত তাদের চুপড়ি বা থলি। ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করে কুড়াবার খেলায় মেতে উঠত, কেউ ধরছে কাঁকড়া, কেউ পেয়েছে অসহায় বাচ্চা অকটোপাস।

পুরুষরা ধরেছে মাছ আর শিকার করেছে সামুদ্রিক স্তনপায়ী জন্তু সীল। জাল বা বঁড়শি ছিল না তাদের, এক টুকরো সরু সোজা হাড়

বা কাঠের দুই মুখ চোখা করে গেঁথে দিত ঝিনুকের ভিতরকার নরম মাংসের টোপ, হাড়ের মাঝখানে পেশীতন্তুর সুতো বেঁধে ছুঁড়ত জলে। টোপ গিললে মাছের মুখে গেঁথে যেত হাড়টি, অবশিষ্ট ফসিল দেখে জানা যায় অন্তত চার রকম মাছ তারা ধরেছে, এদের একটি এখনও ঐখানে স্থলের কাছে এসে বড় বড় দাঁত দিয়ে পাথরের গা থেকে ঝিনুক কামড়ে খসিয়ে নেয়। এ সব খাদ্য সংগ্রহে অধিবাসীদের দক্ষতার প্রমাণ রয়েছে ছ মিটার উঁচু বর্জিত খোলকের স্তূপে, এই আঁস্তাকুড়ে মাছের উচ্ছিষ্ট পচে যে দুর্গন্ধ হয়েছে হয়তো তাই তাদের গ্রীষ্ম কালে ঘরছাড়া করেছে, সেই সময়ে জঞ্জাল সাফ করে দিয়েছে ছুঁচো ইঁদুর সমুদ্রের পাখি ও হাওয়া। আবর্জনা বেশী জমে উঠলে কোনও কোনও আদিবাসী সমাজে এখনও এই রীতি প্রচলিত।

সীল শিকারে বিশেষ পারদর্শিতা বা সাহসের দরকার হয় নি, স্থলচর পরিযায়ী জন্তুর মত তারাও ঋতু অনুসারে স্থান বদলায়, নেলসন বে অঞ্চলের সীল গ্রীষ্ম কালে সমুদ্রে কয়েক শো কিলোমিটার দূরে মাছ ও অকটোপাস জাতীয় প্রাণী খেয়ে বেড়ায়, শীত কালে হাজারে হাজারে এসে জড়ো হয় জলের ধারে। এ যুগের সীল শিকারীরা সেই দলে ঢুকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাদের ঘায়েল করে, সে কালের মানুষও হয়তো তাই করেছে। এই জন্তুর থেকে খাদ্য ছাড়া আরও কিছু পেয়ে থাকতে পারে তারা। বর্তমান এসকিমোদের জীবন অনেকাংশে সীলনির্ভর, চর্বি দেয় দীপের আলো, পেশীতন্তু দিয়ে তৈরি হয় সেলাইর ও বাঁধবার সুতো, চামড়া দিয়ে শীত ও জল আটকানি পোশাক, থলি, এমন কি কাঠামোর উপর শক্ত করে জড়িয়ে ছোট ছিপ নৌকা পর্যন্ত। প্রাচীন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের সীল চর্মের পরিধান দরকার হয় নি, ঐ তরঙ্গক্ষুব্ধ উপসাগরে হয়তো সম্ভবত কিছুতে চড়ে এগোতেও চায় নি তারা, কিন্তু গুহায় আগুন থেকে যেটুকু আলো পেয়েছে তা বাড়াতে পাথরের প্রদীপ বানিয়ে চর্বি জ্বেলেছে হয়তো ; আর দুটি সম্ভাবনা শক্ত পেশীতন্তু দিয়ে মাছ ধরবার সুতো এবং চামড়া দিয়ে থলি।

এই অর্ধযাযাবরদের ছাড়িয়ে স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতার দিকে আরও এগিয়ে গেল আফ্রিকার বিপরীত কোণে ৭২০০ কিলোমিটার দূরে নীল নদ তীরের অধিবাসীরা। মিশরের বর্তমান আসোআন বাঁধ থেকে নদীর নিম্ন

দিকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে প্রশস্ত কম্ ওম্বো প্রান্তর, আজ থেকে প্রায় ১৭,০০০ বছর আগে হাজার পাঁচেক বছর ধরে সেখানে ছোট ছোট দল বাস করেছে। লক্ষ লক্ষ বছরের খাদ্যসংগ্রাহক মানুষ এই নদী তীরে এবং পশ্চিম এশিয়ার অদূরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন শিখে যে যুগান্তকর বিপ্লব এনেছিল, এদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে তার আভাস দেখা যায়। কয়েক রকম বন্য শস্যতৃণ থেকে নিয়মিত নিপুণ শস্য সংগ্রহের ফলে একই জায়গায় সংবৎসর বসবাস প্রথম সম্ভব হল। পূর্ব আফ্রিকায় নীলের উৎস স্থলে যখন বর্ষা আসত, অগাসট থেকে অকটোবর পর্যন্ত নদী ও কম্ ওমবো প্রান্তর জুড়ে তার শাখা প্রশাখা ভরে উঠত, আবার মার্চ থেকে অগাসট শুষ্ক সময়। এই ঋতু পরিবর্তনে শিকারও বদলাত, যথা ভরা জলধারার কূলে কূলে নানা রসালো তরুণ তৃণের লোভে আসত গোজাতীয় পশু এবং জলে দেখা দিত শিং ও পার্চ মাছ, কচ্ছপ ও জল-হস্তী, শুষ্ক মাসে ঘাস খেতে আসত গাজলা হরিণ ও অন্যান্যরা। আর ছিল বছর জুড়ে নানা জাতের পাখি, কিছু শীত কালে আসত য়োরোপ থেকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঘাঁটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে কয়েক রকম হাঁস বক সারস ঈগল ইত্যাদির হাড়। উপরন্তু নিরামিষ আহার্য বন্য শস্যতৃণ ঘন হয়ে ঢাকত প্রান্তরের বড় বড় অংশ, এগুলি যব ও জওয়ার জাতীয় দানার সম্পর্কিত হতে পারে। বস্তুত মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ফ্রেড ওএনডর্ফ এখানে ১৭,০০০ বছর প্রাচীন যবের বীজ পেয়েছেন তাঁর মতে যাদের আকার আকৃতি নির্দেশ করে তারা বুনো নয় ঘরোয়া, অর্থাৎ মানুষের উৎপাদিত, যদিও অধিকাংশ নজির অনুসারে কৃষি ও নবপ্রস্তর যুগের সূচনা মাত্র হাজার দশেক বছর প্রাচীন।

এই বিচিত্র খাদ্য সম্ভার, অপর্যাপ্ত জল ও উদার উন্মুক্ত তৃণপ্রান্তর আদি আধুনিকদের স্বভাবতই আকর্ষণ করেছে। নৃবিজ্ঞানীদের অনুমান এই প্রান্তরে একই সংগে হয়তো ১৫০-২০০ লোকের বাস ছিল, অর্থাৎ প্রায় ২৬০ হেকটেআরে এক জন। পুরাপ্রস্তর যুগে এই ঘনতা ভিড় বলতে হবে। জলের ধারে এক এক বসতিতে সম্ভবত ২৫-৩০ জনের বাস। গোষ্ঠীর ভিতর কিছু কিছু বিশেষত্ব গড়ে উঠেছিল, যেমন খাদ্য সংগ্রহের রীতিতে

বা ব্যবহৃত উপকরণে, যন্ত্রপাতি অন্তত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দলীয় প্রতিযোগিতা বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির থেকে স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা এসে থাকতে পারে।

পূর্বগামীদের থেকে এদের শস্য খাদ্যের দিকে ঝোঁক বেশী, বন্য তৃণের দানা সঞ্চয়নে একগ্রতা দেখে মনে হয় দেহের পুষ্টি অনেকাংশে তার থেকে মিটেছে। এরা রেখে গিয়েছে পাথরের কাস্তে এবং বীজ গুঁড়ো করবার পাথর, তার মাঝখানটা খুবলে গোল করা। সেখানে শস্যের দানা রেখে মোটামুটি গোল ও চ্যাপটা আর একটি পাথর দিয়ে ঘষা হত। অনেকটা অনুরূপ শিল নোড়া দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে রেড ইনডিয়ানরা এখনও ভুট্টার দানা ভাঙে। আমাদের শস্য ভাঙতে পাথরের জাঁতা, মসলা পিষতে শিল নোড়া।

যে বালুপাথরের টিলা থেকে এই পেষণ শিলা সংগৃহীত হয়েছিল তাদেরই নিচে এগুলি পাওয়া গিয়েছে, সাধারণত একত্র কয়েক জোড়া। তার থেকে পুরাবিজ্ঞানীদের ধারণা যে শস্য ভাঙা এবং সম্ভবত তার আগে মাঠ থেকে ডালা ভরে পাকা ফসল আনাও ছিল যৌথ কাজ। ঘাসের মাথায় মাথায় দানাগুলি পাকলে দলের লোকেরা গিয়ে হাতে হাতে সেগুলি ছাড়াত অথবা কাস্তে দিয়ে গোছা গোছা ডাঁটা কাটত, ফসল নিয়ে যেত যেখানে শিল নোড়া রাখা আছে, তার পর গুঁড়ো করা। এই পেষক পাথর ও কাস্তে ছাড়া আর কোনও উপকরণ এখন নেই। এরা পায়ের নিচে দলে বা লাঠির গোছা দিয়ে মেরে দানা ছাড়াত কিনা (যেমন এখন কোনও কোনও প্রাচীন সম্প্রদায় করে), বাতাসে উড়িয়ে সংলগ্ন তুষ ছাড়াত কিনা, কি ধরনের পাত্রে ফসল ভরে আনত, এ সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। এদের পরবর্তীরা নীল নদ কূলের অপর্যাপ্ত খাগড়া ও ঘাস দিয়ে ডালা বুনেছে, অগ্রবর্তীরা কি প্রথম এই বোনার কাজ আরম্ভ করেছে, হয়তো মাদুরের মত কিছু বানিয়ে তার উপর শস্য জড়ো করেছে?

আরও জানতে ইচ্ছা করে ঐ 'আটা' দিয়ে কি খাদ্য তৈরি হয়েছে। হয়তো শুধু শস্যের গুঁড়োতে জল মিশিয়ে তা গরম পাথরে সেঁকে তৈরি হয়েছে কোনও রকম প্রাথমিক রুটি, এই রীতি এখনও দেখা যায়। তা ছাড়া ঐ গুঁড়ো ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে পরিজের মত কিছু বানাতে

বা মাংসের ঝোল ঘন করতে। কেউ কেউ বলেছেন তা গাঁজিয়ে বিয়ারও হয়ে থাকতে পারে। কম্ ওমবোতে এই খাদ্য ব্যবস্থা প্রায় ৫০০০ বছর অব্যাহত থাকার পর, অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০ বছর আগে শিকারের দিকে ঝোঁক দেখা দিল, হয়তো জলবায়ু শুষ্ক হয়ে পড়ল বলে।

সুতরাং দেখা গেল উত্তর মেরু উপকণ্ঠে হিমকঠিন প্রান্তর, দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের মৃদুতর পরিবেশ, নীল নদ সমবর্তী উষ্ণ শস্যপ্রতুল দেশ ইত্যাদি নানা বিচিত্র ও বিপরীত ক্ষেত্রে খাঁটি মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য গড়েছে। কাঠের অভাবে হাড় পুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে, শিকারের পশু দুর্লভ হলে সাগর থেকে খাদ্য আদায় করেছে, যেখানে প্রকৃতি মাঠ ভরে ফসল ফলিয়েছে সেখানে নানা উপকরণ উদভাবন করে তার সদ্ব্যবহার শিখেছে এবং বহু বছরের ভবঘুরে বৃত্তি শেষ করে দেখিয়েছে সংবৎসর এক জায়গায় বসবাস সম্ভব। শুধু দুটি পা ছাড়া যখন গতি ছিল না তখনই সব প্রাকৃতিক বাধা জয় করে দুই বিশাল অজানা মানববর্জিত মহাদেশে মানুষের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছে। বিশ্ব জুড়ে এ যাবৎ তার ঘাঁটির সংখ্যা অন্তত ৩২০, তার দুই-তৃতীয়াংশে উপকরণ অলংকার দেখে তাকে চেনা যায়, বাকিগুলিতে ফসিলও পাওয়া গিয়েছে। চীনে আমাদের পরিচিত জোকোডিয়েন ও অর্ডস ঘাঁটিতে এবং অন্যত্রও তার বাস ছিল।

জোকোডিয়েনে কয়েকটি খুলি ও অন্যান্য ফসিল, ছিদ্রিত পাথরের পুঁতি এবং ছিদ্রিত হাড়, দাঁত ও খোলক আবিষ্কার হয়েছে যার থেকে শিরসাজ ও কণ্ঠসাজ জাতীয় অলংকার অনুমান করা যায়। কোনও কোনও খোলক সংগ্রহ হত ১৫০-৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে। পুঁতি রঞ্জিত করা হয়েছে লৌহ-খনিজ লাল হিমাটাইট দিয়ে। অন্তিম পুরাপ্রস্তর যুগের এই গোষ্ঠী শিকার করেছে বাঘ চিতা হায়না ভালুক উটপাখি ইত্যাদি। উত্তরে অর্ডস মরুর প্রান্তে বর্তমান বিখ্যাত মহাপ্রাচীরের অদূরে কয়েক জায়গায় যে খাঁটি মানুষ ঘাঁটি বেঁধেছিল তার প্রমাণ নানা রকম পাত যন্ত্র, কাজ-করা হাড় ও কাঠকয়লা, যদিও তাদের ফসিল পাওয়া যায় নি। আমিষ ভক্ষ্যের মধ্যে ছিল মরুর গাধা হায়না হরিণ গরু গণ্ডার উটপাখি। এই পূর্ব এশিয়ায়ই বোর্নিও দ্বীপে এক নাবালকের খুলি আবিষ্কার হয়েছে, আমরা গত অধ্যায়ে

দেখেছি যে তা ৪০,০০০ বছর প্রাচীন হতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশে সব দিকে তার চিহ্ন আছে, তার আলোচনা হবে আমাদের শেষ অধ্যায়ে। অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর পশ্চিম য়োরোপে ফসিলের সংখ্যা সর্বাধিক, কিন্তু অন্যান্য দেশে অনুসন্ধান কম হয়েছে বলে হয়তো তার অধিকাংশ এখনও সমাধিস্থ; আর এক কারণ অন্যত্র শীত অত প্রখর নয়, সুতরাং মানুষ সাধারণত গুহায় বাস করে নি এবং উন্মুক্ত স্থানে ফসিল সহজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

যাই হক, সুদীর্ঘ পুরাপ্রস্তর যুগ এবং তার সঙ্গে শেষ তুষার যুগ অবসানের আগেই আমাদের ঘনিষ্ঠতম পূর্বপুরুষ বুদ্ধি ও সামর্থ্যের জোরে সারা পৃথিবীতে জায়গা করে নিয়েছে। সে শুধু টিকে থাকে নি, জীবন সহজ ও উন্নত করেছে, প্রাণী জগতের অবিসংবাদিত অধিপতি সে তখন। নিজের ভরণ পোষণের ভাবনা কমল, যথেষ্ট ও বিচিত্র আহার্য সংগ্রহ করতে পেরে দেহ সবল মন সতেজ হল, তার ফলে শিকারে ছল বল কৌশল বাড়ল। স্বাস্থ্যোন্নতির ফলে হয়তো এ সময়ে অল্প কিছু আয়ু বৃদ্ধিও হয়েছিল, তাতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও সন্তানদের তার অংশ দানের সময়ও পাওয়া গেল বেশী। জ্ঞান বুদ্ধি দেহ বলের ফলে খাদ্য সমস্যা সহজ হওয়াতেও বাস ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বাড়ল, তার থেকে সাজ সজ্জা সরঞ্জাম ইত্যাদি বানাবার ইচ্ছা ও সুযোগ দেখা দিল। জীবন সংগ্রামে প্রায় সবটা সময় ও শক্তি ক্ষয় হল না, অন্য দিকে মন দেওয়ার অবসর বাড়াতে মানব সমাজে শিল্প ও সংস্কৃতির পরিধি দ্রুত প্রসারিত হল, তার নানা নিদর্শন আমরা পাব পরে, ব্যবহারিক ভাবনার সীমা ছাড়িয়ে নবমানবের ধ্যান ধারণা আশা আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি লক্ষ্য করে অবাক হব।

মানুষের অভিব্যক্তিতে বহু লক্ষ বছর ধরে বিবিধ শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু নবমানব আবির্ভাবের পর তা প্রায় থেমে গেল, তখন থেকে মগজ বাড়ে নি, চেহারাও বিশেষ বদলায় নি। যেন ভাস্কর তার নরম মাটি দিয়ে নানা পরীক্ষার পর এই নবতম মূর্তিটি বানিয়ে বললে, ঢের হয়েছে, যা দিয়েছি এ বার তা ভাঙিয়ে নিজের ব্যবস্থা কর। কাজেও হল তাই, বুদ্ধির

জোরে মাত্র এই ৪০,০০০ বছরে ব্যবহারিক জীবনে খাঁটি মানুষ যতটা এগিয়েছে, ৩০ লক্ষাধিক বছরের ইতিহাসে তা সম্ভব হয় নি। আগুন জ্বালানো ও তার ব্যবহার, গৃহ নির্মাণ, বিচিত্র অস্ত্র যন্ত্র এবং কাজ ও সাজের নানা বস্তু সৃষ্টির কারিগরী শিল্পে এই ক্ষমতার চরম বিকাশ দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে নবমানব হাড়, শিং ও ম্যামথ দন্তের সুবিধা ও সম্ভাবনা প্রথম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করল, তার সঙ্গে এ সব উপাদান নিয়ে নেআনডার্টালদের প্রাথমিক প্রচেষ্টার তুলনাই হয় না। আর চকমকি ও কোআর্ট্জাইটের মত ক্ষুদ্র-দানাযুক্ত পাথর থেকে এই কারিগররা যে সব পাত বানিয়েছে বর্তমান জগতের মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক কারুশিল্পীর তেমন দক্ষতা আছে। পশ্চিম য়োরোপে প্রাপ্ত বহু সহস্র চোখা ও ধারালো শিলা খণ্ড একদা বর্শা ফলক অথবা ছুরির কাজ করেছে, সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে এই রকম চকমকির ক্ষেপণাস্ত্র লোহার বর্শা ফলকের চেয়ে তীক্ষ্ণতর হয়, জন্তুর দেহে বেশী গভীরে ঢোকে। কাটার ক্ষমতায় চকমকির ছুরি ইস্পাতের সমকক্ষ তো বটেই, হয়তো উৎকৃষ্টতর। পাথুরে হাতিয়ারের একমাত্র অসুবিধা যে তারা সহজে ভেঙে যায়, সুতরাং নতুন করে বানাতে হয়, তাই তাদের এত প্রাচুর্য।

উন্নত অস্ত্রের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ সহজ হল, কিন্তু পাত (blade) শিল্পের কতগুলি আশ্চর্য নমুনার কোনও ব্যবহারিক কার্যকারিতা নৃবিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি, যেমন ২৮ সেন্টিমিটার লম্বা ও মাত্র এক সেন্টিমিটার পুরু পাত, দু দিকে চোখা মাঝখানে চওড়া হয়ে দেখতে লরেল পাতার মত। নিপুণ হাতে ছোট ছোট ছিলকা খসিয়ে তৈরি এই বস্তুটি এত পাতলা ও ভঙ্গুর যে তা দিয়ে কোনও দরকারী কাজ সম্ভব নয়। বস্তুত এই ধরনের বস্তুর রমণীয়তা ও সৌকর্য দেখে মনে হয় কারিগরী শিল্পের সীমা ছাড়িয়ে তারা চারুকলায় উন্নীত হয়েছে, তাই জল্পনা হয়েছে হয়তো কোনও ওস্তাদ যন্ত্রশিল্পী শুধু নিজের কৃতিত্ব দেখাতে বা সৌন্দর্য সৃষ্টির অদম্য তাড়নায় তাদের বানিয়েছে, হয়তো পরিবারের লোক সযত্নে তাদের রক্ষা করেছে, সগর্বে অন্যদের দেখিয়েছে। আর এক সম্ভাবনা হল কোনও অনুষ্ঠানের কাজে লেগেছে এই সব 'লরেল পাতা'।

এমন সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব হয়েছে কারণ প্রাচীন ফলক শিল্পে ক্রোমানীয়রা

নেআনডার্টালদের মুসতেরীয় ধারার থেকে আরও এগিয়ে গেল লম্বা পাতলা পাত বানাতে শিখে, এগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থের অন্তত দ্বিগুণ। পাথরের পাশে পাশে ভেঙে মোটামুটি বেলনের মত গোলাকার করে সেটিকে খাড়া করে উপর থেকে ধারে ধারে একের পর এক সুদক্ষ আঘাতে বা চাপে সমান লম্বা চ্যাপটা ধারালো পাত খসে পড়ত, সেগুলি প্রায় ১৩ থেকে ৩০ ১/২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, কিন্তু দুই এক সেন্টিমিটারের বেশী পুরু নয়, তার পর এই পাতগুলি সংস্কার হয়েছে প্রায়ই কোনও ছুঁচালো উপকরণ চেপে পাতলা পাতলা ছাল চেঁছে ফেলে, এ ভাবে তৈরি হয়েছে নানা বস্তু, যথা চোখা বা খাঁজ-কাটা যন্ত্র বা ছুরির মত ফলা ইত্যাদি। এই শিল্পে বাটালি জাতীয় যন্ত্র বিউরিনের প্রাধান্য দেখা যায়, হাড়, হরিণ শিং ও ম্যামথ দাঁত কাটতে তা প্রকৃষ্ট। ছুরি এত ধারালো যে এক পাশ ভোঁতা না করলে হাতে ধরা যেত না।

প্রথম থেকে শুরু করে যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির ধাপগুলি আমরা এখানে সংক্ষেপে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারি। হোমো ইরেকটাস পর্যন্ত মানুষ দুটি পাথর ঠুকে ভেঙেছে, তার পর আরও ঘা মেরে টুকরো খসিয়েছে পাশের দিকে ধরে আনতে এবং হাতে ধরবার সুবিধা করে নিতে, প্রধানত এই হাত-কুড়াল ও কাটারি দিয়ে তারা যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেছে। আদি সেপিয়েনস আমলে এই আশলীয় অষ্ঠি হাতিয়ারের পাশাপাশি দেখা দিল তার থেকে চোখা ও চ্যাপটা যন্ত্র লেভালোআ ফলক। নেআনডার্টালদের মুসতেরীয় শিল্পে একই পাথর থেকে অনেক বেশী ফলক পাওয়া গেল, তারা হাড়, শিং ইত্যাদি দিয়েও পরীক্ষা শুরু করল। খাঁটি মানুষরা দেখাল বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্যের চরম বিকাশ, কোনও কোনও নেআনডার্টাল গোষ্ঠীতে ৬০-৭০ রকম পর্যন্ত যন্ত্র উপকরণ দেখা যায়, কিন্তু এই পরবর্তীদের সাধনীর শ্রেণী সংখ্যায় শতাধিক। ধাতু ছাড়া আর সব উপাদানের পূর্ণ সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা আবিষ্কার করে তারা বানিয়েছে নানা কাজের ও সাজের বস্তু, প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি সৌন্দর্য মূর্ত হয়েছে সেই সৃষ্টিতে।

আদি কাল থেকে পাথর ভেঙে অভিপ্রেত বস্তুটি তৈরি হয়েছে আঘাতে আঘাতে এবং ধাপে ধাপে, প্রতি শিল্পধারায় আঘাত ও ধাপের সংখ্যা বেড়েছে। হাড় শিং প্রভৃতি নরম দ্রব্যের উপকরণ দিয়ে মৃদু পরিমিত আঘাত বা চাপ

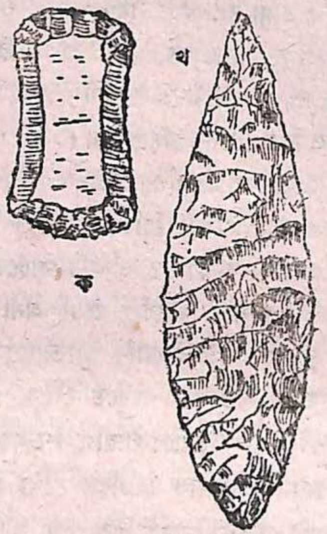
সম্ভব হয়েছে, সুতরাং দেখা দিল ক্রমশ মার্জিততর সূক্ষতর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। অষ্ঠিজাতীয় আশলীয় হাত-কুড়ালে ৯০০ গ্র্যাম পাথর থেকে ১০ সেনটিমিটার ধারালো ফলা পাওয়া যেত, তার তুলনায় পাতে পাওয়া গেল প্রায় ২৩ মিটার। আর প্রাক্তন ফলক ও ক্রোমানীয় পাত তুলনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যন্ত্রশিল্পী আরও পাতলা করে কেটে ও অপচয় কমিয়ে সমপরিমাণ শিলার থেকে ধারালো অংশের অনুপাত বাড়িয়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। সংখ্যায় ও ধারালো অংশে অধিকতর পাত আদায় করতে পেরে যেখানে উৎকৃষ্ট চকমকির অভাব সেখানে এই কাঁচামাল যে কম খরচ হয়েছে তা নিশ্চয় এক মস্ত সুবিধা। কসটেংকির পাতশিল্পীরা অন্তত ১৫০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পেয়েছে চকমকি, পাথরের মিতব্যয়িতা ছাড়া তারা শ্রমও বাঁচিয়েছে কারণ প্রাথমিক পাতগুলি তৈরি হয়েছে সেখানেই, টুকরো টাকরা, অবশিষ্ট আঁঠি অথবা যে সব পাত পছন্দ হয় নি তা সেখানেই বর্জিত হয়েছে, ঘাঁটি পর্যন্ত বয়ে এনেছে শুধু ব্যবহার্য পাতগুলি, ঘরে ফিরে তার সম্মার্জন করেছে। শিকার সন্ধানে বিছু দিনের জন্য দূরে গেলে চকমকির মত ক্ষুদ্র-দানাদার পাথর পাবে কিনা তা অনিশ্চিত, সুতরাং সম্ভবত সর্বত্র শিকারীরা ব্যবহারে নষ্ট অস্ত্র বা যন্ত্রের ক্ষতি পূরণ করতে কিছু পাত বা উপযুক্ত পাথর সঙ্গে নিয়েছে।

হোমো ইরেকটাসের হাত-কুড়াল কিংবা নেআনডার্টালদের ছুরি বা চাঁছনির চেহারায় দেশে দেশে পার্থক্য সামান্য, অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন তারা একই কারিগরের কাজ। খাঁটি মানুষের সৃষ্টির চিত্রটি অনেক বিচিত্র, স্থান কাল ভেদে নানা বৈশিষ্ট্য, উপকরণ আরও বিবিধ কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত। ফরাসী স্থানীয় নাম অনুসারে পশ্চিম য়োরোপে এই সৃষ্টি প্রধানত পাঁচটি ধারায় বিভক্ত, বাংলা বিশেষণ বানিয়ে বলা যায় নিম্ন পেরিগর্দীয় (প্রায় ৩৭,০০০-৩০,০০০ বছর আগে), ওরিনাসীয় (৩০,০০০-২৩,০০০), উচ্চ পেরিগর্দীয় (২৩,০০০-২০,০০০), সলুত্রীয় (২০,০০০-১৬,০০০) এবং মাদলেনীয় (১৬,০০০-১০,০০০)। বিকল্প এক সাম্প্রতিক বিভাগ অনুসারে পেরিগর্দীয় ধারা একটি, ৩৭,০০০ বছর আগে তার সূচনার মাত্র হাজার দেড়েক বছর পরে ওরিনাসীয় ধারার শুরু, দুইয়েরই শেষ হাজার

কুড়ি বছর আগে, অর্থাৎ তারা অনেকটা সমকালীন (ওরিনাসীয় শিল্প কয়েক শো বছর বেশী চলেছিল) ; তার পরে উপরোক্ত তারিখ অনুযায়ী সলুত্রীয় ও মাদলেনীয় ধারা, সুতরাং সব নিয়ে চারটি। এই সব ধারা য়োরোপের পূবে ও পশ্চিম এশিয়ায়ও কিছু কিছু ছড়িয়েছিল।

সৃষ্টি কৌশল বা আকার আকৃতির বিভেদ সত্ত্বেও এদের কার্যকারিতা সমান। বিভিন্ন কাজ সাধন করতে বিবিধ সাধনীর সংখ্যা পুরোগামীদের তুলনায় অনেক বেশী, যথা মাংস কাটতে ও কাঠ কাটতে আলাদা ছুরি, হাড় চাঁছবার এক রকম চাঁছনি, চামড়া চাঁছবার জন্য অন্য রকম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই কারিগররা কুড়াল, ছুরি ইত্যাদি হাতিয়ারে হাড় বা হরিণ শিঙের হাতল লাগিয়েছে, এ ভাবে শক্ত করে ধরতে পেরে বাহু ও ঘাড়ের পেশী থেকে দু তিন গুণ বেশী শক্তি হাতিয়ারে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। নেআনডার্টাল এমন কি হোমো ইরেকটাস আমলেও বিউরিন দেখা যায়, কিন্তু এই যন্ত্রের উন্নতি ও বিচিত্র ব্যবহার ওরিনাসীয়দের এক মস্ত কীর্তি—এই বাটালি হাড়, শিং, ম্যামথ দাঁত, কাঠ ইত্যাদি কাটা এবং কখনও কখনও পাথর কাটা, চেরা ও খোদাইয়ের কাজে লেগেছে। এর সাহায্যে এই সব উপাদান থেকে তৈরি হল বিচিত্র উপকরণ, যেমন সরু পিন বা সুদৃশ্য বর্শা ফলক, এমন কি অগ্নি তাপে বর্শা দণ্ড সোজা করবার জন্য তা ধরবার হাতল, তা ছাড়া মাংস কাটা, ছাল চামড়া পরিষ্কার করা, খুঁটি বানাতে চারাগাছ কাটা ইত্যাদি প্রাত্যহিক কাজ। এই যন্ত্র দিয়ে প্রচলিত বা নতুন অন্যান্য যন্ত্র বানানো সহজ হল। পাথরের গায়ে ঘা না মেরে শুধু সাধনীর উপর হাতের চাপ দিয়ে পাত খসানো সলুত্রীয় বৈশিষ্ট্য, এর ফলে পাতলা 'লরেল পাতা' বানানো সম্ভব হল। প্রথম ছিদ্রিত সুচও এদেরই সৃষ্টি, প্রাচীনতম নমুনাটি পাওয়া গিয়েছে ফ্রানসে, তৈরি হয়েছিল ২০,০০০ বছর আগে। মাদলেনীয় শিল্পে হাড় ও শিঙের আদর, তাদের থেকে সৃষ্টি হল বহুকণ্টকিত বর্শা ফলক ও শূল, নানা সাজ সরঞ্জাম ও বেশভূষা।

বিউরিনের কার্যকারিতার ফলে তার সংখ্যা প্রচুর বাড়ল, যদিও অধিকাংশ হাতিয়ারের মত তা শিকারের কাজে লাগত না। এই যন্ত্র হাতে পেয়ে নবমানবরা হাড়, হরিণ শিং ম্যামথের দাঁত থেকে নানা সাধনী ও সরঞ্জাম



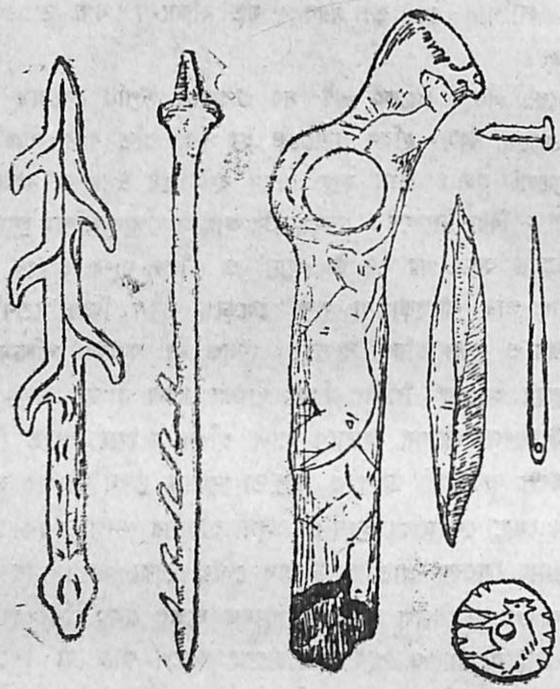
চিত্র ১৮। সল্যুত্রীয় উপকরণ ; ক—চাঁছনি, খ—'লরেল পাতা' ছ্রি।

বানাতে আরম্ভ করল, এ য্গে প্লাসটিক থেকে যেমন হয়েছে। হোমো ইরেকটাস ও নেআনডার্টালরা চাঁছতে, ফুটো করতে বা মাটি খ্ড়তে কিছ্টা হাড় ব্যবহার করেছে, কিন্তু সাধারণত নেআনডার্টাল ঘাঁটিতে হয়তো হাজারটি যন্ত্রপাতির প'চিশটি হাড়ের তৈরি, বাকিগ্লি পাথরের, পক্ষান্তরে কোনও কোনও ক্রোমানীয় উপনিবেশে অস্থি হতে পারে অর্ধেক কিংবা তারও বেশী। হাড়, শিং ও ম্যামথ দাঁতের নানা সুবিধা, তারা কাঠের চেয়ে শক্ত ও স্থায়ী, পাথরের চেয়ে কম ভঙ্গুর বলে তাদের উপর কাজ করা সহজ—কাটা, খাঁজ কাটা, বাটালি চালানো, চাঁছা, চোখা করা এবং বিবিধ আকৃতি গঠন সবই সম্ভব। এই সব উপাদান থেকে যেমন সূক্ষ্ম কাজের সূচ বানানো চলে, তেমনি হরিণের শিং দিয়ে চমৎকার গাঁইতি বা শাবল হয়, ম্যামথের পায়ের হাড় লম্বালম্বি ফাটিয়ে অল্প স্বল্প পরিবর্তন করে হাতল লাগিয়ে নিলে পাওয়া যায় বেশ কার্যকর কোদাল। ম্যামথ দাঁতে গরম

জলবাষ্প লাগিয়ে যে তা দরকার মত বাঁকানো যায় তাতেও কারিগরের সুবিধা হল।

শিকারের পশুর থেকেই এই সব উপাদান উপরি পেয়েছে মানুষ, শিং যোগাড় করতে সর্বদা হরিণ মারতেও হয় নি, প্রতি বছর বর্জিত শিংগুলি সংগ্রহ করলেই হল। স্থান কাল ভেদে যখন যে উপাদান সহজলভ্য হয়েছে তখন তার সুবিধা নিয়েছে। ক্রোমানীয় আমলে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসে জলবায়ু কয়েক হাজার বছর পর পর উষ্ণ-আর্দ্র ও শীতল-শুষ্ক হয়েছে, ফলে যখন এক শ্রেণীর গাছ গাছড়া বা পশু বেড়েছে তখন ভিন্ন শ্রেণী কমেছে। বলগা হরিণ ও লাল হরিণ সম্ভবত কখনও না কখনও পশ্চিম য়োরোপের সবচেয়ে প্রচুর আহার্য শিকার ছিল, হাওয়া যখন ঠান্ডা ও শুকনো তখন উপযুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাবে লাল হরিণ কমেছে কিন্তু মেরু শেয়াল বেড়েছে, যখন বাতাসের তাপ ও আর্দ্রতা চড়েছে তখন আবার লাল হরিণের বৃদ্ধি এবং মেরু শেয়ালের হ্রাস। বলগা হরিণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় নি, হয় ঘাস নয় শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ পেয়ে তারা সংখ্যা বজায় রেখেছে; সুতরাং পশ্চিম য়োরোপে হাড় বা ম্যামথ দন্তের চেয়ে শিং বেশী ব্যবহার হয়েছে। সাইবেরিয়া ও পূর্ব য়োরোপের অংশে কাঠ বা শিঙের তুলনায় ম্যামথের হাড় ও দাঁতের প্রাধান্য ছিল, এক একটি দাঁতের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মিটার ও ওজন ৫০ কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত, সুতরাং প্রচুর উপকরণ অলংকারের খোরাক তা।

সূচ ও ছিদ্রকর যন্ত্র বানাতে কারিগর আগে হাড়ের গায়ে বিউরিন দিয়ে লম্বালম্বি ও পাশাপাশি চিরেছে, তার পর মধ্যবর্তী সরু ছিলকাটি খুবলে বার করে ঘষে মেজে রূপ দিয়েছে। এমনি যথাযোগ্য কৌশল উদভাবন করে হাড় থেকে গড়েছে চ্যাপটা চামচ বোতাম পুঁতি বালা মালা এবং আরও অনেক কিছু গার্হস্থ্য বস্তু, তা ছাড়া হাড় ও হরিণ শিং দিয়ে বর্শা বল্লমের ফলা, শূলের শলা ইত্যাদি। হাড় বা শিং নির্মিত শূল-শীর্ষে শলার নিচের অংশে প্রায়ই এক বা দুই দিকে অংকুশ বা বঁড়শির মত কাঁটা তোলা হত যাতে অস্ত্রটি বেশী জখম করে। কখনও বা বর্শা ফলকের দু পাশে লম্বা খাঁজ কাটা, সেই নালি দিয়ে অতিরিক্ত রক্ত ঝরবে, পলাতক পশু সহজে



চিত্র ১৯। মাদলেনীয় অস্ত্র উপকরণ, হাড়, শিং ও পাথরের তৈরি ; ডান পাশে পিন, সুচ ও বোতাম।

দুর্বল হয়ে ধরা দেবে। পৃথিবীর গায়ে তখন অপর্যাপ্ত জন্তু চরে বেড়াত যাদের মাংস পরম উপাদেয়, য়োরোপ ও এশিয়ায় ম্যামথ, বাইসন, ষাঁড়, লাল হরিণ, বলগা হরিণ ও শুয়োর। ম্যামথ ও অন্যান্য তুষার যুগের প্রাণী প্রায় ১০,০০০ বছর আগে ঐ যুগের শেষে লোপ পায়। আফ্রিকায় বর্তমান প্রাণীরা তখনও ছিল, আর ছিল মোষ, কৃষ্ণসার মৃগ ও জেব্রার অতিকায় লুপ্ত পূর্বপুরুষরা।

শিকার দক্ষতার এক আশ্চর্য নজির আমরা দেখেছি চেকোসলোভাকিয়ায় ম্যামথ অস্থির বিশাল স্তূপে, সম্ভবত গর্তের ফাঁদে ফেলে এদের মারা হয়েছে। আরও বিস্ময়কর একটি দৃষ্টান্ত আবিষ্কার হয়েছে ফ্রানসে সলুত্রে

(যার থেকে সলুত্রীয় শিল্পের নাম) নামক জায়গার অদূরে এক সুউচ্চ পর্বত-গাত্রের নিচে, সেখানে আনুমানিক ১০,০০০ বুনো ঘোড়ার হাড় জমে একটা ছোট খাটো পাহাড় বানিয়েছে। মনে হয় ক্রোমানীয় শিকারীরা বড় বড় দল পাকিয়ে ঘোড়ার পালকে আক্রমণ করেছে। সে কালের বুনো ঘোড়া দেখতে ছিল অন্য রকম, ছোট খাটো গড়ন, লোমশ দেহ, শিকারীরাই তাদের ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, সে কথা পরে হবে। জায়গায় জায়গায় আগুন জেবলে পথ বন্ধ করে, তার পর হাতে মশাল নিয়ে তাড়া করে ঘোড়ার দলকে তারা নিয়ে যেত গভীর খাতের দিকে, সেখানে পেঁছে নিরুপায় উদভ্রান্ত পশুরা গড়িয়ে পড়ত নিচে, হাড়গোড় ভেঙেও যারা বেঁচে থাকত বল্লমের মুখে প্রাণ দিত তারা। ঘোড়ার মাংস যে সে কালের উপাদেয় খাদ্য ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। দুর্দান্ত বলীবর্দ অরক্‌স শিকারেও ছল বল কৌশলের পরীক্ষা হয়েছে। তাদের চেহারা ছিল যেমন প্রকাণ্ড ভয়ংকর, তেমনি হিংস্র মেজাজ। তারা যখন কোনও সংকীর্ণ গভীর গিরিবর্ত্মে ঢুকত তখন পাথর বা গাছ দিয়ে দু দিকের পথ বন্ধ করে তাদের ফাঁদে ফেলা সহজ হত। তার পর চলত হত্যাকাণ্ড, সে কাজেও বল্লম বা বর্শাই ছিল প্রধান প্রহরণ।

এই সব শিকার কৌশল অবশ্য প্রাচীনতর মানুষও জানত, কিন্তু সম্ভবত নবমানবরা য়োরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অন্যত্র দলবদ্ধ বৃহৎ জন্তু শিকারের বিজ্ঞান আরও আয়ত্ত করেছিল, যথা বিভিন্ন পশুর খাদ্য রুচি ও ঋতুগত পরিযানের স্থান কাল, কিসে তারা ভয় পায় কিসে নিশ্চিন্ত হয়, কি করে তাদের ভুলিয়ে আনতে হয় গর্তের বা ফাঁসের ফাঁদে, তাড়া করে বা দূর থেকে সাবধানে আস্তে আস্তে চালিয়ে কেমন করে ঘেরা জায়গায় ঢোকাতে হয় এ সবের কৌশল। এরই সঙ্গে খাদ্য বিজ্ঞানও হয়তো কিছু কিছু শিখেছিল তারা, যেমন কোন জন্তুর কোন অংশ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

পাথরের ফলাযুক্ত অথবা মাথাটি আগুনে শক্ত করা কাঠের বর্শা ছুঁড়ে বা হাতে ধরে বিঁধিয়ে শিকারী যেমন অনেক পশু মেরেছে তেমনি বার বার ব্যর্থও হয়েছে। যাদের চামড়া মোটা, যেমন বিশাল অরক্‌স, তাদের গায়ে বর্শা হয়তো ভাল বেঁধে নি, হরিণ জাতীয় ক্ষিপ্র জন্তুরা সম্ভবত যথেষ্ট কাছে আসবার আগেই পালিয়েছে। এই অক্ষমতা অনেকটা কমল এক নতুন

আবিষ্কারে, তাতে আরও জোরে আরও দূর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ সম্ভব হল। এই ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণত ৩০-৬০ সেন্টিমিটার লম্বা এক দণ্ড, তার এক দিক ঘুরিয়ে বাঁকানো যেখানে বর্শার উলটো মাথাটা আটকায়, অন্য দিক হাতে ধরে শিকারী সজোরে বর্শা ছোঁড়ে। মানুষের হাত আরও লম্বা হলে যা হত এতে সেই কাজ হল। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দু মিটার লম্বা একটি বর্শা হাতে ছুঁড়লে তা ৫৫-৬৫ মিটারের বেশী দূর যাবে না, কিন্তু এই দণ্ডের সাহায্যে তা পৌঁছাবে প্রায় ১৩৭ মিটার এবং ২৭½ মিটার দূরের হরিণ মারা পড়বে। বলা যেতে পারে এই অস্ত্র মানুষের তৈরি প্রথম কল। এটি হাতে পেয়ে শিকারীর কতগুলি বড় সুবিধা হল, কারণ বেশী কাছাকাছি গেলে শিকার পালিয়ে যেতে পারে অথবা হিংস্র জন্তু তেড়ে এসে আক্রমণ করতে পারে, দূর থেকে অস্ত্রক্ষেপ করতে পেরে ব্যর্থতা ও বিপদ কমল, সময় ও শ্রমও বাঁচল।

এ যাবৎ আদিতম ক্ষেপণদণ্ডের কয়েক খণ্ড পাওয়া গিয়েছে ফ্রানসে লা প্লাকার গুহায়, তা প্রায় ১৪,০০০ বছর প্রাচীন, অর্থাৎ মাদলেনীয় সৃষ্টি ; হাড়ের তৈরি একটি খণ্ডের বাঁকানো মাথা দেখতে এ যুগের সভ্য নারীর পশম-বোনা কাঠির মত। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসে এবং কন্‌সতান্‌স হ্রদের কাছে সর্বসাকুল্যে সত্তরের বেশী বলগা হরিণ শিঙের ক্ষেপণদণ্ড উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু অন্যত্র কোথাও না—হয়তো কাঠের তৈরি বলে তা সহজে পচে নষ্ট হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় হাজার দশেক বছর আগে এই অস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, এসকিমোরা কিছু দিন আগেও তা কাজে লাগিয়েছে। অসট্রেলীয় আদিবাসীরা এখনও ক্ষেপণদণ্ড ব্যবহার করে, তাদের এই উওমেরা কাঠের তৈরি, প্রথম ক্রোমানীয় গোষ্ঠীদের নিশ্চয় তাই ছিল, কিন্তু অবিলম্বে তার স্থান নিয়েছে হরিণের শিং। শুধু কাজের জিনিস বানিয়েই কারিগর সন্তুষ্ট হয় নি, মাদলেনীয় অলংকারে ও চিত্রে যে সৌন্দর্য প্রীতি দেখা যায় এই দণ্ডের গায়েও প্রায়ই খোদাই করা নানা নকশায় বা ঘোড়া হরিণ বাইসন পাখি মাছ ইত্যাদির রূপায়ণে তা প্রতীয়মান। হয়তো এদের উপর রংও লাগানো হয়েছিল, একটি দণ্ডের খোবলে লাল গেরিমাটির চিহ্ন, কয়েকটিতে প্রাণীর চোখ কৃষ্ণরঞ্জিত। মাঝে মাঝে কৌতুক

রসও দেখা যায়, যেমন তিনটি দণ্ডে রূপায়িত মলত্যাগরত হরিণ। ফ্রানসের ব্রুনিকেল অঞ্চলে প্রাপ্ত ১৫,০০০ বছর প্রাচীন এক সরু দণ্ডের এক প্রান্ত ছিদ্রিত, অন্য দিকে লম্ফমান এক ঘোড়ার সুন্দর মূর্তি, কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ এটিকে বর্শা-ক্ষেপণদণ্ড বললেও এর সূক্ষ্ম কারুকাজ ও মাত্র ৩০ সেনটিমিটার দৈর্ঘ্য দেখে মনে হয় এর ব্যবহার ছিল আনুষ্ঠানিক।

ক্রোমানীয় সৃষ্টি তথাকথিত আদেশদণ্ডের অনুরূপ উদ্দেশ্য ছিল হয়তো, যদিও এখানেও মতভেদ দেখা যায়। সুংগির ঘাঁটির আলোচনায় আমরা এর অদ্ভুত গঠন লক্ষ্য করেছি, আর কোনও ব্যবহার খুঁজে না পেয়ে ক্ষমতার প্রতীক ভেবে বস্তুটির ঐ নামকরণ হয়েছে, হয়তো আচার অনুষ্ঠানে তা কর্তা ব্যক্তির হাতে থাকত। হাড় বা শিঙের তৈরি এই দণ্ড সাধারণত লম্বায় ৩০ সেনটিমিটারের কম, আকৃতি Y বা T অক্ষরের মত, যেখানে ভাগ হয়েছে সেখানে একটি গর্ত। কোনও কোনওটির গড়ন লিঙ্গাকার। সে কালের মানুষ হুকুমদণ্ডে যাদুকরী শক্তিও আরোপ করে থাকতে পারে। আবার সম্পূর্ণ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যও কল্পিত হয়েছে, যথা তাঁবুর খুঁটি বা শিকারীর কোনও রকম অস্ত্রের হাতল, ধরবার সুবিধার জন্য গর্তের ভিতর দিয়ে সরু চামড়ার পাত ঢুকিয়ে বাঁধা থাকত; অথবা তীর সোজা করবার যন্ত্র, তীরের কাঠি গর্তে ঢুকিয়ে দু দিকে ধরে দণ্ড দিয়ে চাপ দিলে বাঁকা অংশ সোজা হবে, বিশেষত যদি তা জলে ভিজিয়ে বা বাষ্পের গরমে নরম করে নেওয়া হয়।

কিন্তু মানুষ তখনও ধনুর্বিদ্যা শিখেছিল কিনা তাই সন্দেহের বিষয় এবং বস্তুত আদেশদণ্ড এখনও এক হেঁয়ালি। অনেকটা তীরের ফলার মত দেখতে কিছু সলুত্রীয় ব্যবহৃত বস্তু পাওয়া গিয়েছে এবং মাদলেনীয় গুহা-চিত্রেও তীর বা ছোট বর্শার মত অস্ত্র দেখা যায়, যদিও ধনুকের রূপায়ণ একেবারেই অনুপস্থিত। অনেকে বলেন ঐ অস্ত্রগুলি আসলে হয়তো হাতে ক্ষেপণের বাণ (ইংরেজিতে ডার্ট), ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষা আরও পরে। অবশ্য ধনুকের বাঁট সাধারণত কাঠ দিয়ে ও ছিলা পশুর পেশীতন্তু বা অন্ত্র দিয়ে তৈরি হয়, সুতরাং তুষার যুগ থেকে এত কাল টিকে থাকা আশ্চর্য। ডেনমার্কে প্রায় ৮০০০ বছর প্রাচীন গোটা দুই ধনুক এবং উত্তর জার্মেনির

বলগা হরিণ শিকারীদের ঘাঁটিতে হয়তো ১০,০০০ বছর পুরনো পাথরের ফলাযুক্ত কাঠি আবিষ্কার হয়েছে আরও বেশী। ফ্রানসে লা কলম্বিয়ের গুহায় ছোট ছোট শিলা খণ্ডে আঁচড় কেটে আঁকা পালক-বসানো ক্ষেপণাস্ত্রের মত বস্তু দেখা যায়, এই কারুকাজ বিশ সহস্রাধিক বছর প্রাচীন হতে পারে, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ক্রোমানীয় আমলের, কিন্তু ছবিগুলি ছোট বর্শার না তীরের তা নিয়ে সন্দেহ। এর প্রায় ১০,০০০ বছর পরে মধ্যপ্রস্তর যুগে ধনুর্বাণের প্রথম অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় (১১শ অধ্যায়)। অবশ্য ধনুক উদভাবনের মত অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য ক্রোমানীয়দের নিশ্চয় ছিল। বাসা বাঁধতে বা ফাঁদ পাততে গিয়ে তারা শিখেছে যে চাপলে চারা-গাছ বেঁকে যায়, ছেড়ে দিলে লাফিয়ে ফিরে আসে, নানা কাজে দেখেছে যে শুকানো পেশীতন্তু বা অন্ত্র দিয়ে শক্ত দড়ি হয়, সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও নৃবিজ্ঞানীরা অনেকে বিশ্বাস করেন যে ১০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই অর্থাৎ পুরাপ্রস্তর যুগে কোথাও কোথাও ধনুর্বাণ ব্যবহার হয়েছে। তা হলে এই শিকারীরা বর্শার তুলনায় মস্ত সুবিধা পেয়েছে, ক্ষেপণদণ্ডের সাহায্য নিলেও বর্শা ছুঁড়তে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হয়, তাই শিকার হাতছাড়া হওয়ার ভয় থাকে, বিশেষত এক বার বর্শা ব্যর্থ হলে; কিন্তু ব্যাধ অদৃশ্য থেকে বার বার তীর ছুঁড়তে পারে। উপরন্তু বর্শার চেয়ে হালকা বলে তীর বইতে বা ছুঁড়তে কম শক্তি লাগে, অথচ তা আরও দ্রুত ও দূরগামী এবং তা দিয়ে ছুটন্ত পশুর, বিশেষত উড়ন্ত পাখির লক্ষ্যভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ।

পুরাপ্রস্তর যুগের অন্তিম কালে কোনও কোনও সম্প্রদায়ে মাছ ও খোলক-প্রাণী খাদ্যের বড় অংশ হয়ে উঠল, এতে মাংস ও উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভরতা কমে মানুষ স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে নেলসন বে অঞ্চলবাসীরা যে শামুক ঝিনুক ইত্যাদি সংগ্রহ করত, পেশী-তন্তুর সঙ্গে ছোট কাঠের টুকরো বেঁধে জলে ফেলত, মাছ তা গিলে আটকে যেত তা আমরা দেখেছি। ক্রোমানীয় মৎস্য শিকারীরা আর একটি অস্ত্র উদভাবন করেছিল, লম্বা লাঠির মাথায় এক সরু চোখা ফলা, তার দু পাশে বেঁকিয়ে ঈষৎ ফাঁক করে বাঁধা আর দুটি অঙ্কুশের মত শলা।

এই ত্রিশূল হাতে ধরে মারলে মধ্যবর্তী ফলাতে মাছ গেঁথে যেত, শলা দুটি তার ছটফটানি ও পলায়ন বন্ধ করত, ভারতে কোথাও কোথাও এই ধরনের বহুশলা শূল মাছের ঝাঁকে মেরে এক বারে একাধিক মাছ গাঁথা হয়। অল্প পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সম্ভবত য়োরোপে একসঙ্গে আরও বেশী মাছ ধরা সম্ভব হল। প্রথমোক্ত স্থানে প্রাপ্ত ছোট খাঁজকাটা বেলনাকার পাথর জাল ভারী করতে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে, এই জাল হয়তো সরু চামড়া বা উদ্ভিজ্জ আঁশের দাড়ি দিয়ে তৈরি, দু তিন জন জেলে তা দিয়ে এক বারে এক পাল মাছ ধরতে পারত।

অল্প জলে পাথর দিয়ে ঘিরে মাছ বন্দী করা প্রাচীন সম্প্রদায়ের আর একটি কৌশল। ফ্রানসের দর্দনিয় অঞ্চলে মাছের কাঁটা ও আঁশের মোটা স্তূপ পাওয়া গিয়েছে, প্রধানত স্যামন মাছ, ডিম পাড়বার ঋতুতে এদের পরিযায়ী দল দর্দনিয় ও ভেজ্রের নদী বেয়ে চলত। হয়তো এদেরও ধরা হয়েছে ঐ রকম ফাঁদে, চলার পথে সরু ফাঁক দিয়ে বাঁধে ঢুকে তারা ত্রিশূলবিদ্ধ হয়েছে। হয়তো দূর দূর থেকে এই ঋতুতে শিকারীরা এসেছে মাছ সংগ্রহ করতে, নদীর ধারেই তা কেটে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নিয়েছে ঘরে ফিরবার আগে। ফ্রানসে সল্‌ভীয় নামক স্থানে খুঁড়ে উন্মুক্ত এক বৃহৎ চতুষ্কোণ ভূমি সযত্নে ছোট ছোট পাথর দিয়ে বাঁধানো, তার অবস্থান ও আকৃতি দেখে সন্দেহ হয় সেখানে মাছ শুকানো হত।

শীতের সঙ্গে লড়তে পুরামানবের মস্ত সহায় যে আগুন তার ব্যবহার চলে আসছে বহু লক্ষ বছর ধরে। কিন্তু তা প্রাকৃতিক অনল, মানুষ কেবল সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সময়ে প্রথম প্রমাণ দেখা যায় যে স্বহস্তে আগুন জ্বালতে শিখে প্রকৃতির উপর নির্ভরতা কমেছে। বেলজিয়ামের এক গুহায় পাওয়া গিয়েছে সম্ভবত ১০,০০০ বছর আগে পরিত্যক্ত এক সুন্দর গোল করা অগ্নিশিলা, চকমকির আঘাতে এই লৌহবাহী পাইরাইটিস থেকে এমন তপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছোটে যে তাতে শুষ্ক দাহ্য বস্তু জ্বলে ওঠে। বার বার ঘা খেয়ে শিলার গা ক্ষয়ে লম্বা এক গর্ত হয়েছে। এই আকরিক সাধারণত মাটির উপর বিরল, সুতরাং দলের লোকে নিশ্চয় এটিকে সর্বদা সযত্নে সঙ্গে রেখেছিল। আগুন যাতে সহজে জ্বলে এবং বেশী তপ্ত হয়ে

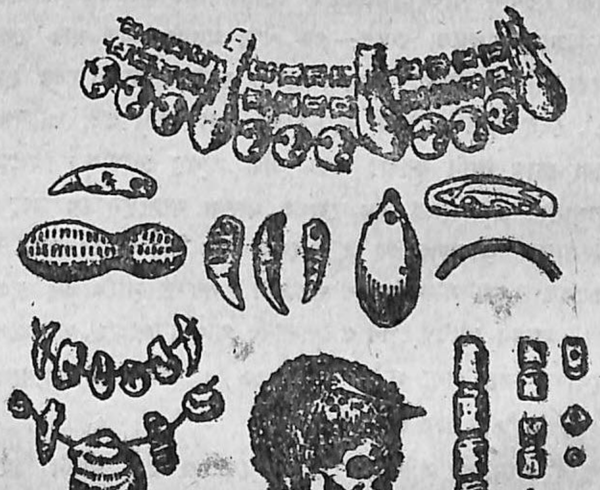
জ্বলে তার জন্য রাশিয়া ও ফ্রানসে চুলার সঙ্গে নালি কেটে বাতাস ঢুকবার পথ করা হয়েছিল, কসটেংকিতে হাড় পোড়াতে যে এই ব্যবস্থা ছিল তা আমরা দেখেছি। এখন ইস্পাত কারখানার বিশাল চুল্লীতে বাতাস ঢুকিয়ে তাপ বাড়ানো হয়।

নানা জায়গায় মৃতদেহ বসন ভূষণে সাজিয়ে কবর দেওয়ার প্রথা ছিল বলে আদি খাঁটি মানুষের পোশাক সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়েছে। মেরুসন্নিকট অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকার শীত সহ্য করতে অধিবাসীরা যে যথাযোগ্য পোশাকও বানিয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা আগে পেয়েছি। আরও অনুমান করা যায় যে সম্ভবত এসকিমোদের মত চামড়ার আঁটসাঁট পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল, তা সেলাই করা কোথাও ফাঁক না রেখে যাতে দেহের তাপ বার হতে না পারে, পাজামা জুতোর মধ্যে গোঁজা, হয়তো লোমশ চামড়ার মোজা। হাড়-কাঁপানো শীতে কোনও রকম হাত-মোজা, পায়ের অনেকটা ঢাকা উঁচু জুতো, মাথার উপর জামার অংশ ঘোমটার মত তোলা। রাশিয়ায় প্রাপ্ত ছোট ছোট স্ত্রী মূর্তির গা লোম-ঢাকা পরিধানে আবৃত মনে হয়।

স্ত্রী ও পুরুষের গলায় শোভা পেত হার, তা হরিণের দাঁত, শামুকের খোল, ঝিনুকের ভিতরাংশ (mother of pearl) কেটে রামধনু-রঙিন চাকতি, মাছের শিরদাঁড়ার খণ্ড ইত্যাদি দিয়ে গাঁথা। দক্ষিণ রাশিয়ার লোকে ম্যামথ দন্তের উপর সুন্দর নকশা খুদে বালা তৈরি করেছে, একই বস্তুর থেকে পুঁতি এবং পোড়া মাটি থেকে দুল বানাত তারা।

সে দিনের কোনও ভদ্রলোক বা মহিলাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে অনেকটা এই রকম ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে: পরনে ঝিনুক-গাঁথা চামড়ার পোশাক, জামার গায়ে ও নিম্ন প্রান্তে, হাতার কবজিতে খোলক, পশুর দাঁত ইত্যাদি পেশীতন্তু দিয়ে সেলাই করে আটকানো। গলায় হার, হাতে বালা, মাথায় ঝিনুক ও দাঁতের তৈরি মুকুট, কোমরবন্ধেও ঝিনুক আর খোলক, মুখমণ্ডল ও অঙ্গ রক্তলাল রঙে রঞ্জিত। এ চেহারা দেখলে সহজে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, এ যুগের রুজ-মাখা সুন্দরীরাও হয়তো বলবেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কালের সব কিছুরই সাংকেতিক

অর্থ ছিল, যেমন ঐ রক্তোপম লাল গৈরিক ছিল প্রাণের প্রতীক। এক জায়গায় দুটি শিশুর জামায় গাঁথা দু হাজারেরও বেশী ঝিনুক, হয়তো মায়েদের মনে ও সব খোলক ছিল পরজীবনের রক্ষাকবচ। যে কারণেই হক, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সে কালে ঝিনুক ও কড়ি জাতীয় খোলক বস্তুর সমাদর ছিল খুব বেশী। ভূমধ্য ও ভারত সাগরের উপকূল থেকে তা সংগ্রহ করে দূর দূরান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এর আগে নেআনডার্টাল মানুষও যে এ সবের কদর কিছুটা বুঝেছিল তা আমরা আগে দেখেছি। কড়ি এ দেশে অনেক কাল টাকার কাজ করেছে, আজও আমরা 'টাকা'র সংগে 'কড়ি' শব্দটা যোগ করি। কড়ির এই ব্যবহার আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যত্রও দেখা যায়। মার্কো পোলোর কাহিনী অনুসারে সে সময়ে চীনে কোথাও কোথাও ভারতের আমদানী কড়ি মুদ্রার কাজ করত।



চিত্র ২০। খাঁটি মানুষের অলংকার ; ম্যামথের দাঁত, মাছের দাঁত, হাড় ও ঝিনুকের তৈরি।

নবমানবের দেহ সজ্জার বর্ণনায় একটি উপকরণ সম্ভবত বাদ পড়ে গিয়েছে,

তা হল পাখির পালক। এর কোনও চিহ্ন অবশ্য এখন পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু বিচিত্রবর্ণ কোমল পালকের মত এমন একটি চিত্তাকর্ষক বস্তু যে সে কালের ফ্যাশন-দুরন্ত মানুষ কাজে লাগায় নি তা ভাবাই যায় না। আজও রেড ইনডিয়ানদের বেশভূষায় পালকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। পুরাণ কাহিনীতেও উল্লেখ দেখা যায়, যথা অ্যাজটেক দেবপতি কেট্জালকোআট্ল বাস করতেন এক রুপার গৃহে, তার ছাত নানা রঙের পালক দিয়ে তৈরি; বাড়ির চার দিকে চারটি ঘর, যথাক্রমে সোনা পান্না জ্যাস্পার ও রঙিন ঝিনুক দিয়ে মোড়া। এখানে মূল্যবান ধাতু ও মণির পাশাপাশি সামুদ্রিক খোলক ও পালকের উল্লেখ লক্ষণীয়।

আজকের মত সে দিনের গৃহকর্ত্রীরও সুচ হারিয়ে যেত, মাদলেনীয় আমলে কে একজন কৌটো বানিয়েছিল পাখির ফাঁপা হাড় থেকে, সুচ-ভরা সেই কৌটো ঠিক তেমনি পাওয়া গিয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এদের সুচ তৈরির সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সাজানো আছে—এক খণ্ড ম্যামথ দাঁত যার থেকে সরু সরু টুকরো খসিয়ে নেওয়া হয়েছে, চোখা ছুরি, বালুপাথরের চাক, তার মধ্যে গর্ত, সেই গর্তে ঘুরিয়ে সুচের গা গোল করা হত, পালিশ করবার পাথর এবং চোখ ফুটো করবার জন্য অতি সূক্ষ্ম চকমকি। হাড়ের তৈরি সুচের প্রশংসায় এ কালের এক লেখক মন্তব্য করেছেন যে বহু শতাব্দী পরে ঐতিহাসিক আমলেও এর জুড়ি দেখা যায় নি, সুসভ্য রোমীয়দের তো নয়ই, য়োরোপের রনেসাঁস (১৫শ শতাব্দী) পর্যন্ত নাকি এর তুল্য কিছু ছিল না। ম্যামথ দাঁতের পিন ও বোতামও পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে কখনও কখনও খোদাই করা পশু মূর্তি (চিত্র ১৯)। এত সাজ সরঞ্জামের সহায়ে পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি সহজ হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে মানুষের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য বোধের ছোট খাটো চিহ্ন লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এই খাঁটি মানুষের সময় থেকে বিচিত্র ব্যক্তিগত অলংকারে, অস্ত্র ও উপকরণের নানা রকম কারুকার্য ও নকশায়, চিত্রে ও ভাস্কর্যে দেখা যায় সৌন্দর্য প্রীতির স্ফূর্তি ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা, যা মানুষের একান্ত স্বকীয় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর কাজের জিনিস সম্বন্ধে বলা চলে যে ধাতুর অবর্তমানে যা যা কিছু বানানো সম্ভব মানুষ যেন দিনে দিনে

আবিষ্কার করেছে তার বিচিত্র রূপ ও কার্যকারিতা। উপকরণগুলি হয়ে এসেছে আগের চেয়ে ছোট, অধিকতর কৌশলের পরিচায়ক ও পৃথক পৃথক কাজের জন্য ভাগ করা। কিন্তু মানুষ যে শুধু কাজের জিনিসে তৃপ্ত নয় তা নানা ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সময়ে—বসনে ভূষণে প্রসাধনে, দেহ চিত্রণে রঙের ব্যবহারে, মেয়েদের চুল বাঁধার সূচনায়। মিস্ত্রীর কাজেও সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগল, হাতের কাজ হয়ে উঠল কারুশিল্প।

নবমানবদের বাস ব্যবস্থা যে পূর্ববর্তীদের চেয়ে উন্নত হবে তাই আশা করা যায়। অন্তত কয়েকটি গুহা বা শিলাশ্রয়ে দেখা যায় প্রাক্তন বাসিন্দাদের মত তারা ভিতরে জঞ্জাল জমতে দেয় নি, বাইরে দূর করে দিয়ে বাস স্থান পরিষ্কার রেখেছে। গুহাবাসীদের দলও অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাস বেশী স্থায়ী। কিন্তু যে সব অঞ্চলে এ রকম প্রকৃতির তৈরি ঘর পাওয়া যায় নি সেখানে বাসা বাঁধতে কৌশল ও উদভাবনী শক্তির প্রকৃত বিকাশ দেখা যায়, এর উদাহরণ আমরা পেয়েছি সাইবেরিয়া, ইউক্রেইন ও কসটেংকিতে, কোথাও কোথাও স্থানীয় গোষ্ঠী অনেকটা গুহার অনুকরণে আংশিক ভূমিনিমজ্জিত বড় বড় চামড়ার ছাউনি বানিয়েছে। মাটি খুবলে ফেলে নিচু উঠনও তৈরি হয়েছে, সে সব জায়গায় চকমকির কারিগরি, চামড়া চাঁছা, রান্না ইত্যাদি দৈনিক কাজ চলত। বিশেষত মধ্য ও পূর্ব য়োরোপ এবং সাইবেরিয়ার খোলা জমিতে আদি বাসিন্দারা মজবুত ঘর তুলে অনেকটা স্থায়ী বসবাস করেছে। একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চেকোসলোভাকিয়ার মোরাভিয়া অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ম্যামথ শিকারীদের গড়া ২৭,০০০ বছর প্রাচীন এক উপনিবেশ।

জায়গাটির বর্তমান নাম দল্‌নি ভেস্‌তোনিৎসে। তৃণাবৃত ঢালু ভূমি, মাঝে মাঝে দু চারটি গাছ, তার মধ্যে পাঁচটি কুটির নিয়ে এই বসতি। এদের অনেকটা ঘিরে এক প্রাচীর তৈরি হয়েছিল ম্যামথের হাড় ও দাঁত মাটিতে পুঁতে তার উপর ঝোপঝাড় ও ঘাসের চাপড়া চাপিয়ে। একটি বাসা অন্যগুলির থেকে প্রায় ৮০ মিটার দূরে, কাছাকাছি ঘর চারটির কাঠামো নির্মিত হয়েছে কাঠের খুঁটি ভিতরের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে মাটিতে গেঁথে, গাঁথনি শক্ত করতে সেখানে চার দিক ঘিরে পাথর চাপানো। পশু চর্মের দেয়াল, সম্ভবত এই ছাল আগে পরিষ্কার করে সেলাই করে জোড়া, তার

পর কাঠামোর উপর ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে পাথর আর ভারী হাড় দিয়ে আটকানো। ঘরগুলির চার পাশের মাটি শক্ত হয়ে গিয়েছে পুরুষানুক্রমিক পায়ের চাপে, এক ধারে ছোট এক ঝোরা ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে, ইতস্তত ছড়ানো ম্যামথ অস্থি, জলার অপর পারে কয়েক লক্ষ শুকানো হাড়ের স্তূপ ম্যামথের উপর অধিবাসীদের নির্ভরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঘরগুলির মাঝামাঝি খোলা জমিতে বেশ বড় এক আগুন জ্বালবার জায়গা, সম্ভবত সর্বদা তাতে হাড় ফেলে ইন্ধন যোগানো হত পশুদের দূরে রাখতে।

সবচেয়ে বড় কুটিরটি ১৫ মিটারের কিছু বেশী লম্বা, ছ মিটার চওড়া, তার মেঝে পাঁচ জায়গায় অল্প খুঁড়ে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা। এমন একটি চুলার সঙ্গে দুটি লম্বা ম্যামথ দাঁত মাটিতে গাঁথা ছিল, সেগুলি ধরে থাকত মাংস সেঁকবার 'শিক'। রান্না ছাড়াও আগুন ঘিরে উপকরণ ও সাজ সরঞ্জাম তৈরি ইত্যাদি প্রাত্যহিক কাজ এবং অবসর বিনোদন পূর্বের মত আমরা অনুমান করতে পারি। মাঝে মাঝে শোনা যেত এক তীক্ষ্ন সুর, শিস দিলে যেমন আওয়াজ হয়; দু তিন জায়গায় ছিদ্রিত এক ফাঁপা হাড়ের এক মুখে ফুঁ দিয়ে কেউ তা বাজাল, এই বাঁশিটি আজও টিকে আছে—মানুষের আদিতম বাদ্যযন্ত্র। হাড়ের তৈরি এমনি আর এক বাঁশি পাওয়া গিয়েছে ফ্রানসের পিরেনে অঞ্চলে, কিন্তু তা মাত্র ১৮, ০০০ বছর প্রাচীন।

দলনিতে পুরাবিজ্ঞানীদের আশ্চর্যতম আবিষ্কার ঘটেছে স্বতন্ত্র পঞ্চম কুটিরটিতে। টিলার ঢালু গা কেটে ঘরটি সেখানে ঠেকানো, দু পাশের দেয়াল কিছুটা পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি, সামনে নিচের দিকে মুখ করে দরজা। ভিতরে আগুনের ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাজা জ্বলন্ত কয়লার উপর গোল করে গড়া মাটির ছাত—রান্নার উনন নয়, আগুন পোহাবার জায়গা নয়, মাটি পোড়াবার আদিতম এক চুল্লী। এটা বিস্ময়ের বস্তু এই কারণে যে মাটির তৈরি পাত্র বা অন্যান্য জিনিস পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়ার কৌশল বহু হাজার বছর পরে নবপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার বলে ধরা হয়। তা ছাড়া সেই আদি কুমোররা ঝোরার ধার থেকে শুধু খানিকটা কাদা তুলে এনে পোড়ায় নি, তারা তার সঙ্গে হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়েছে যাতে পোড়াবার সময়ে তাপ মাটিতে সমান ছড়ায়, ফলে পেয়েছে

পাথরের মত কঠিন বস্তু। পরে মানুষ বিভিন্ন পদার্থ একত্র মিশিয়ে কাচ কাঁসা ইস্পাত টেরিলিন ইত্যাদি এ যুগের অসংখ্য ব্যবহার্য বানিয়েছে, দলনিতে এই কারিগরী কৌশলের প্রথম নিদর্শন দেখা যায়। এর পর জাপানে পোড়া মাটির দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ বছরের ফাঁক।

এই আবিষ্কার কি কাজে লাগিয়েছে দলনির মৃৎশিল্পীরা। ১৯৫১ সালে অনুসন্ধানীরা পেলেন ধোঁয়ার কালি মাখা মেঝেতে ছড়ানো পুতুলের মত ছোট ছোট মূর্তির খণ্ড, তার মধ্যে ছিল ভালুক, শেয়াল ও সিংহের মাথা। একটি বিশেষ মনোরম সিংহ মুণ্ডে ক্ষতের মত এক গর্ত, শিকারী বাস্তবিক পশুরাজকে ঐ রকম আঘাত হানবে শিল্পীর মনে এমন উদ্দেশ্য ছিল হয়তো, নবমানবের রীতি নীতির প্রসঙ্গে আমরা পরে এই ধরনের সম্ভাবনা আলোচনা করব। জন্তু ও মানুষের মূর্তির ভাঙা হাত পাও পাওয়া গিয়েছে, হয়তো পোড়াবার সময়ে সেগুলি খসে গিয়েছে, অথবা তৈরী বস্তুটি শিল্পীর পছন্দ হয় নি বলে সে বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে, তখন তা ভেঙেছে। মূর্তি ছাড়াও চুলার আশেপাশে ছিল মাটির খণ্ড যাদের গায়ে কুমোরের আঙুলের স্পষ্ট ছাপ, কাঁচা মাটি দিয়ে গড়তে গড়তে সে হয়তো কিছুটা বস্তু ছিঁড়ে নিয়েছে, তখন ছাপ লেগেছে, পরে দৈবাৎ আগুনের ছোঁয়া লেগে শক্ত হয়ে গিয়েছে।

সবচেয়ে রহস্যময় কতগুলি ক্ষুদ্র স্ত্রী মূর্তি, কারণ পশু প্রতিকৃতির মত তারা স্বাভাবিক নয়। নানা দেশে নানা কালে ভাস্কররা অনুরূপ বিকৃতাঙ্গ স্ত্রী প্রতিকৃতি সৃষ্টি করেছে, শুধু খেয়ালের বশে নয়, নিশ্চয় কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে। এ নিয়ে যে বিচিত্র জল্পনা হয়েছে তার সূত্র ধরে এই পূর্বপুরুষদের মনোজগতে প্রবেশ করে আমরা আত্মীয়তার আরও নানা সূত্র আবিষ্কার করতে পারি।

ফ্রানস থেকে রাশিয়া পর্যন্ত ওরিনাসীয় থেকে মাদলেনীয় শিল্পীরা সাধারণ পাথর, ম্যামথ দাঁত বা হাড় দিয়ে এই শ্রেণীর স্ত্রী মূর্তি বানিয়েছে, শিলাপটে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিও দেখা যায়। দলনির নমুনাগুলি সম্ভবত এ যাবৎ আদিতম। নৃবিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন জননী দেবী

(mother goddess), মহামাতা (great mother) বা 'ভিনাস', যদিও গ্রীসীর প্রণয় দেবীর কল্পিত চেহারার সঙ্গে এখানে কোনও সাদৃশ্য নেই, কারণ এই ভিনাসরা সাধারণত বিশাল স্তন ও নিতম্বের ভারে বিড়ম্বিত (চিত্র ২৫ খ)। ভারতের কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে আদর্শ সুন্দরী যক্ষপ্রিয়ার অঙ্গ সৌষ্ঠবের বর্ণনায় বলেছেন "শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং", তা মনে রেখেও কোনও কোনও ভিনাস অতিশয়োক্তি মনে হয়, উপরন্তু মূর্তিগুলি "মধ্যে ক্ষামা" নয়, বরং স্ফীতোদরী। অথচ হাত দুটি অত্যধিক সরু, নগ্ন দেহের সামনে লিপ্ত হয়ে প্রায় মিশে গিয়েছে, মুখাবয়বও প্রায়ই অস্পষ্ট, প্রসিদ্ধ ভিলেন্‌ডর্ফ বিগ্রহে মাথার ঘন কোঁকড়ানো চুলে মুখটি প্রায় ঢাকা। এদের থেকে অবশ্য তৎকালীন নারীর চেহারা কল্পনা করা ভুল হবে। বস্তুত ইতস্তত কৃশাঙ্গী ভিনাসও দেখা যায়, যেমন চেকোসলোভাকিয়াতেই বিশ সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন গজদন্তের তৈরি এক মূর্তি, তার কাঠির মত দেহে একমাত্র অঙ্গ শুধু ঝুলন্ত দুই স্তন। পুরুষ মূর্তি বড় দেখা যায় না, অন্যত্র যেমন আফ্রিকায় ভিনাসও গড়া হয় নি।

উচ্চ পেরিগর্দীয় কালে এই পুত্তলিগুলির নির্মাণ বেশী, মাদলেনীয় আমলে যখন য়োরোপে শীত বেড়েছিল তখন তা কমে এসেছে। এর থেকে য়োহানেস মারিংগার জল্পনা করেছেন জলবায়ু যখন অপেক্ষাকৃত মৃদু তখন সমাজে স্ত্রীলোকের মান বেড়েছে, কারণ তারা তখন ফল মূল ইত্যাদি খাদ্যের সংগ্রাহক, তা ছাড়া পরিযায়ী পশুর উপর নির্ভরতা কমে আসাতে মানুষ অনেকটা স্থায়ী ঘর বেঁধেছে, সুতরাং গৃহিণীদের প্রভাব ঊর্ধ্বগামী। এর ফলে জন্ম ও ভূমির উর্বরতার রহস্যের প্রতি কৌতূহল বেড়েছে হয়তো। মাদলেনীয় কালের চরম ঠাণ্ডায় অবস্থাটা বিপরীত, পেটের দায়ে যখন শিকারীরা বলগা হরিণের দল তাড়া করে বেড়িয়েছে তখন ঘর সংসার অস্থির, ভাঁড়ারে মেয়েদের দান কমেছে, তাই তাদের প্রতিপত্তি ও ভিনাস নির্মাণ পড়ন্ত।

মূর্তিগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক প্রধান অভিমত হল যে এরা উর্বরতার প্রতীক, তাই যৌন বৈশিষ্ট্য এত প্রকট এবং স্ফীত উদর হয়তো সন্তান সম্ভাবনার নির্দেশক। নানা দেশে নবপ্রস্তর যুগের কৃষী সম্প্রদায়ের এবং পরে আদি ঐতিহাসিক সমাজের ভাস্কররা তথাকথিত জননী দেবীর অজস্র বিগ্রহ বানিয়েছে

বিভিন্ন রূপ দিয়ে, যেমন মহেন্‌জোদারো ও হরপ্পার মৃন্ময়ী কৃশাঙ্গিনীরা। মিশর ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসগুলিতে অধিষ্ঠিতা ছিল প্রজনন, উর্বরতা ও নবীকৃত জীবনের প্রতিভূ মাতৃদেবী বা পৃথিবী মাতা। এই প্রাণদাত্রী লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যে ঘরে সন্তান মাঠে ফসল। পক্ষান্তরে হয়তো এই দেবী ও ভিনাস একই সূত্রে গাঁথা, কারণ এমন বিশ্বাসও দেখা যায় যে মূর্তিগুলির তাৎপর্য নর নারীর যৌন মিলন সম্পর্কিত, কারণ পুরামানবের মনে প্রবলতম আবেগ জাগত সংগমে ও শিকারে। আংগ্‌ল্‌স-স্যুর লাংগ্‌ল্যাঁ গুহা গাত্রে পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির বিস্ফারিত যোনি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলেছেন এ সবের সঙ্গে কোনও যৌন অনুষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল হয়তো। কিন্তু অধিকাংশ ভিনাসে জননী রূপেই বেশী উচ্চারিত।

মূর্তিগুলি গুহায় বা বাসায় পাওয়া গিয়েছে বলে নৃবিজ্ঞানীরা তাদের জননী বা অন্নদাত্রী ছাড়া পরিবারের ধাত্রী বাস্তুদেবী রূপেও কল্পনা করেছেন, ঘরে ঘরে গৃহস্থ ও তার পরিবারের একান্ত আপন এই কল্যাণী রক্ষিকা দেবী বিপদ দূর করে, মঙ্গল আনে এই বিশ্বাস সুপ্রাচীন; মূর্তিগুলি প্রায়ই পায়ের দিকে সরু, যেন মাটিতে বা কোনও রকম বেদীতে গাঁথার উপযুক্ত করে তৈরি। ইউক্রেইনের এক কুটিরের অধিবাসীরা এমন সাতটি মূর্তি দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ভগ্নাবশেষ সেই অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

অলৌকিক শক্তির ধারণা সে কালে নিশ্চয় বদ্ধমূল ছিল, সুতরাং এও সন্দেহ করা হয়েছে যে এখন নানা প্রাচীন উপজাতি যেমন বিভিন্ন জড়বস্তুর পূজা করে এরা সেই জাতীয়, তাদেরই মত হয়তো ক্রোমানীয়দের বিশ্বাস ছিল যে এরা কোনও আত্মা বা অলৌকিক শক্তির আধার; মূর্তিগুলি ছোট বলে তাদের সঙ্গে রাখা চলত, সৌভাগ্যদায়ক রক্ষাকবচের মত। অথবা শিকারী শিল্পীরা যে আশায় গুহার গায়ে গর্ভবতী বা মৈথুনরত পশুর ছবি এঁকেছে এদেরও তাই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ পশুদের বেশী বাচ্চা হবে, সুতরাং শিকার সহজ হবে, দর্দনিয়তে শিলা গাত্রে উৎকীর্ণ এক ভিনাস এমনি এক রূপক বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে জননী দেবী কিংবা বাস্তুদেবী রূপেই হাজার হাজার বছর ধরে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত এই সব স্ত্রী মূর্তি তৈরি হয়েছে। যাই হক, প্রথম অঙ্কুরিত ধর্মবিশ্বাস বা যাদুকরী শক্তির

সঙ্গে যুক্ত হলেও কোনও কোনও ভিনাসের এক বিশেষ সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে, লেস্‌পুগ, ভিলেনডর্ফ, ব্রাসেম্‌পুয়ি ইত্যাদি স্থানের প্রতিকৃতিগুলি ব্যবহারিক প্রেরণার অতীত চারুকলার পর্যায়ে উঠেছে।

যেমন জন্মের রহস্য তেমনি মৃত্যুও মানুষকে ভাবিয়েছে—মৃত্যুর ভয়, এই চরম নিয়তির কি অর্থ, তার পরে লোকে কোথায় যায় এই সব প্রশ্ন মানুষের সৃষ্টি কাল থেকে আজও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। নেআনডার্টালরা যে সযত্নে শব সমাধিস্থ করেছে, কখনও সঙ্গে দিয়েছে বুনো ফুল, ফ্রানসের কবরে পশুর মাংস পর্যন্ত, তাতে দেখি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রাচীন সূচনা। তার পর ক্রোমানীয় সমাজে মৃতের সমাধি প্রথা অনেক বেড়েছিল বলেই নৃবিজ্ঞানীরা তাদের সম্বন্ধে দৈহিক ও সামাজিক তথ্য এত বেশী সংগ্রহ করতে পেরেছেন। প্রথম আবিষ্কারের ক্ষেত্র ফ্রানসের ক্রো-মানিয়ঁ শিলাশ্রয়ে মৃতের সঙ্গে যে অস্ত্র অলংকার দেওয়া হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। মোরাভিয়ার প্রেডমসট ঘাঁটিতে এক সাম্প্রদায়িক কবরে আটটি শিশু ও বারোটি সাবালকের দেহ রক্ষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাধারণত এক জন বা দু জন করে গোর দেওয়া হত গুহার ভিতরে বা খোলা জায়গায় তাঁবু জাতীয় আবাসের আশেপাশে, সমাধি গহ্বরের উপরে প্রায়ই ভারী পাথর কিংবা ম্যামথ দাঁত বা হাড় চাপানো, কখনও বা শব দেহের নিচেও শিলা শয্যা। গুহার কঙ্কাল প্রায়ই পাওয়া গিয়েছে পাশ-ফেরা অবস্থায়, হাঁটু মুড়ে পা দুটি গোটানো, যেন ঘুমের ভঙ্গি বা গর্ভস্থ ভ্রূণের অনুকরণে। সম্ভবত কখনও ঐ অবস্থায় দেহ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে যাতে প্রেতাত্মা জীবিতদের উত্যক্ত করতে না পারে। অনেক নেআনডার্টাল কবরে যে দেহের একই ভঙ্গি দেখা যায় তা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু মৃতের সৎকারে অবশ্য চরম আড়ম্বর প্রকাশ পেয়েছে রাশিয়ার ঘাঁটিগুলিতে। সমাধিকরণের আগে দেহ যে আপাদমস্তক পোশাকী সাজে সজ্জিত, নানা আভরণে ভূষিত হয়েছে তা আপন জনের প্রতি যত্ন ও বিবেচনার সাক্ষ্য দেয়, বিবর্ণ পাণ্ডুর ত্বকে তারা লাল গেরিমাটি মাখিয়েছে স্বাভাবিক রক্তিমা ফিরিয়ে আনতে—মৃত্যু কি এত দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে যে এই 'মৃতসঞ্জীবনী' দিয়ে প্রিয় জনের প্রাণ ফিরিয়ে আনবার করুণ প্রচেষ্টা সেটা? কিন্তু সম্ভবত সেরা মানুষ হোমো সেপিয়েনস সেপিয়েনস মৃত্যুকে মেনে

নিতে শিখেছিল, তা হলে এই গৈরিকের কোনও সাংকেতিক উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষত তা যখন সজ্জিত দেহেও ছড়ানো হয়েছে, সিংগুরে বৃদ্ধ ব্যক্তিটির পোশাক ক্ষয়ে গিয়ে তা এখনও হাড়ে লেগে আছে। হয়তো তারা বিশ্বাস করত এই রঙে যাদু আছে; অথবা তা তাজা রক্তের প্রতীক, ব্যবহার হয়েছে শুধু জীবিতের রূপ দেওয়ার চেষ্টায়। সুংগিরে বালক দুটির দেহ যে মাথা কাছাকাছি ও পা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে করে শায়িত হয়েছে তার নিশ্চয় কোনও অজ্ঞাত তাৎপর্য আছে। তাদের সঙ্গে ম্যামথ দাঁতের বর্শা এবং আদেশ-দণ্ডই বা কেন?

ক্রোমানীয় কবরে কখনও কখনও পশুর মুণ্ড কিংবা দাঁত বা শিং পাওয়া গিয়েছে, এ কালের আদিবাসীদের রীতি নীতির সঙ্গে তুলনা করে অনেকে তা টোটেমের প্রতীক বলে মনে করেন। টোটেম সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা চলে যে তা হল কোনও এক বিশিষ্ট জীব বা বস্তু যার আত্মা যার গুণ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, তা সেই গোষ্ঠীর মৈত্রী বন্ধন, এই টোটেমকে ঘিরে তাদের সমাজ ও দর্শন; যথা, আমাদের যেমন এক গোত্রে বিয়ে হয় না, তেমনি একই টোটেম গোষ্ঠীতেও হয় না। আজও পৃথিবীর যে সব জাতি প্রায় পুরাপ্রস্তর যুগে বাস করছে তাদের মধ্যে টোটেম তন্ত্র খুব প্রবল, যেমন আমরা ১০ম অধ্যায়ে দেখব।

মৃতের সৎকারে এত ঘটা, সমাধিতে রক্ষিত দান সামগ্রী নিয়মবদ্ধ রীতি নীতির নির্দেশক। যে নেআনডার্টালরা কবরে মাংস রেখেছে তারা নিশ্চয় পরকালে বিশ্বাস করত, খাঁটি মানুষও সম্ভবত পরজীবনে সুখ সুবিধার জন্য এত রকম ব্যবস্থা করেছে; বহু সহস্র বছর পার হয়ে ঐতিহাসিক কালেও নানা দেশে এই রীতি অব্যাহত, চরম নিদর্শন মিশর। অবশ্য ক্রোমানীয় আমলে মৃতের সাজ সজ্জা, রক্ষিত বস্তু ইত্যাদি শুধু ইহজগতে তার মান সমৃদ্ধির নির্দেশক হতে পারে, অথবা সব আয়োজন হয়তো তার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে। অনুমান করা চলে এর সঙ্গে এমন অনুষ্ঠানও ছিল যার কোনও চিহ্ন নেই, হয়তো নাচ গান চিৎকারে গুহা প্রান্তর গম গম করে উঠেছে।

উচ্চ পুরাপ্রস্তর আনুষ্ঠানিক অন্ত্যেষ্টি প্রথার নজির পাশ্চাত্ত্য দেশেই সীমিত নয়, আমাদের সুপরিচিত চৈনিক খাঁটি জোকোডিয়েনে প্রাপ্ত পূর্বোল্লিখিত

অস্থিগুলিতে লাল হিমাটাইট গেরিমাটি লেগে আছে, তার থেকে একই ধরনের অনুষ্ঠান সন্দেহ হয়। হাড় যা পাওয়া গিয়েছে তা দেখে মনে হয় যেন ভারী অস্ত্রে ঘা মেরে ফাটানো হয়েছে, তার ইঙ্গিত এই যে খাঁটি মানুষও এই গুহা শ্রেণীর পূর্বতন হোমো ইরেকটাস বাসিন্দাদের নরখাদক বৃত্তির ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। হাড়গুলি এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত যে সমাধিস্থ হওয়ার আগে অন্তত কোনও কোনও দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অবশ্য গুহায় যে নানা জানোয়ারের আড্ডা ছিল তা জানা আছে, কিন্তু অন্যত্রও কোনও কোনও ঘাঁটিতে অনুরূপ নজির আছে, কোথাও পায়ের লম্বা হাড় ফাটানো যেন মজ্জার লোভে, খুলি পিছন দিক থেকে ভাঙা যেন মগজ বার করতে। পেটের দায়ে বা হিংসার বশে নয়, প্রধানত আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে যে প্রাচীন মানুষ এই কাজ করে থাকতে পারে আদিবাসী গোষ্ঠীদের নজির থেকে এই সম্ভাবনার বিস্তৃত আলোচনা আগে হয়েছে।

আজও মানুষ মৃত আত্মীয়ের 'অস্থি' নিয়ে এসে ঘরে রাখে, তেমনি অনেক আদিম উপজাতি খুলি রক্ষা করে। অসট্রেলীয় আদিবাসীরা মৃতের কিছু হাড় শুকিয়ে মোড়কে ভরে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। ক্রোমানীয়রাও যে খুলি এবং অস্থি সংগ্রহ করে থাকতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে দুটি ফরাসী গুহায়, একটিতে কোনও উদ্দেশ্যে এক সমতল পাথর পাটার উপর তিনটি খুলি রক্ষিত, অন্যটিতে কারা যেন এক নারী মুণ্ড ঘিরে সযত্নে সাজিয়েছে খোলকের অলংকার, অন্যত্র কয়েকটি খুলির খণ্ড এক ছোট সুড়ঙ্গের শেষে সমান যত্নে এক সারিতে চিত করে রাখা। খণ্ডগুলি পরীক্ষা করে ফ্রানস ও জার্মেনির দুই বিশেষজ্ঞ বলেছেন সেগুলি বাটির মত ব্যবহার হয়েছে ; খুলির গা থেকে মাংসের আবরণ পাথরের উপকরণ দিয়ে কেটে চেঁছে পরিষ্কার করবার চিহ্ন রয়েছে এবং মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করতে যেখানে কাটা হয়েছে সে জায়গাটা ঘষে চার দিক সমান করা হয়েছে, ফলে তৈরি হয়েছে নরকপালের পাত্র।

খুলি আত্মীয় জনের হলে স্নেহ মমতা ও গর্বের সঙ্গে তা ব্যবহৃত হয়েছে, শত্রুর হলে বিজয়ের চিহ্ন রূপে। য়োরোপে টিউটন, শক ইত্যাদি জাতির যোদ্ধারা বিজিত শত্রুর খুলি থেকে পান করত, তার পর মধ্য যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধুসন্তদের করোটি পান পাত্র রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতে

নানা কালে খুলির ব্যবহার সুবিদিত, আজও রাজপথে তা নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য হয়ে থাকে। নিজেদের মুণ্ড ছাড়া ক্রোমানীয়রা পশুর খুলি ও হাড়ও কিছু এমন ভাবে রেখে গিয়েছে যার থেকে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সন্দেহ হয়। কোথাও যেন শিকারে সাফল্য আনতে বলি দান, অন্যত্র পশু পূজার ইঙ্গিত, যেমন ভল্লুক মুণ্ডে। আমরা আগে দেখেছি নেআনডার্টালরা প্রকাণ্ড গুহা ভালুক শিকার করে তাদের খুলি গুহার গহনে সযত্নে সাজিয়েছে, যেন পূজা জাতীয় কোনও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, যেমন আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়। ভালুক নিয়ে অনুরূপ কোনও বিশ্বাসের নিদর্শন খাঁটি মানুষের উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগেও আছে।

এ ছাড়া এই মানুষের আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি নীতি নিশ্চয় আরও ছিল যার কোনও স্পর্শযোগ্য নজির নেই, সেগুলি যুক্তিসংগত অনুমান সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের অনুশীলন বিশেষ মূল্যবান, কারণ বর্তমান সভ্য সমাজের কিছু কিছু প্রথার অংকুর যেমন এই সব প্রাচীন সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তেমনি তারাও অনেক বিশ্বাস ও বিধি বিধান প্রাচীনতর কাল থেকে পেয়েছে। বনমানুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মনুষ্য শাখার সামাজিক অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে কতগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশে। নিজের আচরণে দোষ গুণের বিচার, যাকে বলি বিবেক, তা এমনি এক বিশেষত্ব। তাই এর থেকে কিছু বিধি নিষেধ দরকার হয়ে পড়ল, দেখা দিল কড়া সুনির্দিষ্ট সামাজিক আইন কানুন, ইংরেজিতে যার নাম ট্যাবু। তার পরিণতি আজও প্রত্যক্ষ একাধারে কথাকথিত অসভ্য ও সুসভ্য সম্প্রদায়ে। ভাই বোন, পিতা কন্যা, মাতা পুত্রের যৌন সংগম (অজাচার) নিষিদ্ধ হল— এমন কি সমাজ ভেদে বিভিন্ন অনুপাতে আরও দূর সম্পর্কিত আত্মীয়ের যৌন মিলনও। এই ট্যাবুর সূচনা দূর অতীতে তমসাবৃত এবং এর অব্যবহিত কারণ অজ্ঞাত, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে একই পরিবারের বংশকণিকার মিশ্রণে ক্রমে বংশ অবক্ষয়িত হয়। বিজ্ঞান না জেনেও সেই অতীতে মানুষ এই অবক্ষয় লক্ষ্য করেছে কি ?

আমরা আগে জল্পনা করেছি বিবাহ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে স্ত্রী পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় মিলেছে প্রথমে অস্থায়ী, ক্রমশ আরও পাকাপাকি

সংসারে। মানুষের শৈশব বনমানুষ, বানর ও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায়, প্রলম্বিত, তাই নাবালকদের লালন পালন শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনে যৌথ বন্ধন দৃঢ় হয়েছে, পাকা পারিবারিক সম্পর্কের আরও নানা সুবিধা মানুষকে সে দিকে টেনেছে। একই যুগল ক্রমে সঙ্গী সঙ্গিনী বদল না করে ঘর বাঁধল, তার থেকে আনুষ্ঠানিক বিবাহ। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহের ফলে শুধু অজাচার ও তজ্জনিত অবক্ষয় বন্ধ হয় নি, যৌথ শিকারে দল ভারী হয়েছে।

খাঁটি মানুষের কালে নিশ্চয় এই সব দিকে সমাজ অনেকটা সংহত হয়েছে। সাধারণত দু তিনটি পরিবার একত্র বাস করেছে, একই এলাকায় শিকার করে তার বেশী লোকের দিন চলত না, অবশ্য যখন অপর্যাপ্ত আহার জুটেছে তখন দল বড় হয়েছে। সারা জীবনে সাধারণত কারও কয়েক শো'র বেশী লোক চোখে পড়ত না, এই আয়ুও ছিল স্বল্প, শতকরা ১০ জন ৪০ পার হত, পঞ্চাশোত্তীর্ণ ব্যক্তি হয়তো এক জন। অভিজ্ঞতার খাতিরে প্রবীণরা গণ্য মান্য পরামর্শদাতা, শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ, ছেলে মেয়েদের মানুষ করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তারা বুদ্ধি দেয়, লতা পাতা শিকড় দিয়ে রোগ সারায়। মৃত্যু এসেছে নানা পথে—হিংস্র জন্তুর আক্রমণে, আততায়ীর আঘাতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, অনাহারে এবং অবশ্য সংক্রামক এবং বাত ইত্যাদি অন্যান্য রোগে। অনেক রোগ এখন সারে, তখন মারাত্মক ছিল, কিন্তু ভেষজ বস্তু থেকে সম্ভবত কিছু টোটকা ওষুধ বানাত ক্রোমানীয়রা, হয়তো অস্ত্রচিকিৎসাও শিখেছিল কিছু—প্রাচীনতর মানুষের ফসিলে তার চিহ্ন দেখেছি আমরা। কিন্তু বর্তমান সভ্য যুগের সবচেয়ে বড় দুটি হন্তা কর্কট রোগ ও হৃদ্‌রোগের প্রকোপ কম ছিল। এ কালের মত দূষিত জল বাতাস এবং অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বাস্থ্যহানিও হত না।

অনেকের মতে পুরামানব সাধারণত শান্তিপ্রিয় ছিল, বস্তুত হিংসাত্মক হানাহানি বা লড়াইয়ের স্পষ্ট নজির আদি ঐতিহাসিক যুগের আগে অতীব বিরল। দলের কর্তা জোয়ান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যুক্ত পরিবারবর্গ বা গোষ্ঠীর মধ্যে তার প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী। সে শাস্তি বিতরণ করে, নানা বিষয়ে বিধান দেয়, যেমন শিকার কৌশল, অন্য দলের সঙ্গে সম্পর্ক, কখন কোথায়

গিয়ে ঘাঁটি বাঁধতে হবে, ইত্যাদি। সে স্বপ্নে বারে বারে দেখা দেয়, ক্রমে ভয় ও ভক্তির উৎস এই দলপতিই হয়তো দেবতার রূপ ধারণ করল। এ ছাড়া খাঁটি মানুষের সমাজে এক আধ্যাত্মিক নেতার প্রয়োজন দেখা দিল যে একাধারে আদি পুরুত ও ওঝা (shaman, witch doctor), সব কিছুর ব্যাখ্যা করে সে, বলে দেয় কোন বস্তু, প্রাণী, প্রকৃতিক ঘটনা বা সংকেত অমঙ্গলের প্রতীক, কি করলে কি ফল পাওয়া যাবে তার বিধান দেয়, তুকতাক আর কুহক দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করে। সভ্যতার আলোতেও আজ আমাদের মন থেকে এই সংস্কার কুয়াশা কেটে যায় নি, তখন তা মনের প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল, সুতরাং সমাজে এই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা সহজেই অনুমেয়। আগামী অধ্যায়ে তার কাজকলাপের আরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

গর্ভধারণযোগ্যা মেয়েদের প্রায় সর্বদা পেটে নয়তো কোলে শিশু, হয়তো দুইই। দলে শিশুর অনুপাত বেশী। সাজ সজ্জার আড়ম্বর দেখে মনে হয় তারা অনেকখানি ভালবাসা পেয়েছে, যদিও অনেকেরই অল্প বয়সে আয়ু ফুরিয়েছে। তা ছাড়া প্রাচীন সমাজে নানা কারণে শিশু নিধন আমরা আলোচনা করেছি, আদি কালের খাঁটি মানুষও হয়তো খাদ্য সংকটে কিছু কিছু মেরে ফেলেছে, বিশেষত দুর্বল ও অসুস্থদের। অনেকে অনুমান করেন যে বয়স হলেও পুরামানবের মন ছিল শিশুর মত সরল, প্রায় সম্পূর্ণ রূপে সাময়িক আবেগ ও কল্পনার বশবর্তী। শিশু যেমন গল্প বানাতে ভালবাসে, নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, সেও তেমনি প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা নিয়ে গল্প বানাত, মুখপরম্পরায় বংশপরম্পরায় কিংবদন্তী ক্রমে পবিত্র সত্য হয়ে উঠল, ধর্মবিশ্বাস বিধি ব্যবস্থা বা পুরাণ কাহিনীর অংশ হয়ে গেল।

এই সব ভাবনা ও গল্পগাথার অবসর বেড়েছিল, কারণ উন্নত মেধার সাহায্যে নানা যন্ত্র বানিয়ে এবং কৌশল খাটিয়ে খাঁটি মানুষ তার দিনগত কাজ সহজ করেছে। কিন্তু মন শুধু কল্পনার জাল বুনেই তুষ্ট থাকে নি, বাইরের জগৎটা নিয়ে তাতে দেখা দিয়েছে নানা জিজ্ঞাসা। অনেকের মতে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক চিন্তার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে অনেক পরে ঐতিহাসিক কালে (অবশ্য আজও আমাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস সর্বদা যুক্তিনিয়ন্ত্রিত নয়), তবে উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগেও অঙ্কুরিত বৈজ্ঞানিক চিন্তার কিছু আভাস পাওয়া

যায়। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি দুটি গুহায় প্রাপ্ত খাঁজ-কাটা পাথর ও আঁচড়-কাটা হাড় থেকে জল্পনা হয়েছে তা হয়তো নেআনডার্টাল মানবের গণনার সংকেত, খাঁটি মানুষের আমলে এই ধরনের রহস্যময় চিহ্ন আরও সুপ্রচুর। সুংগিরে অধ্যাপক বাডারের অন্যান্য আবিষ্কারের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে হাড়ের তৈরি এক চাকতি ও ছোট একটি অশ্ব মূর্তি, এগুলির গায়ে খোদাই করা কয়েকটি চিহ্নের সংখ্যা ও অবস্থান দেখে তাঁর মনে হয় যে অধিবাসীরা হয়তো গুণতে শিখেছিল।

১৯৬০ দশকে এর চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার দাবি করেছেন মার্কিন অনুসন্ধানী অ্যালেকজ্যানডার মার্শাক। তিনি আগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখতেন, এখন নিজেই বিজ্ঞানী। খোদাই করা দাগ বা চিহ্নের খোঁজে প্রস্তর যুগের শত শত বস্তু ও উপকরণ অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে তিনি সবচেয়ে বেশী পেলেন ওরিনাসীয় সৃষ্টিতে, আদিতমটির বয়স প্রায় ৩৪,০০০ বছর। গোটা তিরিশেক খণ্ডের সূক্ষ্ম পরীক্ষার পর তাঁর সন্দেহ হল হয়তো চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে চিহ্নগুলির সম্পর্ক আছে। আশ্চর্যতম নমুনাটি বলগা হরিণের শিং চেঁছে তৈরি এক ফলক, অর্ধশতাব্দীরও আগে দর্দনিয়ের এক শিলাশ্রয়ে প্রাপ্ত, তার উপর চোখা যন্ত্র দিয়ে খুঁটে বিসর্পিল পথে কেউ পর পর গর্ত করেছে, তাদের সংখ্যা ৬৯; ভাঁজ করা সুতোর মত এই রেখা কয়েক বার উলটো দিকে ঘুরেছে।

অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় মার্শাকের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল, তিনি বলেন চিহ্নগুলি আলংকারিক নয় কারণ সবগুলি এক বারে শেষ করা হয় নি, দু তিন বারেও না; যন্ত্রটি বদলানো হয়েছে ২৪ বার, সেই সঙ্গে যন্ত্রীর হাতের চাপ ও কৌশলও বদলেছে। সুতরাং মার্শাকের মনে হল সেই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ফলকের গায়ে নিয়মিত সংকেত কেটেছে, নিজের বা দলের স্বার্থে। তিনি বললেন দুই ও এক-চতুর্থাংশ মাস ধরে প্রতি রাতে কেউ চন্দ্রোদয় লক্ষ্য করে ফলকটি চিহ্নিত করেছে এবং সংকেতের রেখা মোড় ঘুরেছে মোটামুটি প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর যখন চাঁদের বৃদ্ধি ও হ্রাস আরম্ভ হয়ে তার উদয়ের স্থান বিপরীত দিকে সরতে থাকে, যথাক্রমে পশ্চিম থেকে পূবে এবং পূব থেকে পশ্চিমে। তা যদি হয় তো এই ক্রোমানীয়রা নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ

করে তা 'নথিভুক্ত' করতে শিখেছিল। কিন্তু গর্তগুলির এই তাৎপর্য বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মানেন না, যদিও অন্যরা সমর্থন করেন। ঐতিহাসিক কালের সূচনায় সুমেরে হিসাব রাখবার জন্য দলিল তৈরি করতে মাটির ফলক খুদে খুদে লিখন আরম্ভ হয়েছে, মার্শাক তত্ত্ব সত্য হলে তার প্রায় ২৮,০০০ বছর আগেই মানুষ একই কৌশলে নিজের দরকারী হিসাব রেখেছে। যদিও তাকে পাঠ্য লিপি বলা যায় না, তা হয়তো লিখন, পাটিগণিত ও বর্ষপঞ্জীর ক্ষীণতম প্রাথমিক আভাস এমন কথা উঠেছে।

খাঁটি মানুষের আচার ব্যবহার বিধি ব্যবস্থা নিয়ে তার সমাজের যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে বর্তমান সভ্য সমাজের সঙ্গে নানা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া এবং আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ বলে তাদের চিনতে পারা কঠিন নয়। শুধু আকৃতিতে না, প্রকৃতিতে বসনে ভূষণে পছন্দে অপছন্দে সংস্কারে লোকাচারে এ যুগের নির্ভুল পূর্বাভাস দেখা যায় তাদের মধ্যে। কিন্তু এই সেরা মানুষ তার সেরা কীর্তি রেখে গিয়েছে দুর্গম গুহার আঁধারে আশ্চর্য প্রাচীর চিত্রে। বহু সহস্র বছর পরে সেই গুপ্ত শিল্প সম্ভার আবিষ্কার করে তাদের সুসভ্য উত্তরাধিকারীরা অবিশ্বাস ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে। এই কীর্তি কেবল সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে না, শিল্পীদের ধ্যান ধারণা আশা আকাঙ্ক্ষারও আভাস দেয়, তা ছাড়া কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন তুলে রহস্য ঘন করে। এই সৃষ্টির সম্যক পরিচয়ের জন্য এক পৃথক পরিচ্ছেদ দরকার।

৯। আঁধারের ফুল গুহাচিত্র

১৮৬৮ সালে একদা স্পেইন দেশের পাহাড়ী জমির উপর দিয়ে এক শেয়াল প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে তাড়া করে আসছে জনৈক শিকারীর কুকুর। পলাতক পশুর এবং মানব জাতির ভাগ্য ভাল যে কুকুরটি কতগুলি প্রকাণ্ড পাথরের ফাঁকে পড়ে আটকে পড়ল, তাকে উদ্ধার করতে পাথর সরিয়ে শিকারী দেখে সামনে হাঁ করে আছে এক গুহার মুখ। জমির নাম আল্তামিরা, মালিক সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোক ডন মার্থেলিনো দে সাউতুওলা, পুরাতত্ত্বে উৎসাহী তিনি—এই শ্রেণীর শৌখিন প্রত্নবিজ্ঞানীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু এই গুহা উদঘাটনের কথা তিনি জানতেও পারলেন না সাত বছর পর্যন্ত, তার পর একদা ভিতরে ঢুকে পেলেন প্রাচীন বাইসন ঘোড়া হরিণ ইত্যাদির হাড়। পরে তুষার যুগের কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাঁর আগ্রহ বাড়ল, গুহার ভিতরে খুঁড়ে কিছু পাথুরে হাতিয়ারও সংগ্রহ করলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের নজরটা নিচের দিকে না হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য গুহার ছাত এত নিচু যে উপর দিকে তাকানো সহজ নয়।

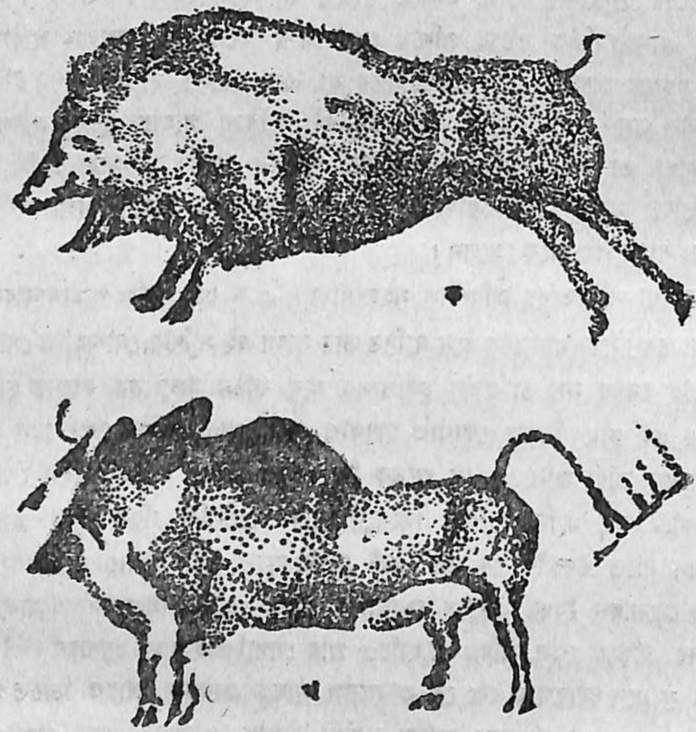
সে দিকে প্রথম দৃষ্টি দিল তাঁর ১২ বছরের মেয়ে। ১৮৭৯ সালে এক দিন বাবার সঙ্গে সে এসেছে গুহা দেখতে, ডন মার্থেলিনো হেঁট হয়ে পাথর খুঁজে চলেছেন, মারিয়া লণ্ঠন হাতে ঘুরে ঘুরে দেখছে, হঠাৎ "তোরো তোরো (ষাঁড় ষাঁড়)" বলে চিৎকার করে সে বাবার কাছে ছুটে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—খিলানের মত গোল শিলাপটে নানা রঙে রঞ্জিত বিচিত্র সব পশু চিত্র, পরস্পরের গা ঘেঁষে বিবিধ ভঙ্গিতে ষাঁড় বাইসন ঘোড়া হরিণ ইত্যাদি, কম্পিত দীপালোকে যেন প্রাণবন্ত চঞ্চল তারা। এই ক্ষুদ্র আবিষ্কর্ত্রীর ক্ষুদ্রতাই ছিল সহায়, সহজেই সোজা হয়ে সে ছাতের দিকে তাকিয়েছে।

কিন্তু এই চাপা গুহার অন্ধকারে কারা এঁকেছে এই অবিশ্বাস্য ছবি? ডন মার্থেলিনো ছুটলেন ম্যাড্রিড শহরে এক অধ্যাপকের পরামর্শ নিতে, তিনি এসে স্বচক্ষে দেখে গুহায় তুষার যুগের পরে কারও প্রবেশের নজির পেলেন না। খবর শুনে বিশ্বের লাগল বিষম বিস্ময়, কিন্তু সে যুগের মানুষ যে এমন ছবি এঁকেছে প্রায় সব পণ্ডিত তা অগ্রাহ্য করলেন। মানুষের প্রাচীনতা তাঁরা মানতে রাজী, তা বলে এমন শিল্পদক্ষতা নয়। এক আন্তর্জাতিক সভায় পশ্চিম য়োরোপীয় বিশেষজ্ঞরা বললেন ছবিগুলি ২০ বছরের বেশী পুরনো হতে পারে না, এক ফরাসী পণ্ডিত যখন ইঙ্গিত করলেন ডন মার্থেলিনোর এক সহকারী লুকিয়ে গুহায় ঢুকে ছবিগুলি এঁকেছেন তা এই বিচক্ষণ গণ্যমান্যদের সমর্থন পেল। আসলে তিনি এই পটগুলির নকল তৈরি করছিলেন। ডন মার্থেলিনো গুহায় তালা লাগিয়ে ১৮৮৮ সালে পরলোকে গেলেন।

অবশ্য পণ্ডিতদের অবিশ্বাস সহজবোধ্য। একে তো বর্বর পুরামানবের যে ধারণা তখন সভ্য মানুষের মনে মুদ্রিত তার সঙ্গে এই সৃষ্টির সৌন্দর্য ও সৌকর্য মোটেই মেলে না, তা ছাড়া চুনাপাথর খুব কঠিন বস্তু নয়, হাজার হাজার বছরে এই ছাত নিশ্চয় কোথাও কোথাও ক্ষয়ে পড়ত, ছবির রংও ম্লান হত। পক্ষান্তরে তাঁরা জানতেন যে অনেক দিন আগেই এক ফরাসী গুহায় খোদিত কয়েকটি পশু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যদিও সেগুলি রঙিন নয়। হাড় বা ম্যামথ দাঁতে উৎকীর্ণ যে সব ছোট ছোট মূর্তি তাঁরা তুষার যুগের সৃষ্টি বলে মেনেছেন বিষয় বস্তুতে সেগুলির সঙ্গে আলতামিরার স্পষ্ট সাদৃশ্যও তাঁদের এড়িয়ে গেল, যদিও গুহাচিত্র প্রায় সেগুলিরই বৃহৎ রূপায়ণ। কিন্তু ক্রমে ফ্রানসে ফঁদগোম এবং লে কঁবারেল নামক জায়গায় আরও চিত্রিত গুহা আবিষ্কারের পর সন্দেহের কুয়াশা কাটতে লাগল, পণ্ডিতরা একে একে ভুল স্বীকার করলেন। অবশ্য গুহাচিত্র সর্বত্র খাঁটি কিনা সেই তর্ক এখনও সম্পূর্ণ স্তব্ধ নয়, যদিও বিখ্যাত ফরাসী বিশেষজ্ঞ আবে অঁরি ব্রয়ী এই শিল্পের প্রাচীনতা প্রমাণে বহু বছর ধরে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা অধিকাংশে সফল হয়েছে। ১৯৫৬ সালে রুফিনিয়াক গুহায় জলহস্তী ও অন্যান্য জন্তুর ছবি পরীক্ষা করে তিনি তাদের প্রাচীনতা সমর্থন করলেন,

অবশ্য অবিশ্বাসীরা বললেন ১৯৪৮ সালের আগে ছবিগুলি ছিল না, পরের আট বছরে তারা ক্রমশ চিত্রিত হয়েছে।

আজ সারা জগতের লোক আসে এই আশ্চর্য চিত্র সম্ভার দেখতে। এই চিড়িয়াখানায় বাইসনের প্রাধান্য, কিন্তু তা ও পূর্বোক্ত জন্তুগুলি ছাড়া আলতামিরায় আরও রূপায়িত হয়েছে বন্য বরাহ ও একটি নেকড়ে। আয়তনে



চিত্র ২১। আলতামিরার বহুবর্ণ চিত্র; ক—বরাহ, খ—বাইসন।

অনেকগুলি বাস্তবিক প্রাণীদের সমান কি আরও বড়, উজ্জ্বল লাল বাদামী হলদে ও কালো রং গায়ে। কোথাও কোথাও শিল্পীরা ছাতের অসমতল পটের সুযোগ নিয়ে আরও প্রাণ ফুটিয়েছে দেহে, যথা উঁচু অংশে এঁকেছে

গোল নিতম্ব। হয়তো এই সুবিধার জন্যই তারা দেয়ালে না এঁকে ঘাড় ব্যথা সহ্য করেও ছাতে এঁকেছে। প্রধান কক্ষটি ১৮ মিটারের অল্প বেশী লম্বা, প্রায় আট থেকে নয় মিটার চওড়া, চিত্রিত পশুর সংখ্যা অন্তত ২৫, কিন্তু শিল্পীরা কখনও একটির উপর আর একটি মূর্তি এঁকেছে, নিচের অস্পষ্ট ছবিগুলি গুনলে সব মিলিয়ে এক শতের কাছাকাছি। পুরাবিৎ য়োহানেস মারিংগারের মতে ওরিনাসীয় কাল থেকে এখানে অংকন চলেছে, শুধু বহিররেখায় রূপায়িত ক্ষুদ্র চিত্র থেকে শুরু হয়ে মাদলেনীয় আমলের বৃহৎ বহুবর্ণ মূর্তিতে রং ও রেখার নিপুণ ব্যবহারে এই শিল্পের পূর্ণ স্ফূর্তি।

এখন নানা য়োরোপীয় গুহা বা শিলাশ্রয়ে ক্রোমানীয় চিত্র উন্মুক্ত হয়েছে, শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানস ও উত্তর-পশ্চিম স্পেইন ভূখণ্ডেই প্রায় ১০০। উৎকৃষ্টতম কাজগুলি সাধিত হয়েছে ১৮,০০০-১২,০০০ বছর আগে। নতুন আবিষ্কারের কাজ আজও চলছে, তার একটা কারণ এই যে ও সব দেশে গুহা আবিষ্কারের নেশায় সাধারণ লোকের অনেকে মাতে, যেমন মাতায় উঁচু থেকে আরও উঁচু পাহাড়ে চড়ার নেশা। অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই—বড় প্ররোচনা কঠিন কাজ সম্পন্ন করার, দুর্জয়কে জয় করার তৃপ্তি। যাই হক, এই বাতিকের চর্চার থেকে যে সব কৌশল ও কর্ম পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে তা যে পুরাতত্ত্বকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আলতামিরার মত অভাবিত আকস্মিক উদ্ঘাটনগুলিই সবচেয়ে চমকপ্রদ, বহু বছর পরে তার সঙ্গে সমান গৌরব দাবি করল যে লাস্কো গুহা তার আবিষ্কারও সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং এখানেও প্রথম দৃশ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায় কুকুর ও নাবালকের ভূমিকায়।

১৯৪০ সালের কথা, তারিখ ১২ সেপটেমবর। ফ্রানসের পেরিগর প্রদেশে (এই জায়গার থেকেই পেরিগর্দীয় কৃষ্টির নামকরণ) এক বনময় মালভূমিতে চারটি বালক ঘুরে বেড়াচ্ছে একদা, নিচে ভেজের নদীর উপত্যকা। হঠাৎ তাদের পোষা কুকুর এক গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক হাজার বছর আগে ঝড়ে একটা গাছ পড়ে যাওয়ায় গর্তটি উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু ভিতরে কি আছে তা দেখবার কথা কারও মনে হয় নি, বরং স্থানীয় চাষীরা

ডালপালা দিয়ে গর্তের মুখটা ঢেকে দিয়েছে যাতে তাদের পশুরা তার মধ্যে পড়ে না যায়।

কুকুরকে ডাকাডাকি করে কোনও ফল হল না, তখন একটি ছেলে গর্তের মুখটা বড় করে কিছু খোঁচা সহ্য করে নেমে পড়ল ভিতরে। কিছু ক্ষণ পরে তার পা ঠেকল ভিজে পিছল ঢালু জমিতে, ক্রমে সে এসে দাঁড়াল প্রায় আট মিটার গভীর এক নিচু সুড়ঙ্গে। তত ক্ষণে তার বন্ধুরা ও কুকুরটাও এসে জড়ো হয়েছে, কিন্তু চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কৌতূহলের বশে দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সব কাঠিগুলি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অগত্যা সে দিনের মত আবার তারা দিবালোকে ফিরে এল গর্তের মুখ বেয়ে।

ভেজ্রের উপত্যকায় চিত্রিত গুহা আগেও পাওয়া গিয়েছে, এবং ঐ অঞ্চলের স্কুলে প্রাগিতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু শেখানো হয়। সুতরাং খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছেলেরা সে রাতটা কাটাল, কাউকে কিছু বলল না। পর দিন দড়ি আর বাতি হাতে নিয়ে আবার তারা ঢুকে পড়ল গর্তে। সেই নিচু সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এক প্রকাণ্ড ডিমাকার কক্ষে উপস্থিত হয়ে যা তারা দেখল তা তাদের নিঃশ্বাস কেড়ে নিল। প্রতিটি দেয়াল জুড়ে ছাত পর্যন্ত আঁকা অতিকায় ষাঁড়ের মূর্তি, তাদের আশেপাশে ঘোড়া হরিণ ও আরও অন্যান্য প্রাণীর আভাস। ঘরটির থেকে যে আরও দুটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গিয়েছে তাদের গায়েও লাল হলদে কালো বাদামী প্রভৃতি কত রং ও কত প্রাণীর বন্যা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কেউ একা, কারা আবার সারি বেধে চলেছে বা জট পাকিয়ে রয়েছে। কেউ আঁকা কেউ বা খোদাই করা। চার বন্ধু ছুটে এল তাদের স্কুলের মাষ্টার মশায়ের কাছে, তিনি এসে স্বচক্ষে দেখে বিশেষজ্ঞদের জানালেন। অবিলম্বে আব্রে ব্রয়ী ও অন্যান্যরা এসে পড়লেন, পরীক্ষা করে বললেন যে প্রস্তর যুগের গুহাগুলির মধ্যে এই লাসকোর স্থান অতি উচ্চে। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, অদূরে ছোট ঘুমন্ত শহর মঁতিনিয়াক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল, এল ক্যামেরাবাহী সাংবাদিক ও পর্যটক, ভিড় করল কুতূহলীর দল। যাতে কেউ কোনও ক্ষতি না করে তার তদারক করতে গুহার মুখে পাহারায় বসল সেই চার বন্ধু।

বিগত মহাযুদ্ধের শেষে সেখানে সিমেনটের পথ ও সিঁড়ি তৈরি হল,

বিজলি বাতি বসল, গুহার অভ্যন্তর শীততাপনিয়ন্ত্রিত, প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শক আসতে লাগল (তাদের দেখাবার জন্য কাজে বাহাল হয়েছিল সেই ছেলেদের মধ্যে দু জন)। কিন্তু এই উনমোচনের ফলেই সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছিল। ১৯৫০ দশকের প্রথম দিকে সন্দেহ দেখা দিল যে ছবিগুলির উজ্জ্বলতা কমে আসছে, কয়েক বছরের মধ্যেই তা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল। উপরন্তু ১৯৬০ সালে এক ব্যক্তি গুহার গায়ে একটি ছোট সবুজ ছোপ লক্ষ্য করে আশঙ্কিত হলেন, তিনি প্রায়ই সেখানে ঢোকেন, কয়েক সপ্তাহ পরে আবার গিয়ে দেখেন ছোপটা আরও বেড়েছে পাঁচড়ার মত। কর্তারা গুহা বন্ধ করে দিলেন, বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গেল এক শেওলা জাতীয় জীবাণু এই 'সবুজ রোগ' সৃষ্টি করেছে। পেনিসিলিন ও অন্যান্য জীবাণুনাশক ছিটিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু লাসকোতে এখন শুধু বাছা বাছা বিশেষজ্ঞদের প্রবেশাধিকার আছে, জীবাণুনাশক আরকে জুতো সুদ্ধ পা ডুবিয়ে ঢুকতে হয়। দর্শকদের সঙ্গে অজানতে যে সব জীবাণু ও আকরিক বস্তু ঢুকেছে তা এবং তাদের নিঃশ্বাসের ও অন্যান্য দৈহিক নিঃসরণের উপাদান ঐ জীবাণুকে পুষ্ট করেছে, যুগিয়েছে প্রয়োজনীয় জলবাষ্প, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগে ভিতরে তাপ ও আর্দ্রতার পরিবর্তন সহায় হয়েছে তার। প্রায় ১৫,০০০ বছরে যে বিপদ ঘটে নি, মাত্র ২০ বছরে কোনও অজ্ঞাত কারণে শুধু লাসকোতেই তা অমূল্য সম্পদ গ্রাস করবার উদ্যোগ করেছিল। গুহার দ্বার রুদ্ধ হওয়ার পর থেকে সবুজ শত্রু আর গজায় নি, তার আশঙ্কা দেখা দিলেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সতর্ক করে দেবে।

আলতামিরার শ্রেষ্ঠ শিল্প যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে আজ থেকে ১২,০০০ বছরের অল্প আগে তুষার যুগের শেষ দিকে, লাসকোর চরম উৎকর্ষ আরও হাজার কয়েক বছর প্রাচীন। ক্রোমানীয় চারুকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই দুটি গুহার সম্পদ সম্ভার, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা দেখা যায়। আলতামিরার ছাতে জন্তুরা প্রায়ই স্থির, সেখানে তাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মুগ্ধ করে, লাসকোর দেয়ালে তারা সাধারণত প্রাণচঞ্চল, কখনও ছুটন্ত, একটি ঘোড়া তো ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে। গুহা দুটির চিত্র সম্পদ পরে আরও ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের গুহায় সুড়ঙ্গে আজ লোকে ভিড় করে আসে পূর্বপুরুষদের অমর কীর্তি প্রত্যক্ষ করতে, উজ্জ্বল আলোকে পৌরাণিক মানুষের কারুকাজ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়। সেই শিল্পীদের ছিল না আজকের আধুনিক সাজ সরঞ্জাম ও সুব্যবস্থা, তারা কাজ করেছে স্থূল উপকরণে, প্রায়ান্ধকারে। কিন্তু তাদের মিটমিটে প্রদীপের অস্থির আলোতেই হয়তো এই নিশ্চল পশুর দল প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, নির্জন নিঃশব্দ তমসাবৃত কক্ষে সেই বিরাট শোভাযাত্রা যে বিস্ময় উদ্রেক করত তার অনুভব সম্ভব নয় বৈদ্যুতিক আলোতে, অনেক লোকের ভিড়ে।

এরা কারা ? কেন এরা মাটির নিচে জলসিক্ত অন্ধকার কক্ষে সুড়ঙ্গে এত যত্নে এত কষ্টে ছবি এঁকেছে ? কি উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ ছিদ্র পথ দিয়ে এরা ক্রমশ ভিতরের দিকে ঢুকেছে—হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে ? উঁচু দেয়াল বা ছাতের কাছে পৌঁছাবার জন্য কত বিপদ অগ্রাহ্য করেছে। তা কি শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা ? প্রাচীন বলেই কি গুহাচিত্রের এত খ্যাতি, নয়তো কি গুণে তারা প্রশংসা সম্ভ্রম বিস্ময়ের যোগ্য ? এই সব কৌতূহল মেটাতে গুহাশিল্পের বিশদ আলোচনা দরকার।

সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ কোন আদি কালে যে মানুষের মনে প্রথম দেখা দিয়েছে তা কেউ জানে না। পাঁচ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকটাস জোকোডিয়েন গুহায় সুদৃশ্য চকচকে স্ফটিক জমিয়েছে, নেআনডার্টালদের মধ্যেও আমরা এই প্রেরণার ইঙ্গিত পেয়েছি, হাতিয়ারে তারা যে সমতা আনতে চেষ্টা করেছে তাতে ব্যবহারিক গুণ বাড়ে না, চক্ষু তৃপ্ত হয়। উত্তর জার্মেনির এল্‌বে নদীর কাছে পাথরের উপর ছোট ছোট মানব প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা নাকি ফরাসী গুহাচিত্রের চার গুণ প্রাচীন, এই তারিখ সত্য হলে সেগুলি নেআনডার্টাল আমলের।

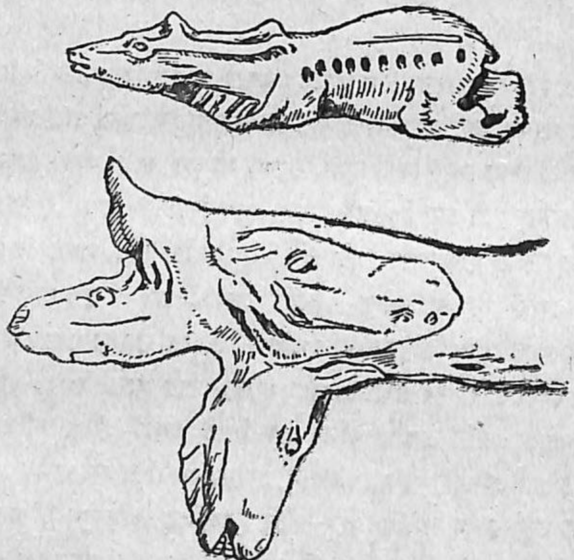
খাঁটি মানুষের সমাজে যে প্রথম থেকেই সুন্দরের সমাদর অনেক বেশী ছিল তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি তার বসনে ভূষণে, হাড় শিং ম্যামথ দাঁত ও পাথরে খোদিত প্রাণীর প্রতিকৃতিতে কিংবা অলংকরণে এবং ভাস্করের হাতে গড়া মূর্তিতে। এই জাতীয় অকেজো সখের জিনিস, সাজাবার জিনিস, অলংকৃত

উপকরণ ইত্যাদি হাজার হাজার তৈরি হয়েছে ফ্রানস থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত, গুহাচিত্রের অনেক আগে অন্তত ৩০,০০০ বছর প্রাচীন কাল থেকে। এ সব ছোট ছোট টুকরো শিল্পে প্রায়ই পুঙ্খানুপুঙ্খ সযত্ন রূপায়ণে হরিণ বাইসন ঘোড়া সিংহ ভালুক এরা সব আশ্চর্য সজীব। তা ছাড়া অবশ্য ছিল নানা বস্তু থেকে নানা রূপে গড়া জননী দেবী মূর্তি, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও কোথাও কোথাও তারা যে মনোমুগ্ধকর তা আমরা গত অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি।

ম্যামথের দাঁত বা হরিণের শিং জাতীয় বস্তুর আকার আকৃতি নির্দিষ্ট বলে তা আরও বিস্ময়কর, তবু আদেশদণ্ড বর্শা-ক্ষেপণদণ্ড ইত্যাদির গায়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে শিল্পীর দেখা ছোট ছোট দৃশ্য, যেমন স্যামন মাছ লাফ মেরে উঠেছে অথবা হায়না নিচু হয়ে তার শিকারের দিকে লাফ দিতে উদ্যত। হয়তো চ্যাপটা চামচের কাজ করেছে হাড় থেকে তৈরি প্রায় ২০ সেনটিমিটার লম্বা স্যামন মাছ, তার পিঠে পেটে পাখনা, চওড়া লেজটি যেন হাতল। ফ্রানসে কিছু কিছু হাড়ের তৈরি ছোট গোল ছিদ্রিত চাকতি পাওয়া গিয়েছে, তাদের গায়ে ক্ষোদিত পশু মূর্তিগুলি কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মারক চিত্র মনে হয়। মাত্র আড়াই মিলিমিটার পুরু এমনি এক চাকতির এক পিঠে একটি হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, উলটো পিঠে সেই হরিণই পা মুড়ে শয়ান, হয়তো বর্শাবিদ্ধ নয় ঘুমন্ত। পর পর ছবি সাজিয়ে ঘটনার বর্ণনা এখন সুপরিচিত (চলচ্চিত্র, কমিক্‌স), অনুমান করা হয় এই চাকতিটি তার আদিতম নিদর্শন। আর দেখা যায় ম্যামথের দাঁত থেকে গড়া সাত সেনটিমিটার মাপের এক ঘোড়া, তার প্রসারিত ঘাড়ে ছোট ছোট সমান্তরাল রেখায় কেশর রূপায়িত।

টুকরো শিল্প প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লা মাদলেইন ঘাঁটির (যার থেকে মাদলেনীয়) একটি কারুকাজ—বলগা হরিণের শিঙে উৎকীর্ণ এক বাইসন ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিঠ চাটছে, প্রসারিত জিভ, বাদামাকার চোখ, উঁচু কপাল, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, বাঁকা শিং, ঝুলন্ত গলকম্বল, রুক্ষ কেশর, মুখ ঘিরে নরম লোম এই সব নিয়ে অতীব বাস্তবিক এক মূর্তি, কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হয়ে পিঠের চুলকানি বন্ধ করার ভঙ্গিটি। মাত্র ১০ সেনটিমিটার মাপের মধ্যে হাজার ১৫ বছর আগে কোনও অজ্ঞাত শিল্পী শিং চিরে চিরে এত কিছু ফুটিয়ে

তুলেছে। কোথাও আতিশয্য নেই, ঠিক যেখানে যেটুকু রেখা দরকার তাই। এমনি সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায় ফ্রানসের ব্রুনিকেল ঘাঁটিতে প্রাপ্ত একই পদার্থ থেকে তৈরি সমপ্রাচীন এক অশ্ব মূর্তিতে, প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা শিঙের এক মাথায় লম্ফমান প্রাণীর সামনের পা দুটি ভাঁজ হয়ে পেটের সঙ্গে লেগে আছে, পিছনের দুটি মিশেছে দণ্ডের সঙ্গে। বাইসন ও ঘোড়া দুইই ক্ষেপণাস্ত্রের



চিত্র ২২। হাতিয়ারের হাতলে শিল্পীর কাজ।

অংশ বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু কাজের সৌকর্য থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যবহারও সন্দেহ হয়। শুধু মাত্র অলংকরণ ছাড়াও যে টুকরো শিল্পের কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ইঙ্গিত মেলে, চেকোসলোভাকিয়া ও রাশিয়ায় এদের কিছু কিছু ভিটেতে গর্তে লুকানো ছিল, তা হয়তো নির্দেশ করে যে পরিবারের চোখে বস্তুগুলির বিশেষ কোনও রকম তাৎপর্য ছিল যেমন ছিল বহুপ্রচলিত জননী দেবী মূর্তিগুলির।

গুহাচিত্র আবিষ্কারের পর বিশ্বের বিস্মিত বিমুগ্ধ প্রশংসা তার উপর বর্ষিত হল, তা বলে এই সব অস্থাবর টুকরো সৃষ্টির মূল্য কম নয়, বরং বলা যায়

তাদেরই স্বাভাবিক ও চরম পরিণতি শিলাপটের বর্ণোজ্জ্বল চিত্র সম্ভারে। দুই ধারা একই সূত্রে গাঁথা এবং আমরা দেখব গুহাচিত্রেরও একই ধরনের তাৎপর্য থাকতে পারে। এই শিল্প কেবল রঙিন ছবিতে অথবা পশ্চিম য়োরোপে সীমিত নয়—যুগোসলাভিয়ার এক গুহার গা চিরে উৎকীর্ণ হয়েছে মাছের প্রতিকৃতি। শিলা প্রাচীরের বৃহত্তর পটে অবশ্য অনেক প্রশস্ত খোদাইয়ের কাজ সম্ভব হয়েছে, যেমন ফ্রানসের রুফিনিয়াক গুহার দেয়ালে বিউরিন দিয়ে চিত্রিত প্রায় সত্তরটি পশমী ম্যামথ, অথবা ঐ দেশেরই গর্জ দ'ফের (নরক কূপ) গহ্বরে স্যামন মাছ (চিত্র ২৬)। নিও গুহাতে মাটির মেঝে চিরে উৎকীর্ণ এক বাইসন, মাথা নিচু করে সে যেন ধুঁকছে; ছাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে মেঝেতে কোথাও কোথাও খোবল হয়েছিল, শিল্পী সেগুলি কাজে লাগিয়েছে কাছাকাছি গোটা কয়েক আঁচড় টেনে যাতে মনে হয় দেহের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। পাথরের গায়ে উঁচু করে ফুটিয়ে তোলা রিলিফ কাজ খোদাইয়ের চেয়ে কঠিন, এই জাতীয় ভাস্কর্যের চরম নমুনা আছে দর্দনীয় অঞ্চলের কাপ ব্লাঁ শিলাশ্রয়ে এক দল পশুর রূপায়ণে। প্রায় ১২ মিটার দীর্ঘ শিলাপটে পাথরের বিউরিন ও শাবল দিয়ে প্রস্ফুটিত অন্তত পাঁচটি ঘোড়া, বৃহত্তমটি দুই মিটার লম্বা, একটি বলগা হরিণ ও তিনটি বাইসনের চিহ্নও বর্তমান। কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল ১৬,০০০-১৫,০০০ বছর আগে, পরে নানা সময়ে অন্য শিল্পীরা কিছু অদল বদল করেছে মনে হয়, কিন্তু সব নিয়ে দৃশ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ। এতটা জায়গা জুড়ে পর পর পশুদের বাঁকা পিঠ মিলে দেখায় যেন সমুদ্রের ঢেউ গড়িয়ে চলেছে। পাথরের স্বাভাবিক গঠন অনুসারে ভাস্কর পশুদের স্থান নির্ধারণ করেছে, যেখানে শিলা প্রাচীর সামনে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে সেখানে সে তার কল্পনা খাটিয়ে তা কাজে লাগিয়েছে পশু দেহে, জায়গাগুলি হয়েছে দেহ পার্শ্বের ফোলা অংশ। ১৯১০ সালে যখন এই বিশাল আলেখ্যটি আবিষ্কার হয় তখন জন্তুদের গায়ে রঙের চিহ্ন লেগে ছিল, নিশ্চয় কয়েক হাজার বছরে অগভীর শিলাশ্রয়ে জল বাতাসের প্রভাব রঙের অধিকাংশ মুছে ফেলেছে। অন্যান্য ঘাঁটির খোদাই কাজেও এই ক্ষতি দেখা যায়, উৎকিরণবর্জিত গুহাচিত্র সাধারণত আরও গভীরে অবস্থিত বলে তাদের গৌরব প্রায় অব্যাহত। অবশ্য অনেক মনোরম পটে তুলি ও খোদাইয়ের আশ্চর্য সম্মিলন দেখা যায়।

ফরাসী পিরেনে পর্বতমালার নিম্ন দেশে ত্যুক্ দোদুবেআর গুহার এক অভিনব সৃষ্টি দেখে মনে হয় উপযুক্ত শিলাপট না পেয়ে ভাস্কর নিজেই তা উদভাবন করে নিয়েছে। ছাত থেকে মস্ত এক খণ্ড চুনাপাথর পড়েছিল, তার গায়ে স্থাপিত হয়েছে উঁচু রিলিফের মত এক জোড়া মৃন্ময় বাইসন, প্রতিটি প্রায় ৩০ সেনটিমিটার লম্বা। ঘাড়ে, ঝুলন্ত গলকম্বলের নিচে, পায়ের পিছনে মাটি চিরে চিরে রোমের রেখা দেখানো হয়েছে, তা ছাড়া বাঁকা পিঠ, নানা অঙ্গ ও পেশীর গঠন, নাক চোখের রূপায়ণ মিলে বাস্তবের এই দুই প্রতিমূর্তি পাথরের পটে স্বাভাবিক ভাবে মিলে গিয়েছে কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত। মাটির তৈরি হলেও গুহার অন্তর্দেশে বলে ১৫,০০০ বছরে তাদের প্রায় কোনও ক্ষতি হয় নি। এই গভীর গহ্বরে তাদের আবিষ্কারও তিনটি দুঃসাহসিক বালকের উদ্যোগে, সে কাহিনী নিশ্চয় বর্ণনাযোগ্য।

তুলুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নৃবিজ্ঞানী কাউন্ট অঁরি বেগুএন জমির মালিক, তার মধ্যে এক ছোট নদীর আশেপাশে ভূগর্ভে অনেক গোপন সুড়ঙ্গ আছে শুনে তাঁর তিন ছেলে ১৯১২ সালে একটি পাহাড়ের গায়ে এক গহ্বরে ঢুকে পড়ল। পেট্রোলের টিন জুড়ে জুড়ে এক ভেলা বানিয়ে সঙ্গে এনেছে তারা, কারণ নদীও ঢুকেছে গহ্বরে, তাইতে চড়ে ভেসে পড়ল ছেলেরা। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল চার দিকে, সে যেন পাতাল প্রবেশ।

ভাসতে ভাসতে ভেলা এল এক বৃহৎ কক্ষে, সেখানে এক ধারে তা রেখে তিন ভাই লণ্ঠন হাতে সংকীর্ণ পথ ধরে এগিয়ে চলল, প্রায় ২৩ মিটার গিয়ে আরও এক প্রশস্ত কক্ষ, সেখানে জল জমে ছোট খাটো এক পুকুর তৈরি হয়েছে। মেঝে থেকে উঠেছে ছাত থেকে ঝুলছে অমল ধবল চুনাপাথরের প্রলম্বিত পাতলা কাঠামো, বিয়ের সাজের তুলনায় পরে এই ঘরের নাম হয়েছে বাসর ঘর। তা পেরিয়ে ১২ মিটার লম্বা ঢালু পথ বেয়ে উঠে অনুসন্ধানীরা ঐ রকম কিছু ঝুলন্ত বাধা ভেঙে ঢুকল এক সুড়ঙ্গে, কয়েক শো মিটার পর নিচু সরু এক অংশ কোনও গতিকে চেপটে পার হয়ে হাজির হল গুহা ভালুকের ফসিল ছড়ানো আরও এক বড় ঘরে, এবং অবশেষে এই গুহাবলীর অন্তিম প্রান্তে পৌঁছাল এক গোল ঘরে। সব শ্রম ও ক্লেশ সার্থক হল এখানে, লণ্ঠনের আলো ছায়ায় পাথরের গায়ে প্রায় ভীতিকর সেই

বাইসন জোড়া দেখে তিন ভাই হতভম্ব। ক্রোমানীয় মানুষ কেন এত কষ্ট করে এই গভীর গহবরে এসে যুগল মূর্তি স্থাপন করেছে, এই আবিষ্কারের পর সংশ্লিষ্ট গুহাশ্রেণীতে আরও কি কি অমূল্য সম্পদ উদঘাটিত হয়েছে সে সব আলোচনা পরে।

হরিণ শিং ম্যামথ দাঁত ইত্যাদির গায়ে প্রাণীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা শিলা প্রাচীরে বৃহত্তর উৎকিরণ ও ভাস্কর্যের তুলনায় নানা রঙে রঞ্জিত গুহাচিত্র অবশ্য অনেক বেশী চমকপ্রদ, যেমন আলতামিরার বাইসন বা ফঁদগোম গুহার আশিটি প্রাচীর পট। ছোট মূর্তিগুলি গুহাচিত্রের মত প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের বৈশিষ্ট্য নয়, সর্বত্র তারা তৈরি হয়েছে, প্রায়ই গুহার বাইরে। প্রাচীরের উৎকিরণ সাধারণত গুহার মুখে বা অগভীর শিলাশ্রয়ে অবস্থিত, চিত্রগুলি গভীর অন্তর্দেশে। কিন্তু এই সব শিল্পেরই প্রধান ও প্রায় একান্ত বিষয়বস্তু প্রাণী জগৎ, অনুপ্রেরণা যে অভিন্ন তা স্পষ্ট। উদ্দেশ্য যে কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি নাও হতে পারে তা নিয়ে নানা যুক্তি আছে, কিন্তু এখন আমাদের চোখে গুহাচিত্রের মান যে তার সৌন্দর্যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই উদ্দেশ্য বিচারের আগে এই শিল্পের বৈচিত্র্য ও গুণের দিকে এবং কি করে প্রাগৈতিহাসের শিল্পীরা তা সম্ভব করেছে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তারা কখনও দেয়ালের গায়ে এঁকেছে প্রাণী দেহের বহিররেখাটি শুধু, কখনও বা সবটায় রং লেপে দিয়েছে, হয়তো সেই লেপনে জায়গায় জায়গায় ফাঁক রেখেছে পেশী বা ধড়ের গোল গড়ন বোঝাতে, অথবা দরকার মত রং চেঁছে বা ধুয়ে তুলে ফেলেছে, যেমন এ যুগের শিল্পীরা করে থাকে।

গুহাচিত্রে বা উৎকিরণে দেখা যায় পরিযায়ী বা দলীয় পশু ঘোড়া বাইসন অরক্স বলগা হরিণ লাল হরিণ, তা ছাড়া মাংসাশীদের মধ্যে সিংহ বাদামী ভালুক ও শুয়োর। ম্যামথ ও গণ্ডার কম, কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে হায়না নেকড়ে সরীসৃপ, জলের প্রাণী মাছ ও সীল এবং পাখির; হাঁস রাজহাঁস সারস বন-মোরগ সাপ ইত্যাদির সঙ্গে যে শিল্পীদের পরিচয় ছিল তা বোঝা যায়; কাদায় পাথরে কিংবা হাড়ে খোদাই করা মাছের চিত্রণে দেখা যায় স্যামন ও ট্রাউট যা এখনও য়োরোপীয়দের প্রিয় খাদ্য। রঙিন ছবিতে উপরোক্ত নিরামিষাশী,

দলীয় পশুদের প্রাধান্য, নিশ্চয় তারাই ক্রোমানীয়দের প্রধান শিকার ছিল বলে। তারই মধ্যে নানা বৈচিত্র্য, একটি ঘোড়া দেখলেই সব ঘোড়া দেখা হয়ে যায় না। আলতামিরায় এক বাইসন রেগে হাঁ করে গর্জন করছে, তার মাথাটা এগিয়ে এসেছে, চোখ বিস্ফারিত, কেশর খাড়া, পিঠ বাঁকা ধনুকের মত—ক্ষিপ্ত পাশবিক রোষের আদিতম প্রতিমূর্তি বোধহয়। কাছেই শান্তির অবতার আর এক বাইসন যেন কিছুই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না, নিশ্চিন্তে মাথা তুলেছে, হয়তো গাছ থেকে পাতা খাবে বলে। একটু দূরে এক মাদী লাল হরিণ দু মিটারের বেশী দৈর্ঘ্য জুড়ে অঙ্কিত, স্পেনীয় গুহাবলীর পশুদের মধ্যে বৃহত্তম রূপায়ণ, তবু বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত নির্ভুল। এখানে আর এক বৈশিষ্ট্য দুটি লম্ফমান বন্য বরাহ, অন্য কোনও ক্রোমানীয় গুহায় এই জন্তুকে নিশ্চিত চেনা যায় না। কয়েকটি বাইসনের পা মোড়া, মাথা নিচু, দেহ গোটানো, কেউ কেউ বলেন তারা মুমূর্ষু, কিন্তু অধিকাংশের মতে ঘুমন্ত বা আসন্নপ্রসবা। আর দেখা যায় এক বাইসনের অস্পষ্ট, প্রায় ভূতুড়ে হলদে মাথা, হয়তো প্রথম দিকে প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে আঁকা, এখন বিবর্ণ।

লাসকোর সম্পদ আরও বিচিত্র। প্রধান কক্ষে ঢুকে বাঁ দিকের দেয়ালে প্রথমেই দ্বাররক্ষীর মত চোখে পড়ে লম্বা ও সোজা দুই শিং উঁচিয়ে এক রূপকথার জন্তু, এক মিটার ৬৮ সেনটিমিটার দীর্ঘ। এটি এখন ইউনিকর্ন নামে পরিচিত, যদিও তা একটি শিং বোঝায়। এর দেহ ঘোড়া অথবা গণ্ডারের, মাথা কৃষ্ণসার মৃগের মত বলে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কারও কারও চোখে সে মানুষ, হয়তো আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশী; গায়ে গোল চাকা চাকা দাগ যা কোনও পরিচিত জন্তুর ছবিতে দেখা যায় না, মুখাগ্র অন্যদের চেয়ে চাপা ও চৌকোণ। পেট ঝুলে পড়েছে থলির মত, বোধহয় গর্ভবতী বলে। নিচে লাল রেখাঙ্কিত আর এক পশুর (সম্ভবত ঘোড়া) চিহ্ন দেখে মনে হয় পরে তার উপর এই অদ্ভুত প্রাণীটি রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু এই কক্ষে রাজত্ব করছে চারটি বিশাল সাদা ষাঁড়, প্রকৃত জন্তুটির চেয়েও বৃহৎ, প্রতিটি প্রায় চার মিটার লম্বা। লাসকোতে সাদা রং ব্যবহার হয় নি, কিন্তু ফিকে পাথরের উপর মোটা গাঢ় কালো দাগে দেহের সীমা চিহ্নিত করে চিত্রকর সাদার ধারণা সৃষ্টি করেছে। জনৈক লেখকের উচ্ছ্বসিত কল্পনায় এই কৌশলের ফলে প্রাণী চতুষ্টয় এক

অলৌকিক মায়ায় মণ্ডিত (যেমন প্রাচীন মিশরের আপিস ষণ্ড দেব ও আমাদের শিবের বাহন) এবং কক্ষের গরু ঘোড়া হরিণ ইত্যাদি ক্ষুদ্রতর পশুর প্রভু হয়তো তারা। বস্তুত, পরে নবপ্রস্তর সমাজে বৃষ পূজার স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতঃপর সংলগ্ন এক ২০ মিটার লম্বা সুড়ঙ্গে পৌঁছে দু দিকের দেয়ালে পশুর দল হুড়মুড়িয়ে ছুটেছে যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। বাঁ পাশে চারটি গরু ও তিনটি ছোট অসম্পূর্ণ ঘোড়া, ডান দিকের স্রোতে আছে ছোট বড় তেরোটি ঘোড়া, দুটির পা সরু ও পেট মোটা, তা প্রাচীন চীনের শিল্পে রূপায়িত ঘোড়ার অনুরূপ বলে তাদের নাম হয়েছে 'চৈনিক অশ্ব'। ওদের একটির আশে-পাশে কতগুলি সোজা দাগ নিক্ষিপ্ত বর্শা হতে পারে। এ ছাড়া লাসকোর শিল্পীরা ১৪ বার নানা ভাবে হরিণ এঁকেছে।

নিও গুহায় এক ঘোড়ার পেট সরু, কেশর লম্বা, সে নিজের গাম্ভীর্যে স্থিরমূর্তি। ঘনকৃষ্ণ আঁচড়ে মুখ ও গলার নিচে লোম, ঝুলন্ত কেশর, লেজ ইত্যাদি বাস্তব রূপ পেয়েছে। এক জোয়ান বাইসনও একই কৌশলে চিত্রিত। উদ্ধত দুই বাঁকা শিং বাগিয়ে মাথা নিচু, যেন শত্রুকে তাড়া করতে উদ্যত (এখানে মেঝেতে খোদাই করা আর এক বাইসন আগে উল্লিখিত হয়েছে)। রুফিনিয়াক গুহায় এক গণ্ডারের ভঙ্গিটাও ঐ রকম, দেহের বহিররেখা তারও কালো, ছোট বড় দুটি ভয়ংকর শিং, কিন্তু ঝোলা পেট প্রায় মাটি ছুঁয়েছে বলে মনে হয় ঐ দেহ নিয়ে তাড়া করলে খুব বেশী ভয় নেই। প্রাণীটির সারা গা জুড়ে সভ্য যুগের কোন চণ্ডাল দর্শক বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখেছে।

গুহাচিত্রের এই স্বল্প বর্ণনায় ক্রোমানীয়দের প্রগল্ভ সৃষ্টির আভাস মাত্র পাওয়া গেল আপাতত। তবে হয়তো এটা স্পষ্ট হল যে জন্তুরা নানা ভঙ্গিতে নানা মেজাজে রূপায়িত হয়েছে বলে দর্শকের উপভোগ শিথিল হয়ে পড়ে না, তাদের বিস্ময় অফুরন্ত। কিন্তু আজ এই চারুকলা শুধু চিত্ত বিনোদন করে না, তার থেকে বিজ্ঞানেরও উপকার হয়েছে। গুহাচিত্র থেকে যেমন আমরা ক্রোমানীয় সমাজ সম্বন্ধে অনেক খবর জেনেছি, তেমনি এই জন্তুদের অন্তত পশ্চিম য়োরোপীয় বন্য জাতি অনেকে আজ লোপ পেয়েছে বলে তাদের চেহারাও

ফসিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া তারা কি ধরনের জলবায়ু পছন্দ করত তা জানা আছে বলে প্রাক্তন মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধেও অনেক খবর মেলে।

সে কালের প্রাচীর চিত্রে যে সব প্রাণীর প্রধান স্থান তাদের সম্বন্ধে আরও দু কথা বলা যেতে পারে। আজকের সব সাধারণ পালিত ঘোড়ার বন্য পিতৃ-পুরুষ তারপান দক্ষিণ রাশিয়ায় ১৮৫১ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। তবে ১৯৩০ দশকে জার্মানি ও পোল্যানডের বিজ্ঞানীরা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত পালিত ঘোড়া বাছাই করে তাদের কৃত্রিম প্রজনের দ্বারা ছোট একটি দল সৃষ্টি করেন যাতে তারপানের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধিকাংশে বর্তমান। এদের বংশধরদের য়োরোপ আমেরিকার চিড়িয়াখানায় দেখতে পাওয়া যায়। খাঁটি বুনো ঘোড়া আজ পৃথিবী থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন, শুধু মংগোলিয়ার প্রান্তরে এখনও বেঁচে আছে তাদের একটি মাত্র জাতি যার দাঁত-ভাঙা নাম প্শেভাল্স্কি (Przewalski), এরা সংখ্যায় হয়তো গোটা কুড়ি, তা ছাড়া শ' দুয়েক আছে নানা চিড়িয়াখানায়। আজকের ঘোড়ার তুলনায় এই মংগোলীয় অশ্ব আকারে ছোট, তার ঝোলা পেট, ঘাড়ের উপর ছোট কালো চুলের খাড়া কেশর। এই সব বন্য অশ্বের সঙ্গে লাসকোয় এবং অন্যত্র চিত্রিত ঘোড়ার আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়, যদিও এমন মূর্তিও দেখা যায় যার সঙ্গে আমাদের জানা কোনও জাতির সাদৃশ্য নেই। এগুলি কি শিল্পীর অক্ষমতার পরিচায়ক, নাকি ইচ্ছাকৃত বিকৃতি (যেমন আধুনিক শিল্পীদের কাজেও দেখা যায়), নাকি শিল্পীরা সত্যিই দেখেছিল ঐ জাতের ঘোড়া তা বলা কঠিন।

সে কালের প্রকাণ্ড বুনো ষাঁড়ের পরিচয় পাওয়া যায় পুরনো দিনের লেখকদের রচনায়। মাটি থেকে ঘাড় পর্যন্ত এর মাপ ছিল প্রায় দু মিটার এবং শিং কখনও কখনও এক মিটার বড় হত। ২০০০ বছর আগে রোমীয় সম্রাট সীজার এক বনে এদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁর লিখিত বর্ণনা অনুসারে হাতির চেয়ে সামান্য মাত্র ছোট এই অরক্স ষাঁড়। এর শক্তি, হিংস্রতা ও তৎপরতার ফলে জন্তুটির কাছে এগোনো দায় ছিল, তবু বুদ্ধির জোরে পুরামানব কি করে এদের দলকে দল ফাঁদে ফেলে শিকার করেছে সে গল্প আগে বর্ণিত হয়েছে। লাসকোর গুহা গাত্রে যে ষাঁড় ও গরু চিত্রিত দেখা যায়

তাদের সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী অরক্সের ঘনিষ্ঠ মিল। এই ভয়ংকর জন্তুটির চরম তিরোধানের এবং 'পুনর্জন্মে'র' ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই য়োরোপে এদের সংখ্যা এত কমে এসেছিল যে রাজা ছাড়া আর কারও শিকারের অধিকার ছিল না। একেবারে শেষ অরক্সটি কবে কোথায় মারা গিয়েছে তার পর্যন্ত দলিল আছে—১৬২৭ সালে পোল্যানডে এক বনে এই বুড়ো গরু সমস্ত প্রজাতির হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। কিন্তু প্রায় ৩০০ বছর অবলুপ্তির পরে অরক্স আবার প্রাণ পেয়েছে প্রাণিবিজ্ঞানীর কৌশলে। ১৯৩১ সালে বার্লিন চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ ডঃ হেক্ এক পরীক্ষা আরম্ভ করেন, যে সব জাতের গরু ষাঁড়ের সঙ্গে গুহাচিত্রে রূপায়িত অরক্সের কিছু মিল আছে তাদের নিয়ে ১৫ বছর ধরে নির্বাচনী প্রজনের ফলে তিনি দাবি করেন যে জন্তুটির সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি তিনি নতুন করে বানাতে পেরেছেন ('সভ্যতার আগে', পৃ ৩৩)।

এই ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী প্রাণী বুনো মোষ বাইসন আলতামিরা, নিও ও অন্যত্র অনেক গুহায় চিত্রিত হয়েছে, প্রায়ই নানা রঙে। নির্বিচার শিকার ও বন জঙ্গল কাটার ফলে সাম্প্রতিক কালে এই প্রাণীটিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছিল, ১৯৪৯ সালে সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা ছিল মোটে ১১০, কিন্তু য়োরোপ ও আমেরিকায় প্রজন ও সংরক্ষণের ফলে বিপদ কেটে গিয়েছে। য়োরোপীয় বাইসন প্রস্তর যুগের জন্তুটির এক ক্ষুদ্রতর বংশধর।

গুহাবাসী সিংহ আগে উল্লিখিত হয়েছে। বিড়াল জাতীয় জন্তুদের মধ্যে একমাত্র এর মূর্তিই মাঝে মাঝে দেখা যায় গুহার গায়ে—প্রায় সর্বত্রই খোদাই করা। শিল্পীরা নিশ্চয় মুখোমুখি পড়েছে এই হিংস্র মাংসাশী পশুর। য়োরোপে অনেক দিন এরা লুপ্ত, এদেরই বংশধর ভারত ও আফ্রিকার সিংহ, এবং আজ তাদেরও বাঁচাবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

গণ্ডার আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু য়োরোপে সে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, বোধহয় গুহাশিল্পীদের সময়েই তার দিন ফুরিয়ে এসেছিল বলে ছবিতে তার দেখা মেলে কদাচিৎ। এই গণ্ডারের সঙ্গে বর্তমান আফ্রিকার পশুটির সাদৃশ্য বেশী, অর্থাৎ তার দুটি শিং এবং চামড়ায় মোটা ভাঁজ নেই এশিয়ার গণ্ডারের মত।

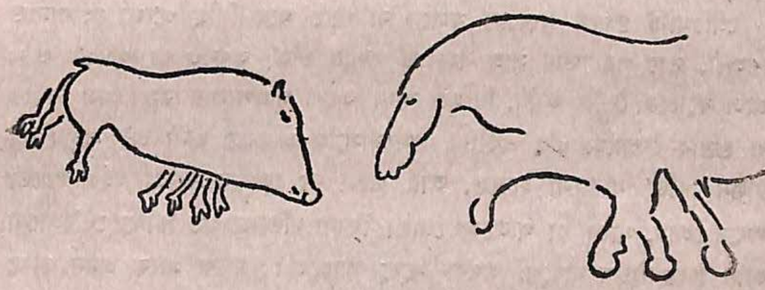
প্রাচীন মানুষ তার সৃষ্টিতে নিজেদের দেখাতে নারাজ ছিল, যেটুকু দেখা

যায় সাধারণত তাও অবাস্তবিক। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসের ব্রাসেম্পুই নামক জায়গায় ২০,০০০ বছরেরও আগে কোনও ভাস্কর ম্যামথের দাঁত থেকে গড়েছিল সজ্জিতকেশী এক তরুণীর মাথা, এই মনোরম মূর্তিটি হয়তো মানুষের প্রথম যথাযথ রূপায়ণ। প্রাগৈতিহাসিক চারুকলার স্বর্ণ যুগে পশ্চিম য়োরোপের গুহা গাত্রে ক্রোমানীয় মানবের বিরল মূর্তি হয় ছদ্মবেশী নয়তো সাংকেতিক—মানুষ নয়, তার ইঙ্গিত। পশুদের আশ্চর্য নিপুণ রূপায়ণের পাশে এই ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে মনোযোগের অভাব সুস্পষ্ট এবং তারা একান্ত বিসদৃশ। প্রায় মনে হয় যেন স্পষ্ট করে নিজের চেহারা দেখাতে সে দিনের মানুষ বিশেষ নারাজ ছিল, যেন রীতি নীতির বিরুদ্ধ ছিল এ কাজ, হয়তো ভয় ছিল বাস্তবিক চিত্র দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। লাসকোর গুহায় এক দৃশ্যে দেখি লেজতোলা এক গণ্ডার আর এক বাইসনের মধ্যে পড়ে আছে জনৈক মৃত ব্যক্তি, বাইসনের দেহ বর্শাবিদ্ধ, পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, তবু মাথা নামিয়ে সে গুঁতো মারতে উদ্যত। পশু দুটি সযত্নে অঙ্কিত, কিন্তু মানুষটিকে মাত্র কয়েকটি সোঁজা আঁচড়ে শেষ করে ফেলা হয়েছে—তার চতুষ্কোণ লম্বা দেহ, কাঠির মত হাত পা। হাতে মাত্র চারটি করে আঙুল, আর সবচেয়ে আশ্চর্য, মুখ যেন পাখির ঠোঁট। পাশেই এক খাড়া লাঠির মাথায় একটি পাখি, শিল্পীর দলীয় টোটেম হতে পারে তা। হয়তো শায়িত দেহটি আসলে আধা-মানুষের। এই ধরনের অংশমানব মূর্তি নিশ্চয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই কল্পিত হয়েছে, কিন্তু গুহাচিত্রের ঐ চেহারাগুলি ছদ্মবেশী মানুষও হতে পারে। ছদ্মবেশ প্রায় নিঃসন্দেহ লে ত্রোআ-ফ্রের গুহায় অঙ্কিত এক মূর্তিতে, তার গায়ে পশু চর্ম, মুখে মুখোশ, মাথায় হরিণের শিং। এই আত্মগোপনের কারণ কি হতে পারে তার আলোচনা একটু পরে।

গুহা গাত্রে মানব মূর্তি বিরল ও বিকৃত হলেও তার হাতের ছাপ প্রচুর ও স্পষ্ট, স্পেইন, ইটালি ও ফ্রানসের কুড়িটির বেশী গুহায় তা দেখা যায়। কখনও দেয়ালে হাত রেখে আঙুল ছাড়িয়ে তা ঘিরে রং লগোনো, কখনও ভিতরটা রঞ্জিত, নয়তো বহিররেখা শুধু, এমন কি পাথর কেটে রিলিফে উৎকীর্ণ হাত। মাঝে মাঝে দু একটি আঙুল বা তার অংশ ফাঁকা, মনে হয় যেন কাটা। শিশু থেকে আরম্ভ করে নানা বয়সের এই হাতগুলি

কোথাও কোথাও পরস্পরের গা ঘেঁষে ভিড় করে আছে, যেন নিজের স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। ফরাসী পিরেনে পর্বত-মালার গার্গা গুহার দেয়ালে এমনি প্রায় ১৫০ ছাপ ছড়ানো।

গুহাচিত্রে মানুষাংশবর্জিত অন্যান্য প্রাণীর যুগ্ম প্রতিকৃতিও দেখা যায়, অর্থাৎ অনেকটা ঐ বকচ্ছপ বা হাঁসজারু গোছের দুঃস্বপ্ন। এ ছাড়া সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট জোড়াতালির দেখা মেলে কোথাও কোথাও—আলতামিরায় আছে এক বুনো শুয়োর, লাসকোয় এক ঘোড়া, তাদের পেটের তলা থেকে অনেকগুলি পা বেরিয়ে এসেছে গাছের ডালের মত। উপরোক্ত



চিত্র ২৩। গুহাচিত্রে বহুপদ কাল্পনিক জন্তু।

ইউনিকর্ন এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়তো। জন্তু জানোয়ারের তুলনায় গাছপালার ছবি খুব কম এবং প্রায়ই এত অযত্নে আঁকা যে তাদের উদ্ভিজ্জ চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এই অবজ্ঞার ইঙ্গিত কি এই যে সে কালের মানুষ প্রধানত আমিষাশী ছিল? সবচেয়ে রহস্যজনক হল ছবির মধ্যে জন্তুদের আশেপাশে আঁকা বা খোদাই করা নানা রকম দাগ, জালকাটা নকশা, বিন্দু ইত্যাদি চিহ্ন। কোনও কোনও রেখা হয়তো অস্ত্র শস্ত্র বর্শা বল্লম, কিন্তু অধিকাংশের তাৎপর্য অজ্ঞাত, যদিও পরে দেখা যাবে যে জল্পনার অভাব হয় নি।

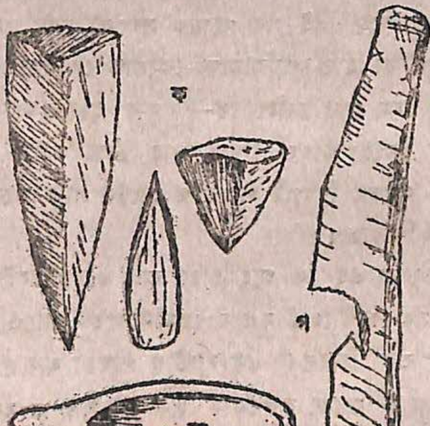
সে কালের স্থূল যন্ত্রপাতি ও সামান্য মাল মসলা দিয়ে ভাস্কর বা চিত্রকর কি করে এই আশ্চর্য শিল্প সম্ভার সৃষ্টি করেছে সে প্রশ্ন স্বভাবতই

মনে জাগে। পাথরের গা খুবলে বা চিরে খোদাই কাজে ব্যবহার হত চকমকির বিউরিন, এই ধরনের উপকরণ এত শত শত পাওয়া যায় যে মনে হয় সে দিনের মিস্ত্রীরা ঘরের বা শিকারের যন্ত্রপাতির দিকে যত সময় দিয়েছে শিল্পীর চাহিদা মেটাতে তার চেয়ে কম ব্যস্ত থাকে নি। রং এসেছে কাঠকয়লা ও স্বাভাবিক আকরিক মৃত্তিকা থেকে, এই দলে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়েছে লৌহবাহী ওকার জাতীয় গেরিমাটি—উজ্জ্বল লাল, গাঢ় বা তামাটে বাদামী এবং হরিৎ বর্ণ পাওয়া গিয়েছে তাদের থেকে। কোনও কোনও কালো রং যুগিয়েছে কাঠকয়লা অথবা আরও স্থায়ী ম্যাংগানিজ অকসাইড, এই আকরিক দুষ্প্রাপ্য ছিল না। অন্যান্য বর্ণ বা বর্ণের মাত্রা তৈরি হত এদের মিশিয়ে।

গেরিমাটি প্রথমে পাথরের ফলকে বা পাত্রে ঘষে মিহি গুঁড়ো রং বানাত শিল্পী, তার পর তার সঙ্গে মেশাত পশুর চর্বি, কখনও বা মাছের আঁশ জলে ফুটিয়ে তৈরি আঠা, ডিমের সাদা অংশ, গাছপালার রস এমন কি রক্ত ও প্রস্রাব ইত্যাদির এক একটি। সোজাসুজি আঁকবার জন্য এই বস্তু চেপে রঙিন 'খড়ি' বানানো হয়েছে, আর তরল রং লেপনে ব্যবহার হত হয়তো পশুর লোম, পাতা বা পালকের গোছা কিংবা দাঁতনের মত চিবিয়ে থেঁৎলানো কাঠি দিয়ে তৈরি বুরুশ, অথবা শুধু আঙুল। মাঝে মাঝে এমন ছবির দেখা মেলে যার থেকে মনে হয় তার অংশ বিশেষে—যেমন অস্পষ্ট আভাসে ঘোড়ার কেশর বোঝাতে—গুঁড়ো রং ছিটিয়ে লাগানো হয়েছে। এ যুগে ফুৎকার যন্ত্রে রং লাগাবার এই কৌশলের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, হয়তো সে দিনের মানুষ বানিয়েছিল এই যন্ত্রের কোনও প্রাথমিক সংস্করণ, ফাঁপা হাড়ে রং ভরে তাতে ফুঁ দিয়ে কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকতে পারে।

২০,০০০ থেকে ১০,০০০ বছরে, কোথাও কোথাও তার বেশী কাল ধরে গুহাচিত্রের যে কোনও ক্ষতি হয় নি, রং আজও প্রথম দিনের মত উজ্জ্বল তা কয়েকটি কারণে। গেরিমাটির রং স্থায়ী, চর্বিও সংরক্ষক, এবং চুনাপাথর ধীরে ধীরে এই মিশ্র বস্তু শুষে নিয়েছে। গুহার গভীর গর্ভে বাতাসের আর্দ্রতা বাইরের মত দিন, ঋতু বা যুগ ভেদে অস্থির নয়, হিমও জমতে পারে নি। এই গহন অন্তঃপুরে দিন দুপুরেও কোথাও কোথাও বাতি ছাড়া চলা ফেরা অসম্ভব, চিত্রাঙ্কন তো দূরের কথা। তবু কি এক আকর্ষণ

চিত্রকরদের সেই দুর্গম অন্ধকূপেই টেনেছে—যেখানে তদুপযুক্ত গুহা নেই, যেমন জার্মেনি চেকোসলোভাকিয়া পোল্যানড ইউক্রেইন এবং রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালা পর্যন্ত, সে অঞ্চলে ছবিও আঁকা হয় নি, যদিও পূর্ব য়োরোপে ভাস্কর্য ও উৎকিরণ দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের মানুষ আঁধার অভ্যন্তরে ছবি আঁকতে পাথর খুবলে বা সুবিধা মত স্বাভাবিক শিলা খণ্ড দিয়ে প্রদীপ বানিয়েছে, তাতে জেবলেছে চর্বি। এই আদি কালের দীপ অসংখ্য পাওয়া গিয়েছে, যেমন উদ্ধার হয়েছে রং গুঁড়ো করবার বা ঘষবার চ্যাপটা নুড়ি অথবা পাতলা পাথরের ফলক। প্রদীপের গায়ে এখনও লেগে আছে কালির দাগ। এ সব প্রদীপ দেখতে প্রায় বর্তমান এস্কিমোদের ব্যবহৃত বাতির মত, তারা শুকনো শেওলা দিয়ে সলতে বানায়, তাদেরও ইন্ধন পশুর চর্বি।



চিত্র ২৪। গুহাশিল্পীদের উপকরণ: ক—খড়ি, খ—প্রদীপ, গ—ফাঁপা হাড়ের বর্ণাধার।

শিল্পীর ব্যবহৃত আর এক শ্রেণীর বস্তু কৌতূহল জাগায়। নুড়ি বা হাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ ছোট ছোট পশু মূর্তি এখানে সেখানে বেশ কিছু

আবিষ্কার হয়েছে, কখনও একের উপর আর এক, কখনও একাধিক। যথা এক খণ্ড ডিমাকার নুড়ির গায়ে আঁকিবুকি দেখতে হিজিবিজির মত, কিন্তু তাতে পর পর সনাক্ত হয়েছে কয়েকটি ঘোড়া বুনো ছাগল গণ্ডার বলগা হরিণ এবং একটি করে অন্য জাতের মর্দা হরিণ ও বিড়াল। সম্ভবত গুহার দেয়ালে হাত লাগাবার আগে এগুলিতে শিল্পী তার কল্পনার অগ্রিম রূপ দিয়েছে, পরীক্ষা চালিয়েছে। গুহার পটে কাজটি সম্পন্ন হলে মনে হয় কখনও কখনও এই নকশার উপর গেরিমাটি বা কাদা লেপে তা ঢেকেছে, শুকিয়ে গেলে আবার তারই উপর টেনেছে নতুন নকশা, এখন এই প্রলেপ-গুলি চলে গিয়ে ফুটে উঠেছে পর পর ছবির রেখা। আলতামিরায় উৎকীর্ণ এক হরিণ মূর্তির কাছেই ছিল হরিণের মাথা আঁকা এক খণ্ড হাড়, হয়তো বনে বনে ঘুরে জীবন্ত জন্তুটির নকশা তৈরি করে এনেছিল শিল্পী আসল কাজে নিজের স্মৃতিকে সাহায্য করতে, যেমন আজও করা হয়। অবশ্য হতে পারে যে গুহাচিত্রের সঙ্গে এই সব খণ্ডের সম্পর্ক নেই, সেগুলিতে ভাবী শিল্পী বা শিক্ষার্থীরা হাত পাকিয়েছে, কোথাও কোথাও মনে হয় রেখা-চিত্রের উপর কেউ যেন হাত চালিয়েছে—শিক্ষক হয়তো। অথবা আজকের চিত্রের যেমন এক টুকরো কাগজ পেলে তার উপর অলস মনে আঁকিবুকি আঁকে, তেমনি সে কালের শিল্পী পাথর ও হাড়ের গায়ে অনেক বিনা কাজের খেয়ালী নকশা রেখে গিয়েছে।

আর এক সম্ভাবনা এই যে গুহাচিত্রের আর এদের একই বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল, যেমন এই সব ছোট ছোট ফলকে তেমনি গুহা গাত্রেও মনোরম আলেখ্য নষ্ট হয়েছে উপরে অন্য চিত্রণে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রায় সব গুহাতেই রঙিন ছবি বা খোদাই কাজে, লাসকোর এক জায়গায় এ রকম চারটি স্তর দেখা যায়। এই লুপ্ত সম্পদ বাঁচলে আজ গুহাচিত্রের সংখ্যা ও সমাদর, উপভোগ ও মর্যাদা আরও বাড়ত। সে দিনের শিল্পী যে নিজের সৃষ্টি অতি সহজেই মুছে ফেলেছে তা হয়তো প্রবলতর কোনও প্রেরণায়, কিন্তু সেই আলোচনা একটু পরে।

যাই হক, আজ আমাদের চোখে গুহাচিত্রের সৌন্দর্যই বড় এবং দীপ, রং ও অন্যান্য পরিত্যক্ত উপকরণ থেকে কিছুটা কল্পনা করা যায় এই শিল্প

সৃষ্টির দৃশ্যটি। সম্ভবত দু তিন জন এক সঙ্গে কাজ করেছে। অভিজ্ঞতম ব্যক্তির অধীনে সহকারী বা শিক্ষার্থীরা বাতি, রং ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর তদারক করেছে। কোথাও কোথাও ছবি এত উঁচুতে যে চিত্রকরকে চড়তে হয়েছে মই বা মাচানের মত কিছুতে। বাতিগুলি দেয়ালের খাঁজে বা মেঝেতে পাথরের উপর রাখা, দরকার হলে সহকারীরা তার আশেপাশে প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে, সেই আলোয় ছায়া কাঁপছে দেয়ালে ছাতে, বদ্ধ বাতাস চর্বি পোড়ার গন্ধে ভারী। ওস্তাদ কাজ আরম্ভ করবার আগে শিলাপটে হাত রেখে তার আর্দ্রতা পরীক্ষা করল, ভাল রকম শুকনো না হলে তার উপর রং লাগাবে না। সন্তুষ্ট হয়ে সে ছোট এক প্রস্তর ফলকে আগে যে নকশা খুদেছিল তা এক বার দেখে নিল, তার পর দেয়াল বা ছাতে বিউরিন দিয়ে কেটে কিংবা কালো রং লেপে প্রাণী দেহের সরল বহিররেখাটি টানল, তার হাতে পশুর লোম দিয়ে তৈরি বুরুশ (যা আজও ব্যবহার হয়) নয়তো রঙিন খড়ি।

এর পর প্রধান কাজ ভিতরে রং ভরে দেওয়া যেমন যেমন দরকার এবং তা হয়ে গেলে কালো দাগে চোখ শিং খুর পেশী ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা। আলাদ আলাদা সামুদ্রিক ঝিনুকে শিল্পী তার রং মেশাল—এই রকম রঙের দাগধরা কয়েকটি ঝিনুক গুহার মেঝে খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে—তার পর পটে বুরুশ দিয়ে আলগা করে তার প্রলেপ লাগিয়ে আঙুলে ঘষে তা সমান করে ছড়াল; অথবা শুকনো শেওলা জাতীয় বস্তু বা লোম দিয়ে তৈরি নরম পুঁটলি দিয়ে চেপে গাঢ়র থেকে হালকা মাত্রায় মিলিয়ে দিল। কোথাও বা ছড়িয়ে দিল চূর্ণ গেরিমাটি, কিংবা ফাঁপা গোল পাখির হাড়ের ভিতরে তা ভরে ফুঁ দিয়ে কুয়াশার মত ছিটিয়ে দিল পাথরের গায়ে। আবার দেহের কোনও অংশে রং লাগালই না, এই কৌশলে সুন্দর ফুটে উঠল দেহের গড়ন। মাঝে মাঝে দেখা যায় শুধু প্রাথমিক রেখাচিত্রটি, যেন কোনও কারণে শিল্পী উৎসাহ হারিয়েছে; হয়তো কয়েকটি পশু নিয়ে সম্পূর্ণ ছবির পরিকল্পনা ছিল মনে, পরীক্ষায় খুশী হয় নি বলে ছেড়ে দিয়েছে।

সে কালের লোক সর্বত্র তার বাস স্থানে গৃহস্থালির নানা জঞ্জাল রেখে গিয়েছে, তার থেকে যেমন তাদের জীবন যাত্রার অনেক ইঙ্গিত মেলে, তেমনি চিত্রিত গুহাগুলিতে তার কাজ কর্ম চলা ফেরার যে সব চিহ্ন পাওয়া যায় তাতে

আচরণে আবেগে আমাদেরই মত সজীব সচল লোকগুলি যেন আরও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে দাঁড়ায়। কোথাও হয়তো শিলাপটের কাছেই পড়ে আছে মাদলেনীয় শিল্পীর তৈরি রঙিন পেনসিল, রং পিষবার জন্য গ্র্যানিট পাথরের নোড়া, রং মেশাবার জন্য পাথর বা কাঁধের হাড় দিয়ে তৈরি পাত্র—তার গায়ে রঙের দাগ এখনও, বর্ণ লেপনের জন্য সোজা এক খণ্ড হাড়, তারও মুখ রঞ্জিত। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, ঠিক আধুনিক শিল্পীর যেমন দরকার হয় তেমন বর্ণাধার—অবশ্য ফাঁপা হাড়ের তৈরি, এখনও অর্ধেক ভরা অব্যবহৃত রঙে। আর যারা এ সব উপকরণ ব্যবহার করেছে, মেঝের বালিতে তাদের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন, কখনও বা সেই বালিরই গায়ে অলস মুহূর্তে আঙুল টেনে আঁকা মাছ বা ষাঁড়ের রেখাচিত্র, কোথাও বা কর্দম মূর্তির গায়ে আঙুলের স্পষ্ট ছাপ। আগে যে পাখিমুখী মানুষের সঙ্গে এক গণ্ডারের কথা বলা হয়েছে তার লেজের নিচে কয়েকটি কালো কালো দাগ দেখে মনে হয় চিত্রকর তার রংমাখা হাতটি অসাবধানে সেখানে রেখেছিল, ফলে তার টিপসই থেকে গিয়েছে এ যুগের শিল্পীর স্বাক্ষরের মত।

গার্গা গুহায় এক সুড়ঙ্গ পথের ঠিক বাইরেই কেউ রেখেছে হাতের ছাপ, কোনও দেবতা বা আত্মার প্রতি মিনতিপূর্ণ আবেদন বলে কল্পিত হয়েছে তা। হাতে মাঝে মাঝে কাটা আঙুল লক্ষ্য করে অনেকে মনে করেন যে হয়তো সে কালে কোনও অনুষ্ঠানে আঙুল বলির প্রথা ছিল এবং হাতের ছাপও সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ (চিত্র ২৫)। আঙুলের এক একটি গ্রন্থি পর্যন্ত উৎসর্গ করে আত্মা বা দেবতাকে তুষ্ট করার রীতি আজও অনেক বর্বর সমাজে প্রচলিত, অসম্ভব নয় যে প্রস্তর যুগেই এই প্রথার উৎপত্তি। ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতের ছাপ অনেক বেশী দেখা যায়, তাও কি কোনও পার্বণের রীতি অনুসারে। আমাদের এই পূর্বপুরুষরা ব্যবহৃত বস্তু, ফসিল ইত্যাদি যা কিছু রেখে গিয়েছে তার চেয়ে এই ছাপগুলি রক্ত মাংসের মানুষটিকে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ করে তোলে, কিন্তু ঐ হাতের ইশারা কি তা আমরা জানি না।

লাসকোর গুহায় প্রদীপ স্তূপের সঙ্গে কিছু হরিণ শিঙের বর্শা ও পাইন জাতীয় গাছের কাঠকয়লা আবিষ্কার হয়েছে। কাঠকয়লা থেকে হয়তো শিল্পী

তার রং বানিয়েছে, কিন্তু তা এ কালের বিজ্ঞানীদেরও কাজে লাগে কারণ সে কালের গাছপালার নির্দেশ দেয়, উপরন্তু কাঠকয়লা কারবন-প্রধান বলে উপযুক্ত তেজস্ক্রিয় ঘড়ি, তার থেকে জানা যায় যে লাসকোর গুহায় মানুষের আনাগোনা ছিল প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে। কিন্তু তারা বর্শা এনেছিল কেন? গুহাচিত্রে কখনও কখনও অস্ত্রবিদ্ধ পশু দেখা যায়, আবার কোথাও বা পটের গায়ে নানা রকম দাগ থেকে মনে হয় পশুর দেহে বার বার ঘা বা খোঁচা মারা হয়েছে। আমরা আগে দেখেছি ছবির উপর ছবি এঁকে ক্রোমানীয়রা তা নষ্ট করেছে, এই অত্যাচারও সে রকম আর এক দৃষ্টান্ত, তাই এখানেও গূঢ় উদ্দেশ্য সন্দেহ হয়। গুহা গহ্বরের অন্যান্য নজির এই সন্দেহ দৃঢ়তর করে, এ বার সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

ক্রোমানীয়রা যে এই সব গুহার অন্তর্দেশে ঢুকেছে শুধু চারুশিল্প রচনার তাগিদে নয়, তাদের মনে যে হয়তো আরও গুরুতর প্রেরণা ছিল তার কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি গুহার গাত্রে নানাবিধ রহস্যজনক সংকেত, হাতের ছাপ, নিজ সৃষ্টির প্রতি অনাদর ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে। বস্তুত বিশেষজ্ঞরা সকলেই মনে করেন যে গুহাচিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নিছক সৌন্দর্যের উপাসনা বা চিত্ত বিনোদন নয়, এই শিল্প প্রধানত ব্যবহারিক, তাকে বলা যায় ফলিত কলা। এই বিশ্বাসের নানা কারণ, এক বড় যুক্তি এই যে ছবি অনেক সময়ে এমন জায়গায় এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে দর্শকের পক্ষে তার গুণ উপলব্ধি করা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করা তো দূরের কথা, ছবির মুখোমুখি হওয়াই অত্যন্ত কঠিন; ছবি কখনও খাড়া দেয়ালের অনেক উঁচুতে অবস্থিত যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না, কখনও অতি নিচু ছাতের গায়ে (যেমন আলতামিরায়), কখনও বা দুস্তর সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে কোনও অন্ধকার কোণে, হয়তো ভূগর্ভে দু তিন কিলোমিটার দূরে। গুহার অভ্যন্তর ঠাণ্ডা, ভিজে ও অন্ধকার; আগুন জ্বাললে ধোঁয়ায় দম আটকে আসে, সেখানে বেশী ক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। তবু শিল্পী ও তার সহকারীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হয়তো দিনের পর দিন সব অসুবিধা তুচ্ছ করেছে।

এই ধরনের গহন গভীর গুহা গহ্বরের আবিষ্কারে ও পরীক্ষায় সে কালের

ও এ কালের মানুষের যে অদম্য সাহসিকতা ও উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি উদাহরণ না দিলে তার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। কি এক প্রবল প্রেরণা প্রায়ই সে দিনের শিল্পীকে শিলাশ্রয় বা গুহার বহির্দেশ অবজ্ঞা করে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে একেবারে অন্তঃপুরে, সবচেয়ে দুর্গম, বিপদসংকুল, ঘোরালো পথ পেরিয়ে সেই সব আঁধি-কামরায় এঁকেছে সে তার শ্রেষ্ঠ ছবি। ফ্রানসের দর্দনিয় বিভাগে লে কঁবারেল গুহা ২১৬ মিটার দীর্ঘ, কিন্তু তার এক মিটার ৮০ সেনটিমিটার চওড়া সুড়ঙ্গে ছবি আরম্ভ হয়েছে ১০৫ মিটার ভিতরে ঢুকে অখণ্ড তমসায়। স্পেইনে লা পাসিয়েগা গুহার প্রবেশ পথ নদীর ১৫০ মিটার উঁচুতে এক ক্ষুদ্র গহ্বর দিয়ে, ভিতরে চুনাপাথরের মেঝেতে এত সংকীর্ণ এক গর্ত যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষে তার ভিতর দিয়ে নেমে পড়া কঠিন কাজ—কিন্তু এক বার নামলে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। আরব্যোপন্যাসের প্রাসাদের মত কক্ষের পর কক্ষ, দেয়ালে দেয়ালে বিস্ময়কর ছবি, তাদের সংখ্যা ২৬২। অতি কষ্টে আর একটি ফাটল পার হয়ে আসতে হয় শেষ ঘরটিতে, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সভা ঘর', কারণ চুনাপাথরের এক স্বাভাবিক 'সিংহাসন' সেখানে বিরাজমান। ক্রোমানীয় মানুষ যে এই সিংহাসনে বার বার বসেছে তা বোঝা যায় হাতলে তার ময়লা হাতের ছাপ দেখে, এখানে সে ছবি এঁকেছে, রেখে গিয়েছে হাতিয়ার—এ সবের থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে এই সব রহস্যময় অলিগলির পথে মানুষের আনাগোনা ছিল ঘন ঘন, যদিও তারা জানত যে এক বার পা পিছলালেই সর্বনাশ।

ফ্রানসের বৃহত্তম গুহা নিও পাহাড়ের ভিতরে ১২৮০ মিটার ঢুকেছে, প্রথমে পথ আটকে দাঁড়ায় ভূগর্ভের এক হ্রদ, তাকে পেরিয়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, পথে নানা জায়গায় সাঁতার কেটে জল পার হতে হয়, কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে কোনও গতিকে শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণ বর্ত্ম অতিক্রম করেই হয়তো দেখা যায় উত্তুঙ্গ পাথরের চাক পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। তবু ক্রোমানীয় মানব যে নিয়মিত এ পথে চলাফেরা করেছে কাদায় তাদের স্পষ্ট পদচিহ্ন তা প্রমাণ করে।

এক ফরাসী সাঁতারু, নাম কাস্তেরে, ১৯২৩ সালে যে আশ্চর্য সাহস ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন গুহা আবিষ্কারের ইতিহাসে তা অমর হয়ে থাকবে। লাসকোর কাছেই ওরিনিয়াক নামক জায়গা (যার থেকে ওরিনাসীয়),

তার কিলোমিটার কয়েক দূরে মংতেস্‌পাঁ গুহা; গুহার ভিতর দিয়ে এক জলধারা বয়ে গিয়েছে, জল কোথাও কোথাও ছাত পর্যন্ত ঠেকে, সুতরাং এর ভিতরে ঢোকার সব চেষ্টা ইতিপূর্বে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে কাসতেরে স্থির করলেন তিনি সাঁতরে পার হবেন রাস্তা। কিন্তু আরম্ভ করে দেখা গেল জল আর শেষ হয় না; পাহাড়ের গর্ভে নদী ঢুকেছে পাঁচ ছ কিলোমিটার, তার সবটাই পার হতে হল বরফের মত কনকনে জলে সাঁতরে বা হেঁটে, দু জায়গায় ছাতে মাথা ঠেকে গেল, তখন ডুব সাঁতার ছাড়া উপায় নেই—কিন্তু কত ক্ষণে মাথা তুলে শ্বাস নেওয়া যাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এ ভাবে এত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করে অবশেষে যা পুরস্কার তিনি পেলেন তাতে অবশ্য সার্থক হল সব শ্রম আর দুঃসাহস, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর এই যে বহু হাজার বছর আগেও মানুষ ঠিক এই বিপদই অগ্রাহ্য করেছে, তারও বুকে ছিল এতখানি সাহস; বরং আরও বেশী, কারণ তার ছিল না বৈদ্যুতিক আলো, কৃত্রিম শ্বাস-ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা উপকরণ। এই পথেই কবে প্রথম কে এক অসমসাহসী প্রাণ হাতে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অজানা ঘোর তিমিরে, হিমশীতল জলে কখনও ভেসে কখনও ডুবে পিছল পাথরের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে গভীর থেকে গভীরে, পিছনে দাঁড়িয়ে প্রদীপ হাতে তার সঙ্গীরা অপেক্ষায় অধীর হয়েছে··· ফিরে আসবে কি, অভিযান সফল হবে কি, পাওয়া যাবে তো ছবি আঁকবার ঘর? এই কল্পনা-চিত্রটি চোখের সামনে থাকলে বিংশ শতাব্দীর মানুষের যত অভিমান, তার হিমালয় জয়, তার মেরু আবিষ্কার ইত্যাদির উজ্জ্বলতা কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। মনে হয় যে যে কৌতূহল উদ্যম ও সাহস মানুষকে আজ এতখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রগতির পথে তা মানুষেরই সমান প্রাচীন। জনৈক গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে সে কালে গুহাটি হয়তো শুকনো ছিল, কিন্তু অন্যত্র ক্রোমানীয়দের অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখে কোনও গূঢ় অদম্য তাড়নায় কাসতেরের মত দুস্তর বাধা অতিক্রম অসম্ভব মনে হয় না।

সে দিন মংতেসপাঁ গুহার অনুসন্ধানীরা যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল। কাসতেরে অবশেষে যে কক্ষে গিয়ে পেঁাছালেন তার মেঝেতে এক কালে ছিল বহু পশু মূর্তি, এখন ঝরা জলে তার অনেকগুলি নষ্ট; কয়েকটি ঘোড়া

চেনা যায়, আর ঘরের মাঝখানে এক বেদীর উপর এক মিটার লম্বা এবং ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু এক বিমুণ্ড ভালুক মূর্তি ; তার ঘাড়টা সমান করে কাটা, মধ্যে এক গর্ত, হয়তো শিক ঢুকিয়ে সত্যিকারের মাথা জুড়বার জন্য —এ ধারণার সাক্ষী স্বরূপ এক ভাঙা খুলি পড়ে আছে সামনে। এ ছাড়া দেড় মিটার দীর্ঘ তিনটি সিংহী মূর্তিও পাওয়া গেল।

শুধু দুর্গম গুহা গহ্বরের আবিষ্কারেই নয়, ছবি আঁকার কাজেও সে যুগের শিল্পীর অনেক কষ্ট অনেক বিপদ অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। হয়তো কখনও আর কারও কাঁধে দাঁড়িয়ে, কখনও শুয়ে পড়ে সে হাত পেয়েছে নির্ধারিত স্থানে, তা শুধু কঠিন নয়, কখনও কখনও বিপজ্জনক। আলতামিরার নিচু ছাতের কথা আগে বলেছি, তার চিত্রণে শিল্পীদের নিশ্চয় চিত হয়ে পড়তে হয়েছে, এ কালে মাইকেলেন্‌জেলোকে যেমন হতে হয়েছিল রোমের সিস্‌টিন ভজনালয়ের ছাত আঁকতে।

দুর্গম পথে তিন ফরাসী বালক কেমন করে ত্যুক দোদুবেআর গুহা আবিষ্কার করেছিল একটু আগে তা আমরা দেখেছি। দু বছর পরে তারা বাবার সঙ্গে আর একটি সংযুক্ত গুহার অনুসন্ধান আরম্ভ করে। আবার নানা বাধা বিপত্তি, হামাগুড়ি দিয়ে সংকীর্ণ পথ পার হওয়া এবং ঢালু পথে চড়া, এক জায়গায় এক সরু সুড়ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে ক্ষোদিত ও রঞ্জিত কয়েকটি সিংহ মুণ্ড। অবশেষে ভূগর্ভে এক প্রকোষ্ঠ, তার দেয়াল জুড়ে নানা জন্তুর উৎকীর্ণ চিত্র যেন এক রূপকথার চিড়িয়াখানা। কোনও কোনও মত অনুসারে তাদের পালক এক সংকর প্রাণী, তার পা দুটি মানুষোপম কিন্তু পিছনে লেজ, মাথায় শিং, নাচতে নাচতে বাঁশি বা অন্য কি এক বাদ্য যন্ত্র বাজাচ্ছে। তাকে গ্রীসীয় উপকথার অর্ধনরছাগ ও প্রকৃতি দেব প্যান-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কিন্তু আরও চমকপ্রদ এক মূর্তি কক্ষের উপরে বিরাজমান এই আজব পশু দলের প্রভুর মত। তার মাথায় হরিণের শিং, কান হরিণ বা নেকড়ের, চোখ দুটি পেঁচার মত গোল, মুখের নিচে লম্বা দাড়ি, লেজ ঘোড়া বা নেকড়ের, সামনের থাবা ভালুকের সঙ্গে মেলে, পিছনের দুই পা মানুষের এবং মনে হয় জননেন্দ্রিয়ও তাই। দুই পায়ে ভর করে সে ঘাড় ফিরিয়ে

তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে। এই ছবির কাছাকাছি যাওয়ার একমাত্র উপায় হল জানলার মত এক খুপরির থেকে ঝুলে পড়ে প্রসারিত এক চুনাপাথরের স্তম্ভে পায়ের আঙুল দিয়ে ভর করা। কাউনট মহোদয় তাঁর তিন পুত্রের সম্মানে গুহাটির নাম দিলেন লে ত্রোআ-ফ্রের (তিন ভাই)।



চিত্র ২৫। ক—লে ত্রোআ-ফ্রের গুহার মুখোশ-পরা নর্তক, খ—'ভিনাস' বা জননী দেবী, গ—গুহার গায়ে হাতের ছাপ।

গুহাচিত্রের উদ্দেশ্য সন্ধানে এই বহুরূপী 'পশুরাজ' এক মূল্যবান সাক্ষী। রোম ও গ্রীসের আর্টেমিস ও ডায়ানার মত শিকার দেবতা হতে পারে সে, শিকারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে প্রচুর জুটিয়ে দেওয়া তার হাতে। নতুবা হয়তো সে শিকারী, পশুর সাজ পরে আত্মগোপন করেছে যাতে সহজে তাদের কাছে এগোতে পারে, মুখোশের এই ব্যবহার নাকি ব্যাধ সমাজে এখনও অনেক জায়গায় প্রচলিত, যেমন আমেরিকার ইনডিয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মধ্যে। কিন্তু অনেকের মতে এই শিং ও

পশুচর্মধারী ছদ্মবেশী মানুষটি প্রায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তি, একাধারে মায়াবী যাদুকর, ওঝা ও পুরোহিত, তার বিধি অনুসারে ভাগ্য পরিবর্তন হয়। বস্তুত গুহাচিত্রের প্রধান প্রেরণা যাদুর সাহায্যে সৌভাগ্য আনা বলে ধরে নিলে অনেক হেঁয়ালির জবাব মেলে। ছবি যদি চিত্ত বিনোদনের জন্য হত তো প্রায়ই এমন দুরধিগম ও তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে তার স্থান কেন, গুহার মুখের দিকে বা অগভীর শিলাশ্রয়ে শিল্পী ও তার সহকারীদের কাজ অনেক সহজ ও কম বিপদসংকুল হত, দর্শককেও ক্ষীণ কম্পিত দীপালোকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত না। বরং মনে হয় যে এ সব গহন অন্তর্লোক সর্বসাধারণের জন্য নয়, তাদের চোখের আড়ালে অনুষ্ঠিত হবে যাদুসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ।

পুরামানবের প্রধান দৈনন্দিন ভাবনা ছিল শিকার যার থেকে তার পেট ভরবে। তার আশা ও বিশ্বাস যে তুকতাক দিয়ে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শিকার সহজ হবে, মন্ত্র বা যাদুর বলে শত্রু নিপাতের চেষ্টা আজও নিশ্চিহ্ন হয় নি। মন্ত্র বা প্রার্থনার সঙ্গে এখন দেশে দেশে যেমন নানা উপকরণ দরকার, সে কালে পশুর চিত্র বা মূর্তিও তাই ছিল, তাই ছবিতে তারা প্রায়ই বর্শাবিদ্ধ দেখা যায়, লে ত্রোআ-ফ্রের গুহাতেই ক্ষোদিত আছে এক মুমূর্ষু ভালুক, তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, সবটা দেহ জুড়ে গোল গোল দাগ, সেগুলি পাথরের আঘাত নির্দেশ করছে। কখনও কখনও ছবির পটে প্রকৃত বর্শা বা লাঠির ক্ষতও উপস্থিত, লাসকোর গুহায় প্রাপ্ত বর্শার কথা এখানে মনে পড়ে। মঁতেসপাঁতে তিন সিংহী মূর্তিকে বার বার বল্লম ফোটানো হয়েছে, ফঁদগোম গুহায় কয়েকটি ফাঁদ বা খোঁয়াড়ের মত জায়গায় জন্তু আটক রয়েছে, একটিতে এক বিশাল ম্যামথ। বাস্তব ক্ষেত্রে শিকারীর যা আশা বা প্রার্থনা চিত্রকর বা ভাস্কর তারই রূপ দিয়েছে —প্রথম প্রয়োজন সুপ্রচুর জীব জন্তু, তাই গুহায় কন্দরে ছবিতে মূর্তিতে তাদের ভিড়। ত্যুক দোদুবেআর গুহার মাটির বাইসন জোড়া সম্ভবত তৈরি হয়েছে বাইরে মাঠে এরা সুলভ হবে এই আশায়।

দ্বিতীয়ত চাই শিকার ঘায়েল করা, তাই অস্ত্রবিদ্ধ পশুর রূপায়ণ। কোথাও কোথাও ছবি বা মূর্তির সামনে দলের লোকেরা অস্ত্র হাতে প্রকৃত ঘটনার

মহড়া দিয়েছে এমন দৃশ্য কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না। আরও অনুমান করা চলে নাচ গান চিৎকারে, হয়তো বাঁশির সুরে, গুহা গম গম করে উঠত; কোথাও বা নৃত্যরত মানুষের পদচিহ্ন দেখা যায়, লে ত্রোআ-ফ্রের গুহার দুটি ছদ্মবেশী মূর্তির যেন নর্তকের ভঙ্গি; তার সঙ্গে ছবির গায়ে ঘন ঘন বর্শা লাঠি পাথরের ঘা পড়ত, এই আচার অনুষ্ঠানে ছবি আরও বাস্তবের দিকে এগিয়ে যাবে বলে। শিকারী আর রক্ত মাংসের প্রাণীর মধ্যে যোগ সাধন করে এই যোজক যাদু (sympathetic magic), এই সব কিছুর নিয়ামক গুরু হলেন যাদুকর। গুহার গহনে ছবির চিড়িয়াখানাগুলি তা হলে আক্ষরিক অর্থে যাদুঘর।

ম্যামথ বাইসন ঘোড়া হরিণ ইত্যাদি যুগিয়েছে খাদ্য ও পরিধান—যাদু বলে তারা ধরা পড়বে মারা পড়বে। তা ছাড়া সংখ্যা বাড়লে তারা সহজলভ্য হবে, যাদু সেই ইচ্ছাও পূরণ করতে পারে, তাই দেখা যায় আসন্নপ্রসবা গরু ঘোড়া হরিণীর ঝোলা পেট, অন্যদের দুধভরা ফোলা বাঁট, কোথাও কোথাও মৈথুনরত যুগল। তুষার যুগে শীতের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পর্বে এক শ্রেণীর পশু বিদায় নিয়ে অন্যরা দেখা দিয়েছে, সুতরাং স্থানে স্থানে শিকারের অভাব ঘটেছে হয়তো, তখন যাদুর উপর নির্ভরতা বেড়েছে। হিংস্র পশুর ভয় ছিল, তাই সিংহ ভালুক ইত্যাদির ছবি বা মূর্তি, যাদু বলে বিপদ কাটবে বলে। মানুষের বাস্তবিক ছবি যে নেই তার কারণ হয়তো সেও তা হলে যাদুর কবলে পড়ে মরতে পারে, তাই যেখানে তাদের না দেখালে চলে না সেখানে তারা বিকৃত, ছদ্মবেশী, বহুরূপী হয়ে যেন যাদু শক্তিকে ফাঁকি দিচ্ছে, যেমন উপরোক্ত 'পশুরাজ' ও একই গুহার প্যান দেব। লাসকোতে বাইসন ও গণ্ডারের মধ্য স্থলে পাখিমুখী মানুষের ছবি সাত মিটার এক গহ্বরের নিচে দুর্গম অংশে অঙ্কিত, অনেকের বিশ্বাস সেও মুখোশপরা যাদুকর, কোনও এক অনুষ্ঠানে সম্মোহনের আবেশে সংজ্ঞা হারিয়ে শুয়ে পড়েছে। এঁদের যুক্তি এই যে তার কাছেই যে লাঠি বা বর্শা ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় পাখি দেখানো হয়েছে এ রকম পাখি আধুনিক সাইবেরিয়ার যাদুকররা ব্যবহার করে। কিন্তু এই মানুষটি সম্বন্ধে বিকল্প ধারণাও আছে, তা পরে দেখা যাবে।

ছবির উপরে ছবি আঁকার রীতিও যাদু তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত

ছবি যদি মনোরঞ্জনের জন্য হত তা হলে এত সহজে চিত্রকর নিজের ছবি নষ্ট করত না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাছেই গুহা গাত্রে জায়গা খালি আছে, তার থেকে মনে হয় এক এক স্থলের বিশেষ মূল্য ছিল কারণ সেখানে ছবি এঁকে কার্য ক্ষেত্রে ভাল শিকার পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং অনুষ্ঠান হুবহু রীতি-মাফিক হলে বার বার পুরস্কার মিলবে এই ছিল আশা। কোনও কোনও গুহার অন্যদের তুলনায় বেশী কদর ছিল হয়তো একই কারণে—দেয়ালে সর্বত্র জন্তুর ঠেলাঠেলি, যেমন লে কঁবারেল কন্দরে, তার শিলায় প্রায় ৩০০ প্রাণী ক্ষোদিত। ছবিতে কোথাও কোথাও যে দেখা যায় এক জন্তুর শুধু মাথাটি বদলে অন্য পশুর মুণ্ড বসানো হয়েছে তাও হয়তো ভিড়ের ঠেলায় কিংবা পরিশ্রম বাঁচাতে; কারণ অনেক দেহ তিন থেকে ছ মিটার লম্বা, তার চিত্রণ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ক্লেশসাধ্য, অথচ হরিণ দরকার, তাই শিল্পী যেন ভাবল তার সবটা না এঁকে বাইসনের সঙ্গে শুধু মস্তক বিনিময় করবে। নুড়ি বা উপল খণ্ডে উৎকীর্ণ মূর্তিও এই রকম শ্রম লাঘবের কৌশল হতে পারে, গুহার গায়ে বড় ছবি না এঁকে সহজে কাজ হাসিল হল। এই সব ছোট ছোট পটেও যে কখনও একের উপর এক পশু রূপায়িত হয়েছে তাও হয়তো বিশেষ শিলা খণ্ডের যাদু বল প্রবলতর প্রমাণিত হয়েছে বলে। অবশ্য আমরা দেখেছি অনেকের বিশ্বাস যে এগুলিতে গুহাশিল্পী তার প্রাথমিক নকশা বানিয়েছে মাত্র, অথবা ভাবী শিল্পীরা হাত পাকিয়েছে।

আদি কাল থেকে পুরামানব যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছে তখন সে তার মুখের কাছে বাস করেছে, সঁ্যাতসেতে বদ্ধ আঁধার অন্তঃপুর এড়াতে চেয়েছে। কিন্তু ক্রোমানীয়রা ছবি আঁকতে অনেক কষ্ট সয়ে ঢুকেছে সেই গভীর ভূগর্ভে, সব নিগ্রহ তুচ্ছ করে তারা পেঁৗছেছে এক দূর মায়াময় গোপন জগতে। তাদের সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র সেই স্তব্ধ তিমিরাচ্ছন্ন কেন্দ্র স্থল, দেখে বাহবা দেওয়ার জন্য নয় সেই ছবি। সেখানে অলিতে গলিতে আনাচে কানাচে কুহক আর অসম্ভবের খেলা। প্রদীপের কম্প্র প্রভায় রূপকথা রূপ নেয়, ছায়ামূর্তি সব নেচে বেড়ায়, অলৌকিকের সঙ্গে যোগ সাধনের অদ্বিতীয় লীলাভূমি তা। গুহায় কন্দরে আঁকাবাঁকা গলি, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ, ছোট বড় কক্ষ, দেয়ালে প্রসারিত পাথরের তাক ইত্যাদি নিয়ে নানা বৈচিত্র্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই

আছে এক স্বতন্ত্র নিরালা এলাকা, যা হয়তো আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়েছে, অনেকটা আজকের ঠাকুর ঘরের মত।

কখনও কখনও এই এলাকায় পেঁছানো অতীব কষ্টসাধ্য। মানুষের মনে দুর্গম ও পবিত্রের যে নিকট সম্পর্ক আজও দেখা যায় তা ক্রোমানীয় মানসে আগেই অংকুরিত হয়েছে এমন ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং কোনও কোনও প্রত্নবিজ্ঞানী অনুমান করেন যে এই সব গুপ্ত নিভৃত আশ্রয়ে যৌবন-প্রবেশের দীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। তরুণ দীক্ষার্থীরা সংকীর্ণ অন্ধকার আর্দ্র সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছে, এই গোলক ধাঁধায় সতত বিপদে পড়ে অন্ধ তিমিরে হারিয়ে যাওয়ার ভয়, হয়তো উপবাসের ক্লান্তিতে প্রায় অজ্ঞান তারা—অবশেষে পুণ্য স্থানের কাছাকাছি এসে দূরে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যায়, শক্তি ও সাহস ফিরে আসে, তার পর সেই মায়াকক্ষ, সেখানে দেয়ালে দেয়ালে ছবির সামনে দীক্ষার নানা উপকরণ। এই অনুমানের নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু আদিতম ঐতিহাসিক কালেই অনুরূপ ভাবগম্ভীর পরিবেশে যে এই ধরনের ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত তার লিখিত নজির আছে ; তা ছাড়া আজও আদিবাসী সমাজে তা প্রচলিত, এবং ক্রোমানীয়দের সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের নানা যোগসূত্র আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। উপরন্তু কিছু কিছু চিহ্ন কৌতূহল জাগায়, যেমন মঁতেসপাঁ গুহার এক দুর্গম কোণে কয়েক জন বসেছিল একদা, নিতম্বের ছাপ দেখে বোঝা যায় তারা বয়সে তরুণ, কল্পনার রাশ কিছুটা ছেড়ে দিলে ভাবা যায় সেখানে তারা যৌবন সূচনার দীক্ষা লাভ করেছিল।

তেমনি ত্যুক দোদুবেআর গুহার জোড়া বাইসন কক্ষের কাছেই এক ক্ষুদ্রতর প্রকোষ্ঠে প্রায় পঞ্চাশটি ছোট বড় গোড়ালির ছাপ দেখা গিয়েছে, মনে হয় তা ১৩-১৫ বছর বয়স্ক পাঁচ ছ'টি বালকের। হতে পারে তারাও এ কালের ফরাসী বালক তিনটির মত কৌতূহলের বশে গুহার অনুসন্ধানে এসেছিল, নয়তো ছাপগুলি সাম্প্রদায়িক নাচের চিহ্ন, কিন্তু তাদের কাছেই মাটির তৈরি কয়েকটি ছোট ছোট কলার মত বস্তু পাওয়া গিয়েছে যা লিঙ্গ বলে অনুমান করা হয়। হয়তো গভীর ভূগর্ভে প্রায় অনধিগম্য এই খুপরির

উর্বরতাজনক কোনও অনুষ্ঠানের স্থল, সেখানে বালকরা জেগে অধিবাস যাপন করেছে। বৃহৎ বাইসন ক্রোমানীয়দের মাংস ও চামড়ার প্রয়োজনের অনেকটা যোগাত, তাদের পক্ষে প্রাণীটির সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা স্বাভাবিক।

এখনও এসকিমো দেশে ও সাইবেরিয়ায় ক্রোমানীয়দের মত শীতাঞ্চলের মানুষ পেটের দায়ে জন্তুদের তাড়া করে বেড়ায়, সতত তাদের ঐ চিন্তা। তাদের চেষ্টা হল অনুষ্ঠানের প্রভাবে পশুর আত্মাকে তুষ্ট করা যাতে সে সহজে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজী হয়, তার পর সেই আত্মা যাতে ফিরে এসে শিকারীর অনিষ্ট না করে। শিকার সহজলভ্য করতে যাদুর ব্যবহার ও মন্ত্র শক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ফিনল্যানডের এক পুরাকাহিনী থেকে। ব্যাধ লেমিনকাইনেন বনে ঢুকে সুর করে গাইছে, "হে বনদেব টাপিও, আমার সহায় হও, শিকারের কাছে নিয়ে চল আমাকে।" বনদেবীকে বলছে, "আমার দিকে শিকার পাঠিয়ে দাও, যদি নিজে কষ্ট করতে না চাও তো তোমার দাসীদের বল আমায় সাহায্য করতে।" তার মেয়েকে বলছে, "পশুদের পিছনে বেত মেরে তাদের পাঠিয়ে দাও এ দিকে, আমি অপেক্ষা করে আছি।" মন্ত্র বলে কাজ হল, দেব দেবী ও কন্যারা খুশী হয়ে হরিণ পাঠিয়ে দিল শিকারীর দিকে, হরিণ মেরে সে এ বার গাইল কৃতজ্ঞতার গান, তার পর তাদের জন্য সোনা রুপা ছড়িয়ে রেখে ঘরে ফিরল।

নেআনডার্টালরা গুহা ভালুকের খুলি জমাত, তাতে যে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের আভাস থাকতে পারে তা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। ক্রোমানীয় আমলে যাদুর প্রয়োগ আরও বেড়েছে এই অনুমান স্বাভাবিক। মানুষ ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠানে পশুকে বশ করে দুর্বল করে শিকার সহজ করেছে, খাদ্য সমস্যা মেটাতে তাদের উর্বরতা ও সংখ্যা বাড়িয়েছে, হিংস্র জন্তুর বিপদ কাটিয়েছে—অন্তত নিজেদের চোখে। তা ছাড়া এ সব গুহা গহবরে সম্ভবত আরও ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয়েছে, যৌবন দীক্ষা ছাড়াও হয়তো ছিল মায়া বলে মন্ত্র বলে ভাগ্য বদল রোগ সারানো ভূত ছাড়ানো, সব কিছুর নির্দেশ দিয়েছে যাদুকর যাজক বা সর্দার ওঝা, সমাজে কেউকেটা লোক সে। গুহার দেয়ালে রহস্যজনক নকশা বা চিহ্নগুলি এ সব প্রথার সংগে সম্পর্কিত কিনা কে জানে, এদের কোনও

কোনও ব্যাখ্যায় যে অলৌকিকের ইঙ্গিত আছে তা আমরা অবিলম্বে দেখব। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এরাও দুর্গম অঞ্চলে অঙ্কিত, কতগুলি চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ভূগর্ভের এক তমসাবৃত হ্রদের ধারে, আর কতগুলি দেখা যায় খুব উঁচু এক খুপরির মধ্যে যেখানে চড়তে হয় প্রাণ হাতে করে। অন্যত্র এক খুপরির ছাতে যে সংকেত চিহ্নিত হয়েছে তা দেখতে হলে শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

যাদুকর-যাজক-ওঝারা আজও সাইবেরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অন্যত্র নানা আদিবাসী সমাজে প্রতিষ্ঠিত, মায়া বলে তারা ভেলকি খেলায়, দেহ থেকে রোগ তাড়ায়, উচ্ছ্বাসে আবেশমগ্ন হয়ে গুপ্ত বস্তুর সন্ধান দেয়, ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। সাধারণ লোক প্রকৃতির হাতে অসহায়, তাদের দুর্বোধ বিপদসংকুল ভাগ্য তারা নিয়ন্ত্রণ করে দেয়। মধ্য সাইবেরিয়ার শিকারী সম্প্রদায়ের এমনি এক যাদুকর কি করে নিজের পেশায় দীক্ষিত হয়েছে তা শুনে এক লেখক সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পরলোকগত পূর্ব-পুরুষরা প্রথমে তীর ছুঁড়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল, তার পর তার দেহ কেটে কাঁচা মাংস খেল। এই অনুষ্ঠানের সময়ে সারা গ্রীষ্ম কাল সে নিজে কিছু খেল না পান করল না, অবশেষে তারা এক বলগা হরিণের রক্ত পান করে তাকেও দিল। সম্প্রদায়ের প্রত্যেক যাদুকরের এই দীক্ষা, এখন তার মৃত ভাইয়ের আত্মা এসে তার মুখ দিয়ে কথা বলে। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম অংশে তিয়েরা দেল ফুএগো দ্বীপে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুসারে এক আদিবাসী যাদুকর নানা অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে উত্তেজনা-কম্পিত হাতে নিজের মুখ থেকে একটি ছোট বস্তু বার করল, চোখের সামনে ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে তা মিলিয়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত স্থানীয় দর্শকরা বললে বস্তুটি কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য এক শয়তান, প্রভুর হুকুমে সে লোকের শরীরে পোকা মাকড়, ইঁদুর, ধারালো পাথর, বাচ্চা অকটোপাস ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিতে পারে।

এই ধরনের বর্ণনা খুব আশ্চর্য লাগে না, তার কিছুটা আজগুবী বা অতিরঞ্জন, কিছুটা ম্যাজিক। আপাতদৃষ্টিতে যা অতিপ্রাকৃত অসম্ভব কীর্তি তা আমরা আজ মহানগরে আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে বসেও দেখি এবং

সেখানে যাদুকররা অলৌকিক শক্তির দাবি করে না, তা ইন্দ্রজাল বলে মানে। কিন্তু সাধারণের মনে এই আদিবাসী যাদুকরদের বাণী ও ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খাঁটি বাস্তব। এই প্রভাব ক্রোমানীয়দের মধ্যে নিঃসন্দেহে আরও প্রবল ছিল, যাদুর থেকে তারা পেত শক্তি ও উদ্দীপনা, সাহস পেত মৃত্যু ও অজানার ভয়কে বশ করতে। বিশেষত শিকারীর দৃষ্টিতে যাদু তার বর্শার মতই আবশ্যিক অঙ্গ, তা যদি হার মানে তো বুঝতে হবে নিশ্চয় অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি ছিল, নয়তো প্রবলতর কোনও শক্তি বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

শুধু তথাকথিত বর্বর সমাজে কেন, আজও সভ্য দেশের কোণে কোণে এই বিশ্বাস টিকে আছে যে উইচ্‌রা শত্রুর মোমমূর্তিকে মন্ত্র তন্ত্র সহকারে কাঁটাবিদ্ধ করে তার মৃত্যু বা অনিষ্ট ঘটাতে পারে—বর্শাবিদ্ধ পশুর ছবি আঁকা বা ছবির গায়ে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে এর পার্থক্য নেই। এখনও ইংল্যান্ডে গাই ফক্‌স-এর প্রতিকৃতি, এ দেশে রাবণের প্রতিকৃতি দাহনে প্রস্তর যুগের বিশ্বাসই প্রতিফলিত। সে দিনের যাদু আজ হয়তো সম্পূর্ণ রূপকে পরিণত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক যোগসূত্রটি আজ পর্যন্ত সভ্য জগতেও অনুধাবন করা যায়।

এত কথার পর মনে হতে পারে যে ক্রোমানীয়রা গুহাশিল্প সৃষ্টি করেছে শুধু যাদুর খাতিরে, কিন্তু এই তত্ত্বে সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে না, কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। ছবিগুলি যদি পশু মারবার ফন্দি হয় তবে হতাহতের তুলনায় অক্ষত এবং শান্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে রূপায়িত জন্তুর সংখ্যা অনেক বেশী কেন? তা ছাড়া সম্পূর্ণ কাল্পনিক প্রাণীর সঙ্গে শিকার বা যাদুর যোগ কোথায়, যেমন পেটের নিচে চারের বেশী পা ঝুলছে এমন সব দুঃস্বপ্ন অথবা লাসকোর ইউনিকর্ন?

যাদু তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে অ্যালেকজ্যানডার মার্শাক বলেছেন যে ক্রোমানীয়দের পরিত্যক্ত হাড়ের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় বলগা হরিণের মাংস ছিল সবচেয়ে সমাদৃত, অথচ ছবিতে তাদের সংখ্যা ঘোড়া বাইসন ও অন্যান্য জন্তুর অনেক নিচে। তা ছাড়া গুহাচিত্রের মাত্র ১০ শতাংশ পশু নিহত দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে ছবি ও টুকরো শিল্পের ঘন ঘন ব্যবহার ছিল সামাজিক

আচার অনুষ্ঠানে অথবা ঋতু পরিবর্তনে। অনেক শিল্প বস্তু, যেমন দক্ষিণ জার্মেনির ফোগেলহের্ড ঘাঁটিতে প্রাপ্ত ৩২,০০০ বছর প্রাচীন ম্যামথ দাঁতের তৈরি এক ছোট ঘোড়া বহু ব্যবহারে মসৃণ, হয়তো থলিতে করে তাদের বয়ে বেড়ানো হয়েছে। ফ্রানসের পেশ্ মেআর্ল গুহার বহু ছবিতে বার বার সংস্কারের চিহ্ন দেখা যায়—দেহের রেখা নতুন করে আঁকা, নতুন রং লেপন, কোথাও বা শিং সংযোজন ; এর থেকে মনে হয় উপরোক্ত উদ্দেশ্য পালনে লোকেরা সেখানে ফিরে ফিরে এসেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানসের মংগোদিয়ে গুহায় প্রাপ্ত বলগা হরিণ শিঙের তৈরি বর্শা-ক্ষেপণাস্ত্রের দু পিঠে উৎকীর্ণ হয়েছে এক জোড়া মর্দা ও মাদী সীল, দুটি সাপ, একটি স্যামন মাছ, ছোট ফুল ইত্যাদি যা মার্শাকের মতে বসন্ত কালের জীব জগৎ, যথা প্রাণীদের যৌন মিলন বা পরিযাণ, নির্দেশ করে ; আরও ক্ষোদিত হয়েছে এক বুনো ছাগলের মাথা, তাতে একটি ক্রস আঁকা যেন জন্তুটিকে বলি দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ খাদ্যের জন্য নয়, ঋতুগত পার্বণে হত্যা। শুধু ছবি বা টুকরো শিল্প নয়, গুহার গায়ে এবং শিং বা অন্যান্য বস্তুর উপর এলোমেলো আঁকিবুকি, ফুটকি ও অন্যান্য চিহ্ন আসলে ঋতু বদল ও আকাশ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই তত্ত্ব তিনি তাঁর 'সভ্যতার মূল' গ্রন্থে ও বিবিধ রচনায় প্রবর্তন করেছেন, তার কিছু পরিচয় আমরা গত অধ্যায়ের শেষে পেয়েছি। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে তা হলে ক্রোমানীয় চিত্র, ভাস্কর্য, উৎকিরণ এবং এই সব আপাত-অর্থহীন চিহ্ন একই আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে পরস্পর সম্পর্কিত।

কারও কারও মতে গুহাচিত্রে রূপায়িত আধা-মানুষগুলিকে টোটেম বলে ভাবা যায়, অর্থাৎ যাদের টোটেম হল পশু তাদের আদি পুরুষ পশু-মানব। এই প্রসঙ্গে লাসকোর বিখ্যাত পাখি-মানবের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। মানুষটি মুখোশপরা যাদুকর এই ধারণা সবচেয়ে চলতি হলেও জন কয়েক বিশেষজ্ঞের মতে ছবিটি তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের রূপক রূপায়ণ, তাদের টোটেম ছিল পাখি, বাইসন ও গণ্ডার। কিন্তু প্রবীণ বিশেষজ্ঞ আবে ব্রয়ী যা চোখে দেখেছেন তাই মেনেছেন, অর্থাৎ ছবিটি এক মারাত্মক শিকারের দৃশ্য, মানুষটি প্রথমে অস্ত্রাঘাতে বাইসনের নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে, তার পর নিজে গণ্ডারের হাতে মারা পড়েছে। এই বিশ্বাস তাঁর

এতই দৃঢ় ছিল যে শিকারীকে হয়তো সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছে ভেবে তিনি মাটি খুঁড়লেন ফসিল অনুসন্ধানে, কিন্তু কিছু পেলেন না।

আবার এমন তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছে যে ছদ্মবেশী বা বিকৃত নর মূর্তি-গুলি পুরাণ বা রূপকথার কাল্পনিক জীব, সম্ভবত জননী দেবীর মতই দেবতা। অথবা শুধু নররূপীরা নয়, সব মিলিয়ে গুহাচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ। তা হলে মানুষ যে চির কাল গল্প বলতে ভালবাসে এই তার প্রাচীনতম নিদর্শন। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে দু একটি ছবি দেখে মনে হয় যেন চিত্রকর কোনও বাস্তবিক দৃশ্য বা ঘটনা ধরতে চেষ্টা করেছে তার তুলিতে বা বিউরিনে। কেউ বা বলেছেন যে ছবিগুলি আসলে শিকারে নিহত পশুদের প্রতিকৃতি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যে ব্যাখ্যা তাতে বলে গুহাচিত্র এ সব প্রাণীর সৃষ্টি-আলেখ্য ; সে কালে হয়তো বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী মাতার গর্ভে জন্ম নিয়ে প্রাণীরা এই সব সুড়ঙ্গ আর গহ্বরের পথে মাটির উপরে উঠে আসত।

আর এক দল বিশেষজ্ঞ পাখি-মানুষের দৃশ্যে দেখেছেন স্ত্রী ও পুং ধর্মের সংঘর্ষ, বাইসনের পাকানো নাড়িভুঁড়ি আকারে ডিমের মত বলে সে স্ত্রীর প্রতীক আর বর্শাটি পুরুষ-রূপক। ফরাসী নরবিজ্ঞানী আঁদ্রে লরোআ-গুর্ঁ বহু গুহাচিত্র পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এর মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ শিকার যাদুর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রায় সবই এক ফ্রয়েডীয় যৌন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। তিনি বলেন গুহাচিত্রের প্রাণধর্ম হল স্ত্রী ও পুরুষ গুণের স্বাতন্ত্র্য, শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রায়ই সারা দুনিয়া এই দুই মহলে বিভক্ত। হরিণ বুনো ছাগল ভালুক এবং গন্ডার পুরুষধর্মী, আর বাইসন ও বুনো গরু ষাঁড় স্ত্রীদলীয়। তেমনি এক ফ্রয়েডীয় নিয়ম অনুসারে নানা সংকেত ও নকশার মধ্যে চোখা দাগ এবং বর্শা বল্লম বা লাঠির মত চিহ্নগুলি পুং, পক্ষান্তরে ডিমাকার, ত্রিভুজ ও চতুষ্কোণ নকশা স্ত্রী। প্রায় ষাটটি গুহায় দুই সহস্রাধিক ছবি পরীক্ষা করে লরোআ-গুর্ঁ বলেছেন বাইসন ও অন্য স্ত্রীধর্মী গোজাতীয় পশুর ছবির ৯০ শতাংশ যে দেখা যায় গুহার কেন্দ্রে, যেন জরায়ুতে, এবং ৭০ শতাংশ পুং প্রতীকরা এই গর্ভ স্থলের বাইরে দূরে, এর সম্ভবত এক গূঢ় সাংকেতিক তাৎপর্য আছে।

সুতরাং এই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে গুহার প্রাচীরে প্রাচীরে আমরা দেখি এই দুইয়ের সমন্বয়—এমন কি হয়তো এই দ্বৈতবাদে সন্ধি হয়েছে শুধু স্ত্রী পুরুষের নয়, সব রকম বিপরীত সত্তার, যেমন প্রাচ্য দর্শনের ইন ও ইয়াং, আত্মা ও বস্তু, পুরুষ ও প্রকৃতি। এই তত্ত্বের তীব্র প্রতিবাদে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন লাসকো, আলতামিরা ইত্যাদি গুহা যে কয়েক শতাব্দী ধরে খাপছাড়া ভাবে চিত্রিত হয়েছে তার যথেষ্ট নজির বর্তমান, অথচ তত্ত্ব বলে ক্রোমানীয়রা অগ্রিম পরিকল্পনা অনুসারে যৌন প্রতীকের সমতা বজায় রেখে সব ছবি সাজিয়েছে। তা ছাড়া সেই কালে এতখানি দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি কল্পনা করা অসম্ভব না হলেও সহজ নয়।

গুহার গায়ে নানা রকম দাগ, বিন্দু বা নকশাও জল্পনার উর্বর ক্ষেত্র, কোনও কোনও ব্যাখ্যা দুঃসম্ভব বা হাস্যকর। দক্ষিণ ফ্রানসের মার্সুলাস গুহার দেয়াল বেয়ে উঠেছে এক গোলাপী রেখা, তার দু পাশে ছোট ছোট তেরছা দাগ, সবটা দেখতে যেন লতার মত, কিন্তু পালক, তীর এবং সাংকেতিক পুং জননেন্দ্রিয়ও অনুমান করা হয়েছে। আলতামিরায় জালের মত এক নকশাকে বাসা বলে ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং আব্বে ব্রয়ী, অন্যান্য মতে তা ফাঁদ, উচ্চ বংশের প্রতীক (coat-of-arms) বা ঢাল। স্পেইনেরই লা পিলেতা গুহায় আছে দুটি কাছাকাছি সমান্তরাল আঁকা-বাঁকা পথে লালচে ফুটকি, মাঝে মাঝে দু পাশে অনুরূপ শাখা; মতভেদে তা সাংকেতিক দিনপঞ্জী, পথের নির্দেশ, গাছ, এমন কি আপেল, চেরি, র‍্যাস্‌প্‌বেরি ও স্ট্রবেরি যা আঁকা হয়েছে তারা ভাল ফলবে এই আশায়।

পেশ মেআর্ল গুহায় দুই বিপরীতমুখী ঘোড়ার গায়ে চাকা চাকা গোল দাগ আর উপরে নিচে কয়েকটি হাতের ছাপ। শুধু অলংকরণ না হলে বিকল্প অনুমান দাগগুলি বর্শা-ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতীক, ছাপগুলি বোঝাচ্ছে হননীয় পশুর উপর মানসিক ক্ষমতার প্রাধান্য, দুইয়ে মিলে অতিলৌকিক শক্তির প্রতি সার্থক শিকারের জন্য প্রার্থনা। লরোআ-গুরঁ নানা সংকেতেও যৌন মিলনের গূঢ় অর্থ দেখেছেন, যেমন স্পেইনের এল্‌ কাসতিলো গুহায় প্রায় সমান্তরাল রেখার অনুক্রমে বসানো ঈষৎ লম্বা লাল লাল ছোপ পুরুষের আর আড়াআড়ি দাগ টেনে আঁকা বাক্সের মত নকশা স্ত্রীর চিহ্ন,

দুইয়ের যোগে বোঝাচ্ছে এক ধর্মবিশ্বাস যার ভিত্তি উর্বরতা। এই গুহায় আরও দেখা যায় ঘণ্টার মত ছবি এবং পাশে সরু রেখার শেষ অংশের দু পাশে পালকের মত তেরছা দাগ, তাঁর মতে এগুলি যথাক্রমে সাংকেতিক পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, সুতরাং জোড়াগুলি চৈনিক দর্শনের ইন ও ইয়াং গুণের সমাবেশ।

কোনও কোনও জায়গায় ফুটকি ও সোজা দাগের অবস্থান দেখে কারও কারও মনে হয়েছে যেন সংকেতে লেখা যাদুর মন্ত্র, অর্থাৎ মার্শাক তত্ত্বের মত সংকেত বার্তা, যদিও বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিন্দু বা রেখা ছাড়া অন্যান্য দাগ বা নকশা সীলমোহরের মত মালিকানার চিহ্ন হতে পারে এমন জল্পনা হয়েছে। জালকাটা জ্যামিতিক নকশাগুলি সম্বন্ধে নানা অনুমান, যথা তারা মনুষ্যনির্মিত ঘরের প্রথম ছবি—নিজের বা কোনও আত্মা বা দেবতার আবাস; অথবা ফাঁদ, তাতে ধরা পড়বে পশু পাখি কিংবা বিরুদ্ধ আত্মারা যাতে তারা শিকারে বাধা দিতে না পারে। এই ধরনের ফাঁদ নাকি মালয়শিয়ায় আজও ব্যবহার হয়। পিতৃপুরুষের ভীতি মানুষের সমাজে বোধহয় বহু প্রাচীন কাল থেকে বদ্ধমূল, নেআনডার্টাল কালে যখন কবর প্রথার সূচনা হল অন্তত তখন থেকেই মানুষ অলৌকিক ও পারলৌকিকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে. তারই ফলে সম্ভবত মৃতের মুণ্ডচ্ছেদ, খুলির পূজা। ঐ সব ফাঁদে বন্দী হবে প্রেতাত্মা বা পিতামহদের রূপক ঐ ছদ্মবেশী বা বিকৃত মানুষ মূর্তিরা—যাদুকর, আত্মগোপনকারী শিকারী ও টোটেম ছাড়া এদের এই আর এক ব্যাখ্যা।

কেউ কেউ হাতের ছাপগুলির এমন অর্থ করেছেন যার সঙ্গে যাদু বা আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্ক নেই। হয়তো তারা কোনও গণনায় ব্যবহার হয়েছে, হয়তো বা জনগণনায়। এও কল্পনীয় যে গুহাচিত্রের সঙ্গে যে ছাপগুলি আছে তা এ কালের মত শিল্পীর পরিচিতি বা স্বাক্ষর। এ ছাড়া আফ্রিকার বুশম্যানরা শিকারে বেরিয়ে হস্ত সংকেতে সঙ্গীদের জানায় কি জন্তু দেখতে পেয়েছে, মুখ খুললে শিকার পালিয়ে যাবে বলে; বিভিন্ন প্রাণী বোঝাতে বিভিন্ন আঙুল ভাঁজ করতে হয়, হাতের ছাপে আংশিক আঙুল দেখে তাই সন্দেহ করা চলে তারা শিকারের

সাংকেতিক ভাষা। কিন্তু চলতি অভিমত হল আঙুল যে আংশিক তার কারণ তা কাটা, হয়তো বলি বা উৎসর্গ।

সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষরা গুহার দেয়ালে দেয়ালে চিত্রে ও সংকেতে যে সব ধাঁধার সৃষ্টি করে গিয়েছে আজ এত গবেষণা ও বিচিন্তার পরেও তার চরম সমাধান সম্ভব হয় নি। অবশ্য এমন কথা ভাববার কারণ নেই যে হাজার হাজার বছর ধরে তারা সর্বত্র গুহা গাত্র চিত্রিত করেছে কেবল একটি উদ্দেশ্যে, বরং সমাজ ও ধ্যান ধারণায় প্রাবাদিক বিশ্বাস, পুরাণ কথা, যাদু, টোটেম তন্ত্র, স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি বা ঘটনা ইত্যাদির প্রভাব অনুসারে স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রেরণা দেখা দিয়েছে হয়তো, তাই কোনও এক ব্যাখ্যার সঙ্গে সব কিছু মেলে না। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে গুহা-গুলি নিভৃত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র বা যাদুর মায়াকক্ষ ছাড়াও সভা ঘর, শিক্ষাশালা, মন্দির ইত্যাদির কাজ করে থাকতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শিকারযুক্ত যাদু তত্ত্বের সমর্থন সবচেয়ে বেশী কারণ তা দিয়ে সর্বাধিক সমস্যার মীমাংসা হয়। এবং সে কালের জীবনে শিকার এত জরুরী বিষয় ছিল যে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন সমষ্টির খাতিরে সব নিগ্রহ অগ্রাহ্য করে দুর্গম গুহার দেয়ালে দেয়ালে যারা এই মায়ার জাল বিস্তার করেছে সমাজের তারা ছিল গণ্যমান্য, সেই গুহ্য অন্তঃপুরে হয়তো শুধু তাদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এই দক্ষ শিল্পীরা বনে প্রান্তরে পশুর পিছনে তাড়া না করেও মাংসের ভাগ পেত, অন্যান্য দিনগত শ্রমেও তাদের শক্তি ক্ষয় করতে হত না। তা যদি হয় তো শিল্পীর সেই স্বর্ণ যুগ আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি।

কিন্তু তারা যে শুধু মাত্র ছবি আঁকবার খেয়ালে কখনও আঁকে নি, এই সব মনোরম সৃষ্টির আড়ালে সর্বদা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাই বা ধরে নিতে হবে কেন? আজকের চিত্রকর ছবি এঁকে তার সৃষ্টি পিপাসা চরিতার্থ করে, প্রশ্ন ওঠে না কেন সে তুলি চালায়, এবং ক্রোমানীয়রা মনে প্রাণে প্রায় সর্বাংশে আমাদেরই মত মানুষ। অবশ্য তখন দুর্বোধ জগৎটাকে নিয়ে ভয় ভাবনা বেশী ছিল, তাই প্রকৃতির খেয়াল এড়াতে সংস্কারাচ্ছন্ন মন প্রায় সব কাজে চালিত করত তাকে। গুহাচিত্রও প্রথমত এই প্রবল প্রেরণার

প্রতিফলন এমন কথা ভাবতে অসুবিধা হয় না। তেমনি আশা করা যায় যে যাদের পুরোগামীরা বহু সহস্র বছর আগে অস্ত্র উপকরণ বানাতে অতিরিক্ত যত্নের চিহ্ন রেখে গিয়েছে, যন্ত্রপাতির হাতলে এমন কারুকাজ করেছে যাতে ব্যবহারের সুবিধা বাড়ে না, এই কাজে অনেক চিন্তায় অনেক যত্নে এমন এক পশু ও তার এমন ভঙ্গি বেছে নিয়েছে যা যন্ত্রটির সঙ্গে ঠিক খাপ খায়, যারা বসনে ভূষণে সুন্দর সাজতে চেয়েছে তাদের ছবিতেও অন্তত কিছুটা নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা স্ফূর্ত। শ্রেষ্ঠ গুহাচিত্রগুলিতে পশুর প্রাণবন্ত চেহারায় শিল্পানুরাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান। আরম্ভে কোনও সামাজিক প্রেরণা থাকলেও চোখের সামনে যখন পশু ক্রমে তার স্বাভাবিক গরিমায় মূর্তি পেয়েছে তখন নিশ্চয় স্রষ্টার মনে উদ্দীপনা জ্বলে উঠেছে, সুন্দরের মোহে মেতে ক্ষণেকের জন্যও সে ভুলেছে যে তার কাজ দশের কল্যাণে, আত্মতৃপ্তির স্বার্থে নয়। কেবল নিরস ব্যবহারিক কোনও লক্ষ্য নিয়ে এতখানি রস সৃষ্টি সম্ভব কিনা সন্দেহ।

তা বলে গুহাচিত্র সর্বত্র নিখুঁত নয়, রসের দাবি কতটা সমর্থনীয় এ বার তারও পরীক্ষা দরকার। উচ্ছ্বাস অতিরঞ্জনের ভেজাল বাদ দিয়ে গুণের পরিমাপ করতে ত্রুটি ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করে দেখতে হয় শিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, নৃবিজ্ঞানীকে দূরে রেখে।

গুহাচিত্রের চরিত্র বাস্তবধর্মী, যে জন্তুটি যেমন দেখেছে শিল্পী তাকে তেমনি রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। বাস্তবের সঙ্গে অনেক ছবির সাদৃশ্য এত নিখুঁত যা দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও একাগ্র শিক্ষানবিসির পরেই সম্ভব। এই রূপায়ণ কোনও মতেই আলোকচিত্রের মত প্রতিচ্ছবি নয়, মাঝে মাঝে ঈষৎ বিকৃতি ও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে যাতে এ যুগের 'আধুনিক' শিল্পধারার ইঙ্গিত আছে। সে কালের সেরা শিল্পীরা এই ধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও তাদের বাস্তবিকতায় এমন পরিমাণ অভিনবত্ব ও অস্বাভাবিকতা মিশিয়েছে যাতে ছবিতে এসেছে বৈশিষ্ট্য, আবার তা দুর্বোধ অথবা বিসদৃশ হয়ে পড়ে নি। মাঝে মাঝে যে অতিরঞ্জন এসে পড়েছে, যেমন হয়তো বাইসনের কুঁজে কিংবা হরিণের শিঙে, তা সাধারণত মাত্রা

ছাড়িয়ে যায় নি, ছবির উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয় নি তাতে। অবশ্য এরও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, যেমন যেখানে ঘোড়ার মাথাটা দেহের তুলনায় অতি ছোট সেখানে তা পড়েছে অদ্ভুতের পর্যায়ে, তখন ছবি আর মনোরম নয়।

লাসকোতে এক দল হরিণের অপরূপ দৃশ্য ক্রোমানীয় বাস্তবিকতার সুন্দর নিদর্শন। নানা শ্রেণীর হরিণ সে কালের শিল্পীদের খুব মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তাদের শিঙের বাহার ফুটিতে তুলতে তারা বারে বারে মগ্ন হয়ে পড়েছে। বস্তুত লাসকোতে এত হরিণ মূর্তির মধ্যে হরিণীর ছবি একটিও নেই, এর কারণ অজানা, হয়তো শিঙের শোভা নেই বলে তারা অবজ্ঞাত। উপরোক্ত দৃশ্যে হরিণ দল সারি বেঁধে সাঁতরে জল পার হচ্ছে, জলের উপরে শুধু গলা মাথা আর ডালপালা ছড়ানো শৃঙ্গশ্রেণী দেখা যাচ্ছে, পুরোগামী প্রাণীটির মাথা পিছন দিকে একটু বেশী হেলানো, তাতে মনে হয় জলের নিচে সবে মাটিতে পা ঠেকেছে তার। প্রস্তর যুগের ছবিতে এ রকম বাস্তবিক খুঁটিনাটি প্রায়ই আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, দেখেই মনে হয় সেই প্রথম চিত্রকরদের নজর, শিল্প বোধ ও প্রতিভা কিছু কম ছিল না এ যুগের তুলনায়। কালো রেখায় অঙ্কিত এই আলেখ্যটির আরও কিছু বিশেষত্ব লক্ষণীয়; শুধু কয়েকটি হরিণের প্রতিকৃতি না ভেবে হয়তো এটিকে সমগ্র দৃশ্যের রূপায়ণ বলে আমরা কল্পনা করতে পারি— গুহাচিত্রে তা অপেক্ষাকৃত বিরল, কারণ জন্তুরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকলেও শিল্পী সাধারণত তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপে এঁকেছে। তা ছাড়া চতুর শিল্পী পাথরের এক খাঁজকে কাজে লাগিয়েছে জলের ঊর্ধ্ব সীমা বোঝাতে, তাও এক ব্যতিক্রম, কারণ ক্রোমানীয় শিল্পে পরিবেশ ও পটভূমি অনুপস্থিত, নদী পাহাড় দিগন্ত রেখা বড় গাছপালা ইত্যাদি দেখা যায় না। যাদু তত্ত্ব জাতীয় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অনুসারে এ সব অনাবশ্যক, কিন্তু তা বলে ঐ জলপারানী হরিণদের রূপায়ণে শিল্পী যেন তার লক্ষ্য ভুলেছে সুন্দরের মোহে। নতুবা শুধু এক দল হরিণ আঁকলেই হত, সাঁতাররত পশু বা একটি সবে জলের নিচে মাটিতে পা ঠেকিয়েছে দেখাবার দরকার ছিল না, শৃঙ্গশোভাবিহীন হরিণীরাও বাদ পড়ত না, কারণ শিকারীরা নিশ্চয় তাদেরও মেরেছে খেয়েছে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেটুকু দেখানো দরকার তার বেশী শিল্পী সাধারণত আঁকে নি বলে দৃশ্য বা ঘটনা প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে নি। পাখিমুখী মানুষের ছবিটি যদিও বা ঘটনা বিশেষের পুনর্বর্ণনা হয়, তেমন পট খুবই কম, এই অভাব আজ আমাদের চোখে পরিতাপের বিষয়। এই চিত্রে ও অন্যত্র মানুষের বিকৃত রূপও গুহাচিত্রের ত্রুটি বলে ভাবা যায়, যদিও তা যে সংগত কারণে ইচ্ছাকৃত হতে পারে তার আলোচনা আগে হয়েছে। আজকের শিল্পীর দৃষ্টিতে সম্ভবত আরও বড় ন্যূনতা এই যে পশু দেহের চিত্রণ সর্বদা পাশের দিক থেকে, কখনও মুখোমুখি নয়। হয়তো তা কঠিন বলে, আবার হয়তো তা অক্ষমতা নয়, নিজের সর্ববিধ পারদর্শিতা প্রমাণ করা প্রস্তর যুগের শিল্পীরা খুব জরুরী মনে করে নি। এই সব দিকে গুহাচিত্রের পরিধি সংকীর্ণ হলেও তার বৈচিত্র্যের নানা উদাহরণ আমরা আগে পেয়েছি।

গুহাশিল্পের যে সৌকর্ষ আমাদের বিস্ময় জাগায় শুধু ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনে ততটা নিষ্প্রয়োজন হয়েও প্রতিভা যে পূর্ণবিকশিত তা নির্দেশ করে খাঁটি শিল্পী মন। পটের পশুরা অনেক সময়েই ছুটছে লাফাচ্ছে বা চরছে, কিন্তু যখন কিছুই করছে না তখনও তারা কপিবুকের ছবির মত নিষ্প্রাণ বা চরিত্রবর্জিত নয়। অধিকাংশ প্রতিকৃতির মধ্যেই দেহের এমন একটি ভঙ্গি ও সৌষ্ঠব আছে যা সেই প্রাণীর সম্পূর্ণ নিজস্ব, মুখে চোখে ভাবে তার প্রজাতিগত চরিত্রটি এমন ফুটেছে যেন তাতে প্রকৃতির আপন হাতের ছোঁয়া। এবং এ সবই হয়েছে রেখার মিতব্যয়িতা ও ইচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণতার কৌশলে। মাত্র কয়েকটি তুলির টানে এ কালে নিপুণ শিল্পী কি করে শুধু একটি মুখ নয় তার চরিত্রকে পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলে তা দেখে আমরা অবাক হই, এই ক্ষমতা প্রস্তর যুগের চিত্রকরদের হাতে পূর্ণ মাত্রায় ধরা দিয়েছিল। শুধু মুখ চোখে নয়, অল্প কয়েকটি তেরছা টানে ঘাড়ের বা গলার লোম পরিপাটি ফুটে উঠেছে, সামান্য তুলির আঁচড়ে দ্বিভক্ত খুর বা স্ফীত পেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু রেখার নয় রঙেরও ন্যূনতা বা শূন্যতা সার্থক হতে পারে, সে দিনের শিল্পী তা যে উপলব্ধি করেছিল তা বোঝা যায় যখন চোখে পড়ে ছবির মাঝে রং বাদ দিয়ে বা

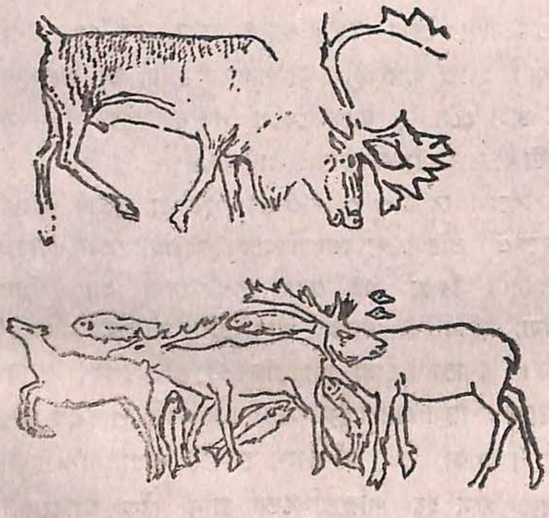
প্রলিপ্ত রং চেঁছে ফেলে কি সুন্দর ভাবে সে রূপায়িত করেছে নাক চোখ ঠোঁট; রং বাদ দিয়ে বা তার গাঢ়তা কমিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে পাঁজরের নিচে পেটের বঙ্কিমা, রং ছিটিয়ে রূপ দিয়েছে কেশরের রোমরাশির, যেমন বিখ্যাত 'চৈনিক' ঘোড়ায়। এ সব কৌশল আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা সভ্য মানুষের স্বাধীন আবিষ্কার, কারণ তখন গুহাচিত্র জানা ছিল না; তাই হাজার হাজার বছর আগে তাদের সুদক্ষ প্রয়োগ দেখে সেই বর্বর শিল্পীদের উদভাবনী শক্তির প্রতি বিস্ময়ে ও প্রশংসায় শ্রদ্ধানত হতে হয়।

ছবির মূর্তিগুলি কখনও বা বাস্তব প্রাণীদের চেয়ে বৃহদাকার এবং ছবি এত বড় যে তার সবটা একসঙ্গে দেখা যায় না, তবু বিভিন্ন অংশের গঠন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভুল। আবার কোনও কোনও কাজ এত সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র যে প্রখর বৈদ্যুতিক আলোয় সবে চোখে পড়ে মাত্র; অথচ তারা সৃষ্টি হয়েছে মিটমিটে প্রদীপের প্রভায়, তবু তাদের সৌন্দর্য কম নয় বৃহত্তর পটের তুলনায়। ছোট বড় সবই সম্পাদিত ম্লান অস্থির আলোয়, চিত্রকরের নির্ভর বাইরে দেখা প্রাণীর স্মৃতি, হয়তো এক খণ্ড উপল ফলকে প্রাথমিক নকশা। হাতে রুক্ষ তুলি বা পাথুরে ছুরি, তা দিয়ে পাথর চিরে রেখা টানতে ভুল হলে তা মুছে ফেলে নতুন করে আঁকা সহজ নয়, কিন্তু এই চেষ্টা বা তার প্রয়োজন দেখাই যায় না।

এই চিত্র শিল্পে কোথাও কোথাও যে খুঁত বা অভাব আছে (যেমন আছে সভ্য যুগেও) তার কিছু আমরা লক্ষ্য করেছি, যেমন বিভিন্ন অঙ্গের আপেক্ষিক বৈষম্য। কিন্তু এর চেয়ে বেশী দেখা যায় বিভিন্ন প্রাণীর আকারের বৈষম্য, হরিণ ও ম্যামথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দুইয়েরই আকৃতি সমান। এখানে হয়তো পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি শিল্পী কোনও নজরই দেয় নি, তার উদ্দেশ্য ছিল জায়গাটুকুর মধ্যে এক একটি প্রাণীকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বাভাবিক রূপে আঁকা, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্বসম্পূর্ণ। অবশ্য কোথাও কোথাও মনে হয় পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান ঠিক আয়ত্তে ছিল না, পেরিগর্দীয় ও ওরিনাসীয় কালে দেখা যায় এক পাশের পা বা শিঙে পিছনের অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে কিংবা হয়তো দূরের শিং অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকিয়ে দুটোকেই সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে। কোথাও হয়তো পাশ-ফেরা

জন্তুর দ্বিভক্ত খুর পুরোপুরি দৃশ্যমান, ঠিক ঐ অংশে পা বেঁকিয়ে দিলে যেমন হয়। কিন্তু এই বিকল পরিপ্রেক্ষিতের নিন্দা করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় পিকাসো প্রমুখ আধুনিকদের, তাঁর ছবিতেও দেখি পাশ-ফেরা মুখে দুই চোখই দৃশ্যমান।

কখনও কখনও বিভিন্ন প্রাণীর অসংগত সমাবেশ দেখা যায়, যেমন ফ্রানসের এক গুহায় তিনটি হরিণ ও পাঁচটি মাছ, প্রতিটি প্রাণী সুন্দর রূপায়িত, একটি হরিণ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়েছে, কিন্তু চতুষ্পদদের পিঠের উপর পেটের নিচে, শিং বা পায়ের ফাঁকে তেড়া বাঁকা ভঙ্গিতে জলচররা কি করছে? একটি মাছ আবার মুখ খুলে যেন হরিণের স্তন্য (!) পান করতে উদ্যত। মনে হয় মাছগুলি ইতস্তত ফাঁক পূরণ ছাড়া কিছু নয়—শিল্পী অবশ্য খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর দর্শকদের কথা ভাবে নি।



চিত্র ২৬। মাদলেনীয় খোদাই কাজের উৎকৃষ্ট নমুনা; উপরে সুইৎসারল্যানডের গুহায় হরিণ শিঙের গায়ে উৎকীর্ণ বলগা হরিণ, নিচে ফরাসী গুহার কাজটিতে হরিণ ও মাছের বিসদৃশ সমাবেশ।

কিন্তু মাদলেনীয় কালের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি—যেমন আলতামিরার বহুবর্ণ বাইসন (চিত্র ২১) সভ্য যুগের তুলনায় যে কোনও অংশে হীন নয় প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পজ্ঞানীদের তাই অভিমত। অল্প কথায় বলতে গেলে গুহাচিত্রের প্রাণধর্ম তিনটি: চিত্রিত পশুদের আশ্চর্য বাস্তবিক মূর্তি, তাদের স্বজাতীয় স্বাভাবিক ভঙ্গি, এবং রং ও রেখার সংযমে নিপুণ সৃষ্টি। এই তিন গুণে সে কালের সেরা ছবিগুলি এ কালের কড়া বিচারেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আজ আমাদের চোখে কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বে এই সৌন্দর্যই প্রধান স্থান নিয়েছে। প্রস্তর যুগের পর এর তুল্য কিছু সৃষ্টি হয় নি বহু সহস্র বছর।

যে সব ধাপে ধাপে এই চারুকলার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে তারও কিছু কিছু অনুসরণ করা যায়। শুরুতে হাড় শিং ও শিলাখণ্ড দিয়ে অলংকার ও পশুর প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে খাঁটি মানুষরা প্রথম কিঞ্চিৎ রসের স্বাদ পেল। তার পর হয়তো স্বাভাবিক কৌতূহল তাদের টেনেছে গুহার গভীর অন্তরে, সেই পথে পদে পদে অজানার আশংকায় সারা অংগ শিহরিত, রং চড়েছে কল্পনায়, কম্প্র দীপালোকে অন্ধকারের বাসিন্দা কাদের যেন ছায়ার মত নিঃশব্দ চঞ্চল লুকোচুরি। বাতি কাছে নিয়ে নজর করে দেখলে চেনা চেনা মনে হয়, ছাতের উঁচু নিচু পাথর পটে যেন এক দল বাইসন মূর্তি নিচ্ছে, এখানে ওখানে দেয়ালের আঁকাবাঁকা ফাটল যেন হরিণের শিং। পরিচয়ের সংগে ক্রমে ভয় কেটে গেল, ইচ্ছা জাগল খোদার উপর খোদকারি করতে, ছুরি বা রঙের আঁচড়ে কোথাও দেখা দিল চোখ, কোথাও যোগ হল পা বা লেজ। সে আজ প্রায় ৩০,০০০ বছর আগের কথা। ক্রমশ প্রধানত ফ্রানস ও স্পেইনে গুহার দেয়ালে দেয়ালে আরও বড় কাজে হাত দিল তারা—হয়তো সুলভ শিকারের লোভে, সমাজের কল্যাণে—কিন্তু পেয়ে গেল রসের ভাণ্ডার।

হাতেখড়ির প্রথম পর্বে রঙের আকর্ষণ ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করে কাঠি বা আঙুল দিয়ে পাথরের গায়ে তার এলোমেলো লেপন, আনাড়ী হাতে হয়তো শুধু পশু দেহের বহিররেখাটি টানা, চোখের জায়গায় মাত্র একটি ফুটকি। ক্রমে সেই টানা রেখা ভেঙে ছোট ছোট তেরছা দাগে

দেখানো হল ঘাড় বা পেটের লোম, ফুটল চোখ কান খুর, দেখা দিল দুটির জায়গায় চারটি পা, দেহের বিভিন্ন অংশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল অল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে বা রঙের মাত্রা ভেদে—এমনি করে চিত্রণের নেশায় মাতাল হল শিল্পীরা। শিশু যখন প্রথম আঁকতে চেষ্টা করে তখন যেমন হয়, প্রথম চিত্রকররাও আয়ত্ত করতে পারে নি দূর ও নিকটের যুক্ত রূপায়ণ। পরে একমাত্র মাদলেনীয় শিল্পীরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিল কাছের অঙ্গ দিয়ে দূরের অঙ্গ আংশিক ঢেকে বাস্তবিক চিত্রণের কৌশল। গুহায় গুহায় নানা পরীক্ষার পর প্রতিভার চরম ব্যঞ্জনা ঘটল আজ থেকে ১৮,০০০-১২,০০০ বছর আগে বাস্তবমূর্ত প্রকাণ্ড বহুবর্ণ প্রাচীর চিত্রে।

কিন্তু অবশেষে এই আঁধারের ফুল ক্রমে শুকিয়ে উঠল যখন বাস্তবিকতা ক্ষয় পেল সাংকেতিক ও আলংকারিক ধারায়, যেমন সভ্য যুগেও নানা শিল্পে ঘটেছে বারে বারে। রেখার বাহুল্য বাড়তে বাড়তে শেষে পরিণত হল অর্থহীন আঁকিবুকিতে, বুদ্ধিদীপ্ত সংযম পথ হারাল গতানুগতিকতার মধ্যে। সমগ্র গুহাচিত্রে এই নিকৃষ্টের অংশ যে কম নয় তাও মনে রাখা দরকার।

তার পর মানুষগুলির মত এই চারুকলার ধারাও যখন হারিয়ে গেল তখন কে জানত যে পরবর্তী প্রায় ১৩,০০০ বছরে, অর্থাৎ য়োরোপীয় মধ্যযুগ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে শিল্প সৃষ্টির উদ্যম থাকবে অসাড় হয়ে। গুহায় গুহায় দীপ নিভে গেল, নিশ্ছিদ্র আঁধার আর অখণ্ড শান্তির মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে পশুরা ঘুমিয়ে পড়ল বহু সহস্রকের ঘুমে। মাটির গর্ভে সে ঘুম যখন আবার ভাঙল মানুষের পদধ্বনি আর বিস্মিত চিৎকারে, মাটির উপরে তখন তারা অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

•

খাঁটি মানুষ তো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়েছিল, সুতরাং গুহাচিত্র সম্বন্ধে এত কথার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে প্রস্তর যুগে কি আর কোথাও ছবি আঁকার নেশা ধরে নি। উপরোক্ত সৃষ্টির আরও কিছু কাল পরে প্রধানত পূর্ব স্পেইনে ও আফ্রিকার নানা জায়গায় অধিবাসীরা পাথরের গা খুদে বা রাঙিয়ে এই নেশায় মেতেছে, যদিও তার অধিকাংশ ঠিক গুহাচিত্র নয়, শিলাশ্রয়ে বা উন্মুক্ত পাষাণ পটে অঙ্কিত। এই সব শিল্প লাসকো বা আলতামিরার

তুলনায় বাস্তবিকতায় নিকৃষ্ট হলেও বিষয়বস্তু ও সৃষ্টিকৌশলে অভিনব বলে আগ্রহ জাগায়।

তুষার যুগের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রানস ও উত্তর-পশ্চিম স্পেইনের গুহা গহবরে মাদলেনীয়রা তখনও ছবি এঁকে চলেছে এমন সময়ে প্রায় ১১,৫০০ বছর আগে স্পেইনের পূর্বাঞ্চলে এক নতুন শিল্পের সূচনা। তার পর ৭000 বছর ধরে প্রায় ১০০ অল্পবিস্তর উন্মুক্ত শিলাপটে শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত ছোট ছবিতে যে সব দৃশ্য ফুটিয়েছে তাতে তাদের সামাজিক চিত্রটিও অনেকটা মূর্ত। এর মধ্যে পুরাপ্রস্তর ও তুষার যুগ শেষ হয়ে য়োরোপে এসে গিয়েছে মধ্যপ্রস্তর যুগ, আরও পুবে পরবর্তী নবপ্রস্তর যুগও। এই শিল্পে প্রথমেই চোখে পড়ে মনুষ্য মূর্তির অবাধ নিঃসংকোচ রূপায়ণ, পশু কুলের সংগে সমান তালে সেও বর্তমান। মূর্তিগুলিকে মানুষ বলে চিনতে অসুবিধা হয় না, তবে এখানেও তারা সম্পূর্ণ বাস্তবিক নয়—হয়তো দেহ বেশী সরু, পা ফোলা গদার মত অথবা পেট ফোলা বেলুনের মত। শিকারে বা অন্য কিছুতে তারা প্রায়ই চঞ্চল, তৎপর। শিকার যে তখনও এক প্রধান কাজ তা ছবিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান, কিন্তু শিকারীদের হাতে এই প্রথম ধনুর্বাণ। এই অস্ত্র নিজেদের বিরদ্ধেও ব্যবহার হয়েছে।

ছবিগুলি যে প্রায়ই কোনও অভিজ্ঞতা বা ঘটনার বর্ণনা, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাও এক পার্থক্য এবং হয়তো মানসিক প্রসারতার নিদর্শন। উপরন্তু মানুষের ইতিহাসে প্রথম দেখা যায় নারী ও শিশুর মূর্তি এবং একত্র অনেক লোকের চিত্রণ, তাতে গোষ্ঠী জীবনের আভাস ও ইঙ্গিত মেলে। কোগুল গুহায় এক দৃশ্যে মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে একটি ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্তিকে ঘিরে যেন নাচছে, হয়তো আনুষ্ঠানিক নৃত্য, তাদের সারা দেহ এক বিচিত্র পোশাকে ঢাকা, তার নিচটা ঘণ্টার মত। আশেপাশে হরিণ ও অন্যান্য বন্য জন্তু, কিন্তু দুটি গোজাতীয় পশু পালিত হতে পারে। অন্য ছবিতে পালিত কুকুরও সন্দেহ হয়, তা হলে এগুলি প্রথম পালিত পশুর চিত্রণ। অন্যত্র মধ্যপ্রস্তর সমাজে পোষা কুকুরের কিছু নজির পাওয়া যায়, কিন্তু গোপালন নবপ্রস্তর আমলের কীর্তি বলে বিবেচিত। আর এক চিত্রে স্কার্ট-পরিহিতা মা তার উলংগ শিশুর হাত ধরে চলেছে, বাচ্চার চুল মাথার

চূড়ায় দুটি ছোট্ট ঝুঁটি করে বাঁধা, মায়ের ভঙ্গিতেও যত্ন মমতা ফুটে উঠেছে। এই দুটি ছবির সঙ্গে তুলনীয় লেংটি-পরা আর এক নারী, তার হাত দুটি কাঠির মত, যদিও পায়ের আকার স্বাভাবিক। গোষ্ঠী জীবনের আর এক দৃশ্যে দূরে সারিবদ্ধ কয়েক জন মাথার উপর ধনুক তুলে চিৎকার করছে, সামনের দিকে শরবিদ্ধ শায়িত এক মূর্তি, হয়তো তার পতনের সঙ্গে চিৎকারের শুরু—এই ছবির নাম হয়েছে 'মৃত্যু দণ্ড'। হতভাগ্য ব্যক্তিটি সমাজের অপরাধী কিংবা দলের শত্রু হতে পারে, শাস্তির বিধানেও আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

কয়েকটি দৃশ্যে দেখা যায় ধনুর্বাণধারী যোদ্ধার দল পরস্পরকে আক্রমণ করছে, যদিও কোথাও কোথাও তা হয়তো ছদ্ম যুদ্ধে সামরিক ক্রীড়া অথবা শক্তি ও সাহসের প্রদর্শন। এক দৃশ্যে শরবিদ্ধ যোদ্ধা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, ধনুক ও বাণ ইতস্তত ছিটকে পড়েছে, মাথার সাজও খসে গিয়েছে। তার লাঠির মত ধড় ও গদার মত পায়ের এবং বাণগুলিরও এক এক অংশ সাদা, এমনি কোনও কোনও ছবিতে মানুষ বা পশুর দেহে শিল্পী জায়গায় জায়গায় রং লাগায় নি, হয়তো সেখানে শুধু পর পর ফুটকি বসিয়ে বহিররেখা বুঝিয়েছে; বুক পিঠ উরু গোড়ালি ইত্যাদির আকস্মিক সাদা অংশ চোখে লাগে, কিন্তু নিশ্চয় তার কোনও তাৎপর্য ছিল।

এক ছবিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে পর পর কয়েক জন ব্যস্তবাগীশ চলেছে, এক হাতে ধনুক অন্য হাতে কয়েকটি তীর, মাথায় নানা রকম টুপি বা শিরসজ্জা, সামনের লোকটির উঁচু শিরস্ত্রাণ সবচেয়ে জমকালো। দেখে সামরিক শ্রেণী বিভাগ সন্দেহ হয়, কোথাও কোথাও এই রকম নায়কের মৃত্যু বিশেষ যত্নে চিত্রিত।

বর্শার তুলনায় ধনুর্বাণের নানা সুবিধা আমরা আগে আলোচনা করেছি, এই নবাবিষ্কৃত লঘু এবং ক্ষিপ্র অস্ত্র হাতে পেয়ে এরা যে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে মেতেছে তা স্পষ্ট নানা ছবিতে। প্রায়ই দেখা যায় শিকারী এক হাতে তীর ছুঁড়ছে, অন্য মুঠিতে ধনুকের সঙ্গে এক গোছা তীর ধরা আছে, যাতে পর পর দ্রুত শরসন্ধান করতে পারে। এক পটে তিন ধনুর্ধর ছিলায় টান মেরে তাক করেছে, প্রায় আকাশে লাফ মেরে তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক বুনো ছাগল, ভয়ংকর

বাঁকা শিং তার, সামনের পা দুটি গোটানো, শিকারীদের বাণ ক্ষণেকে তার দিকে ছুটবে, আবেগে উদ্বেগে তাদের মাথা হেলেছে পিছনে, একটি করে পা শূন্যে উঠে পড়েছে, এক ব্যক্তির অন্য পায়ের হাঁটু মাটিতে ঠেকেছে। কে জিতবে কে মরবে বলা কঠিন। জমকালো ছবি নয়, সরু সরু আঁচড়ে সম্পাদিত প্রায় সাংকেতিক রূপায়ণ, তবু অতীব নাটকীয় এক ভগ্নমুহূর্তের আলোকচিত্র যেন। আর এক দৃশ্যে বাণবিদ্ধ রোষক্ষিপ্ত একাণ্ড এক ঝম্পমান ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দ্রুত-পলাতক শিকারী নিঃসন্দেহে হার মেনেছে, ছাড়া ছাড়া রঙের ছোপে ও রেখায় পশু ও মানুষের মুখ এবং অবয়ব স্পষ্ট নয়, তবু শুধু তাদের দেহের ভঙ্গি সবটাই বলছে। এই ছবি দুটি বাস্তবিক ঘটনার স্মৃতি-আলেখ্য হতে পারে, যদিও অনেকের মতে তারা সহজ শিকারের উদ্দেশ্যে পূজার ক্ষেত্রে অঙ্কিত আনুষ্ঠানিক চিত্র।

পূর্ব স্পেইনের এই শিল্পের সঙ্গে আফ্রিকার পাষাণ চিত্রের মিল স্পষ্ট। মহাদেশের উত্তরে, সাহারায় ও তার দক্ষিণে সাধারণত মুক্ত পটে অধিবাসীরা রঙে বা উৎকীর্ণ রেখায় মানুষ ও তার দৈনন্দিন কাজের রূপ দিয়েছে। আফ্রিকী শিল্পের তারিখ অস্পষ্ট, তবে এরও কিছু কিছু সম্ভবত তুষার যুগের শেষ ভাগে সম্পাদিত, অধিকাংশ পরবর্তী সৃষ্টি। উত্তর আফ্রিকায় প্রধানত বর্তমান টিউনিসিয়ার ও অ্যালজিরিয়ার দক্ষিণ-পূব অঞ্চল জুড়ে প্রায় ১২,০০০ থেকে ৮৮০০ বছর আগে পর্যন্ত ছিল ক্যাপ্সীয় কৃষ্টি, সেখানেও পাথরে মানুষ ও পশুর অনুরূপ রূপায়ণ হয়েছে, বস্তুত সমকালীন পূর্ব স্পেনীয় শিল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে পারে। প্রাথমিক খোদাই কাজ এতই রূঢ় যে মূর্তি ভাল করে ফোটে নি, এ অঞ্চলের পরবর্তী পরিণত শিল্প সম্ভবত ক্যাপসীয় বংশধরদেরই সৃষ্টি, এমন কি হয়তো আরও পূবে ও দক্ষিণে ছড়ানো প্রাণী কুলের চমৎকার বাস্তবিক ও প্রকাণ্ড রূপায়ণও।

ক্যাপসীয় ধারার বিষয়ও ছিল মানুষের প্রধান প্রাত্যহিক কাজ খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার। ছবির মানুষগুলি সর্বদা ব্যস্ত, হয়তো লম্বা লম্বা পা ফেলে শিকারের পিছনে ছুটছে কিংবা ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়ছে। তাদের চেহারা অনেকটা ব্যঙ্গচিত্রের মত, দেহটি তৈরি যেন কতগুলি কাঠি জোড়া লাগিয়ে, পা হয়তো বেলুনের মত স্ফীত কিংবা অসম্ভব লম্বা, কোমর



চিত্র ২৭। ক্যাপসীয় শিল্পের নমুনা ; ক—চাক থেকে মধু সংগ্রহ, খ—শিকার।

বোলতার মত সূক্ষ্ম। এ সবই পূর্ব স্পেনীয়দের মনে করায়। গায়ে অলংকার দেখানো হয়েছে, তা ছাড়া তারা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মেয়েরা পরেছে আঁটো বক্ষবাস, নিচে ঘণ্টার মত স্কার্ট, মাথায় উঁচু চোখা টুপি। পূর্ব ভূমধ্য সাগরে ক্রীট দ্বীপে প্রত্নবিজ্ঞানীরা যে ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করেছেন তার প্রাচীরচিত্রে প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সে দেশের মেয়েদের বেশভূষার পরিচয় মেলে, তার সঙ্গে পূর্ববর্তিনী ক্যাপসীয় ললনার ফ্যাশনের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার এদের পোশাকের পরিকল্পনা কখনও আদি মিশরী (৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মৃৎপাত্রে অঙ্কিত নকশার অনুরূপ। হয়তো প্রাগৈতিহাসিক কালেই এ সব দেশের যোগাযোগ ঘটেছিল, কিন্তু কে কার থেকে নিয়েছে তা বলা যায় না।

উত্তর আফ্রিকায় সাহারাতে বহু আঁকা ও খোদাই ছবি পাওয়া গিয়েছে। সাহারা তখন ছিল সরস উর্বর ভূমি, ছবিগুলিতে দেখা যায় জিরাফ সিংহ উটপাখি বুনো গরু গাধা ইত্যাদি, অর্থাৎ এমন সব প্রাণী যারা তৃণপ্রান্তরে চরে বেড়ায়। পানীয় জলের কাছাকাছি, হয়তো হ্রদ বা জলধারার ধারে, শিল্পীরা এঁকেছে অতিকায় পশু-মূর্তি। সাহারার তাসিলি অঞ্চলে খাতের ক্ষয়িত দেয়ালে দেয়ালে বিশাল জন্তু জানোয়ারের মেলা। হাতি গণ্ডার জিরাফ ষাঁড় ইত্যাদি ও তাদের সঙ্গে মানুষের প্রচুর উৎকীর্ণ মূর্তি বা বর্ণ-

চিত্র প্রায়ই বাস্তবিক প্রাণীদের সমায়তন, ৮০০০ বছর ধরে এগুলির সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় ৮০০০ বছর আগে অঙ্কিত এক রঙিন ছবিতে নীল ও হলুদ-বর্ণ আকাশের নিচে বিবিধ পশু নানা আকারে, ভঙ্গিতে ও রূপে চিত্রিত, এক ব্যক্তি ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে, দুটি ভৌতিক মূর্তি দু হাত তুলে নাচছে, মধ্যে এক বিরাট পুরুষ, তার মাথা চ্যাপটা, কান দুটি শিঙের মত তোলা।

মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এক অভিনব উৎকিরণ কৌশল চোখে পড়ে। শিল্পীর যন্ত্র পাথরের গায়ে পাখির মত ঠুকরে ঠুকরে মূর্তির রূপ দিত, ছবির কোনও নির্দিষ্ট বহিররেখা টানা হত না। দক্ষিণ আফ্রিকা দেশের ট্রান্স্ভাল অঞ্চলে মাটির থেকে মাথা তুলে আছে ধাতুতুল্য কঠিন প্রকাণ্ড পাথরের পাটা, তার উপরে এই কাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, গণ্ডার ম্যাস্টোডন ইত্যাদির আশ্চর্য প্রাণময় প্রতিকৃতি—শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির গুণ যে কোনও কালের উৎকীর্ণ পশু মূর্তির সমান বলে বিবেচিত। এক ছবিতে গণ্ডারের গায়ে পাখিরা বসেছে পোকার খোঁজে, বিরক্তি ভরে সে মাথা তুলেছে, লেজ ঘুরিয়ে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করছে—চোখ নাসারন্ধ্র গায়ে চামড়ার ভাঁজ সব একেবারে নিখুঁত। এ শুধু অনেকের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত। এ ধরনের ছবি দেখলে মনে হয় পশুটি যেন শিল্পীর চোখে দেখা, শিকারীর চোখে নয়। কিন্তু এই শিল্পীরা আমাদের আরও বেশী কিছু দিয়েছে, এ সব বিস্ময়কর ছবিতে অন্তত ১০ রকম প্রাণীর প্রতিকৃতি দেখা গিয়েছে যারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বলে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। হাতির ও ম্যামথের পূর্বপুরুষ ম্যাসটোডন মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এমন কথাই জানা ছিল; বিস্মিত পুরাজীববিজ্ঞানীরা এ বার মানতে বাধ্য হলেন যে আফ্রিকার গহন গর্ভে আরও অনেক দিন তারা বেঁচে ছিল। বিজ্ঞান যে চারুকলার কাছে ঋণী হতে পারে তার এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত নিশ্চয় বিরল।

রোডীসিয়া, ট্যানজানিয়া ইত্যাদি অঞ্চলেও আঁকা ও ক্ষোদিত ছবি পাওয়া গিয়েছে। এই সব আলেখ্যের অনুকৃতি দেখালে বৃদ্ধ বুশম্যানরা এখনও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে এ তাদের শিল্প, তাদেরই আপন জনের সৃষ্টি—পুনর্বার মনে জাগে স্মৃতির অন্ধকারে প্রায়াবলুপ্ত কোন দূর অতীতের গল্প-গাথা আচার অনুষ্ঠান নাচ গান।…

১০। সে যুগের লোক এ যুগে

পুরাপ্রস্তর যুগের সমাপ্তি ও নবপ্রস্তর যুগের সূচনা মানুষের ইতিহাসে এক বৃহৎ সন্ধি ক্ষণ, এই নতুন যুগে নব নব আবিষ্কার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে সভ্যতার দিকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ সন্ধি ক্ষণ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কালে। এমন নয় যে একদা স্কুলের ঘণ্টার মত এক ঘণ্টা বাজল, জগতের সব লোক একই সঙ্গে পুরনো শ্রেণী ছেড়ে নতুন শ্রেণীতে এসে বসল। নবপ্রস্তর যুগের প্রথম ও গুরুতম বিদ্যা, সবচেয়ে মৌলিক নিশানা হল কৃষি ও পশুপালনের আবিষ্কার—যার ফলে মানুষের খাদ্য সমস্যা অনেক সহজ হয়েছে, পাকা ঘর বাঁধা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে, এক কথায় জীবন যাত্রার ধারায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু আজকের দিনের মত এ আবিষ্কার সে দিন তারে বেতারে এক দণ্ডে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, খবর পেঁছেছে ধীরে, দূরান্তরের দেশকে হয়তো স্বাধীন ভাবে শিখতে হয়েছে। নবপ্রস্তর বিপ্লবের শুরু মধ্যপ্রাচ্যে, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সংগম স্থলে, কিন্তু বর্তমান যুগে এত রকম আবিষ্কারের হোতা পশ্চিম য়োরোপে তার প্রথম চিহ্ন দেখা দিতে দিতে কেটে গেল বেশ কয়েক হাজার বছর। তামা আবিষ্কারের পর মধ্যপ্রাচ্যের লোক যখন তিন সহস্রাধিক বছর ধাতুর সুখ সুবিধা ভোগ করেছে ব্রিটেন তখনও পাথুরে অস্ত্র উপকরণ ছাড়া কিছু জানে না। আবার ইংল্যানডে যখন স্টীম এন্‌জিন আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে তখন নিউ জিল্যানডে মাওরিদের পাথরের অস্ত্র, বনের পশু ও ফল মূল ছাড়া প্রাণ ধারণের কোনও সংগতি ছিল না, এবং এদেরই প্রতিবেশী অসট্রেলিয়ার কয়েক হাজার আদিবাসী আজও রয়েছে পুরাপ্রস্তর যুগে।

তেমনি অন্যত্র পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন কোণে কোণে নানা সম্প্রদায় এখনও চাষ বাসে অজ্ঞ শিকারী সংগ্রাহক, যেমন আফ্রিকার পিগমি ও ও বুশমান, কোনও কোনও আন্দামান দ্বীপবাসী উপজাতি, উত্তর আমেরিকার

এসকিমো এবং ফিলিপিন দেশের সম্প্রতি আবিষ্কৃত তসদাই আদিবাসী। ১৯৮২ জানুআরির খবরে প্রকাশ ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক অভিযাত্রী দল ভুটান ও অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে গভীর তুষারাবৃত চেতক গিরিবর্ত্ম পার হতে হতে এক অজ্ঞাত গোষ্ঠীর মুখোমুখি পড়ে, তারা চেহারায় মংগোলীয় ধরনের, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, রান্না জানে না, কাঁচা মাংস খায়, গুহায় বাস করে।

একই নৃতাত্ত্বিক যুগে বিভিন্ন পরিবেশে স্বভাবতই জীবন ধারায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যেমন য়োরোপের প্রখর শীতে ক্রোমানীয়রা চাপাত মোটা ভারী পোশাক আর আজ মরু অঞ্চলে অসট্রেলীয় আদিবাসীরা প্রায় উলঙ্গ থাকে। তথাপি আধুনিক আদিবাসী সমাজের সমীক্ষা থেকে বহু সহস্র বছর প্রাচীন কালের মূল্যবান আভাস মেলে। ফসিলের সাক্ষ্য আরও প্রত্যক্ষ, কিন্তু ফসিল প্রায়ই আংশিক, কখনও অনুপস্থিত, উপরন্তু তা সমাজ ব্যবস্থা, রীতি নীতি, ধ্যান ধারণার কোনও খবরই দেয় না। তাই দূর অতীতের পুনর্গঠনে বর্তমান আদিবাসীরা নৃবিজ্ঞানীদের অপরিহার্য দ্বিতীয় সহায়। প্রত্নবিৎ গ্র্যাহাম ক্লার্কের মন্তব্য সমীচীন যে "প্রাগিতিহাস শুধু প্রাচীন মানব জীবনের পুরাবৃত্ত নয়, তা এখনও বর্তমান"।

জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদিবাসীরা সভ্য সমাজের অনেক পিছনে পড়ে আছে বলে ভাবের জগতেও তারা হেয় এই ধারণা মস্ত ভুল। যন্ত্র সভ্যতায় মান্ধাতার আমলে থাকলেও তারা নির্বোধ নয়, তাদের ভাবনা অনুভব বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ খাঁটি মানুষেরই উপযুক্ত, ভাষা আমাদের চেয়ে কম জটিল নয়। তেমনি প্রায় সব কাজে ওতপ্রোত রয়েছে উচিত অনুচিতের অনুজ্ঞা, তাদের টোটেম ট্যাবুর পূর্ণ মর্মোদ্ধার নৃবিজ্ঞানীদের পক্ষেও দুরূহ। আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা লক্ষ্য করে প্রত্নবিৎ গর্ডন চাইল্ড মন্তব্য করেছেন যে যদিও অস্ত্র উপকরণে ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে আধুনিক আদিবাসীরা পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির থেকে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি, তবু এমন কথা মনে করা ভুল হবে যে সেই সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা শক্তিও অচল হয়ে থেকেছে, এ কালের মননও সে কালের গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ প্রাথমিক যোগসূত্রটা সে দিন থেকেই চলে এসেছে, পরবর্তী মানুষ জট পাকিয়েছে সেই সুতোয়। তথাপি সাধারণ সামাজিক গঠন সরল

বলে ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবন চলে মসৃণ পথে, নানা কঠিন সমস্যায় জর্জরিত আধুনিক সভ্য সমাজের তা ঈর্ষার বস্তু। ফরাসী দার্শনিক রুসো যে 'মহান বর্বর' কল্পনা করেছিলেন তার কিছুটা অবাস্তব হলেও খাঁটি অংশটুকু এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ।

সাধারণত এই সমাজে পেশা, রাজনীতি, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণী বিভাগ নেই, নবপ্রস্তর যুগের আগে তার চিহ্ন নেই। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাজের যে ভাগাভাগি খাঁটি মানুষের চেয়েও প্রাচীন একমাত্র তাই দেখা যায়—পুরুষ শিকারী, স্ত্রী সংগ্রাহক ও গৃহিণী—কিন্তু এই ব্যবস্থাও সর্বদা অনড় নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে শুধু নিত্য কাজের বস্তু ছুরি বাসন ধনুক ইত্যাদি, অব্যবহৃত সঞ্চিত সম্পদ কিছু নেই। সমাজে প্রভাব অর্জিত হয় ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিয়ে, জোর করে কর্তৃত্ব খাটিয়ে নয়, যারা সবচেয়ে বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, আপস মীমাংসায় দক্ষ তারাই নেতৃস্থানীয়, বুশম্যান সম্প্রদায়ে যে সর্বাপেক্ষা উদারচিত্ত সেই চরম শ্রদ্ধার পাত্র। দুই সম্প্রদায়ের শিকার ক্ষেত্র অংশত এক হলেও তা নিয়ে ঝগড়া হয় না, কারণ বিবাহ সূত্রে কুটুম্বিতা থাকে। একই দলের মধ্যে এবং বিভিন্ন দলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে নেই তা নয়, তবে প্রায়ই তা বেশী দূর গড়ায় না। যুদ্ধ বিগ্রহ অসম্ভব কারণ সেনা-বাহিনী পুষবার মত অতিরিক্ত সম্পদ নেই, ক্ষয়যোগ্য তরুণবয়স্করাও সংখ্যায় কম, এবং হিংসাত্মক আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি সামাজিক বিধি নিষেধ বা ট্যাবুর কড়া লাগামে আঁটা।

বিভিন্ন দেশে নানা সম্প্রদায় এখনও প্রায় পুরাপ্রস্তর যুগে বাস করছে, তিন মহাদেশের তিনটির সঙ্গে আমরা পরিচয় করব। আফ্রিকার কালাহারি মরুবাসী বুশম্যানরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যে নিগ্রোদের থেকে স্বতন্ত্র, হয়তো ঐ মহাদেশের আদি বাসিন্দাদেরই বংশধর, রুক্ষ বন্ধ্যাপ্রায় ভূমি থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে চলেছে কত কাল ধরে। কালাহারির উত্তরাংশে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সদয়, বছর কয়েক আগে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সেখানে এক গ্রামের আদিবাসীদের গৃহস্থালি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করেছেন। এরা সংগ্রাহক শিকারী, কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্যই প্রধান উপজীব্য। যদিও বৃষ্টি কম, কোথাও কোথাও রকমারি গাছ গাছড়া গজায়। মাঝে মাঝে বালির ঢিবি, তাদের মাথায়

মুংগংগো গাছে ফলে প্রোটিন ও তেল সমৃদ্ধ বাদাম, দেহের পুষ্টিতে তা মস্ত নির্ভর। বাদামের খোসাও মিষ্টি, তা জলে ফুটিয়ে তৈরি হয় সুরুয়া। গ্রীষ্ম কালে অল্প কিছু দিন বৃষ্টি হয়, দেখতে দেখতে তার অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি, শুধু নিচে চুনাপাথরের স্তর থাকলে সেখানে জল জমে। সংবৎসর জল থাকে গ্রামের মাত্র একটি অগভীর পুকুরে, তার নিকটবর্তী গাছে বাদাম ফুরিয়ে গেলে ক্রমশ দূরে দূরে অভিযান দরকার হয়, বর্ষা এলে তার ভরসায় ২০-২৫ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত গিয়ে স্থানীয় ঢিবির উপর অস্থায়ী ঘর বাঁধে এরা। ঘর বলতে শুকনো লম্বাজাতীয় ঘাসের ছাউনি, রোদ বৃষ্টি এড়াবার আশ্রয় মাত্র। কিন্তু বছরের অধিকাংশ কাটে অনাবৃষ্টিতে, তাই জলের খোঁজ চলে নিরন্তর, মরুভূমির কিছু কিছু উদ্ভিদ নীরস মাটি থেকেও জল শুষে জমিয়ে রাখে, তা নিংড়ে রস বার করে তৃষ্ণা মেটায় এরা।

মেয়েরা বাদাম খুঁজে এনে খোসা ছাড়ায়, ফাটায়, পুরুষরা ঢিবির নিচে নিচে শিকার খুঁজে বেড়ায়, সঙ্গে তীর ধনুক আর খনন দণ্ড, এই লাঠির চোখা মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে শিকড় বা ডাঁটা উদ্ধার ছাড়াও নানা কাজে লাগে তা। কালাহারি মরুতে বড় জন্তু বিরল, বিষমাখানো তীর দিয়ে একটি কৃষ্ণসার মৃগ শিকার করতে বহু দিন এমন কি কয়েক মাস চলে যায়। তখন এই সার্থক শিকারীর মান বাড়ে, তা শুধু তার শক্তির প্রমাণ বলে নয়, দলের সবাই মাংসের ভাগ পায় বলেও। ছোট জন্তু পরিবারের বাইরে ভাগাভাগি হয় না। বৃহৎ পশুদের বাচ্চারাই সাধারণত মারা পড়ে বেশী, কারণ শিকারীর কুকুরের তাড়া খেয়ে তারা অল্পে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তীরের বিষ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজ করে, বয়স্ক পশুদের মত এক দু দিন সময় লাগে না বলে অনুসরণ করতে হয় কম (ধনুর্বাণ বা পালিত কুকুরের অবশ্য মধ্যপ্রস্তর যুগের আগে কোনও দৃঢ় প্রমাণ নেই, সুতরাং সে দিক থেকে এরা পুরাপ্রস্তর যুগ অতিক্রম করেছে)। বুশম্যানরা পশু পাখির আচার আচরণ ভাল করে জানে, তাই তারা ধরা পড়ে সহজে, যেমন গিনি-মুরগীর বাসার থেকে একটি ডিম সরিয়ে এক ধারে রাখল আর পাতল ফাঁদ, মা-পাখি বাসায় ফিরে ডিমটি গড়িয়ে ভিতরে নিতে চেষ্টা করলে ফাঁদ নড়ে তাকে বন্দী করবে, পাখি ও ডিম দুইই লাভ হবে।

মোটা জাতের এক খরগোশ মাটির নিচে বাসা বানায়, দিনে সেখানে ঘুমিয়ে রাত্রে বার হয়। তাকে ধরতে প্রথমে এক জন লম্বা ছড়ি ঢুকিয়ে তার বাঁকানো মাথা দিয়ে খরগোশকে আটকায়, আর এক জন গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে ঘাড় পর্যন্ত নিচে নেমে জন্তুটি ধরে, তার পর খনন দণ্ড দিয়ে তাকে মেরে পিটিয়ে হাড় ভেঙে নরম করে দেয় বয়ে নিতে সুবিধা হবে বলে। এর মাংসের পরিমাণ সাধারণ খরগোশের প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং সার্থক শ্রম। প্রায়ই দু জনে মিলে গল্প করতে করতে শিকারে যায় এই বুশম্যানরা, কিন্তু কোনও জন্তু বা তার পায়ের ছাপ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ, তখন থেকে শুধু হাতের ইশারা চলে। প্রতি জন্তুর পৃথক সংকেত, যথা হাতের আঙুলগুলি তুলে শুধু মধ্যমাটি নামালে বুঝতে হবে জিরাফের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—তোলা আঙুলগুলি তার কান ও শিঙের চমৎকার অনুকরণ। কনুই থেকে হাত বেঁকিয়ে তুলে আঙুলগুলি ঢাকনার মত জড়ো করলে উটপাখি, মাটির কাছে হাত নামিয়ে একই অঙ্গুলি সজ্জা ছোট কচ্ছপের ইঙ্গিত, সজারু বোঝাতে আঙুল ছড়াতে হবে কাঁটার মত। হাত স্থির রেখে নানা রকম হরিণ, পাখি এমন কি সিংহের অনুরূপ বাস্তবিক অনুকরণ আছে, কিন্তু উপরোক্ত খরগোশের লাফিয়ে ছোটা দেখাতে সংকেত অনুসারে আঙুল সাজিয়ে হাত চালাতে হয়। হাতের পাতা সোজা তুলে ধরলে বুঝতে হবে জন্তুটির হাত মানুষেই মত, সে প্রায় নর অর্থাৎ বানর। খুবই সম্ভব যে আদি মানুষরাও শিকারে এই ধরনের সাংকেতিক বার্তা বিনিময় করেছে হয়তো মুখে ভাষা ফোটার আগেই।

প্রাচীন বুশম্যানরা পাথরের গায়ে বহু ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, এখন এদের নজর দেহের সাজ সজ্জার দিকে, সে বিষয়ে পুরুষরা সমান উৎসাহী। যদিও পরনে শুধু সামান্য ল্যাঙট, মাথায় হাতে এমন কি পায়েও রঙিন কাপড়, পুঁতির মালা ইত্যাদি পরার সখ আছে। প্রধান চারুকলা সংগীত, গান বাজনা নাচ সুন্দর গড়ে উঠেছে। ধনুকের মত একতারা উদভাবন করেছে এরা, তার এক মাথা মুখে ঢুকিয়ে গালে চেপে তারের উপর আঙুল চালায় বাদক, শুনে মনে হয় দুটি বাঁশি একসঙ্গে বাজছে। অন্ন চিন্তা যখন থাকে না তখন প্রহরের পর প্রহর কাটে নাচে। মেয়েরা গোল হয়ে

বসে হাততালির তালে তালে গান গায়, পুরুষরা তাদের ঘিরে ধীর কদমে জটিল পদ চালনে নাচে, মাঝে মাঝে তাদেরও গলা খুলে যায় গানে। প্রায়ই সারা রাত এবং পর দিন বেশ বেলা পর্যন্ত চলে এই অবসর বিনোদন, নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে গল্প বলা, রঙ্গ তামাসা, আহার নিদ্রাও চলে যার যার খুশি মত। এদের পুরোহিত তন্ত্র নেই, নাচ কিছুটা তার অভাব পূরণ করেছে, তার মধ্যে এরা যাদু বা অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া পায়, ত্রিশোর্ধ্ব বছর বয়স্ক পুরুষদের অধিকাংশই সেই শক্তির প্রয়োগে রোগ সারায়। নাচ জমে উঠলে কেউ কেউ গভীর সম্মোহাবেশে ডুবে যায়, গা কাঁপতে থাকে তখন, এই তন্ময় অবস্থায় অনেকে খালি পায়ে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটে, হাত দিয়ে তা তোলে। এদের বিশ্বাস এ রকম সমাধিমগ্ন পুরুষরা এক বিশেষ শক্তি আহরণ করে, তার বলে তারা প্রেতাত্মার সঙ্গে লড়তে পারে, ভূত ছাড়িয়ে অসুস্থদের রোগ সারাতে পারে।

পুরাপ্রস্তর সমাজের সঙ্গে সাদৃশ্যের পাশাপাশি দেখা যায় আধুনিক সভ্যতার নানা সংযোগ চিহ্ন—ধাতুর তৈরি বালা বা অস্ত্রের মাথা, কার্তুজের খোলস থেকে ধূমপানের পাইপ, সুতির কাপড়, খেলনা-পিয়ানো, টিন খুলবার চাবি কানে ঝুলিয়ে অলংকার, এমন কি হাতঘড়ি পর্যন্ত, বহির্জগৎ থেকে আমদানি যত কিছু।

আফ্রিকার মত সুদূর অসট্রেলিয়ার অন্তঃপুরেও আজ পুরাপ্রস্তর যুগ বিদ্যমান, বহু সহস্র বছর আগে বর্তমান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসে উপনিবেশ বানিয়েছিল। তুষার যুগের শেষে বরফ-গলা জলে সাগর ফুলে এই মহাদ্বীপকে বাইরের জগৎ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে রাখল মাত্র কয়েক শো বছর আগে শ্বেতকায় মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত। দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ এখনও কম, নবাগতরা দখল করেছে বাসযোগ্য উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি, নীরস রৌদ্রদগ্ধ অন্তর্দেশে চিরাগত আদিবাসী জীবন ধারা এখনও প্রায় সর্বাংশে অপরিবর্তিত। তাতে অন্তত এই সুবিধা হয়েছে যে এরা 'সভ্য' হয়ে উঠবার আগেই পণ্ডিতরা এদের সমাজ দর্শন সমীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন।

পোশাক বড়জোর নামমাত্র ল্যাঙট, রোদ বৃষ্টি এড়াতে সাময়িক আশ্রয়গুলি ঘাস পাতা বাকল ডাল দিয়ে গড়া, ঘুম মুক্ত আকাশের নিচে। পাকা বাস ব্যবস্থা নেই, কারণ এরা এখনও যাযাবর খাদ্যসন্ধানী। নবপ্রস্তর কৃষ্টির প্রধান অবলম্বন কৃষি ও পশুপালন যে এরা কখনও আবিষ্কার করতে পারে নি তা হয়তো এই কারণে যে উষর মরু অঞ্চলে চাষের যোগ্য উদ্ভিদ, পোষণের উপযুক্ত পশু বড় একটা ছিল না। আজও তাই দিনের অধিকাংশ কাটে অন্ন চিন্তায়, যেমন সে কালে সর্বত্র কেটেছে পুরাপ্রস্তর মানুষের। আজও এদের পুরুষরা দূর দূরান্তরে ঘুরে শিকার করে আনে ক্যাঙারু, এমু পাখি, কুমির ও ক্ষুদ্রতর অন্যান্য সরীসৃপ, মাছ ইত্যাদি, মেয়েরা বনে প্রান্তরে ঘোরে বুনো ফল মূল মিষ্টি আলু বীজ বাদাম গুটি জলপদ্ম শামুক আর মধুর খোঁজে। শিকারীরা শুধু হাতে ফিরলেও গৃহিণীরা কিছু ঘরে আনেই তাদের ক্লান্ত দেহের ক্ষুধা মেটাতে।

মৌলিক পুরাপ্রস্তর অস্ত্র উপকরণ দিয়েই উদর পূর্তি ও সংসারের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়—ধনুর্বাণ নেই, আছে চকমকির ফলাযুক্ত কাঠের বর্শা, বর্শা-ক্ষেপণদণ্ড, খনন দণ্ড, আগুন জ্বালবার কাঠি, পাথুরে কাটারি। আর আছে নানা কাজের বস্তু বড় গোছের কাঠের বাটি, এক গুঁদ গাছের ফাঁপা গুঁড়ি কেটে তৈরি; খাদ্য ও জল ছাড়াও প্রায় সব কিছু রাখবার বা বইবার পাত্র তা, এমন কি শিশুর শয্যা—শিকারীর বর্শার মতই মূল্যবান সমাদৃত সম্পত্তি।

এদের পূর্বপুরুষরা নিরেট পাথরের গায়ে জন্তুর ছবি এঁকেছে, হয়তো ক্রোমানীয়দের মত শিকারে সাহায্য হবে ভেবে, যথা লাল রঙে আঁকা প্রকাণ্ড সরীসৃপ। এগুলি আজ পবিত্র বলে সম্মানিত। চিত্রশিল্প এখনও আছে, উত্তর উপকূলের এক নমুনা ইউকালিপটাস গাছের বাকলে গেরিমাটি দিয়ে অঙ্কিত, এক দল মেয়ে নাচছে সম্ভবত সফল শিকারেরই উদ্দেশ্যে, তাদের দেহ দেখতে ঢোলের মত, মুখ চোখ সাংকেতিক।

দেহের ক্ষুধাই সব কিছু নয় জীবনে, তা হলে আর মানুষ কি। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের লেখ্য ভাষা না থাকলেও তা নির্বস্তুক ভাব এবং যথেষ্ট সূক্ষ্ম তারতম্য বোঝাতে সক্ষম। গৃহস্থালি সরল, শরীর উলঙ্গ

হলেও ভাবের জগৎ পরিপূর্ণ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জটিল টোটেম তন্ত্রে এক সূত্রে গ্রথিত সব কিছু। তদনুসারে প্রতি ব্যক্তি এবং পরিবার থেকে গোষ্ঠী পর্যন্ত সব সমষ্টি কোনও প্রতীকের রক্ষক, কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদের আধ্যাত্মিক মিতা; তার উপর তাদের নির্ভর এবং এই টোটেমও মানুষের আবেগ অনুভবের পূর্ণ অংশীদার। নানা কাজে তার প্রভাব প্রত্যক্ষ, যেমন যাদের আধাত্মিক মিতা ক্যাঙারু তারা তার লাফিয়ে চলার অনুকরণে গোল হয়ে নাচে। একই ব্যক্তি নিজের টোটেম ছাড়া আত্মীয় ও বংশের টোটেমের প্রতিও অনুগত হতে পারে। শিক্ষা, যৌবনাভিষেক, বিবাহ, সংঘর্ষ ও সব রকম সম্পর্ক এই জটিল তন্ত্রের বহু পুরাতন কড়া অনুশাসনের অধীন, উপরন্তু তা মনে নিঃসঙ্গতার বেদনা দূর করে, একতা আনে, প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতায় সাহায্য করে, সংসার ও প্রকৃতির মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের স্বীকৃতি তা। কিন্তু টোটেম যাদু শক্তিতে কার্য সিদ্ধির উপায় নয়।

যৌবনের আরম্ভে সমাজে পূর্ণ পুরুষত্ব অর্জন করতে কিশোরদের অনেক কৃচ্ছ্র করতে; ব্যবহারের রীতি নীতি, পুরাণ ইতিকথার কাহিনী ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সুন্নত অনুষ্ঠান, দাত ও চুল উৎপাটন, দেহ বিক্ষত করে উলকি গ্রহণ, যথা বুক চিরে সরু চামড়া কেটে তুলে ফেলা; এই সব ক্ষতের যে দাগ থেকে যায় তা আকর্ষণীয় ও পুরুষত্বের প্রতীক বলে বিবেচিত। তা ছাড়া রক্ত স্নান অনুষ্ঠানে টোটেমী ধর্মপিতা নিজের শিরা কেটে বালকের মাথার উপর ধরে যেন প্রাণশক্তি দান করে তাকে। আর এক ক্রিয়ায় বংশের প্রাবাদিক বীরদের কীর্তির পুনরাভিনয় করা হয়, উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর ঐক্য প্রদর্শন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ। কেউ খুন হলে নিহত ব্যক্তির গোষ্ঠী সাক্ষীর সামনে অপরাধীকে অপমান করে এবং তার দিকে বর্শা ছোঁড়ে, খুনী তা এড়িয়ে যায়, তখন গোষ্ঠী তার উরুতে এক সংকেতিক আঁচড় কেটে ছেড়ে দেয়। হত্যা দিয়ে যে কলহের উৎপত্তি, সামাজিক অনুশাসনে প্রায় অহিংস ভাবে তার নিষ্পত্তি।

অসট্রেলীয় আদিবাসীর ধর্মবিশ্বাসের গোড়ার কথাটা সরল, যা সহজেই পুরাযুগের দুর্বোধ—প্রায় বিরুদ্ধ—জগতে বিহ্বল সন্ত্রস্ত মানুষের মনে রূপ নিতে পারত। সে কথাটা এই যে এই দৃশ্যমান জগতের আড়ালে আছে

এক আত্মা-লোক, সব প্রাণী সেখান থেকে আসে, আবার সেখানেই ফিরে যায়। এই অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট শক্তির হাতে মানুষ ও পশুর ভাগ্য রক্ষিত, এরাই নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতির সব রকম খেলা। নতুন জন্মের ব্যবস্থা করতে এদেরই প্রসন্ন করতে হয়, এদেরই সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ করা সম্ভব। এই তুষ্টি বা পূজার কাজে শুধু ভক্তি হলে চলবে না, পবিত্র সংকেত ও পবিত্র স্থানও দরকার এবং সবচেয়ে বেশী দরকার জটিল অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য শুধু বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়েরই নয়, আমাদের পূজা পার্বণেও চোখে পড়ে। বেদের সংহিতা অংশে যজ্ঞের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অংশে সেই সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য—কোন যজ্ঞের কি আহুতি, কি পদ্ধতি, যেমন কখন কি ভাবে আগুন জ্বালতে হবে, কুশ কোথায় কি ভাবে রাখতে হবে ইত্যাদির সম্পূর্ণ নির্দেশ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেবতাদের আরাধনা হল হব্য, পিতৃগণের তর্পণ কব্য—এই কব্যের অনেকটা অবৈদিক। ঐতিহাসিক কালের অন্যান্য আধুনিক ধর্মেরও ব্যবহারিক দিকটা অনুষ্ঠান-ভারাক্রান্ত; এ সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক সূত্র অনুধাবন করা যায় কিনা, বা কত দূর পর্যন্ত করা যায় তা পণ্ডিতদের বিবেচ্য।

প্রশান্ত মহাসাগরেই অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, তার মিনডানাও দ্বীপে রাজধানী ম্যানিলার ১০৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে সম্প্রতি এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের আকস্মিক আবিষ্কার নৃবিজ্ঞানীদের বিস্ময় ও উত্তেজনার কারণ হয়েছে। প্রথমত অন্যদের তুলনায় এরা রয়েছে প্রাচীনতম যুগে, প্রায় অনুমিত হোমো ইরেকটাস সমাজে। তা ছাড়া রুসোর মহান বর্বর যদি কোথাও থাকে তো এরা তাই। পৃথিবীর কোনও বিস্মৃত গোপন কোণে এমন সরল জীবন ও সাদা নিষ্কলুষ মন যে এখনও টিকে আছে তা সভ্য মানুষের জটপাকানো মন বিশ্বাস করতে চায় না।

গল্পের সূচনা রোমাঞ্চকর। দাফাল নামে এক ফিলিপিনো ফাঁদ পেতে পশু পাখি ধরতে বিশাল অনাবিষ্কৃত এক পার্বত্য জঙ্গলে একা ঘোরাঘুরি করতেন, ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে এই 'মানববর্জিত' অঞ্চলে কতগুলি পদচিহ্ন দেখে তিনি অবাক, অনুসরণ করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল

তিনটি ছোট খাটো বাদামী রঙের মানুষ, পরনে শুধু পাতার ল্যাঙট, এক চোখা লাঠি দিয়ে খুঁড়ে মস্ত এক শিকড় উদ্ধার করছে তারা। দাফালকে দেখে মানুষগুলি বানরের মত ছুটে পালাল। চিৎকার করে অভয় জানাতে জানাতে তিনি তাদের পিছনে ছুটলেন, অবশেষে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা থামল এক জলধারার কাছে। অজ্ঞাত তসদাই উপজাতি বিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি হল।

সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এই অনাবিষ্কৃত বনবাসীদের গুজব পেঁছাতে ১০ বছর কেটে গেল। হেলিকপটার থেকে বৃষ্টিবহুল পাহাড়ী জঙ্গলে নজরে পড়ল অজানা মানুষগুলি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্তা মানুএল এলিজালদে শঙ্কিত হলেন, কারণ কাঠের ব্যবসায়ীরা তসদাই এলাকায় জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাচ্ছিল, বহির্জগতের প্রবেশে এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন জীবনে রূঢ় আঘাত লাগবে। তাঁর ডাকে আদিবাসীরা এসে উপস্থিত হল দেখা করতে, হাতে পাথুরে কুড়াল, মুখে দুর্বোধ ভাষা। সম্পর্কিত ভাষাভাষীদের সাহায্যে ধীরে ধীরে কথা বার্তা এগিয়ে চলল, শুরু হল যোগাযোগ। আজ তাদের জন্য জঙ্গলের অনেকটা অংশ সংরক্ষিত, কিন্তু বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নি, বাইরের লুব্ধ কুতূহলী জগৎটা সর্বদা উঁকিঝুঁকি মারছে।

অবশেষে এক দিন এলিজালদে আকাশ পথে গিয়ে পেঁছালেন সেই গুপ্ত সুপ্ত উপনিবেশে: দেখলেন পাহাড়ের গায়ে এক গুহায় কয়েকটি আগুনের পাশে বসে ছোট ছোট দল আলাপরত, শিশুরা এক মসৃণ পাথরের গায়ে চড়ছে, হাসতে হাসতে পিছলে নামছে, একটি ছেলে প্রজাপতির সঙ্গে সুতো বেঁধে তাকে ঘুড়ির মত ওড়াচ্ছে। পাহাড়ের এই চূড়াটির থেকেই এদের নাম হয়েছে তসদাই। ২৫০ মিটার উঁচু শিখরের দিকে ১৩৫ মিটার উঠে ঐ গুহা ঘর, তার মুখ চওড়া, ভিতরটা আট থেকে ১২ মিটার গভীর। সাজসজ্জাহীন আবাস, তবে মেঝে নিয়মিত ঝাঁট দেওয়া হয় চেরা বাঁশের ঝাঁটা দিয়ে।

নৃবিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় ক্রমশ এদের খাদ্য উপকরণ ভাষা সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ পেল। খাদ্য সংগ্রহ হয় কয়েকটি পরিবারের সহযোগে, কাজটি সাধারণত পুরুষের, মেয়েরা সন্তানের দেখাশোনা করে,

কিন্তু প্রায়ই রীতির বিপরীতও দেখা যায়। প্রধান খাদ্য বন্য পাম জাতীয় গাছের নরম শাঁস, তা ছাড়া আছে বেত ও বাঁশের কচি ডাঁটা এবং বুনো মিষ্টি আলু, গুহার আগুনে সেঁকে খাওয়া হয় তা। আমিষ ভক্ষ্য ব্যাঙাচি কাঁকড়া মাছ ইত্যাদি, শুধু হাতে ধরা হয় এ সব। পাতার চোঙা বানিয়ে তাতে সংগৃহীত খাদ্য রাখে তসদাইরা, ঘরে ফিরে রান্না।

আগুন জ্বালতে কাঠের খণ্ডের গর্তে কাঠির এক মাথা বসিয়ে দু হাতে তা ঘোরাতে ঘোরাতে জায়গাটা গরম হলে সেখানে এরা শুকনো ঘাস পাতা ও শেওলা চাপায়, তা জ্বলে উঠলে ফুঁ দিয়ে আগুন বাড়ায়, সব সুদ্ধ লাগে পাঁচ মিনিট। দাফালের থেকে তসদাইরা আঠার সাহায্যে পাখি ধরতে শিখেছে, সেকেলে ধরনের ফাঁদ পেতে এখন বুনো বেড়াল, বড় ইঁদুর, বানর ও শুয়োরও ধরে, মাংস পাক হয় খোলা আগুনে সেঁকে, নয়তো বাঁশের নলের মধ্যে ফুটিয়ে। এরা চাল ভুট্টা নুন চিনি কচু জানে না, বিশেষজ্ঞরা বলেন সারা দুনিয়ায় একমাত্র তসদাইরাই তামাকের খোঁজ রাখে না বা তা ব্যবহার করে না। খাদ্যের সঙ্গে দিনে ১০০০-১৫০০ ক্যালরি শক্তি-মাত্রা জোটে, তা কম মনে হলেও শারীরিক পরীক্ষায় পুষ্টির অভাব লক্ষিত হয় নি, দাঁতের ক্ষয় ম্যালেরিয়া যক্ষা রোগ নেই। তবে ২৫ ব্যক্তির পরীক্ষায় কয়েক জনের গলগণ্ড হার্নিয়া ও ব্রংকাইটিস দেখা গিয়েছে। অতীতে ঐ অঞ্চলে বসন্ত জাতীয় মহামারী রোগ এত ক্ষতি করেছে যে শোনা যায় তার ভয়ে এরা নাকি রুগীকে ত্যাগ করেছে একলা মরতে। তিন বছরের মধ্যে মাত্র এক জনের মৃত্যু হয়েছে, সম্ভবত কোনও দুর্ঘটনায়। কিন্তু কম লোকই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচে।

তসদাইরা চাষ বা পশুপালন জানে না, ধাতুর ব্যবহার তো নয়ই। পাথরের চাঁছনি, কাটারি ও হাতুড়ি দিয়ে বাঁশ থেকে পাত্র, ছুরি ও অন্যান্য উপকরণ বানায়। পোশাকের মধ্যে নিম্নদেহে শুধু পাম, অর্কিড ইত্যাদি পাতা জড়ানো। দলে প্রায় ২৫ জন লোক, যেমন হোমো ইরেকটাসের ছিল বলে অনুমান করা হয়, তারা যেমন আগুন নিভতে দিত না এরাও তেমনি সর্বদা দুটি আগুন বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতি অকৃপণ, প্রয়োজন সামান্য, সুতরাং অভাব নেই কখনও, যার যা আছে তা ইরেকটাসের মতই ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত। যে কাজ যে ভাল পারে তাই সে করে, কিছু নিয়ে নিজেদের মধ্যে গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ দেখা দেয় না।

নিরীহ মানুষগুলি আপন গোষ্ঠী ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ, গীতার ভাষায় "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ", তাই বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এত কাল। এরা পাঁচ ছ বছরের বেশী দূর অতীত মনে করতে পারে না, কিন্তু পূর্বপুরুষদের রীতি নীতি ভক্তি করে, তদনুসারে একই গুহায় সবাই একসঙ্গে বাস করে, কাছাকাছি গাছ ও পাথরের যত্ন করে, তাদের ভালবাসে, জীবন কাটে গৃহ ঘিরে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। কাজ ও আমোদ প্রমোদ কম, সকলে একত্র হয়ে দিন কাটাতে ভালবাসে, প্রায়ই জন কয়েক মিলে কাছাকাছি চুপচাপ বসে থেকেই তৃপ্ত, হাসাহাসি জড়াজড়ি গা ঘষাঘষির মধ্যে প্রহর কেটে যায়। সাপের ভয়ে সন্ধ্যার পর গুহার বাইরে যায় না। জঙ্গল এদের প্রিয়, খোলা জায়গায় "চোখ যায় বড় বেশী দূর"। বৃষ্টির সময়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সারা অঙ্গে জলের ধারা অনুভব করা এক আনন্দ। বাঁশ দিয়ে কুবিং নামে বীণা জাতীয় এক যন্ত্র বানিয়েছে এরা, বাঁশের কৌটোয় তা সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় তার বাজনা ভালবাসে বলে। ভোরে খাবার খুঁজতে বার হয়, কিন্তু বেশী দূর যায় ক্বচিৎ। ভাষায় সমুদ্র শব্দটি নেই, কারণ দ্বীপবাসী হয়েও তা কখনও দেখে নি তসদাইরা। সে ভাষায় মালয় ও পলিনেশিয়ার মিশ্র প্রভাব আছে, এবং তাতে এদের গৃহমুখী জীবন, মূল্য বোধ, সমাজ ইত্যাদির আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সভ্য জগতের যা সব আবশ্যিক উপাদান তা এদের সমাজে অনুপস্থিত, শব্দকোষে তার প্রতিশব্দও নেই, যেমন চাষ চারুকলা ধর্ম অস্ত্র শত্রু যুদ্ধ হত্যা, এমন কি মন্দ পর্যন্ত। কিন্তু ভাল বোঝাতে আছে মাফিয়ন, তা সুন্দরও বোঝায়। অর্থাৎ যা শিব তাই সুন্দর।

১৯৭১ সালে বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রথম অনুসন্ধানে দেখেন শিশুর সংখ্যা ১৩, অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী, তার মধ্যে দুটি মাত্র মেয়ে। দলের অন্তরঙ্গতা ও পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে শিশুরা সকলেরই আপন, তাদের বাপ মা মারা গেলে অন্যদের কাছে মানুষ হয়। স্বামী বা স্ত্রীর বহুবিবাহ নেই, যদিও আদিবাসী সমাজে এই প্রথা সাধারণ। নারীর তুলনায় পুরুষ সংখ্যাধিক হলেও বিবাহ বিচ্ছেদ অজ্ঞাত। পরিবারে দম্পতির সঙ্গে থাকে অবিবাহিত সন্তান, কখনও কোনও অনাথ বা নিঃসন্তান বিধবা। বিয়ের সম্বন্ধ করে

বাপ মা, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাহ অবৈধ বলে বৌ যোগাড় করা সহজ নয়, দুটি অনুরূপ বনবাসী উপজাতি সম্প্রতি লোপ পাওয়াতে সমস্যা আরও কঠিন হয়েছে। বালায়ম নামে এক পাণিপ্রার্থীর জন্য এলিজালদে জঙ্গলের বহির্ভূত এক সম্প্রদায়ের থেকে একটি কুমারী আমদানি করলেন, বর সাদর সানুরাগ প্রেম নিবেদন করল তাকে এবং গোষ্ঠীর সকলে তাদের ঘিরে মৃদু সুরে "মাফিয়ন মাফিয়ন" বলতে বলতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করল। সন্তানের জন্ম কালে মা অপরের সাহায্য বিনা প্রসব করে।

পরিবারের বাইরে দলগত সংগঠন, সর্দার বা মোড়ল কিছু নেই, সম্ভবত আদিতম মানুষদেরও ছিল না। পরিবার একত্র খাদ্য অন্বেষণে যায়। দলীয় বিষয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি সাবালকের মতামতের সমান দাম, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকলের সমর্থনে অভিজ্ঞতম ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে। এই পরামর্শ জ্ঞানী পিতামহদের থেকে হস্তান্তরিত, স্বপ্নে এই পরলোকগত 'আত্মার আত্মীয়রা' দেখা দেয়, গাছের চূড়ায় মনোরম গৃহে তাদের বাস। আর দেখা দেয় 'গিরিশ্রেণীর মালিক', সে বলে দেয় কোথায় খুঁজতে হবে পাম গাছের শাঁস আর শিকারের প্রাণী। দলের কবি বালায়াম, আত্মা কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, "তোমার যে অংশ স্বপ্ন দেখে তাই হয়তো আত্মা"। প্রস্তর যুগের কোন কাল থেকে চলে এসেছে তসদাইদের এক অনুশাসন, "সব মানুষকে এক মানুষ ভাব"। বাস্তবিক জীবনে এখনও বিদ্যমান পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংগতি। এদের শান্ত নম্র আচরণ রীতি লক্ষ্য করে এক নৃবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ গোষ্ঠীদের অন্যতম এরা।

কিন্তু দূর সাগর দ্বীপের এই লুপ্ত ইডেন কানন কত দিন নিষ্কলুষ থাকবে বলা যায় না, সভ্য সমাজের তরঙ্গমালা প্রস্তর যুগের এই ক্ষীণ যোগসূত্রটিকে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। কাঠ, খনিজ বস্তু ও চাষের ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য আক্রামকদের থেকে বাঁচাতে ফিলিপিন সরকার প্রায় ১৮,৬০০ হেকটেআর জঙ্গল নিয়ে এদের জন্য সংরক্ষিত আবাস বানিয়েছে। কিন্তু সম্ভবত কাষ্ঠশিল্পপতিদের টাকা খেয়ে জন কয়েক সশস্ত্র পেশাদার খুনী তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তসদাইদের পাহাড়ের নিচে প্রহরীরা তাদের

তাড়িয়ে দেয়, আদিবাসীরা শুধু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, বুঝতে পারল না, কারণ হিংসা কথাটি নেই তাদের ভাষায়।

যারা দুরভিসন্ধি নিয়ে আসে না তারাও ক্ষতি করে। বেশ কয়েক জন বিজ্ঞানী, সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের লোক এসেছে গিয়েছে, অদ্ভুত প্রশ্ন সকলের। এক বিজ্ঞানী বালায়ামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি পাথরের সঙ্গে কথা বল?" ফলে ক্রমশ বিদ্রোহ দেখা দিল, এক তসদাই দৃঢ় সুরে বললে, "আমরা আমাদের চেতনার মর্ম মূলে ফিরে যেতে চাই।" আর এক ব্যক্তি এলিজালদেকে জানালে "চড়া কণ্ঠ স্বর আর তীক্ষ্ম দৃষ্টি" তাদের ক্লান্ত করেছে। তা ছাড়া অনেকে বহির্জগতের উপহার এনে দেয়—তীর ধনুক, ইস্পাতের ছুরি ও চিনি দিয়েছে দাফাল, অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আসে সুসভ্য বিশ শতাব্দী, তার চমকদার সাজ সরঞ্জাম, সুতরাং বিদ্রোহের পাশাপাশি প্রলোভনও সাড়া দেয়। ধাতুর ছুরি দিয়ে পামের শাঁস বার করা অনেক সহজ, টর্চের আলোতে অন্ধকারে ব্যাং ধরতে সুবিধা। এলিজালদে হেলিকপটারে করে যখন আকাশ থেকে নামলেন সঙ্গে সঙ্গে এরা তার নাম দিল পবিত্র মহাবিহঙ্গ। আগন্তুকদের অনুসন্ধানী প্রবৃত্তি এদের মধ্যেও সংক্রামিত হল, জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলে প্রলুব্ধ হয়ে কবি বালায়াম পর্যন্ত এক রাত্রে সকলের হয়ে এলিজালদেকে বললে, "জঙ্গলের বাইরে কি আছে এক বার দেখলে মন্দ হয় না।" তিনি তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করলেন, কিন্তু কত দিন এই পরামর্শ মানবে তারা।

আদিবাসী সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই সমস্যা জগতের সর্বত্র অল্প বিস্তর বর্তমান এবং তার সমাধান সহজ নয়। এ সব সম্প্রদায় যত 'সভ্য' হবে, তাদের সূত্রে দূর অতীতকে জানা তত কঠিন হবে। আমাদের দৃষ্টান্ত-গুলিতে এই দুইয়ের মধ্যে যে সব সাদৃশ্য দেখা গিয়েছে, অনেকাংশে তাদের থেকেই নৃবিজ্ঞানীরা পুরামানবের সামাজিক কাঠামো গড়েছেন। কিন্তু তা বলে মানুষের বহু শতাব্দীসঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে, শিল্প বিজ্ঞানের সম্পদ থেকে তারা কি চিরবঞ্চিত থাকবে; চাষ থেকে আরম্ভ করে আজকের চরম যন্ত্রসভ্যতা কত দিকে জীবন সহজ করেছে, অবসর ও তা উপভোগের আনন্দ বাড়িয়েছে, কোন অধিকারে তাদের আমরা ছোঁয়া বাঁচিয়ে যাদুঘরের নমুনা রূপে কঠিন জীবন দশায় বন্দী করে রাখব।

পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার সবটাই সুখদায়ক বা কাম্য নয়। নানা নতুন সমস্যাও এনেছে তা, মাঝে মাঝে তাদের ভারে নিরানন্দ, ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে জীবন, যন্ত্রসভ্যতার জটিল জাল থেকে মুক্তি পেতে তখন সরল ও অকৃত্রিমের দিকে মন টানে। তাই আদিবাসী সমাজে কৃত্রিম রীতি নীতি, বিজাতীয় মূল্য বোধের অনুপ্রবেশ দুঃখজনক। অবশ্য প্রাচীন সমাজ মাত্রই চিত্তাকর্ষক এমন কথা ভাবলে ভাবালুতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে, কয়েক বছর আগে দেখা গিয়েছে উগান্ডায় আবিষ্কৃত এক সম্প্রদায়ের লোকে অপরের উৎপীড়নে আনন্দ পায়। তসদাইরা শুধু প্রাচীনতম সমাজের অন্যতম নয়, তাদের তুল্য অহিংস নিষ্কলুষ অল্পে তুষ্ট সমাজ খুঁজে পাওয়া ভার—তাই তাদের বিংশ শতাব্দীতে স্বাগত জানাতে আরও দ্বিধা হয়।

১১। বনে জঙ্গলে

স্পেইন ও আফ্রিকার শিল্প প্রসঙ্গে আগে আমরা মধ্যপ্রস্তর আমলের আভাস পেয়েছি, এখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দরকার। প্লাইসটোসিন অধিযুগে য়োরোপ ও এশিয়ার অনেকাংশ ঢেকে বরফের চাদর চেপে ছিল, কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রায় ২০,০০০ বছর আগে পৃথিবী উষ্ণ হতে আরম্ভ করল, তখন বরফ গলে ঐ চাদরের সীমানা উত্তরে সরতে লাগল, এই ধীর অপসরণ আজও চলছে। এর মধ্যে পৃথিবীর ভূগোলের শেষ মহাপরিবর্তন সাধন করে এই চতুর্থ তুষার যুগ বিদায় নিল, এল হলসিন বা 'সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক' অধিযুগ। ভূবিজ্ঞানীদের বিভাগে এই সন্ধি ক্ষণ আজ থেকে ১০,০০০ বছর প্রাচীন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে পুরাপ্রস্তরের পরে নবপ্রস্তর যুগ যে সর্বত্র এক কালে আরম্ভ হয় নি তা আমরা দেখেছি, হলসিনের অল্প বিস্তর আগে পরে তার শুরু। অল্প কয়েক হাজার বছর কেটেছে যখন মহাতুষার যুগের হিমপ্রকোপ কমে এসেছে, অথচ মানুষ ইচ্ছাধীন খাদ্যোৎপাদনের গুরুতর রহস্যটি শিখে নবপ্রস্তর পর্বে পা দেয় নি, মধ্যবর্তী এই ফাঁকটি ভরতে প্রত্নবিজ্ঞানীরা প্রায়ই আর একটি ভাগের উল্লেখ করে থাকেন, তার নাম মধ্যপ্রস্তর বা মেসোলিথিক (mesolithic); অন্য মতে ভূতত্ত্বে ও প্রত্নতত্ত্বে তা যথাক্রমে হলসিন অধিযুগ ও পুরাপ্রস্তর যুগের অংশ বলেও বিবেচনা করা যায়। আফ্রিকায় মধ্যপ্রস্তরের সূচনা হয়তো য়োরোপের কিছু আগে, এশিয়ায় তার অস্তিত্বই সন্দেহের বিষয়। এই যুগের সবচেয়ে স্পষ্ট বিকাশ ও চিহ্ন উত্তর য়োরোপে, তার থেকে জানা যায় যে চাষ বাস না শিখলেও এই সময়ে কয়েকটি বিশিষ্ট উদভাবনের সাহায্যে মানুষ বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, জীবন যাত্রা আরও সহজ হয়েছে তার। কোনও কোনও উদভাবনের ক্ষীণ সূচনা বিগত যুগের অন্তিম পর্বে দেখা দিলেও এই সময়ে তাদের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার ঘটল, উপরন্তু নতুন আবিষ্কারের ফলে সমাজের রূপটি বেশ বদলে গেল।

পৃথিবীর যে ভৌগোলিক চেহারাটা আজ আমরা জানি তা এই সময়ে

রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। বরফ-গলা জলে সাগর ফুলে উঠে নানা জায়গায় গ্রাস করল স্থল, মহাদেশীয় য়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংল্যানড হল দ্বীপ, অন্য দিকে সাইবেরিয়ার পূর্ব প্রান্তে এশিয়া ও আমেরিকার যোগ ছিন্ন হল। য়োরোপের তুষারমুক্ত বন্ধ্য প্রান্তর প্রথমে বার্চ ও উইলো এবং পরে পাইন ওক এল্‌ম্‌ ইত্যাদির বনে আচ্ছন্ন হল। প্লাইসটোসিন ও হলসিনের অন্তর্বর্তী পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন এই বন, তার মধ্যে মধ্যে বরফ-গলা জলে সৃষ্টি হল হ্রদ আর স্রোতস্বিনী, মানুষও চির কালের মত গুহা গহ্বর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘর বাঁধল বনের ফাঁকে ফাঁকে অথবা সাগর নদী আর হ্রদের ধারে ধারে। গৃহ নির্মাণের উপাদানও বন আর জলের দান, কখনও কখনও জল বা জলার উপরেই গোল করে খুঁটি পুঁতে নলখাগড়ার ছাউনি দিয়ে সারা বছরের বাসা তৈরি হয়েছে। বৃহৎ পশুরা তখন অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কেউ মানুষের হাতে, কেউ হয়তো বরফের সঙ্গে উত্তরে পালিয়েছে। ম্যামথ ও বলগা হরিণের বদলে দেখা দিয়েছে জঙ্গলের জন্তু লাল হরিণ, এল্‌ক্‌ হরিণ, বুনো শুয়োর এবং জলে নানা রকম মাছ ও বুনো হাঁস রাজহাঁস বক ইত্যাদি পাখি, অপর্যাপ্ত খাদ্যের খোরাক সব। কিন্তু নতুন শ্রেণীর প্রাণীদের ধরন ধারন আলাদা, তারা প্রায়ই ক্ষুদ্র বা ক্ষিপ্র, দলবদ্ধ বা পরিযায়ী নয়, সুতরাং খাদ্য সমস্যার সমাধানে দরকার হল নতুন শিকারী বিদ্যা ও কৌশল। মানুষের হাতে যুগোপযোগী অস্ত্র তখন ধনুর্বাণ, কবে কোথায় তার আবিষ্কার তা সঠিক জানা নেই, এ সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। হয়তো পুরাপ্রস্তর যুগের অন্তিম পর্বে উত্তর আফ্রিকায় এই অস্ত্র প্রথম দেখা দিয়েছে, য়োরোপে মধ্যপ্রস্তর কালে তার আদিতম নিঃসন্দেহ ব্যবহার দেখা যায়, তার পর সারা মহাদেশ জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ল। তখন সম্ভবত বনের প্রাচুর্য ও চঞ্চল সতর্ক পশুশ্রেণী ধনুর্বাণের প্রেরণা যুগিয়েছে, অতঃপর আধুনিক যুগে রাইফ্‌ল বন্দুকের চরম উন্নতি পর্যন্ত পশু পাখি ও মানুষ হত্যার এমন কার্যকর অস্ত্র আর হাতে আসে নি। পরবর্তী দিনের মত সে কালের ধনুর্ধর ব্যাধও লুকিয়ে শিকার অনুসরণ ও নিধনের সুবিধা পূর্ণ উপলব্ধি করেছে। ধনুর গুণ পেশী-তন্তু দিয়ে তৈরি, বাণের মুখে সাধারণত চকমকির তীক্ষ্ণ ফলা।

মাছ ধরতে আবিষ্কার হল জাল বঁড়শি, শূল ও ফাঁদ। একসংগে অনেক মাছ ধরা পড়ত, তাদের আকর্ষণ করতে ফাঁদে টোপও ব্যবহার করত জেলেরা। উপরন্তু পরিযায়ী জন্তু জানোয়ারের মত মৎস্য দলেরও ঋতুগত চাল চলনের স্থান কাল শিখে তদনুসারে মানুষ তাদের শিকারের ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং জলা জংগলে পশু পাখির অভাব হলেও মাছ ছিল অপর্যাপ্ত। জল থেকে ঝিনুক ইত্যাদি নানা জাতের খোলকপ্রাণীও উদ্ধার করে খেয়েছে তারা—উত্তর ও পশ্চিম য়োরোপ উপকূলে স্তূপাকার জমে আছে মাছের কাঁটা ও খোলক—বাড়তি মাছ শুকিয়ে জমা করেছে; এই রকম অতিরিক্ত খাদ্যের আদান প্রদানে এক প্রাথমিক বিনিময় বাণিজ্যও গড়ে উঠেছে হয়তো, সমাজে সূচনা হয়েছে আর এক নতুন ব্যবস্থার।

এই সব মধ্যপ্রস্তর বসতিতে মানুষের আশেপাশে আর একটি প্রাণীকে আমরা দেখতে পাই, সে তার 'শ্রেষ্ঠ বন্ধু' এবং হয়তো প্রথম পালিত পশু। পুরামানবের সংগে শিকারে কত পশুরই যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু কুকুর তাদের দলে পড়ে না। তার নিকটাত্মীয় নেকড়ে সদা-ক্ষুধার্ত ও ধূর্ত, হয়তো তারা মানুষের ঘাঁটির আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট চুরি করে তার হাতে মারা পড়েছে, আবার জঞ্জালনাশক বলে মানুষ সহ্যও করে থাকতে পারে তাদের উৎপাত। সে সখ করে তাদের বাচ্চা ঘরে রেখেছে আদরের পাত্র ও ছোটদের খেলার সাথী রূপে। হয়তো এই সময়েই কুকুরের বন্য স্বভাবটা নরম হল, সে বন্ধু, রক্ষক ও অংশীদার হয়ে দাঁড়াল। পরিবর্তে পেল মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা, নাড়িভুঁড়ি, হয়তো প্রভুর পর্যাপ্ত খাদ্যের অংশও। সে বসতির পাহারাদার, শিকারে অমূল্য সহযোগী, সংগে গিয়ে শুয়োর হরিণ খরগোশ খুঁজে বার করেছে, দৌড়ে তাদের হয়রান করেছে, পলায়নে বাধা দিয়েছে, শরবিদ্ধ পাখিকে জল ও জলার জংগল থেকে উদ্ধার করে এনেছে—শিকারে তার চেয়ে বড় সহায় আর কিছু হতে পারত না। তা ছাড়া তার স্নেহপ্রবণ বিশ্বস্ত স্বভাব নিশ্চয় মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এই সব কারণে সম্ভবত তাকে খাবারের ভাগ দিতে সে দ্বিধা করে নি। এই যৌথ ব্যবস্থায় কুকুরও সুবিধা পেল, পেটের ভাবনা দূর হওয়ায় তার প্রভু ভক্তি বাড়ল। পারসীক পুরাণে দেখা যায় হোশাং

দেব মানুষের হয়ে কুকুরকে শিকার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এমন বন্ধুর মাংসও যে মানুষ খেয়েছে প্রাগৈতিহাসিক জগতে তার চিহ্ন আছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে হয়তো কুকুর পোষা হয়েছে মধ্যপ্রস্তর যুগে নয়, অনেক পরে এবং সে মানুষের প্রথম পালিত পশু নাও হতে পারে ('সভ্যতার আগে', পৃ. ৩৪-৩৬)।

আজ উত্তর মেরু অঞ্চলে কুকুরে স্লেজ টানে, এই প্রথম স্থলযানও মধ্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার। ঘাস, জলাভূমি বা তুষারমণ্ডিত জমির উপর চলেছে এই শকট, বরফের উপর চলতে কুকুর ছাড়া মানুষ নিজেও হয়তো স্লেজ টেনেছে পায়ের নিচে স্কি লাগিয়ে, বলগা হরিণ পোষ মেনেছে অনেক পরে। চলার সুবিধার জন্য স্লেজের নিচে দু পাশে যে লম্বা রানার থাকে প্রথম দিকে তা ছিল না, মধ্যপ্রস্তর কালের ফিনল্যানডের জলাভূমিতে এই নিম্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। উত্তর ইউরেশিয়ায় উদ্ধার হয়েছে স্লেজের এ যাব প্রাচীনতম অবশিষ্টাংশ, বয়স ৬০০০ বছর, এবং সুইডেনে ৪০০০ বছর প্রাচীন স্কি-র ভগ্নাংশ, তখন নবপ্রস্তর যুগ এসে গিয়েছে সেখানে।

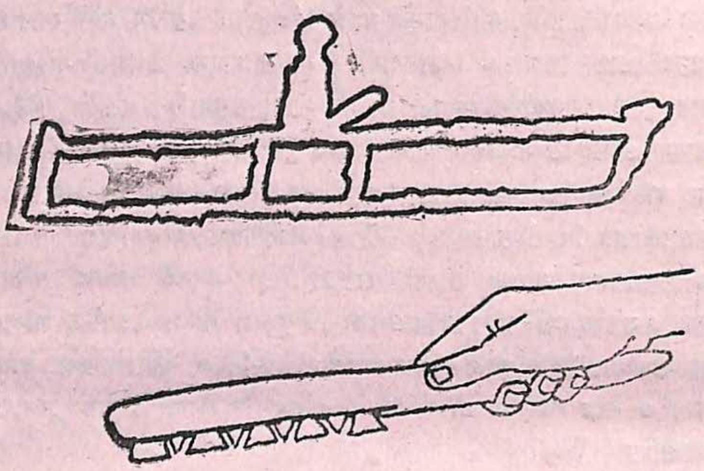
আদিতম জলযানও মধ্যপ্রস্তর যুগের সৃষ্টি। অবশ্য আরও অনেক হাজার বছর আগেই কোনও রকম নৌকা বা ভেলায় চড়ে মানুষ প্রথম অসট্রেলিয়ায় পেঁৗছে থাকতে পারে, কিন্তু তা শুধু অনুমান। নিশ্চয় জলের পর্যাপ্তির থেকেই নৌকার জন্ম, ধনুর্বাণে বুনো হাঁস ধরতে ব্যাধরা সম্ভবত যে ধরনের ডোঙায় চড়ে জলে বিলে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে বলা হয় ক্যানু, আজও প্রশান্ত মহাসাগরে ও অন্যান্য জায়গায় এই জাতীয় ডোঙার যথেষ্ট ব্যবহার আছে; বৃক্ষকাণ্ডের শাঁসাংশ খুবলে ফেলে এই ক্যানু তৈরি হয়। (বস্তুত বাংলায় ডোঙা বা ডিঙি এমন কি ভেলা শব্দটি পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল থেকেই আমদানি, আদি অসট্রেলীয়দের অস্ট্রিক ভাষায় এগুলির উৎপত্তি। বাঙালীর জাতিগত গঠনেও আদি অসট্রেলীয় উপাদান কম নয়।) হল্যানডে ৮২০০ বছর প্রাচীন ক্যানু পাওয়া গিয়েছে, ইংল্যানডে ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে আবিষ্কৃত বৈঠার বয়স ৯৫০০ বছর। চামড়ার তৈরি গোল টবের মত এক ভাসমান যানের ঐতিহ্যও য়োরোপে বহু প্রাচীন, তাও মানুষের প্রথম জলযান হয়ে থাকতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ দিকে হিরডটাস লিখে গেছেন এই

ধরনের নৌকা প্রাচীন ব্যাবিলনেব ঘাটেও ভিড়ত ইউফ্রেটিস নদী বেয়ে।

স্লেজ ডোঙা ভেলা ও বৈঠা বানাতে নতুন ধরনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতির দরকার হয়েছে, প্রকৃতির চেহারা বদলের সঙ্গে রকমারি অস্ত্র উপকরণের উদভাবন ও উন্নতি বাড়ল। পাথর হাড় ও শিং ছাড়া তখন অরণ্যচর মানুষের প্রধান কাঁচামাল ছিল কাঠ (বস্তুত মধ্যপ্রস্তর যুগকে কাষ্ঠ যুগও বলা চলে), তাই ছুতোরের শিল্প দ্রুত গড়ে উঠেছে। কাঠ চিরতে হরিণ শিঙের ধারালো গোঁজ পুরাপ্রস্তর যুগের শেষেই য়োরোপীয়রা কখনও কখনও ব্যবহার করেছে, এ যুগের কারিগররা কোথাও কোথাও কুড়াল শাবল ইত্যাদির পাথুরে ফলায় ঘষে ধার দিতে, তা গর্ত করে হাতল বসাতে শিখল, তাতে তাদের কার্য-কারিতা ও শক্তি বেড়ে গেল অনেক। এ ভাবে কাটবার চিরবার খুবলাবার বিবিধ যন্ত্র দেখা দিল।

তা ছাড়া কোণকরা ছোট ছোট শিলা খণ্ড দিয়ে নতুন এক শ্রেণীর যন্ত্র বা অস্ত্র সৃষ্টি হল, তাদের নাম মাইক্রোলিথ বা অণুশিলা। সাধারণত চকমকির এক লম্বা পাত পাশাপাশি ভেঙে যন্ত্রী উপযুক্ত টুকরোগুলি বেছে নিত, তারা প্রায়ই ত্রিকোণ, কিছু চাঁদের কলা, অসমান চতুষ্কোণ ও অন্য জ্যামিতিক আকৃতিও দেখা যায়। এগুলি বসত তীর ও বর্শার মুখে অথবা শূলের পাশে, এ সব অস্ত্রে যেমন মাছ মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি অণুশিলার কাস্তে দিয়ে কেটে বুনো শস্য এসেছে ঘরে, যদিও স্বাধীন চাষ তখনও শুরু হয় নি। কাস্তে বানাতে কাঠ বা হাড়ের হাতলে শিলা খণ্ডগুলি পর পর জোড়া হয়েছে আদি কালের কোনও আঠা দিয়ে, যেমন পাইন গাছের বাকল আগুনে সেঁকে নিসৃত আলকাতরার মত রস। কাস্তে দিয়ে হয়তো ঘাস খড়ও কাটা হয়েছে, তা লাগত বিছানায় ও ঘরের চালে। তেমনি অণুশিলার তৈরি করাত আর এক সুযোগ্য যন্ত্র।

৮০০০-৭০০০ বছর আগে য়োরোপে উত্তর সাগর উপকূলে জলা জঙ্গলে বাস করত সুদর্শন মানুষের দল, তাদের দেহ দীর্ঘ বুক চওড়া। এই কুশলী কারিগররা মানুষের সবচেয়ে দরকারী কতগুলি অস্ত্র উপকরণের আবিষ্কার ও উন্নতি করেছে, যথা মাছ ধরতে চকমকি, হাড় বা খোলক থেকে গড়া বঁড়শি, শিং থেকে তৈরি দুই বা তিন শলার শূল এবং ফাঁদ,



চিত্র ২৮। উপরে নরোএ দেশে পাথরের গায়ে ক্ষোদিত চামড়ার নৌকায় মানুষ, নিচে হাতলে অশ্মশিলা জুড়ে কাস্তে বা করাত জাতীয় যন্ত্র।

যেমন সরু ডাল দিয়ে তৈরি এক দিকে সরু অন্য মুখে চওড়া লম্বা খাঁচা। এরা তীরে চকমকির ফলা ছাড়াও ভোঁতা কাঠের খণ্ড জুড়েছে, মাথার উপরে হংস বলাকার দিকে তা ছুঁড়েছে যাতে তার আঘাতে অচেতন কিন্তু অক্ষত অবস্থায় পাখি ধরাশায়ী হয়। ধনুক তৈরি হয়েছে জলে নরম করা অ্যাশ্ গাছের কাঠ আর পেশীতন্তু দিয়ে, কাঠের কুটির ও ডোঙা বানাতে প্রধান হাতিয়ার হাতলযুক্ত পাথুরে কুড়াল, বৃক্ষকাণ্ড থেকে ডোঙা বানাতে হয়তো কাঠ আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে খুবলাবার কাজ সহজ করা হয়েছে। তাতে চড়ে হাতে হার্পুন নিয়ে এরা দীর্ঘ সাগর যাত্রায় ভেসে পড়ত, সীল এমন কি তিমিও শিকার করত। হার্পুনের কাঁটাদার মুখটি গাছের আঁশ থেকে তৈরি শক্ত দাঁড় দিয়ে হাতলের সঙ্গে বাঁধা।

ভরা গ্রীষ্মের দিনে এদের যাবতীয় কাজ কর্মের দৃশ্য অনুমান করলে হয়তো দেখব কুটিরগুলির বাৎসরিক সংস্কার চলেছে, মেয়েরা জলা থেকে নলখাগড়া কেটে আনছে, তা দিয়ে চাল মেরামত হবে, ঘরের ভিতরে এক

নারী নতুন বাকল পাতছে মেঝেতে। অন্যত্র মেয়েরাই মাছের পেট কেটে পরিষ্কার করছে, কাছেই কেউ সেই মাছ শিক কাবাবের মত আগুনের উপর ঝুলিয়ে দিচ্ছে, ধোঁয়ায় সেঁকা হলে তা আগামী দিনের জন্য সংরক্ষিত হবে। গাছের আঁশ পাকিয়ে বানানো সুতো দিয়ে এক ওস্তাদ জাল বুনছে —ছেঁড়া জাল জোড়া দেওয়ার কাজে সুতো চালাতে লাগত এমন এক ছোট দণ্ড পাওয়া গিয়েছে এখানে। অদূরে বন প্রান্তে দুই জোয়ান কুড়ালের কোপে গাছ কাটছে। এ দিকে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, বসে দেখছে কাজ অথবা খেলছে শিশুদের সঙ্গে। অন্য দিকে সমুদ্র তীরে তারা কাজে ব্যস্ত, সেখানে জন কয়েক তীরন্দাজ সরু নৌকায় চড়ে বুনো হাঁস শিকারে মেতেছে, তাদের তৎপর সহকারী এই পশুরা।

দক্ষিণ ফ্রানসের আজিলীয় কৃষ্টিতে মধ্যপ্রস্তর আচার অনুষ্ঠানের নজির পাই। অধিবাসীরা নদী থেকে নুড়ি (অধিকাংশ কোআর্টজাইটের) সংগ্রহ করে তার উপর লাল গৈরিকের ছোপ দিয়েছে, বিসর্পিল রেখা বা পর পর লম্বা দাগ এঁকেছে, কখনও পাথরগুলি ইচ্ছা করে ভাঙা, কোনও কোনও নকশা দেখে মনে হয় তারা মানুষের বিকৃত মূর্তি। এই সব নুড়ির ব্যবহার অজ্ঞাত, পবিত্র কিছু হতে পারে তারা। আজিলীয়দের এক প্রধান উপাদান ছিল হরিণের শিং, তা থেকে দু পাশে কাঁটাদার হার্পুন বানিয়ে লম্বা হাতলে জুড়ে তারা স্থলচর জন্তু মেরেছে।

উত্তর-পশ্চিম যুগোসলাভিয়ায় দানিউব নদী তীরবর্তী বর্তমান লেপেন্‌স্‌কি ভির নামক স্থানে প্রায় ৭০০০ বছর আগে এক বসতি গড়ে উঠেছিল, সেখানে গৃহের সংখ্যা ৫৯। কাঠ আর পাথর নির্মিত এই ঘরগুলির নানা আকৃতি, মেঝে সযত্নে পলস্তারা দিয়ে প্রলিপ্ত। প্রতি গৃহের কেন্দ্রের কাছে পাথরের তৈরি এক অদ্ভুত গোল মুখ স্থাপিত, দু পাশে ঝোলানো ঠোঁট ও গোল চোখ দেখে মাছ ও ব্যাং দেবতা বলে সন্দেহ হয়। নিশ্চয় নদীর মাছই অনেকাংশে এত বড় গ্রামটির খোরাক যুগিয়েছে।

মধ্যপ্রস্তর আমলে কেবল বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়ে নি, একই বস্তু একসঙ্গে অনেক তৈরি হয়েছে, অনেকটা এ যুগের কারখানায়

যেমন হয়। ১৯৪৯-৫১ সালে এক আদিতম 'কারখানা' উদঘাটন করেন নৃবিজ্ঞানী গ্র্যাহাম ক্লার্ক ইংল্যানডের ইয়র্কশায়ার প্রদেশে। স্টার কার নামক জায়গায় এক নিমজ্জিত মাঠের জল সরিয়ে দেখা গেল এখানে এক হ্রদের ধারে প্রায় ৯৫০০ বছর আগে জলাভূমির উপর কয়েক স্তর ডালপালা পেতে তা পাথর ও আঠালো মাটি চাপিয়ে শক্ত করে সে কালের ইংরেজরা প্রকাণ্ড এক মঞ্চ বানিয়েছিল, তার এক এক দিক ২১০ মিটার দীর্ঘ।

তিন দিকে জল থাকাতে কর্মীদের কাজের সুবিধা হয়েছে, আধুনিক কালের যেমন রীতি তেমনি তারাও সম্ভবত কাজ ভাগ করে নিয়েছিল, কেউ হয়তো গাছের ছাল খুলে এনেছে, আর এক জন তা আগুনে সেঁকে ঘন কালো আঠা বার করেছে, তৃতীয় ব্যক্তি তা বর্শার মুখে মাখিয়ে তার সাহায্যে চকমকির সূক্ষ্ম কাঁটা জুড়েছে, এই অণুশিলা অবশ্য তৈরি হয়েছে অন্য এক নিপুণ প্রস্তরকর্মীর হাতে। কেউ আবার বর্শার মুখ বানিয়েছে হরিণ শিং থেকে, সেই শিং আগে নরম করে নেওয়া হয়েছে হ্রদের জলে ডুবিয়ে রেখে। শেওলা কুড়িয়ে এনেছে হয়তো কোনও মেয়ে, তার আগুনে শিং সেঁকার কাজটা ভাল হয়। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে এখানে শিং থেকে তৈরি হয়েছে কাঁটাদার বর্শা ফলক, ছোরা, চামড়া পরিষ্কার করবার চাঁছনি এবং কাঠের হাতলে জোড়া কোদাল, তা দিয়ে খুঁড়ে শিকড়ের জট থেকে আহার্য ডাঁটা বা মূল উদ্ধার করতে সুবিধা। আর ছিল ছুতোরের বাইস, তার ফলার এক দিক চ্যাপটা, গাছ কাটতে এবং সেই কাঠের উপর ছুতোরগিরি করতে কাজে লাগত কুড়াল ও এই বাইস। অণুশিলার ফলা বসিয়ে ছোট জাতের বর্শা তৈরি হয়েছে, মাত্র একটি তীরের সমান লম্বা। শিংসংযুক্ত হরিণ খুলি পাওয়া গিয়েছে, সম্ভবত শিকারী তা মাথায় চাপিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করত। জলে চলাচল করতে ছিল ডোঙা নৌকা, চামড়া-জড়ানো টব ও ভেলা, স্থলে ভারী মাল টানতে এরা বানাল স্লেজ। শীত কালে বরফের উপর শিকার ধাওয়া করেছে অধিবাসীরা, হেলানো খুঁটির গায়ে হরিণের চামড়া জড়িয়ে তাঁবু বানিয়েছে। এই সমবায় শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠতে নিশ্চয় কয়েকটি পরিবারের যৌথ উদ্যোগের দরকার হয়েছিল, তাদের মধ্যে যন্ত্রপাতি তৈরি, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সম্মিলিত ব্যবস্থা।

সম্ভবত পরিবারগুলির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল, এক নেতার অধীনে তারা সমষ্টির স্বার্থে কাজ করেছে, শ্রম ও পুরস্কার দুইই ভাগ করে নিয়েছে।

দলীয় সহযোগিতার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের পাশাপাশি দুটি মুণ্ড-শিকারী মধ্যপ্রস্তর সম্প্রদায়ও উল্লেখযোগ্য। এক দল বাস করেছে ডেনমার্কে প্রায় ৬৫০০ বছর আগে, কাঠ আর চামড়া দিয়ে নৌকা বানিয়েছে। এদের পরিত্যক্ত জঞ্জালের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে চিরে চেঁছে পরিষ্কার করা মানুষের খুলির খণ্ড, তার গায়ে ছুরির দাগ। এর থেকে বোঝা যায় যে নিজেদের মজ্জা ও মগজ খেতে এদের আপত্তি ছিল না, যদিও প্রধান খাদ্য যে ছিল ঝিনুক জাতীয় সামুদ্র খোলকপ্রাণী তার প্রমাণ মেলে পরিত্যক্ত খোলের প্রকাণ্ড স্তূপে। হয়তো এই একঘেয়ে খাবারে ক্রমে অরুচি ধরেছিল এবং কোনও কারণে মাছ ও বনের পশুও বিরল হয়ে এসেছিল, তাই স্বজাতি ভক্ষণের কথা ভাবতে হয়েছে। শুধু ঝিনুকের আহারে সম্পূর্ণ পুষ্টি সম্ভব নয়, তজ্জনিত রোগ মাংসাহারে যে সারে তা হয়তো এক দিন এরা আবিষ্কার করেছিল, যদিও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে মনে হয় না যে নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় এবং অনেকটা 'অহিংস' ভাবে এরা মানুষ মেরেছে।

নর মুণ্ডের যে ধর্মসংক্রান্ত বা আচারগত সাংকেতিক মূল্য থাকতে পারে তার ইঙ্গিত মেলে আর একটি য়োরোপীয় সম্প্রদায়ে, এদের ঘাঁটি ছিল আরও দক্ষিণে, বর্তমান জার্মেনির ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে। অফ্‌নেট নামে জায়গায় এক গুহায় এরা রেখে গিয়েছে দুটি মুণ্ড সংগ্রহ, খুলির সংখ্যা একটিতে ছয় অন্যটিতে ২৭, মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযোগের হাড়ে কাটা দাগ। খুলি-গুলিতে লাল গৈরিক মাখিয়ে এরা প্রতিটির মুখ পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে স্থাপন করেছে, জায়গাটি ঘিরেছে বিচিত্র অলংকারে। হয়তো এই মুণ্ডসংগ্রাহকরা আজকের কাপালিক সম্প্রদায়ের মত নরকপাল সঞ্চয় করেছে দেবতাকে উৎসর্গ করতে অথবা নিজেদের সামরিক মর্যাদা বাড়াতে। তা হলে মানুষ এক দিকে যেমন ক্রমে সামাজিক সহযোগিতার পথে এগিয়েছে, অন্য দিকে তেমন হিংসা ও রক্তপাতও হয়তো দেখা দিয়েছে সমাজে। এই দ্বৈত ধারার আভাস আমরা আগেই ক্রোমানীয়দের মধ্যে পেয়েছি—খুলি সংগ্রহ, তার আনুষ্ঠানিক অধিষ্ঠান, হয়তো স্বজাতি ভক্ষণেরও অনুরূপ নজির তারাও

রেখে গিয়েছে মৃত ব্যক্তির সযত্ন সমাধি প্রথার পাশাপাশি। তাদের সঙ্গে তুলনায় আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে শারীরিক দিক থেকে মধ্যপ্রস্তর য়োরোপীয়রা নিকৃষ্ট ছিল এমন অভিমত দেখা যায়, যেমন ক্ষুদ্রতর দেহ ও মগজে, হাড় ও দাঁতের রোগে। কাংস্য যুগে এবং ঐতিহাসিক কালের মধ্য যুগে আবার নাকি য়োরোপবাসীরা দেহে উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

পৃথিবীর নানা বর্তমান উপজাতিদের মধ্যে উত্তর ক্যানাডার কারিবু এসকিমো সমাজে মধ্যপ্রস্তর জীবন ধারার সবচেয়ে বেশী মিল দেখা যায়। হাড্‌সন উপসাগরের পশ্চিমে হ্রদবহুল হিমপ্রান্তর এই সম্প্রদায়ের চিরাগত বাসভূমি, এই মেরুসন্নিকট ধু ধু ক্ষেত্রে আহারযোগ্য কিছুই প্রায় ফলে না, চাষ জানা থাকলেও তা সম্ভব ছিল না। পশু পাখি ও মাছ শিকার করে পেট ভরে। প্রধান সম্পদ কারিবু বলগা হরিণ যার থেকে এদের নাম, তার অধিকাংশই ভক্ষ্য, এমন কি রক্তও। এরা সরু টুকরো করে মাংস কেটে তা ঝুলিয়ে শুকিয়ে নেয়, হাড় ফাটিয়ে মজ্জা চুষে খায়, পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ বস্তুও বাদ পড়ে না, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাবে তার থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন মেলে। দেহের অবশিষ্ট অংশও কাজে লাগে, চামড়া পরিষ্কার করে মাটিতে গেঁথে শুকাতে দেয়, তা দিয়ে শীতনিবারক পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি তৈরি হয়, তার আগে কখনও কখনও চিবিয়ে নরম করে নেয় তা। শিং থেকে ধনুকের বাঁট, পেশীতন্তু দিয়ে তার ছিলা, হাড় শিং ও কাঠ দিয়ে হয় আরও নানা যাবতীয় উপকরণ। মধ্যপ্রস্তর য়োরোপীয়দের মত যেমন আছে তীর ধনুক তেমন আছে নৌকা, তার নাম কায়াক, এই সরু যানটি ঢাকা, ঢাকনার মাঝখানে এক গর্তে শুধু একটি লোক বসবার জায়গা। একাধারে মাঝি ও শিকারী সে, তার সঙ্গে দুমুখী বৈঠা ও বর্শা। কায়াকের কাঠামো চিরসবুজ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি, তার গায়ে চামড়া জড়ানো। স্থলে স্লেজও চলে।

কায়াকের প্রধান ব্যবহার কারিবু শিকারে। হরিণ হ্রদে নেমে জল পার হচ্ছে দেখলে শিকারী দ্রুত নৌকা চালিয়ে গিয়ে বর্শা ছোঁড়ে। তার ফলা পাথরের, দণ্ড কাঠের। মাছ ধরতে তিন কাঁটার শূলও এই দুই উপাদানে

তৈরি, তা ছাড়া আছে অন্য দুটি মধ্যপ্রস্তর উপকরণ বঁড়শি ও জাল। হ্রদের জলে মাছের অভাব নেই, কিন্তু তার দরকার পড়ে হরিণের মাংস বাড়ন্ত হলে, সেটাই বেশী মুখরোচক। পাখি মারতে অবশ্য ধনুর্বাণ। এই সব অস্ত্র উপকরণের সাহায্যে জীবন ধারণ হয়, যেমন হত য়োরোপে ১০,০০০ বছর আগে। এবং এদের আশেপাশে উপস্থিত একমাত্র পালিত পশু কুকুর।

সে কালের মত এক এক অস্থায়ী বসতিতে কয়েকটি পরিবারের বাস, দলের পরিবারও বদলায়। সম্প্রদায়ের লৌকিক নেতা বলে কেউ নেই, যারা বয়সে প্রবীণ, জ্ঞানে বিচক্ষণ, শিকারে দক্ষ তারা সম্মানিত, সবচেয়ে জ্ঞানী গুণী শিকারী বসতির প্রধান বলে মান্য। তা ছাড়া যাদুকর-ওঝা-পুরুত শ্রেণীয়দের সকলে ভয় ভক্তি করে, কারণ তারা মায়া বলে রোগ সারায়, ভূত ছাড়ায়, আবার ইচ্ছা করলে কোনও দুষ্ট আত্মা ঘাড়ে চাপাতেও পারে। কারিবু এসকিমোদের একমাত্র দেবতা আকাশবাসী পিংগা, মানুষ ও পশুদের আত্মা রক্ষা করে সে এবং মৃত্যুর পর অন্য দেহে তার স্থান করে দেয়, অর্থাৎ তার কৃপায় অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। কিন্তু দেবতা অথবা যাদুকর হরিণ পালের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম, অথচ তাদের এই বাৎসরিক অভিযানের উপর শিকার সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাদের ভুলিয়ে বাগে আনতে মানতে হয় শিকারের বিবিধ বিধি নিষেধ ও ট্যাবু।

খুন এবং অন্যান্য গর্হিত অপরাধের কঠিনতম শাস্তি হল একঘরে হওয়া, তাই পড়শীদের সদ্ভাব সব রকম ব্যক্তিগত বস্তু-সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। আদি কালের মত এখনও এই সমাজে কাজের দুটি মাত্র ভাগ, পুরুষরা শিকার করে মাছ ধরে, কাঠ শিং হাড়ের কাজ করে, মেয়েরা যায় একমাত্র নিরামিষ খাদ্য বেরি জাতীয় ফলের খোঁজে, পাতা সংগ্রহ করে আনে, রান্না ও সেলাই করে, চামড়া ও মাংস শুকাবার জন্য তৈরি করে দেয়, তাঁবু খাটায়, আগুন রক্ষা করে। তা বলে বাঁধাধরা নিয়ম কিছু নেই, কখনও কর্তা হয়তো মোজা রিপু করল, স্ত্রী কারিবু শিকারে গেল। ছেলে মেয়ের অল্প বয়সে বাপ মা বিয়ে ঠিক করে, কন্যাদাতা হয়তো বদলে পেল কায়াক ও স্লেজ একটি করে। বহুবিবারের প্রথা আছে, যেমন আছে বন্ধুদের মধ্যে পত্নী বিনিময়। জন্মহার কম ও শিশুদের মৃত্যুহার বেশী বলে তাদের অতিরিক্ত

সমাদর, তারা যা চায় তাই পায়, কেউ কাঁদলে যত ক্ষণ না তাকে ঠাণ্ডা করা যায় তত ক্ষণ বাড়ি সুদ্ধ সব কাজ বন্ধ, শিশু যাই দোষ করুক তার জন্য তিরস্কার বা শাস্তি নেই। পৃথিবীর এক রিক্ত নির্দয় কোণে দিনের প্রয়োজন মেটাতে কঠিন জীবন এই এস্কিমোদের, তার মধ্যে প্রধান আমোদ চর্বির বাতির স্বল্প আলোয় তাঁবুর ভিতরে নাচ গান বাজনায় দীর্ঘ সন্ধ্যা যাপন, নাচের তালে তালে বাজে ঢাক।

কোন আদিম কাল থেকে অব্যাহত এই জীবন ধারায় পরিবর্তন শুরু হল ১৯৫০ দশকে। দেখা দিল বন্দুকধারী ব্যবসায়ী শিকারী, দক্ষিণ থেকে বিজাতীয়রা কাঠ কাটতে কাটতে এগিয়ে এল, তা ছাড়া রোগ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণেও হরিণের দল হালকা হয়ে পড়ল। ফলে মানুষও অনাহারে মরল অনেক, অন্য অনেকের জীর্ণ দেহ সহজেই নবাগত শ্বেতাঙ্গদের অপরিচিত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হল, প্রতিরোধ শক্তি না থাকায় প্রাণ হারাল তারা। এখন সরকারী ব্যবস্থায় অবশিষ্ট অনেকের নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্বাসন হয়েছে, কিন্তু তাদের শুধু এক ক্ষুদ্র অংশের জীবন নির্বাহ হয় কারিবু শিকারের প্রাচীন পেশার অনুসরণে। তবে সভ্যতার সঙ্গে কিছু কিছু সুবিধাও এসেছে, বর্শা বা শূলের শিখরে পাথরের বদলে লোহা বসেছে, তা ছাড়া লাভ হয়েছে রাইফ্‌ল ব্রহ্মাস্ত্র।

য়োরোপীয় মধ্যপ্রস্তর সমাজের সঙ্গে নানা সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই সমাজ তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়, ভূগোল ও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণে তা অসম্ভব। নাতিশীতোষ্ণ য়োরোপের অরণ্যে শিকারী নিঃসঙ্গ লাল হরিণের পিছু নিত, উত্তর ক্যানাডার মেরুপ্রান্তরে তার লক্ষ্য পরিযায়ী হরিণের পাল। উষ্ণতর আবহাওয়ায় ফল বীজ বাদাম বুনো শস্য জুটত, এই এস্কিমোদের সে সব মেলে না। তবু স্থান ও কালের এই বিশাল বিভেদ অতিক্রম করে খাদ্য সংগ্রহ, অস্ত্র উপকরণ, জল স্থলের যান ইত্যাদি বিষয়ে এতখানি সাদৃশ্য নিশ্চয় আশ্চর্য। য়োরোপে ও অন্যত্র মধ্যপ্রস্তর যুগের সমাজ গঠন, রীতি নীতি ধর্মবিশ্বাসও যে অনেকাংশে অনুরূপ ছিল এমন অনুমান অসংগত হবে না।

১২। ভারতের ভৌতিক মানুষ

পৃথিবীর যে সব অংশ আমরা এ যাবৎ প্রধানত আলোচনা করেছি তা প্রায়ই ফসিল ও পাথুরে হাতিয়ার ছাড়াও অন্যান্য উপকরণে সমৃদ্ধ, তাই মানুষগুলিও অনেকটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় প্রাগিতিহাসের অভিনেতারা দীর্ঘ কাল অদৃশ্য অদেহী, তাদের গতিবিধি প্রায়ান্ধকার মঞ্চে ভূতের খেলা যেন (ভারত বলতে প্রধানত সমগ্র উপমহাদেশ)। তার কারণ ঐতিহাসিক যুগের অল্প আগে পর্যন্ত তারিখ-নির্দিষ্ট একটি কঙ্কাল, খুলি এমন কি দাঁতও পাওয়া যায় নি। ডব্লিউ. থিওবাল্ড নামক জনৈক কর্মী নাকি বিগত শতাব্দে মধ্যভারতে প্লাইসটোসিন স্তরে একটি খুলির উপরাংশ পেয়েছিলেন এবং ১৮৮১ সালে এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার খবর প্রকাশ করেন, কিন্তু কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির রক্ষণাগার থেকে পরে তা হারিয়ে যায়। পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ যে এই বিশাল উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিচিত্র পরিবেশে বাস করেছে বৃদ্ধি পেয়েছে তার নীরব সাক্ষী শুধু তাদের হাতে গড়া অসংখ্য শিলা যন্ত্র ও অস্ত্র। আলংকারিক বা আনুষ্ঠানিক দ্রব্যও নেই কিছু। কাঠ চামড়া শিং ইত্যাদি অন্যান্য বস্তুর তৈরি যে সব উপকরণ তারা প্রতি দিন ব্যবহার করেছে, বর্তমান নজির অনুসারে তার সবই পচে ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, শুধু অল্প কিছু হাড়ের কাজ ছাড়া।

সুতরাং আমাদের এই ভৌতিক পূর্বপুরুষরা কেমন দেখতে ছিল বা কি রকম ছিল তাদের জীবন যাত্রা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমাদের নেই। তবু এই ছায়ামূর্তিগুলির কাহিনী গড়ে তুলতে প্রত্নবিজ্ঞানীদের চেষ্টার অভাব হয় নি, এবং যদিও এখনও অনেক কাজ বাকি এবং মূর্তিগুলি আজও ঘোমটাপরা ছায়া, ভারতীয় পুরাচিত্রটির মোটা বহিররেখা এবং প্রধান ভাগগুলি নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রথমে এই উপমহাদেশের তথাকথিত নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগ (অথবা ভূবিজ্ঞানীদের মধ্য প্লাইসটোসিন অধিযুগ) অর্থাৎ মোটামুটি চার থেকে এক লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত অংশ আলোচনা করব, তার পর কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করব কয়েক হাজার বছর আগে

নবপ্রস্তর যুগের শুরু পর্যন্ত, যখন মানুষ যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে প্রথম স্থায়ী বসবাস শিখল। এখানে মনে রাখা দরকার যে পুরাপ্রস্তর আমলের কিছু কিছু যন্ত্রপাতি অনেক পরে পর্যন্ত চলে এসেছে, বিশেষজ্ঞ স্টুআর্ট পিগট মন্তব্য করেছেন ভারতীয় নিম্ন পুরপ্রস্তর বস্তুত প্লাইসটোসিনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে অবধি বিস্তৃত।

প্লাইসটোসিন অধিযুগে য়োরোপের তুষার যুগের মত উত্তর ভারতেও, প্রধানত কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে চার পর্যায়ে হিমের আক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু আরও দক্ষিণে পালা করে এসেছে শুষ্ক ও আর্দ্র পর্ব, অর্থাৎ বারিপাত কমেছে বেড়েছে। সম্ভবত ভারতীয় ও য়োরোপীয় হিম পর্ব মোটামুটি সমকালীন, যেমন ভারতের ও আফ্রিকার বর্ষণ পর্বের মধ্যেও সংগতি থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়টা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। কিছুটা পৃথিবীর গায়ে এই সব পরিবর্তনের ফলে প্রাক্‌নবপ্রস্তর ভারতের তারিখ ও ঘটনা পরম্পরা নির্ধারণ করা প্রায়ই কঠিন। সুতরাং উপমহাদেশীয় আবিষ্কারগুলি নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পুরাপ্রস্তর শ্রেণীতে ভাগ করা সহজ হয় নি। উপরন্তু উচ্চ পুরাপ্রস্তরের বিশিষ্ট পাত ও বিউরিন শিল্পের নজির সাধারণ ভাবে এ দেশে অনুপস্থিত কিংবা অসংলগ্ন ছিল। মধ্যপ্রস্তর আখ্যাটিও ভারতের পটে উপযুক্ত নয়, কারণ যদিও অপর্যাপ্ত অণুশিলা তৈরি হয়েছে, য়োরোপীয় মধ্যপ্রস্তর পর্বে তা ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব কারণে ১৯৬১ সালে নতুন দিল্লীতে প্রত্নতত্ত্ব কংগ্রেসের অধিবেশন পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ বর্জন করে আদি (Early), অন্তর্বর্তী (Middle) ও অন্তিম (Late) প্রস্তর যুগ নামগুলির ব্যবহার সুপারিশ করে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় পুরাপ্রস্তরের তিন ভাগ মানলেও তাদের ভিত্তি ও নামকরণ নিয়ে মতৈক্য নেই, তাই সুপরিচিত য়োরোপীয় আখ্যাগুলিরও প্রয়োগ দেখা যায়। আবার অনেকে বলেন ভারতে উচ্চ পুরাপ্রস্তর পাত শিল্প এবং মধ্যপ্রস্তর অধ্যায় সম্প্রতি আরও স্পষ্ট হয়েছে, সুতরাং ঐ বিভাগীয় নামগুলি গ্রহণীয়। কিন্তু য়োরোপের উচ্চ পুরাপ্রস্তরের বৈশিষ্ট্য শুধু পাত শিল্প সীমিত নয় এবং সেখানে মধ্যপ্রস্তর পর্বের অন্যান্য নির্ণায়ক লক্ষণগুলি বাদ দিলেও বন জঙ্গলের পরিবেশে অণুশিলার পাশাপাশি বৃহত্তর পাথুরে

যন্ত্রপাতিও ব্যবহার হয়েছে, এ দেশে এই ধরনের বৈচিত্র্য অতি বিরল।

প্রত্নতত্ত্ব কংগ্রেসের সুপারিশ অনুসারে আদি প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য সুপ্রাচীন ও সর্বজনীন অশ্ঠি যন্ত্র হাত-কুড়াল, তা ছাড়া নুড়ি থেকে তৈরি কাটারি। অন্তর্বর্তী যুগে ফলক শিল্পের প্রাধান্য। আর ক্ষুদ্র পাত বা অণুশিলা শিল্প অন্তিম প্রস্তর যুগের অন্তভুর্ক্ত। এই তৃতীয় ভাগটি সম্পূর্ণ প্লাইসটোসিন-পরবর্তী কালের এবং এর শেষাংশ নবপ্রস্তর এমন কি আরও সাম্প্রতিক কৃষ্টি পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু মাত্র অন্তিম প্রস্তর যুগেই পাথুরে যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য সাক্ষ্যও পাওয়া গিয়েছে যার থেকে আমাদের পূর্বগামীদের জীবন রীতি বুঝতে সাহায্য পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ আদি প্রস্তর যুগে কাটারি ও হাত-কুড়াল ছাড়াও তৈরি হয়েছে চওড়া ফলাযুক্ত ছেদনাস্ত্র এবং বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার হাতিয়ার। এই সব যন্ত্রপাতি বানাতে পাথরের চাক অথবা অশ্ঠি থেকে ফলক খসিয়ে অভিপ্রেত আকার ও আয়তন আনা হয়েছে। এই ফলকগুলিতেও মাঝে মাঝে ব্যবহারের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু স্পষ্টতই কারিগরের দৃষ্টি ছিল অশ্ঠি যন্ত্রের প্রতি। তারা নানা কাজে লেগেছে—শিকারে নিহত জন্তুর ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটা, হাড় ফাটিয়ে মজ্জা বার করা, মাটি খুঁড়ে আহারযোগ্য শিকড় উদ্ধার, গাছ কাটা এবং সেই কাঠ থেকে বর্শার দণ্ড, লাঠি, মাটি খুঁড়বার খোঁচানি ছড়ি ও শেষের দিকে হয়তো রুক্ষ পাত্রও। এই যুগের নর নারী গাছের আঁশ পাতা ঘাস ইত্যাদিও তাদের নানা প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করে থাকতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের কৌশল ধীরে ধীরে এই আদি পর্ব থেকে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু নজরটা সরে গেল অশ্ঠির থেকে ফলকের দিকে। এই সময়ে ভারী অশ্ঠি ব্যবহার হয়ে থাকলেও যন্ত্র শিল্পীর চেষ্টা ছিল হালকা, পাতলা ও সুষম সুগঠিত ফলক সৃষ্টি, কেউ কেউ তার মধ্যে সাদৃশ্য দেখেন য়োরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার লেভালোআ-মুসতেরীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে। সযত্নে তৈরি এক একটি অশ্ঠি থেকে এই রকম গোটা কয়েক ফলক খসানো হত। সুতরাং যেমন অন্যত্র তেমন ভারতেও যন্ত্র শিল্পের ধারা ক্রমশ অশ্ঠি থেকে মার্জিত ও মার্জিততর ফলকে অভিব্যক্ত হয়েছে। কোনও কোনও ফলক যন্ত্র নিশ্চয় আদি কালের অশ্ঠির মত হাতে ধরে ব্যবহার হয়েছে, অন্যদের ক্ষুদ্রতর

আকার থেকে মনে হয় তাদের সঙ্গে দণ্ড বা হাতল লাগানো হয়েছিল হয়তো। লাক্ষা বা অন্যান্য সহজলভ্য রজন দিয়ে তা জোড়া হত।

অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য নানা ধরনের চাঁছনি—গোল, চতুষ্কোণ অথবা ছুঁচালো ফলক ঘিরে তাদের ফলার আকৃতি কখনও অবতল (concave), কখনও উত্তল (convex), কখনও বা সোজা। মধ্য নর্মদায় ও দক্ষিণে এমন চাঁছনিও পাওয়া গিয়েছে যাদের ফলায় নতুন করে ধার দিতে দিতে তা প্রায় ক্ষয়ে গিয়েছে। উষ্ণদেশীয় গাছের কঠিন কাঠ থেকে নানা উপকরণ সৃষ্টি চাঁছনির অন্যতম ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। ফলক ও আঁঠি থেকে অন্যান্য যন্ত্রপাতিও এই যুগে গড়া হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে হাত-কুড়াল দেখা যায় তা সর্বদাই অপেক্ষাকৃত ছোট। আর দেখা যায় বড় বড় ছিদ্রকর যন্ত্র, তা ছাড়া ক্ষেপণাস্ত্রের ফলা রূপে ব্যবহার্য চোখা ফলক। শেষের দিকে ছাড়া বিউরিন বিরল। আদি প্রস্তর যুগে মিস্ত্রীদের প্রধান কাঁচামাল ছিল কোআর্টজাইট, অন্তর্বর্তী যুগের যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরি হয়েছে অ্যাগেট, জ্যাস্পার ও ক্যাল্সিদনি দিয়ে, মনে হয় তার অধিকাংশ নদী কূলের নুড়ি থেকে সংগৃহীত। ব্যবহৃত কোআর্টজাইটের দানা সর্বদাই সূক্ষ্ম, সম্ভবত পাথরগুলি সযত্নে বাছাই করা।

অন্তিম প্রস্তর যুগে প্রবেশ করার আগে এই যুগ দুটি একত্র আলোচনা করা যেতে পারে। এ দেশে মানুষের প্রাচীনতম সাক্ষী হল কিছু ফাটানো কোআর্টজাইট নুড়ি এবং বড় বড় রুক্ষ ফলক। কেউ কেউ বলেন এগুলি দ্বিতীয় তুষার যুগের শেষে সৃষ্টি এবং প্রাথমিক জাভা মানবের সমসাময়িক হতে পারে, কিন্তু তা বিতর্কের বিষয়। এই সব শিলা খণ্ডের কিছু কিছু এতই স্থূল যে তারা প্রকৃতির সৃষ্টি না মানুষের হাতে গড়া তা পণ্ডিতরাও বুঝে উঠতে পারেন না। এই শিল্পের নাম দেওয়া হয়েছে প্রাক্সোআন—কারণ আদি প্রস্তর যুগের প্রধান উত্তর ভারতীয় কৃষ্টিকে বলা হয় সোআন—কিন্তু কারও কারও মতে এরা আদি সোআন। আর এক প্রধান শিল্পের কেন্দ্র দক্ষিণে, তার নাম মাদ্রাজ কৃষ্টি। এই দুই ভারতীয় শিল্পধারার পূবে ও পশ্চিমে প্রতিবেশী দেশগুলির আগ্রহজনক সম্পর্ক লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু সেই আলোচনার আগে বিশ্বের পটে হাতিয়ার শ্রেণীর বিবর্তন সংক্ষেপে বিবেচনা করা দরকার।

প্লাইসটোসিনের শুরুতে বা তারও আগে তথাকথিত হাবিলিস গোষ্ঠী নানা রকম পাথর থেকে ছিলকা খসিয়ে যে সব যন্ত্রপাতি বানিয়েছে তাই প্রাচীনতম। এই সৃষ্টি থেকে আদি মানবের প্রথম মৌলিক হাতিয়ার আশলীয় হাত-কুড়াল রূপ নিয়েছে—আফ্রিকা ও পশ্চিমের অন্যান্য এলাকা ছাড়া মধ্য ও দক্ষিণ ভারতেও। এই অষ্ঠি শিল্পই ভারতের মাদ্রাজ কৃষ্টি। হাত-কুড়ালের মত আর একটি মৌলিক ও মূল্যবান হাতিয়ার হল এক শ্রেণীর কাটারি যাদের যৌগিক আখ্যা chopper-chopping tool। (আসলে এই জোড়া নামের বিশেষ প্রয়োজন নেই—চপারের এক দিক সোজা, শুধু বাঁকা দিকে ছিলকা খসিয়ে ধার আনা হয়েছে, দ্বিতীয় যন্ত্রে নুড়ির দুই দিকই কিছুটা গোল, তার থেকে হয়েছে দুমুখী কাটারি।) এই কাটারি শিল্প উত্তর ও মধ্য ভারতের সোআন কৃষ্টির অন্যতম, তা ছাড়া অন্যত্রও তা গড়ে উঠেছে, যেমন পূবে যবদ্বীপ, বর্মা, মালয়শিয়া এবং চীনে। ভারতে যে এই দুই প্রধান ধারার সন্ধি দেখা যাচ্ছে অবিলম্বে তার সম্ভাব্য তাৎপর্য আমরা আলোচনা করব।

বিগত সাড়ে সাত লাখ বছরে পৃথিবীতে সম্ভবত চারটি তুষার যুগ দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যবর্তী কালে জলবায়ু মৃদুতর হয়েছে। প্রথম তুষার যুগের শেষ ও দ্বিতীয়টির সূচনা অনিশ্চিত, এটির সমাপ্তি হয়তো চার লাখ বছর আগে, তৃতীয় তুষার যুগ দু লাখ থেকে এক লাখ ২৫,০০০ বছর আগে পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চতুর্থটি তার হাজার পঞ্চাশেক পর থেকে আরম্ভ হয়ে মাত্র ১০,০০০ বছর আগে সমাপ্ত। দ্বিতীয় তুষার যুগ শেষ হলে এই উপমহাদেশে হিমালয়ের হিমবাহ বিদায় নিল, হাওয়া মৃদু হয়ে এল, নদী পথের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে শিকার তখন সহজলভ্য—এই অনুকূল পরিবেশে মানুষ সংখ্যায় বেড়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতিয়ারও (আদি ও মধ্য সোআন)। সেই কালের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি প্রকাণ্ড পাথর অথবা পাহাড় থেকে প্রসারিত পাষাণ পাটা ভেঙে তৈরি। বড় পাথরে অন্য পাথর দিয়ে ঘা মেরে উপযুক্ত ছোট ছোট খণ্ডে ভাঙতে যথেষ্ট শক্তি দরকার, পাথরের গা ঘেঁষে আগুন জেলে সেই তাপেও তা ফাটানো হয়ে থাকতে পারে। একমুখী ও দুমুখী সোআন কাটারি তৈরি হয়েছে বড়

বড় গোলাকার, ডিমাকার অথবা চ্যাপটা নুড়ি থেকে এবং তাদের ধারগুলি গোল করে বাঁকানো বলে কাটারির আকৃতি আনতে ফলক খসাতে হয়েছে কম।



চিত্র ২৯। নুড়ি থেকে তৈরি সোআন যন্ত্র।

সোআন শিল্পের অনেকগুলি ঘাঁটি আছে পাঞ্জাবে, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিন্ধু নদে বয়ে গিয়েছে সোআন বা সোহান (সংস্কৃতে শোভনা) নদী, তার অববাহিকায় এই শিল্পের অধিকাংশ ঘাঁটি আবিষ্কার হয়েছে বলে ঐ নাম। নুড়ি থেকে তৈরি কাটারি শ্রেণী এই কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য, সোআনরা তাদের দু তিন লাখ বছরে দক্ষিণ ও পুবের অন্যান্য দেশের চেয়ে এ সব যন্ত্রপাতির আরও সার্থক উন্নতি করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুষার যুগের মধ্যবর্তী কালে আদি সোআন পর্বে নুড়ি ও ফলকের প্রাধান্য, কিন্তু আরও পরিণত পর্বে, অর্থাৎ তৃতীয় তুষার যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী উষ্ণ কালেও দেখা যায় প্রধানত আগের চেয়ে ছোট ও মার্জিত ফলক যা অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের বিশেষত্ব। নুড়ি ও ফলক ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার ও গঠনে মার্জিত হয়েছে। বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় পশ্চিম য়োরোপের লেভালোআ কৌশলের মত সযত্নে সৃষ্ট পাথরের চাক থেকে খসানো ফলকে। মনে হয় এই কাজে ভারতেও শেষের দিকে পাথুরে হাতুড়ির বদলে কাঠ, শিং বা হাড়ের দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। পরিণত সোআনরা যে যন্ত্র শিল্পে য়োরোপীয় লেভালোআর খুব কাছাকাছি এসেছিল তাতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল হয়তো। যেমন অন্যত্র তেমন এ দেশেও হাতিয়ারের

বিবর্তনে প্রথম দিকে ফলক প্রধান লক্ষ্য ছিল না, অশ্ম যন্ত্র বানাতে তা আনুষঙ্গিক উৎপাদন মাত্র, পরে যন্ত্রীরা কাজ করেছে ফলকের উদ্দেশ্যেই।

এ বার দক্ষিণের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। মাদ্রাজ কৃষ্টি নামটি এসেছে ঐ শহরের সন্নিকট এক ঘাঁটিতে এই শিল্পের প্রথম আবিষ্কার বলে। এ শিল্পের কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের ঘাঁটি শ্রেণীতে হলেও দেশের মধ্য ও পশ্চিম অংশে এমন কি সোআন অঞ্চলেও মাদ্রাজ যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছে। প্রধান পার্থক্য এই যে কাটারির সংখ্যা অল্প এবং পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে তা দ্রুত কমে এসেছে। সুতরাং সোআন ও মাদ্রাজ কৃষ্টির মধ্যে স্পষ্ট সীমা রেখা কিছু নেই, বরং হাত-কুড়াল ও কাটারি শিল্পের পূর্ণ মিলন হয়েছে পাঞ্জাবে।

প্রথম দিকের হাত-কুড়াল কখনও কখনও ওজনে বেশ ভারী, কয়েকটি ৩০ সেনটিমিটার পর্যন্ত লম্বা। হাত-কুড়ালের বহিররেখা সাধারণত ডিমাকার কিংবা সরু দিকটা আরও চাপা হয়ে পেআর ফলের মত, প্রায়ই সর্বাংশ থেকে ছিলকা খসানো এবং সবটা ঘিরে ধারালো করা, পক্ষান্তরে কাটারি-শ্রেণীতে এক পাশের অংশ সাধারণত অক্ষত। আদি প্রস্তর যুগে ছিলকা খসানোর কৌশলে ক্রমোন্নতির ফলে অশ্ম যন্ত্রও উন্নত হয়েছে, আরও ছোট হালকা ও পাতলা হাত-কুড়াল দেখা দিল, তাদের আকারে সমতা বাড়ল, ধারালো ফলাটি আর আঁকাবাঁকা নয়, সোজা হয়ে ঘিরেছে অস্ত্রটিকে। অনেক ঘাঁটিতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত প্রথমে আশলীয় হাত-কুড়াল থেকে আরম্ভ করে ছেদনাস্ত্র ইত্যাদি, তার পর ফলক পার হয়ে পরিশেষে ভূপৃষ্ঠে অথবা তার কাছাকাছি অণুশিলার বিবর্তন দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতীয়রা লক্ষ লক্ষ হাত-কুড়াল বানিয়েছে, শুধু শিকড় ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য উদ্ধারে তা ব্যবহার হয় নি, বরং সব কাজের মামুলী হাতিয়ার তারা, যেমন অন্যত্র। দক্ষিণ কিনিয়ার অলর্গেসেইলি ঘাঁটিতে বহু বেবুনের ফাটানো খুলি ও হাড়ের সঙ্গে যে প্রচুর হাত-কুড়াল পাওয়া গিয়েছে তা আমরা দেখেছি, স্পষ্টই সেগুলি দিয়ে ঘিলু ও মজ্জা বার করেছে মাংস কেটেছে হোমো ইরেকটাস।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই সব যন্ত্রপাতির স্রষ্টারাও ছিল যাযাবর শিকারী।

মাঝে মাঝে অস্থায়ী বাস গুহা ও শিলাশ্রয়ে, তাদের বেশ কয়েকটি খুঁড়ে পরীক্ষা করে স্থায়ী বসবাসের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি, এক শুধু উপমহাদেশের অন্তিম উত্তর-পশ্চিম কোণে (প্রাক্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) সাংঘাও গুহা ছাড়া। ঐ অঞ্চলের চরম জলবায়ুতে গুহাটি প্রায় আদর্শ আশ্রয়। দাক্ষিণাত্যে ও নর্মদা উপত্যকায় যন্ত্র গড়ার 'কারখানা' ঘাঁটিগুলি অথবা প্রধান নদীগুলির কাঁকর কূলে বিবর্জিত শিলা যন্ত্র সবই উন্মুক্ত যাযাবর জীবন নির্দেশ করে। এই কালের এবং পরবর্তী যুগের মানুষ যে নদীর ধারে ধারে এত চিহ্ন রেখে গিয়েছে তার একটা কারণ হয়তো এই যে সেখানে সকালে সন্ধ্যায় পশুরা জল খেতে আসত, তাদের উদ্দেশ্যে তৈরি হাতিয়ারেরও তাই এত ছড়াছড়ি।

আমাদের আলোচ্য সময়ে ভারতে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য হাতিয়ার ধারার মিলন দেখা যায় তা আগ্রহোদ্দীপক জল্পনার সৃষ্টি করেছে। ঐতিহাসিক কালে যান বাহনের ফলে দেশে দেশে ভাবের আদান প্রদান সহজ হয়েছে, সুতরাং সে সময়ে দূরাঞ্চলের মধ্যে কৃষ্টিগত মিল তত আশ্চর্য নয়, কিন্তু এখন আমরা যে সময়ের আলোচনা করছি তখন কোথাও পা ছাড়া চলা ফেরার কোনও গতি ছিল না মানুষের এবং তাদের সংখ্যাও ছিল অল্প। তবু অস্ত্র তৈরির ধারা ছড়িয়েছে মহাদেশ থেকে মহাদেশে, আগে আমরা দেখেছি যে এর পিছনে বিপুল কোনও উদ্দেশ্যমূলক অভিযান এবং মিশ্রণ সর্বদা কল্পনা করা উচিত হবে না, কোনও খবরদার যে বার্তা বয়ে এনেছে তাও নয়। মনে রাখা দরকার যে সে কালের লোকের ঘর বলে কিছু ছিল না, ভবঘুরের দল শিকারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, অস্ত্র শিল্পও ছড়াত তাদের সঙ্গে সঙ্গে। এ ভাবে কোনও বিদ্যার প্রসার অবশ্য সময়সাপেক্ষ, কিন্তু দেশে দেশে সময়ের দূরত্ব যে ছিল অনেকটা তাতে সন্দেহ নেই। সেই কালের ভারতীয় হাতিয়ারের আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত প্রত্নবিৎ সার মর্টিমার হুইলার মন্তব্য করেছেন যে ভাব যে কি করে ছড়ায় তা বলা যায় না, এক এক সময়ে মনে হয় যেন তার গায়ে পাখা আছে এবং প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে এখানে সেখানে ডিম পাড়ে সে।

হুইলারই ভারতের দুই প্রধান শিল্প ধারা সম্বন্ধে এই জল্পনার উদ্যোক্তা যে সোআন কাটারি জাভা মানব (এশীয় হোমো ইরেকটাস) অথবা সম্পর্কিত জাতের কাজ, আর য়োরোপ আফ্রিকার হাত-কুড়াল ঐতিহ্য হয়তো ঐ দ্বিতীয় মহাদেশ থেকে আমদানি। মধ্য প্লাইসটোসিনে এ দেশে পূর্বাঞ্চলিক আদি মানবের এবং পশ্চিমের ইরেকটাস ও পরে আদি সেপিয়েনস আর আদি নেআনডার্টাল জাতীয় মানুষের বাস ছিল এমন অনুমান কষ্টকর নয়। কিন্তু ফসিলের অভাবে আপাতত এ সব কেবলই জল্পনা। অবশ্য তা যদি সত্য হয় তো সেই আদিম কালেই ভারতে "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা"। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ ও ঐতিহ্য-প্রসূত এই দুই দলের মানুষ যদি ভারতে এসে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে থাকে তো কি ভাবনা কি আবেগ জেগেছে তাদের মনে তা কল্পনা করতে চেষ্টা করা হবে চূড়ান্ত জল্পনা।

এই উপমহাদেশে অন্তিম প্রস্তর যুগের শুরু শেষ তুষার যুগের অন্তে, এবং বিদেশের অনুকরণে যাকে বলা হত (এখনও অনেকে বলেন) মধ্যপ্রস্তর যুগ তা তার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মধ্যপ্রস্তরের বিশিষ্ট বিকাশ হয়েছে শুধু য়োরোপে, সেখানে অণুশিলা-স্রষ্টাদের বিশেষ জীবন ধারাও নবপ্রস্তর যুগের আগে এক সুনির্দিষ্ট অধ্যায় নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে ভারতে অণুশিলার ব্যবহার অনেক জায়গায় মৃৎপাত্র এমন কি ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতি (যথাক্রমে নবপ্রস্তর ও ধাতুপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য) দেখা দেওয়ার পরেও চলেছে, সুতরাং এ দেশে নবপ্রস্তর বা তৎপরবর্তী পর্বগুলি অন্যত্র যেমন দেখা যায় তেমন স্পষ্ট সীমারেখায় চিহ্নিত নয়। হুইলার মন্তব্য করেছেন যে ভারতে কোনও কোনও ঘাঁটিতে কাঁসা এবং পরে লোহার তৈরি উপকরণের পাশাপাশি অণুশিলার ব্যবহার চলেছে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও—অবিলম্বে তার উদাহরণ দেখব আমরা। ১৯৪৭ সালে উত্তর কর্ণাটকে ব্রহ্মগিরি ঘাঁটিতে খনন করে নাকি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দেও অণুশিলার প্রচলন দেখা গিয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে কোনও কোনও প্রত্নবিৎ য়োরোপের মধ্যপ্রস্তর যুগকে পৃথক এক যুগ বলে দেখেন না, তাঁদের দৃষ্টিতে



চিত্র ৩০। ভারতীয় অণুশিলা।

তা উচ্চ পুরাপ্রস্তরের অন্তিম পর্ব মাত্র। পাতলা লম্বা পাথর-পাত শিল্প যে এই উচ্চ পুরাপ্রস্তরের বিশেষত্ব তাও আমরা জানি। এ দিকে ভারতে এই পাত ও বিউরিন শিল্পের যথেষ্ট নজির নেই যা দিয়ে উচ্চ পুরাপ্রস্তর চিহ্নিত করা চলে। এ কথা বিশেষ প্রযোজ্য উত্তর ভারতে, কিন্তু মধ্য ভারতে গোদাবরীর শাখা প্রভরা নদী উপত্যকায় আশলীয়-পরবর্তী শিল্পে যথার্থ উচ্চ পুরাপ্রস্তর বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে, যেমন অ্যাগেট, চার্ট, ক্যালসিদনি এবং জ্যাস্পারের তৈরি পাত, চাঁছনি, কিছু বিউরিন ও অস্থি যন্ত্রে। বম্বে শহরের ৩৪ কিলোমিটার উত্তরে খান্দিভ্লিতে হাত-কুড়াল স্তরের উপরে পাত ও বিউরিন শিল্পের ক্রমবিবর্তন ও সর্বোচ্চ স্তরে পূর্ণবিকশিত বিউরিন লক্ষিত হয়েছিল, যদিও পরে এ সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তবে উচ্চ পুরাপ্রস্তর-নির্দেশক উৎকৃষ্টতর ঘাঁটি আরও আবিষ্কার হয়েছে।

কিন্তু আপাতত য়োরোপীয় আখ্যা ব্যবহার না করে ভারতীয় অন্তিম প্রস্তর যুগে অণুশিলা কৃষ্টির স্বাধীন আলোচনা করাই ভাল। অন্তর্বর্তী পর্ব থেকে এ যুগের ক্রমিক অভিব্যক্তির আগ্রহজনক দৃষ্টান্ত কিছু আছে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে। জব্বলপুর, বম্বে ও মধ্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের শেষাংশ থেকে ধারা বহন করে অন্তিম প্রস্তর যুগে চলে এসেছে। আরও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী তীরের এক অন্তর্বর্তী ঘাঁটির এবং হায়দ্রাবাদের প্রায় ৬৪ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি ছোট নদীর ঊর্ধ্বে আর একটি অনুরূপ ঘাঁটির খুব কাছে এক একটি করে অন্তিম প্রস্তর যন্ত্রের সৃষ্টি স্থল আবিষ্কার হয়েছে; প্রতিটি জোড়া এতই সন্নিকট যে একের জঞ্জালের সীমা অপরটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যদিও কেন্দ্রগুলির

অন্তর্বর্তী ও অন্তিম প্রস্তর চরিত্র স্পষ্ট ও অক্ষুণ্ণ। মাদ্রাজের দক্ষিণে দেশের অন্তিম প্রান্তের আবিষ্কারও অন্তর্বর্তী থেকে অন্তিম প্রস্তর শিল্পে ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ নির্দেশ করে।

হুইলার বলেছেন যেমন হাত-কুড়াল তেমন অণুশিলাও বিদেশী আমদানি হয়ে থাকতে পারে, উত্তর আফ্রিকা থেকে আরবের পথে তা ভারতে ছড়িয়েছে। সে যাই হক, এই ছোট ছোট শিলা খণ্ড প্রগলভ পরিমাণে বানিয়েছে এ দেশের মানুষ—কোথাও কোথাও যেমন নর্মদার তীরে পথ চলতে চলতে অনায়াসে তা দিয়ে পকেট ভরে ফেলা যায়। এই প্রলোভন স্বাভাবিক কারণ শিলাণুগুলি অ্যাগেট, জ্যাসপার, ক্যালসিদনি ইত্যাদি কিছুটা মূল্য-বান পাথর থেকে তৈরি বলে জহুরীর কাটা মণির মতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত স্থানীয় জহুরী ও মালাকাররা এখনও এ সব পাথর ব্যবহার করে এবং শ্রেষ্ঠগুলি সে কালের মতই নর্মদার সৈকতে সংগ্রহ করে। কিন্তু অনেকের বিবেচনায় আফ্রিকা ও য়োরোপের বাসিন্দারা যে খাঁটি চকমকি ও অব্‌সিডিয়ান পেয়েছে তা দিয়ে আরও উৎকৃষ্ট যন্ত্র হয়, এ দেশে সাধারণত এগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল।

অণুশিলা শিল্পী প্রথমে সযত্নে প্রস্তুত এক খণ্ড পাথরের গায়ে হাড় বা শক্ত কাঠের এক চোখা যন্ত্র ঠেকিয়ে হাতুড়ির ঘা মারত, অনেকটা যেমন বাটালি ব্যবহার হয় এখন। এ ভাবে উৎকৃষ্ট পাথরের অপেক্ষাকৃত ছোট অষ্ঠি থেকে অল্প সময়ে অনেকগুলি ছোট ছোট পাত তৈরি সম্ভব হয়েছে, তাদের দুই ধার সমান্তরাল। এই সব পাত নানা উদ্দেশ্যে সোজাসুজি ব্যবহার হয়েছে অথবা খণ্ড করে সেই অণুশিলা দিয়ে কারিগর বৃহত্তর যন্ত্র যন্ত্র বানিয়েছে। অণুশিলা বানাতে অন্য উপায়ও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে, যেমন অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের ফলক তৈরির কৌশল অনুসারে অথবা, স্ফটিক পাথরের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত শিলা খণ্ড গরম করে দু একটি সযত্ন আঘাতে ফাটিয়ে যে ফলক বা ছিলকা পাওয়া গিয়েছে তা খণ্ড করে। এই সব শিলাণু কাঠ বা হাড়ের দণ্ড বা হাতলে রজন বা অন্য কোনও আঠা দিয়ে জুড়ে নানা রকম কাটবার যন্ত্র অথবা ক্ষেপণাস্ত্রের ফলা তৈরি করা চলে। খুব সম্ভবত এ ভাবে তীরের ফলাও বানানো হয়েছে, বিদেশে

শিকারীরা তার প্রত্যক্ষ নজির রেখে গিয়েছে ; মধ্য ভারতের গুহাচিত্রেও ধনুর্বাণ দেখা যায়, কিন্তু সেই চিত্র অন্তিম প্রস্তর যুগের বলে দাবি করা হলেও তারিখ নিয়ে সন্দেহ আছে। কোনও কোনও অণুশিলা দেখে মনে হয় তীরের মুখে তা আড়াআড়ি বসানো হয়েছে।

ভারতীয় অণুশিলার সবচেয়ে স্পষ্ট দুটি রূপ হল অর্ধ চন্দ্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র, তা ছাড়া দেখা যায় পাতার মত অথবা দুই পাশ সমান্তরাল আকৃতি, কিন্তু ত্রিভুজ এবং ট্র্যাপিজিয়ামের মত তথাকথিত জ্যামিতিক গড়ন বিরল। শিলাণুর দৈর্ঘ্য সাধারণত ২০-৪০ মিলিমিটার, সর্বদা যে মোটা দিকটাই যন্ত্রে জোড়া হয়েছে তা নয়। বিভিন্ন উপাদানের অংশ জুড়ে তৈরি যুক্ত যন্ত্রের নানা সুবিধা, যেমন পাথর খরচ হয় কম, তাই যন্ত্রও হালকা হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তু থাকে শুধু চোখা মুখ, ফলা ইত্যাদিতে। তা ছাড়া মাত্র কয়েক ধরনের অণুশিলা অদল বদল করেই নানা বিচিত্র যুক্ত যন্ত্র তৈরি সম্ভব। সব রকম তীরের ফলা বানাতে তারা বিশেষ উপযুক্ত, তাই হয়তো দেশে দেশে এই শিলাণু শিল্প ও ধনুর্বাণ এক সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই উপমহাদেশের যন্ত্রীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অণুশিলার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে, যদিও এ যাবৎ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতেই তাদের সন্নিবেশ দেখা যায়। পাকিস্থানে, বিশেষত পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানে, স্পষ্ট কিছু নজির নেই। অন্য দিকে উড়িষ্যা, আসাম ও বাংলাদেশেও অন্তিম প্রস্তর যুগ প্রায় চিহ্নহীন থাকায় পূর্বাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপত্যকা এমন আর এক বন্ধ্যা ভূমি বলে গণ্য, কিন্তু বিগত কয়েক বছরে বিহার, পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যায় তিনটি প্রস্তর যুগেরই বিভিন্ন ঘাঁটি উদঘাটিত হয়েছে।

একমাত্র পাকিস্থানের সাংঘাও গুহা ছাড়া আদি ও অন্তর্বর্তী প্রস্তর যুগের স্থায়ী আশ্রয় এখনও আর কিছু জানা না থাকলেও যন্ত্রপাতির নজির থেকে মনে হয় অন্তিম যুগের ভারতীয়রা খোলা জায়গায় ছাড়াও গুহা ও শিলাশ্রয়ে নিয়মিত অধিকতর স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেছে। এই যুগে ঘাঁটির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও বেড়েছে, ছোট খাটো উন্মুক্ত ঘাঁটি প্রায় সর্বদাই পাহাড় বা উচ্চভূমির চূড়া রেখায়। এ সব জায়গায় সম্ভবত মাটি ডালপালা পাতা দিয়ে দু দিনের পলকা ঘর বাঁধা হত, ছেড়ে গেলে দেখতে

দেখতে যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় দামোদর তীরের বীরভানপুর ঘাঁটির মাটিতে কয়েকটি গর্ত দেখে মনে হয় কুটির বানাতে খুঁটি পুঁতবার জন্য সেগুলি খোঁড়া হয়েছে। আবার নানা জায়গায় ছোট খাটো যন্ত্র সমষ্টি যে পাওয়া গিয়েছে তা বাস স্থলের অবশিষ্ট বস্তু না হয়ে বরং গাছ কাটা বা শিকারের জন্তু কাটা এই রকম কোনও সাময়িক কাজ সেরে বর্জিত বলে মনে হয়। মধ্য ভারত, উত্তর কর্ণাটক ও সিংহলে হাতিয়ার তৈরির অপেক্ষাকৃত বড় বড় কেন্দ্রের আয়তন দেখে অনুমান হয় যে অন্তিম যুগে সহবাসী পরিবারবর্গ ও দল আরও ভারী হয়েছে।

প্রথম দিকে এই যুগের লোকেরাও নিশ্চয় উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার করে পেট ভরিয়েছে, কিন্তু অনুমান করা যায় যে আগের তুলনায় শিকার দক্ষতা বেড়েছে। তামিলনাদু, সিংহল ও পশ্চিমে সাগর উপকূলে নিশ্চয় দৈনিক খাদ্যের এক বড় অংশ ছিল মাছ, তা ধরতে অনেকটা সময় ও শ্রম ব্যয় হয়েছে, যেমন এখনও হয়। অন্তর্দেশে হয়তো যেখানে বারিপাত বেশী সেখানে অপেক্ষাকৃত বড় উপজীব্য ছিল সংগৃহীত ফল মূল, যেখানে তা কম সেখানে শিকার-লব্ধ জন্তু। অবশ্য কাছাকাছি নদী থাকলে তার থেকেও মাছ ধরা হয়ে থাকতে পারে।

দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ভারতে নানা ঘাঁটি উদঘাটিত ও অনুসন্ধিত হয়েছে, তার প্রধান কয়েকটির উপর এ বার আমরা দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাব। গুজরাটের প্রান্তরে, নদী সৈকতে এবং টিলাতে অনেক ঘাঁটি ছিল, টিলাগুলি প্রায়ই প্রাচীন বালিয়াড়ি, এই সব বালু ঢিবির খাতে খোবলে বছরের কিছুটা সময় জল জমে থাকত, সেখানে জন্তুরা আসত তৃষ্ণা মেটাতে। সুতরাং লুকিয়ে অপেক্ষা করলে শিকার ধরা সহজ, তা ছাড়া টিলার উপর থেকে চার দিকে দৃষ্টি রাখা চলে, তাতে নানা সুবিধা। এমনি এক প্রসিদ্ধ স্থান লাংঘনাজে অনেক দিন ধরে বাস করেছে অন্তিম যুগের মানুষ, এ কালের বিজ্ঞানীরা ভাল করে অনুসন্ধান করেছেন তার অবশিষ্ট চিহ্ন। উদ্ধার হয়েছে বিচিত্র জন্তু জানোয়ারের হাড়, যথা গরু মোষ ঘোড়া বুনো শুয়োর নেকড়ে ও কয়েক শ্রেণীর হরিণ, তা ছাড়া বেজি কাঠবেড়াল ইঁদুর কচ্ছপ মাছ ইত্যাদি ছোট প্রাণী। কয়েকটি নর কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছে, তাদের

পা মুড়ে কবর দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে ছিল ঝিনুকের মালা, এ সব ঝিনুক বেশ কিছুটা দূর থেকে সংগৃহীত। আরও উদ্ধার হয়েছে একটি পাথরের হাতুড়ি এবং একশিঙা গণ্ডারের কাঁধের চ্যাপটা হাড় একটি, তার ক্ষতবিক্ষত চেহারা থেকে মনে হয় অণুশিলা তৈরিতে নেহাই রূপে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। অণুশিলার বস্তু হল স্ফটিকশিলা, জ্যাসপার এবং চার্ট পাথরের ছোট ছোট নুড়ি, সম্ভবত প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে সবরমতী নদী থেকে কুড়িয়ে আনা। এ ছাড়া আবিষ্কার হয়েছে নবপ্রস্তর কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দুটি ছোট ছোট ঘষে ধার দেওয়া হাত-কুড়াল।

বস্তুত নিয়মানুগ খননের ফলে লাংঘনাজে পর পর বাস্তু স্তরে অণুশিলা থেকে ধাতুর ব্যবহার পর্যন্ত ক্রমবিবর্তন উদঘাটিত হয়েছে। অবশিষ্ট বস্তুর নজির থেকে দেখা যায় নিম্নতম বাস ভূমির গভীরতা প্রায় দেড় মিটার, তার কিছুটা উপরে পাওয়া গেল নবপ্রস্তর যুগের চিত্রিত মৃৎপাত্রের খণ্ড, তার পর ৯২ সেন্টিমিটার গভীর স্তরে তামার ছুরি এবং আরও উপরে লোহার তৈরি তীরের ফলা একটি।

বহু দিনের প্রাচীন শিকার ও সংগ্রহ বৃত্তি ছেড়ে কৃষি ও পশুপালন শিখে স্বাধীন খাদ্য উৎপাদন নিশ্চয় এক যুগান্তকর বিপ্লব, এই সন্ধি ক্ষণেই নবপ্রস্তর যুগের জন্ম। লাংঘনাজে চাষ ও পালিত পশুর স্পষ্ট চিহ্ন নেই। মাটির নিচ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক দিকে চ্যাপটা কয়েকটি বালু-পাথরের পাটা, সেগুলিতে সম্ভবত বন্য তৃণের দানা অথবা মসলা গুঁড়ো করা হয়েছে, কারণ কৃষিজাত শস্যের কোনও নজির দেখা যায় না। তেমনি গরু মোষের হাড়ও প্রমাণ করে না যে লাংঘনাজবাসীরা তাদের পোষ মানিয়েছিল, পশুগুলি নিকটবর্তী কোনও পালক গোষ্ঠীর থেকে অন্য কিছুর বিনিময়ে পাওয়া অথবা চুরি করা হয়ে থাকতে পারে। খুব সম্ভব অন্তিম প্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগের নানা সম্প্রদায় এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বাস করেছে, হয়তো বেশ কাছাকাছি। বর্তমান শতাব্দীর আধুনিক সভ্য সমাজের মধ্য স্থলে বিশ্বের নানা স্থানে পুরাপ্রস্তর গোষ্ঠীর সহবাস আমরা আগে দেখেছি এবং জানি যে অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপের মধ্যে কেবল কালের নয়, স্থানের ব্যবধানও সম্ভব।

লাংঘনাজের আরও দক্ষিণে ও পূবে মধ্য ভারতও, বিশেষত তার পশ্চিমাংশ অন্তিম প্রস্তর ঘাঁটিতে সমৃদ্ধ, পাহাড়ের গায়ে বা টিলার উপরে সে সব জায়গা থেকে চতুর্দিকে অব্যাহত দৃষ্টি রাখা গিয়েছে। যন্ত্র উপকরণের বৈচিত্র্য ও বর্জিত বস্তুর পরিমাণ থেকে মনে হয় অনেক দিন ধরে ব্যবহার হয়েছে এ সব ঘাঁটি। আজও মধ্য ভারতের উপজাতিরা এই ধরনের আশ্রয় পছন্দ করে, ঘুরে ঘুরে ফিরে এসে দিন কয়েক কাটায়। যন্ত্র তৈরির 'কারখানা' ঘাঁটি কখনও কখনও আরও বড়, আয়তনে অর্ধ হেকটেআরের মত। এ ছাড়া অনেকগুলি শিলাশ্রয়েও যে মানুষের বাস ছিল তার সাক্ষী অপর্যাপ্ত পাথুরে হাতিয়ার ও আবর্জনা, হাড় কাঠকয়লা ও অন্যান্য অবশিষ্ট। রাখাল ছেলেরা তাদের পশু নিয়ে এখনও এ সব শিলাবাসে আশ্রয় নেয়। ১৯৬১-৬৩ সালে মির্জাপুর জেলায় লেখাহিয়া অঞ্চলে দুটি শিলাশ্রয়ের খননে অন্তিম প্রস্তর যুগের হাতিয়ার এবং কয়েকটি সমাধি উদঘাটিত হয়েছে। হাতিয়ার ক্রমশ ছোট হয়েছে এবং তাদের বৈচিত্র্যও বেড়েছে, এক স্তরে মৃৎপাত্র দেখা দিল, তার পর উপরের দিকে তাদের সংখ্যা বেড়ে চলল।

পশ্চিম মধ্য ভারতে বিভিন্ন সমৃদ্ধ ঘাঁটির মধ্যে নর্মদা উপত্যকায় আদমগড় পর্বতের শিলাশ্রয়গুলিও বিধিসম্মত অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভূগর্ভ থেকে প্রায় ২৫,০০০ অণুশিলা উদ্ধার হয়েছে, ৫০ থেকে ১৫০ সেনটিমিটার গভীর কালো মাটি জুড়ে নানা হাতিয়ার নিমজ্জিত ছিল। একটি শিলাবাসের সামনে খাত কেটে প্রায় ৫০০০ যন্ত্রপাতি ছাড়া ৮৫ সেনটিমিটার গভীর মাটি পর্যন্ত মৃৎপাত্রের খণ্ড, ২৫-৪০ সেনটিমিটারের মধ্যে জন্তুর হাড় এবং ১১ সেনটিমিটার নিচু স্তরে লোহা আবিষ্কার হয়েছে। ১৫-২১ সেনটিমিটার গভীরে পাওয়া ঝিনুক তেজী কারবন পদ্ধতি অনুসারে প্রায় ৭০০০ বছর প্রাচীন। প্রাণীর হাড় লাংঘনাজের মতই বন্য ও পালিত প্রজাতির নির্দেশ দেয়, কিন্তু গরু মোষ ও নানা জাতের হরিণ ছাড়া ছাগল এবং ভেড়াও দেখা যায়, উপরন্তু পোষা কুকুর, সজারু ও গোসাপ জাতীয় সরীসৃপের চিহ্ন আছে, কিন্তু গণ্ডারের নেই। গরু, শুয়োর ও ডোরাকাটা হরিণের কিছু হাড়ে পোড়া দাগ। লাংঘনাজের মত আদমগড়ের নজিরও ইঙ্গিত করে যে শেষের দিকে অধিবাসীদের উপর নবপ্রস্তর ও পরবর্তী কৃষ্টির প্রভাব পড়েছিল।

মধ্য ভারতীয় পর্বতমালার পূর্ব সীমান্তে দামোদর উপত্যকায় বীরভানপুরে প্রায় ২৬০ হেকটেআর জুড়ে অণুশিলা ঘাঁটি আবিষ্কার হয়েছে। পাত, বাঁকা চাঁদ, চাঁছনি, ছিদ্রকর যন্ত্র, বিউরিন ইত্যাদি ছিল মাটির প্রায় এক মিটার নিচে এক বাস্তু স্তরে, অথবা আরও গভীরে। এই প্রাচীন জমিতে কয়েকটি গর্ত দেখা গিয়েছে, মনে হয় যেন খুঁটি বসিয়ে কুটির গড়া হয়েছে, বসবাস বা হাতিয়ার তৈরি অথবা দুইয়েরই উদ্দেশ্যে। মাটির পাত্রের কোনও চিহ্ন নেই, প্রাণীর হাড়ও শিকারী-সংগ্রাহক সমাজের চেয়ে উন্নততর কৃষ্টির নির্দেশক নয়। যন্ত্রপাতির দুই-তৃতীয়াংশের বেশী স্ফটিকশিলার তৈরি, উত্তর ভারতীয় ঘাঁটির জ্যাসপার, ক্যালসিদনি ইত্যাদির তুলনায় তা ব্যতিক্রম, দক্ষিণেই বরং স্ফটিক-শিলা এই সব পাথরের চেয়ে সহজলভ্য ছিল।

উত্তর প্রদেশ থেকে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কিছু কিছু আবিষ্কারের দাবি শোনা গিয়েছে, বিধিসম্মত পূর্ণ পরীক্ষার আগে তা কত দূর যথার্থ বলা যায় না। প্রতাপগড় জেলার মহাদহ গ্রামে একটি খাল কেটে চওড়া করা হচ্ছিল, সেখানে ১৯৭৮ সালে মহকুমা শাসক এল. বি. পান্ডে হঠাৎ এক ফসিল খুলি দেখতে পান। তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র, খবরটা জানালেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. আর. শর্মাকে, এর থেকে যাত্রা শুরু হল দূর অতীতে। জানা গেল কয়েক বছর আগে এই খালের কাজ করতে করতে ঠিকাদাররা আরও কয়েকটি খুলি পেয়েছিল, কিন্তু গোপনে তা সরিয়ে ফেলেছে এই ভয়ে যে জানাজানি হয়ে গেলে প্রত্নবিজ্ঞানীরা তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই খুঁড়তে আরম্ভ করবেন। যাই হক, এই নতুন আবিষ্কারের পর সেই কাজ আরম্ভ হল এবং প্রাথমিক ফলাফল থেকে আশা জাগল যে গঙ্গা উপত্যকাবাসী অণুশিলা শিল্পীদের কঙ্কাল পাওয়া যাবে অর্ধশতেরও বেশী। মহাদহে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত আটটি পুরুষ, পাঁচটি স্ত্রী এবং চারটি অনির্দিষ্ট কঙ্কালের প্রাথমিক পরীক্ষা নির্দেশ করে দীর্ঘদেহ সুদর্শন এক জাতি, পুরুষ ও নারীর গড় উচ্চতা যথাক্রমে ১৯১ এবং ১৭৮ সেন্টিমিটার। কিন্তু আয়ু মাত্র ১৭-৩৫ বছর, হয়তো জীবন ধারণ কঠিন বলে। এরা জলের কাছে মৃতদেহ কবর দিয়েছে। মৃতের সমাধি ও সৎকারে সম্ভবত কিছু রীতি নীতি মানা হত, কারণ অধিকাংশ দেহ পুব পশ্চিম বরাবর

শায়িত। এক কবরে একটি নারীর স্থান অন্য এক পুরুষ দেহের উপরে, যদিও আর একটিতে স্ত্রী দেহ পুরুষের বাম পাশে স্থাপিত, মাথা দুটিও বাঁ দিকে ঝুঁকে আছে। আপন জনরা মৃতদের সঙ্গে দিয়েছে অণুশিলা ও কয়েক রকম খোলক। এরা সম্ভবত কোনও পরিযায়ী সম্প্রদায়, এখানে বাস করেছে নদী তীরে, তা ছাড়া ছিল হ্রদ, বন্য জন্তুর হাড় থেকে মনে হয় বন জঙ্গলও ছিল—এখন শুধু বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা ভূমি ধু ধু করছে।

এই অঞ্চলে প্রায় ১০০ "প্রস্তর যুগের" ঘাঁটি উন্মুক্ত হয়েছে, কখনও কখনও প্রায় ৬০ সেনটিমিটার গভীর মাটি থেকে। প্রচুর যন্ত্রপাতি, বিশেষত চওড়া পাত ও চাঁছনি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি বানাতে পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে বিন্ধ্য পর্বত থেকে। প্রাণীর হাড় থেকে জলহস্তী হাতি মোষ হরিণ ভেড়া ছাগল ও কচ্ছপ চেনা যায়। বাসা ও চুলার নজিরও আছে, কুটিরগুলি হয় গোল নয় লম্বা ধরনের। হাড়ের উপর সূক্ষ্ম পল কেটে এরা যে দুল ও হার বানিয়েছে, ভারতে অলংকার ব্যবহারের তা সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন এমন দাবি করা হয়েছে। এ সব অলংকার ও যন্ত্রপাতি নাকি "উচ্চ পুরাপ্রস্তর থেকে মধ্যপ্রস্তর কৃষ্টির বিবর্তনের" প্রথম চিহ্ন। এখানে এখন পর্যন্ত শিকার ও সংগ্রহ ছাড়া অন্য খাদ্য ব্যবস্থার কিংবা নবপ্রস্তর যুগে প্রবেশের কোনও নজির মেলে নি।

এই নতুন যুগে উত্তরণের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে এলাহাবাদের মাজা মহকুমার অন্তর্গত চোপানো-মান্দো ঘাঁটিতে। পরিশেষে বেলান নদীর দুই কূলে প্রায় ২,৯১,৩৭০ হেকটেআর এলাকা জুড়ে সাম্প্রতিক খননে ফসিল, হাতিয়ার ও অন্যান্য বস্তুর প্রচুর সম্পদ উদঘাটিত হয়েছে। দাবি করা হয়েছে অঞ্চলটিতে "নিম্ন পুরাপ্রস্তর থেকে মধ্যপ্রস্তর", এমন কি নবপ্রস্তর এবং কোল্দিওআ-দেওঘাটে তামার ব্যবহার পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ এইচ. ডি. সাংখালিয়ার ভাষায় "পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী" নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ দেখা যায়। অবশ্য আমরা স্মরণ করতে পারি এ সব দাবি প্রাথমিক এবং এখনও বিধিবদ্ধ প্রমাণসাপেক্ষ।

১৯৭৩ সালে উজ্জয়িনী, পুনে ও সুইৎসার্ল্যানড থেকে এক দল বিজ্ঞানী ভূপালের ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভীমবেট্কা নামক জায়গায় গুহাচিত্র

আবিষ্কার করেন, আনুষঙ্গিক প্রাচীন পুরু স্তরে নির্দেশ পাওয়া যায় প্রস্তর যুগের মানুষ "লক্ষাধিক বছর ধরে" এই অঞ্চল ব্যবহার করেছে। এখানে ১০ কিলোমিটার জুড়ে প্রায় ৬০০ গহ্বরের মধ্যে প্রধান গুহাশ্রেণীর নাম ভীমবেটকা (ভীমের স্থল), কারণ কিছু ভীমাকার শিলা পট দেখা যায় বনপরিবৃত এক পাহাড়ের চূড়ায়, বনে শিকারযোগ্য নানা পশুর বাস। শিল্পীরা এদের রূপায়িত করেছে গুহা গাত্রে, লাল রঙে ও মাঝে মাঝে সবুজের ছোঁয়ায় প্রায় ৫০০ ছবিতে এঁকেছে গণ্ডার, বরাহ, বাঘ, হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ, গরু, কুকুর, তা ছাড়া মাছ, কচ্ছপ ও কাঁকড়া। সাম্প্রদায়িক জীবনও ধরা পড়েছে এই শিল্পে, যেমন শিকার ও নৃত্য, এবং আরও পরবর্তী কালে যুদ্ধ ও মিছিল। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের (পুনে) ভি. এস. ওআকাংকার একাধারে প্রত্নবিৎ ও চিত্রশিল্পী, তিনি মনে করেন প্রথম দিকের সরল বিষয়ক ছবিগুলি প্রায় ১০,০০ বছর আগে "মধ্যপ্রস্তর" যুগের কাজ, কিন্তু ভারতে তারিখ নির্ণয় কঠিন এবং এ ক্ষেত্রেও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। যদি সত্যিই প্রমাণ হয় যে ভীমবেটকার চিত্র সম্ভার প্রাক্‌নবপ্রস্তর তা হলে এ যাবৎ আবিষ্কৃত ভারতীয় চারুশিল্পের মধ্যে তারা প্রাচীনতম ; বর্তমানে সেই সম্মানের অধিকারী শ্রীনগরের সন্নিকটে বুর্জাহোমে প্রাপ্ত এক খণ্ড পাথরে খোদাই করা ছবি, তা নিশ্চিত নবপ্রস্তর যুগের, ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সৃষ্টি। যাই হক, গণ্ডার ও কুকুরের অস্তিত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ প্রথমটি এখন ভারতে বিরল হয়ে এসেছে এবং কুকুর মধ্যপ্রস্তর য়োরোপের প্রথম পালিত পশু হতে পারে। আরও এক সম্মান ভীমবেটকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সেখানে প্রাপ্ত খুলি ও অস্থি খণ্ড নাকি ভারতে খাঁটি মানুষের প্রাচীনতম ফসিল। কিন্তু এই দাবিও বিতর্ক-কণ্টকিত।

ভীমবেটকার মত মধ্য ভারতের অন্যান্য গুহায়ও নাচের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে, দেখে মনে হয় এই সব আসরে বেশ কয়েকটি পরিবার বা দল একত্র হত। আমরা যেমন ঘরে ছবি টাঙাই তেমনি এই সব গুহাবাসী দেয়াল ও ছাত সাজিয়েছে কখনও একটি মূর্তি কখনও বা কোনও দৃশ্যের ছবি এঁকে, তাতে সাধারণত জন্তু জগৎই প্রধান। শিল্পীরা ব্যবহার করেছে হিমাটাইট জাতীয় স্বাভাবিক রঙিন খড়ি, আশেপাশে তার খণ্ড এখনও

রয়েছে সাক্ষী। সাধারণত ছবি আঁকা হয়েছে বিন্ধ্যীয় বালুপাথরের গোলাপী-হলদে অথবা হালকা হলদে-বাদামী পশ্চাৎপটে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেগুনি-লাল, লাল এবং হালকা কমলা-বাদামীর প্রলেপে। কোথাও শিলাপটের স্বল্পপরিসর সমতল অংশে দেখা যায় একা এক একটি প্রাণী, যেখানে জায়গা হয়েছে সেখানে তাদের দল অথবা শিকারের দৃশ্য রূপায়িত, যেমন আদমগড় শিলাশ্রয়শ্রেণীর গণ্ডার শিকারের ছবি। শিল্প কৌশলেও নানা বৈচিত্র্য, কোথাও জন্তুদের ফুটিয়েছে শুধু গাঢ় বহিররেখায়, কোথাও দেহ সম্পূর্ণ ভরে দিয়েছে অথবা আড়াআড়ি রেখায় আংশিক ভাবে। মির্জাপুর জেলার মোরানা পাহাড়ের শিলাশ্রয়গুলিতে এই তিন কৌশলই দেখা যায়। হরিণ ও কৃষ্ণসার মৃগের ছবি সবচেয়ে বেশী, তাদের দেহ মোটা কিন্তু পা ও শিং সরু। বুনো শুয়োর, গণ্ডার, হাতি, মোষ, গরু ও বানর অপেক্ষাকৃত বিরল। কোথাও কোথাও মানুষও বর্তমান, কখনও শিকারের দৃশ্যে পশুর সঙ্গে এবং অন্যান্য বড় ছবিতে, কখনও বা একা অথবা দলে, এমন কি জন্তুর মাথাযুক্ত নর মূর্তিও আঁকা হয়েছে কোন খেয়ালে কে জানে। তা ছাড়া আছে বস্তু এবং সমষ্টির নকশা যা ঠিক চেনা যায় না, যথা চার দিক সমান বা লম্বাটে চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, তাদের অংশ জুড়ে আড়া-আড়ি দাগ টানা। এগুলি কুটির বা ঘেরা জায়গার রূপায়ণ হতে পারে, দেখে য়োরোপীয় গুহাচিত্রে অনুরূপ নকশা মনে পড়ে। পশু ও বিশেষ করে মানুষ মূর্তিগুলি কিছুটা সাংকেতিক ও অবাস্তব হলেও অনেকেই আড়ষ্ট নয়, বরং প্রাণবন্ত, কর্মচঞ্চল। মানুষদের হাতে ধনুর্বাণ ও বর্শা, অথবা তারা সারি বেঁধে নৃত্যরত। তা ছাড়া, কখনও কখনও কিছু অসাধারণ ঘটনাও ছবিতে ধরা হয়েছে, যেমন মোরানা পাহাড়ের চিত্রে বর্শা ও তীর ধনুক হাতে লোকেরা চার ঘোড়ায় টানা দু চাকার এক রথ আক্রমণ করছে।

দক্ষিণ ভারতে উত্তর কর্নাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের গ্র্যানিট পাথরের পটে কয়েকটি ঘাঁটিতে শিল্পীরা কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছে। ছবির বিষয়, রং ও অংকন কৌশল উপরোক্ত মধ্যভারতীয় চিত্রের মত—রঙিন খড়িতে আঁকা জন্তু ও কাঠির মত মানুষ। পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রূপায়িত বড় কুঁজওয়ালা ষাঁড়, তাদের লম্বা শিঙে কখনও কখনও সাজসজ্জা দেখা যায়,

যেন কোনও উৎসব উপলক্ষে। তা ছাড়া হাতি, কখনও পিঠে আরোহী নিয়ে, কুড়াল বা বর্শা হাতে মানুষ, কখনও বা তারা ঘোড়ায় চড়ে—প্রায় নিঃসন্দেহে এ সব ছবি পরিণত নবপ্রস্তর আমলের সৃষ্টি। কিন্তু মাঝে মাঝে হরিণ ও বাঘও দেখা যায়, তা যেন পূর্বতন শিকারী সমাজের প্রতি নির্দেশ করে। তেমনি মধ্য ভারতীয় শিল্পেও ঘোড়ায় টানা রথ এবং বাহনে আরোহী ব্যক্তিদের ছবি অন্তিম প্রস্তর যুগের শিকার ও শিকারের জন্তুর ছবির চেয়ে বিরল ও অনেক আধুনিক। ওআকাংকার মধ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় শিলাচিত্রের এক প্রাথমিক ও প্রমাণসাপেক্ষ কালপঞ্জী প্রস্তাব করেছেন, তদনুসারে এই শিল্পের মেয়াদ দীর্ঘকালীন।

এই সব ছবি মানুষের সামাজিক জীবন, দৈনিক প্রয়োজনের কাজ এবং অবসর বিনোদনের খবর দেয়, কিন্তু এদের মধ্যে তার স্বাভাবিক শিল্পানুরাগও বিকাশমান। এই অনুরাগ কখনও কখনও যন্ত্রশিল্পীদের মার্জিত সৃষ্টিতেও ফুটে উঠেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে অন্যত্র ক্রোমানীয়দের মনোরম পাথুরে উপকরণেও লক্ষ্য করেছি। পশ্চিম মধ্য ভারত একাধারে শিলা শিল্প ও উন্নত অণুশিলার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, এই সব ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ডে যে সৌকর্য ও সূক্ষ্মতা দেখা যায় শুধু মাত্র কার্যকারিতার খাতিরে তা নিষ্প্রয়োজন; পাতগুলির আশ্চর্য সমতা ও সূক্ষ্মতার ফলে তাদের পল থেকে আলো ঠিকরে আজকের জহুরীর কাটা মণির মতই জ্বলজ্বল করে।

সুতরাং এই উপমহাদেশে চাষবাস ও স্থায়ী বাস্তু ব্যবস্থার আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রস্তর যুগের যে চিত্রটি আমরা পাই তার সাধারণ ধারাটা পৃথিবীর অন্যত্র যা দেখেছি তার থেকে ভিন্ন নয়। যাযাবর মানুষের দল বনের পশু, জলের মাছ, আহার্য শিকড় বাদাম ইত্যাদির খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, অল্প বিস্তর কাল কাটে গুহায়, শিলাশ্রয়ে, খোলা নদী তীরে। সর্বদা চলেছে কাঠ হাড় পাথর থেকে যন্ত্র উপকরণ তৈরি, প্রথমে রুক্ষ অষ্ঠি থেকে শুরু করে ক্রমে ফলক ও পরিশেষে অণুশিলায় এই হাতিয়ার শিল্পের বিবর্তন। এই অন্তিম পর্বে নবপ্রস্তর ও পরবর্তী কৃষ্টিরও কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করেছে এখানে সেখানে, সাম্প্রদায়িক জীবনের কিছু কিছু

চিহ্ন ও চারুশিল্প প্রীতিও চোখে পড়ে আমাদের। গুণে য়োরোপীয় গুহা-চিত্রের সঙ্গে ভারতীয় শিলাচিত্রের তুলনা হয় না, তবে দুইয়েরই প্রাণবস্তু প্রধানত পশু জগৎ ও শিকার।

কিন্তু য়োরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার সমকালীন মানুষ সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তার তুলনায় আমাদের স্বদেশী পূর্বপুরুষদের বিষয়ে জ্ঞান নিতান্তই সামান্য, কারণ আলোচ্য কালের একেবারে অন্তিমে ছাড়া তারিখ-সুনির্দিষ্ট ফসিলের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব। যদিও আদিতম কাল থেকেই, সম্ভবত হোমো ইরেকটাসের আমল থেকে, মানুষ এ দেশে বাস করেছে, অধিকাংশ দৃশ্যে নাটমঞ্চ প্রায় ফাঁকা এবং অভিনেতৃবৃন্দ পর্দার আড়ালে অদৃশ্য। আগামী কালের অন্বেষণে তারা মূর্তি নেবে এই আমাদের আশা।

১৩। শেষের কথা

মানুষের দৈহিক ও মানসিক অভিব্যক্তির এই দীর্ঘ কাহিনীর শেষে আমরা যাদের দেখছি, প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর অতীতে প্রত্যুষের আদিতম পূর্বপুরুষের থেকে তারা বহু দূর এগিয়ে এসেছে। প্রথমে আগুন কাজে লাগাতে শিখে নানা দিকে জীবন ধারণ সহজ হল। পরে মানুষের হাতে মহান চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, অলংকার ও দেহ সজ্জায় আমাদের মতই সৌন্দর্য প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। পাশবিক প্রবৃত্তি ছিল—তা আজও আছে—কিন্তু তারই মধ্যে স্নেহ মমতার মত মানবিক ধর্মেরও বিকাশ দেখা যায়, যেমন ফুল সাজিয়ে মৃতের সৎকারে, সঙ্গে পরলোকের প্রয়োজনীয় বস্তু উপহারে। কিন্তু কালের পটে এই অগ্রগতি অতীব মন্থর—আগুন ব্যবহার ও তার সৃষ্টির মধ্যেই বহু লক্ষ বছরের ব্যবধান।

উপরন্তু বর্তমান দৃষ্টি স্থল থেকে পিছনে তাকালে দেখা যায় আমাদের কাহিনী যেখানে শেষ তৎকালীন মানুষ অনেকটা দূরে পড়ে আছে। আজ মাঠে বনে ঘুরে ফল মূল বীজ বাদাম সংগ্রহ করে এনে পেট ভরাতে হয় না, মাংস খেতে শিকারের বিপদ ও অনিশ্চয়তা মানতে হয় না, ফলে সে কালের যাযাবর মানুষ এখন স্থায়ী গৃহস্থ। তার অস্ত্র উপকরণে পাথরের বদলে ধাতু, পরনে বোনা কাপড়, স্থলযান চাকায় গড়িয়ে চলে। যে আবিষ্কার সমষ্টি এই সব এবং আরও অনেক অগ্রগতি সম্ভব করেছে তা কিন্তু সাধিত হয়েছে আমরা যেখানে শেষ করছি তার মাত্র হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে, নবপ্রস্তর বিপ্লবের পর তখন মানুষের সৃজনী প্রতিভা দেখতে দেখতে স্থাপন করল সভ্যতার ভিত। দ্রুত আবিষ্কার ও উদভাবনের এই রোমাঞ্চক ইতিহাস এবং তার সঙ্গে মানুষের সমাজ ও ধ্যান ধারণার অভিব্যক্তির সূত্র অনুসরণ করেছে আমাদের পৃথক ও তৃতীয় গ্রন্থ।

নির্দেশিকা

(প্রধান বিষয়গুলির প্রধান উল্লেখ ; দ্র.=দ্রষ্টব্য)

অজাচার incest
অণুশিলা microlith
অধিবৃত্তিক parabolic
অভিব্যক্তি evolution
অষ্ঠি core

আজিলীয় Azilian
আদেশ দণ্ড baton de commandement
আধুনিক মানুষ Homo sapiens sapiens
আশলীয় Acheulian

উপজাতি tribe
উপপ্রজাতি subspecies
উপবৃত্তিক elliptical

একগামিতা monogamy

ওঝা shaman, witch doctor
ওরিনাসীয় Aurignacian
ওল্‌ডুভীয় Olduvian

কাটারি chopper
কৃত্রিম নির্বাচন artificial selection
কৃন্তক incisor
কৃষ্ণসার মৃগ antelope
ক্যাপ্‌সীয় Capsian

খনন দণ্ড digging stick
খাঁটি মানুষ true man ; দ্র. আধুনিক মানুষ

গণ genus
গলবিল pharynx
গেরিমাটি ochre
গোত্র order

ঘাঁটি site

চকমকি flint
চাঁছনি scraper
চার্ট chert

ছিদ্রকর যন্ত্র awl
ছেদক canine

জননী দেবী mother goddess, Venus
জাতি race

টুকরো শিল্প art mobilier

তেজস্ক্রিয় radioactive

নবপ্রস্তর যুগ Neolithic age
নুড়ি pebble

পরিযাণ migration
পরিযায়ী migratory
পাত blade
পিতৃতন্ত্র patriarchy

পুরঃপেষক premolar
পুরাপ্রস্তর যুগ Palaeolithic age
পেরিগর্দীয় Perigordian
পেষক molar
প্রকার variety
প্রজনন breeding
প্রজাতি species
প্রাক্‌মানব hominid
প্রাকৃতিক নির্বাচন natural selection
প্রাণী animal

ফলক flake

বংশকণিকা gene
বর্গ family
বর্শা-ক্ষেপণদণ্ড spear-thrower
বাটালি burin
বিবর্তন evolution
বেলন cylinder

মধ্যপ্রস্তর যুগ Mesolithic age
মাতৃতন্ত্র matriarchy
মাদলেনীয় Magdalenian
মুস্‌তেরীয় Mousterian
মেরুদণ্ডী vertebrate

যাদুকর shaman, witch doctor

লেভালোআ Levallois

শারীরস্থান anatomy
শিলাশ্রয় rock shelter
শ্রেণী class
শ্রোণীচক্র pelvis

সংকর hybrid
সংগ্রাহক gatherer
সলুত্রীয় Solutrean
সুষুম্নাকাণ্ড spinal cord
স্তন্যপায়ী mammal
স্ফটিক, স্ফটিকশিলা quartz

হাত-কুড়াল hand-axe

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
৩১	২৫	আডিস আবাধা	আডিস আবাবা
৪৮	৩	সদৃশ্য	সদৃশ
৬২	২৩	কিছ	কিছু
৬৮	২০	আবিস্কৃত	আবিষ্কৃত
৭৩	৫	তন্দল য়	তন্দলীয়
৯০	৯	মের্গনথ্রপাস	মেগানথ্রপাস
১৪৫	৪	জিব্রলটরে	জিব্রলটারে
১৫৫	৯	ই কেভ	ই. কেভ
১৫৯	২৫	আশীলয়	আশলীয়
১৯৮	২১	কূঁজো	কুঁজো
২০৭	১০	দর্দইনে	দর্দনিয়তে

অজাচার incest
অণুশিলা microlith
অধিবৃত্তিক parabolic
অভিব্যক্তি evolution
অষ্ঠি core

আজিলীয় Azilian
আদেশ দণ্ড baton de commandement
আধুনিক মানুষ Homo sapiens sapiens
আশলীয় Acheulian

উপজাতি tribe
উপপ্রজাতি subspecies
উপবৃত্তিক elliptical

একগামিতা monogamy

ওঝা shaman, witch doctor
ওরিনাসীয় Aurignacian
ওল্ডুভীয় Olduvian

কাটারি chopper
কৃত্রিম নির্বাচন artificial selection
কৃন্তক incisor
কৃষ্ণসার মৃগ antelope
ক্যাপ্সীয় Capsian

খনন দণ্ড digging stick
খাঁটি মানুষ true man ;
দ্র. আধুনিক মানুষ

গণ genus
গলবিল pharynx
গেরিমাটি ochre
গোত্র order

ঘাঁটি site

চকমকি flint
চাঁছনি scraper
চার্ট chert

ছিদ্রকর যন্ত্র awl
ছেদক canine

জননী দেবী mother goddess, Venus
জাতি race

টুকরো শিল্প art mobilier

তেজস্ক্রিয় radioactive

নবপ্রস্তর যুগ Neolithic age
নুড়ি pebble

পরিযাণ migration
পরিযায়ী migratory
পাত blade
পিতৃতন্ত্র patriarchy

পুরঃপেষক premolar
পুরাপ্রস্তর যুগ Palaeolithic age
পেরিগর্দীয় Perigordian
পেষক molar
প্রকার variety
প্রজনন breeding
প্রজাতি species
প্রাক্‌মানব hominid
প্রাকৃতিক নির্বাচন natural selection
প্রাণী animal

ফলক flake

বংশকণিকা gene
বর্গ family
বর্শা-ক্ষেপণদণ্ড spear-thrower
বাটালি burin
বিবর্তন evolution
বেলন cylinder

মধ্যপ্রস্তর যুগ Mesolithic age

মাতৃতন্ত্র matriarchy
মাদলেনীয় Magdalenian
মুস্তেরীয় Mousterian
মেরুদণ্ডী vertebrate

যাদুকর shaman, witch doctor

লেভালোআ Levallois

শারীরস্থান anatomy
শিলাশ্রয় rock shelter
শ্রেণী class
শ্রোণীচক্র pelvis

সংকর hybrid
সংগ্রাহক gatherer
সলুত্রীয় Solutrean
সুষুম্নাকাণ্ড spinal cord
স্তন্যপায়ী mammal
স্ফটিক, স্ফটিকশিলা quartz

হাত-কুড়াল hand-axe

প্রায় ৪০ লক্ষ বছর আগে আগ্নেয়গিরির উদ্গার থেকে পালাতে পালাতে কারা পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে…মানুষ ও বনমানুষের কোন বকচ্ছপ খুলিটি পণ্ডিতদের বোকা বানিয়েছিল…কোন প্রাচীন মহিলাটির আদুরে নাম লুসি…আগুন হাতে পেয়ে মানুষের চেহারা ভদ্র হল কি করে…মানুষের জন্ম আফ্রিকায় না এশিয়ায়…নরখাদকবৃত্তি ও শিশু হত্যা কত প্রাচীন…প্রত্নতত্ত্বের কোন কোন আশ্চর্য আবিষ্কারের পথ দেখিয়েছে কুকুর ও নাবালক…৬০,০০০ বছর আগে কারা ফুলশয্যায় প্রিয়জনকে কবর দিয়েছে…ঘনান্ধকার গুহায় জল সাঁতরে প্রাচীন মানুষ বহু দূর এগিয়েছে কেন…এমনি আরো অনেক প্রশ্নের আলোচনা বা জবাব আছে এই বইতে।

শচীন্দ্রনাথ বসুর 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থটি তার দ্বিতীয় ও প্রধান ভাগের পরিবর্ধিত ও আধুনিক সংস্করণ এবং এক স্বসম্পূর্ণ কাহিনী। বহু লক্ষ বছর দূর অতীতে বনমানুষের সূত্রে মানুষের সৃষ্টি থেকে পুরাপ্রস্তর যুগের সূচনা, মাত্র হাজার দশেক বছর আগে তার শেষ। এই দীর্ঘ কাল ধরে খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার করে, বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে টিকে থাকা ছিল প্রধান চিন্তা। প্রথমেই দ্বিপদ চলন পেয়ে কতগুলি সুবিধা হল, মুক্ত হাত দুটির কুশলতা ও সেই সঙ্গে মেধা বাড়ল। আগুন হাতে পেয়ে নানা দিকে সহজ হল জীবন। বর্তমান খাঁটি মানুষের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা, তার আগে এসেছে গিয়েছে রুক্ষ অসংস্কৃত পূর্বপুরুষরা, কিন্তু তাদের মানসেও উঁকি দিয়েছিল মৃতের প্রতি মমতা, সৌন্দর্য প্রীতি ইত্যাদির অংকুর। মানবিক বৈশিষ্ট্য ও পটুতার দ্রুত বিকাশ দেখা যায় খাঁটি মানুষের সমাজে, তার চরম দৃষ্টান্ত য়োরোপের আশ্চর্য সুন্দর গুহাচিত্র। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিশাল মহাদেশে এরাই প্রথম পা দিল, উদ্ভাবনী কৌশলে দেশে দেশে বিরুদ্ধ পরিবেশেও স্থান করে নিল। কিন্তু সমাজ তখনো অসংহত, প্রায় সর্বাংশে যাদু ও টোটেম তন্ত্রের অন্ধসংস্কারে আবদ্ধ, যাযাবর জীবনে খাদ্য সংগ্রহের ভাগ্য অনিশ্চিত, নবপ্রস্তর বিপ্লবের আগে যার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় নি।

পুরামানবের দেহ মনের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির বর্ণনা এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের বিষয়। নানা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা ও বই থেকে লেখক সযত্নে সংগ্রহ করেছেন অত্যাধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের খবর।

বিজ্ঞানের কৃতী অধ্যেতা শচীন্দ্রনাথ বসু লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর উপাধি লাভ করেন, তাঁর কর্মজীবন প্রাণিবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কেটেছে। আবার তরুণ বয়স থেকে তিনি সাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট, এই ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয় গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিবিধ সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এই দুই ধারার সংযোগ বিরল, এই কারণে তাঁর বিজ্ঞানিক রচনা বৈজ্ঞান-অজ্ঞানী বা অল্পবয়স্ক পাঠকদেরও হৃদয়গ্রাহী হয়। সরল অনাড়ম্বর ভাষা ও সাবলীল লিখনভঙ্গির গুণে এই বইতে জানার বস্তু হয়েছে উপন্যাসের মত সরস।